বিক্রমপুরের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড

[দ্বিতীয় সংস্করণ]

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

১৩৪৬

অর্দ্ধনারীশ্বর

সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সন্নিধান-বিলসন্নান্দী-নিনাদোর্ম্মিভিঃ
নির্ম্মর্য্যাদর রসার্ণবো দিশতু বঃ শ্রেয়োর্দ্ধনারীশ্বরঃ ॥
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভটৈ
র্নাট্যারম্ভরসৈর্জ্জয়ত্যভিনয়-দ্বৈধানুরোধশ্রমঃ ॥

[বল্লাল সেনের তাম্রশাসন। লেথক কর্ত্তৃক পুরাপাড়ার দেউল হইতে মূর্ত্তিটি সংগৃহীত।]

বিক্রমপুরের ইতিহাস

[প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে মুসলমান-বিজয় পর্য্যন্ত]

প্রথম খণ্ড

পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থা যুগ-যুগ-ধাবিত-যাত্রী,
তুমি চিরসারথি তব রথচক্রে মুখরিত দিবারাত্রি।

—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

প্রণীত

চিত্র ও মানচিত্র সম্বলিত

দ্বিতীয় সংস্করণ
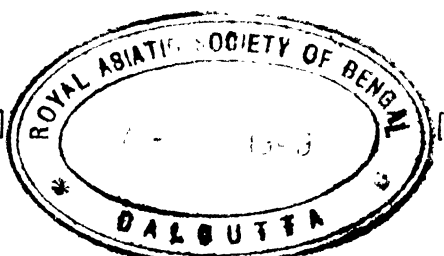
উৎসর্গ

যাঁহার মৃত্যুতে সমগ্র সংসার আমার
নিকট ভীষণ অন্ধকারময় বোধ
হইতেছে,
যিনি আমার একটী নগণ্য ক্ষুদ্র কবিতা পাঠেও
কত না আনন্দ প্রকাশ করিতেন
এবং
যাঁহার আদেশেই মাতৃভূমির এ-প্রাচীন
ইতিহাস সংকলনে প্রবৃত্ত হই
আমার সেই সরল হৃদয়, উদার ও পরোপকারী
স্বর্গত পিতৃদেব
মহেন্দ্রচন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের পুণ্য নামে
মাতৃভূমির এ-পুণ্য ইতিহাস
উৎসৃষ্ট করিয়া
কৃতার্থ হইলাম।

৩০শে আশ্বিন ১৩১৬

প্রথম সংস্করণের গ্রন্থকারের নিবেদন

সোণার শৈশবে মা ও দিদিমার মুখে যখন রামপালের কাহিনী শুনিতাম, সে গজারী বৃক্ষের কথা, রামপাল দীঘির কথা, বল্লাল রাজার যুদ্ধ, রাণীদের অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন, কেদার রায়ের জীবনোৎসর্গ সে কাহিনী শুনিতে শুনিতে আত্মহারা হইয়া যাইতাম আরও শুনিতে সাধ যাইত, কিন্তু তাঁহারা আমার সেই সাধ পূর্ণ করিতে পারিতেন না ; সেই শৈশবেই বিক্রমপুরের অতীত গৌরবের পুণ্য ইতিহাস আমার হৃদয়ে গাঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছিল। তারপর বয়ঃবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সে সুপ্ত বাসনা জাগরিত হইয়া আমাকে দেশের ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করে, তাহারি ফলে সাত আট বৎসরের পরিশ্রমের পর নানা বাধা বিঘ্ন ও শোক-ঝঞ্ঝার ভিতর দিয়া এতদিনে বিক্রমপুরের ইতিহাস জনসাধারণের নিকট উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছি।

আমার ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে বিক্রমপুরের ন্যায় প্রাচীন ও ইতিহাস-বিখ্যাত প্রসিদ্ধ স্থানের ইতিহাস রচনা করিতে যাওয়া যে ধৃষ্টতা, তাহা বুঝিযাও যে কেন আমি এমন গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, তাহার উত্তর দিতে আমি অক্ষম। ছেলে মাকে ভালবাসে, মায়ের কথা শুনিতে ও বলিতে তাহার ভাল লাগে, তার শৈশব-সুলভ সরলতাপূর্ণ বাক্য-বিন্যাসে সে মায়ের কতই না গুণ বর্ণনা করে এবং তাহাতেই তাহার তৃপ্তি হয় ; তেমনি আমার মাতৃভূমির প্রতি তরু, প্রতি লতা, প্রতি মস্‌জিদ, প্রতি মঠ, প্রতি দেবালয় ও প্রতি মৃত্তিকা-কণার মধ্য হইতে বিশ্বজননীর যে চেতনাময় আহ্বান আমাকে তাঁহারি গুণ গানে হৃদয়ে প্রেরণা জাগাইয়া দিয়াছিল,—ইহা কেবল তাহারি বিকাশ।

এরূপ বিরাট ব্যাপার আমার দ্বারা সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়াছে এরূপ অন্ধ বিশ্বাস আমার নাই এবং তাহা থাকিতেও পারে না। যে দেশের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধতমসাচ্ছন্ন, সে দেশের ইতিহাসালোচনা করা যে কিরূপ দুরূহ ব্যাপার তাহা ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরের পক্ষে অনুধাবনা করা অসম্ভব। কাজেই গ্রন্থ মধ্যে বহু ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হইবে তাহা আমি বিশেষরূপেই জ্ঞাত আছি, তবে এ আশা করাও বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে উদার হৃদয় পাঠকবর্গের দৃষ্টি সে দিকে ধাবিত হইবে না।

প্রথমে ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত 'আরতি' নামক মাসিক পত্রিকাতে 'বিক্রমপুরের ইতিবৃত্ত' নামে বিক্রমপুরের কতকাংশ প্রকাশিত হয়, তৎপরে 'প্রবাসী', 'জাহ্নবী', 'নব্যভারত', 'সুপ্রভাত', 'মানসী', 'ঐতিহাসিক চিত্র' ও 'সাহিত্য' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাদিতেও এতদ্‌সম্পর্কিত বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। এখন সে সকল প্রবন্ধাদি সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও বহু নূতন নূতন বিষয় সন্নিবিষ্ট করিয়া বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশ করিলাম। অতি প্রাচীনকাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের সমগ্র ইতিহাস যথাসাধ্য আলোচনা করিয়াছি, প্রাচীন কিম্বদন্তী সমূহও উপেক্ষা করি নাই। নানা প্রকার প্রাকৃতিক বিপ্লব হেতু ও সময়ের পরিবর্ত্তনে বিক্রমপুরের এতদূর পরিবর্ত্তন হইয়াছে যে প্রকৃত প্রাচীন ইতিহাস অনেকস্থলে যথার্থরূপে জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব ; দিন দিন ইতিহাসানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে বহু নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হওয়ায় বহু প্রাচীন সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত ও নবীন সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গৃহীত হওয়ায় ইতিহাসের প্রকৃত সত্য এখন পর্য্যন্তও সম্পূর্ণরূপে উদ্‌ঘাটিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি না। আর ইতিহাসের পক্ষে তাহা কখনই সম্ভবপর নহে। কাজেই আমরা যাহা লিপিবদ্ধ করিয়াছি তাহাই যে অভ্রান্ত সত্য এমন কথা কেমন করিয়া বলিব ? বঙ্গ-গৌরব প্রসিদ্ধ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের ন্যায় মহৎ ব্যক্তির ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তসমূহই যখন দিন দিন ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, তখন আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র ব্যক্তির পক্ষে কোন কথা জোর করিয়া বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা নহে কি ?

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, এই গ্রন্থ প্রণয়নে যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের প্রত্যেকের নিকট আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বিক্রমপুরের অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে যাঁহারা সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নামোল্লেখ না করিলেও বোধ হয় বিশেষ ক্রটী বলিয়া বিবেচিত হইবে না। তাঁহাদের সংখ্যাও অনেক। কেবল নামের তালিকাই দিতে গেলে, দুই তিন পৃষ্ঠা হইয়া পড়িবে। তাহা পাঠে তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা অপেক্ষা, পাঠকের প্রতি অত্যাচার করা হইবে। কাজেই আমার তাহাতে নিরস্ত হইতে হইল, এবং আমার স্বদেশী বন্ধুবর্গও সেজন্য আমায় অকৃতজ্ঞ ভাবিয়া ক্ষুব্ধ হইবেন তাহাও আমার মনে হয় না।

এতদতিরিক্ত যাঁহারা আমাকে সাহায্য করিয়াছেন তন্মধ্যে বিখ্যাত 'প্রবাসী' ও 'মডার্ণ রিভিউর' সম্পাদক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এম, এ, মহোদয় ও ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রণেতা, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত কেদারনাথ মজুমদার এম, আর, এ, এস্, মহোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। শ্রদ্ধাভাজন রামানন্দ বাবু আমাকে কয়েকখানা হাফটোন্ ব্লক প্রদান করিয়া এবং কেদার বাবু ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দের এসিয়াটিক সোসাইটির জার্ণেলে প্রকাশিত রাজাবাড়ীর মঠের একখানা লিথো-চিত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। আর একজন মহাত্মার কথাও এখানে উল্লেখ না করিলে আমার পক্ষে অকৃতজ্ঞতা হয়, তিনি ময়মনসিংহ কালীপুরের প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী সাহিত্যসেবী বিখ্যাত পর্যটক শ্রীযুক্ত ধরণীকান্ত লাহিড়ী চৌধুরী মহাশয়, ইঁহার স্নেহ-ঋণ আমার পক্ষে অপরিশোধনীয়। যে সকল প্রাচীন ঐতিহাসিক গ্রন্থ আমার ন্যায় দরিদ্রের পক্ষে সংগ্রহ করা অসম্ভব হইত, তিনি আমার সাহায্যার্থ বহু অর্থ ব্যয় করিয়াও সে সকল গ্রন্থাদি ক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার এ দয়া ও স্নেহ আমি জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না।

আজ বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রকাশিত হইল, কিন্তু আমার হৃদয় শোকভারে নত হইয়া আসিতেছে। দু'জনের শোক-স্মৃতি আমাকে ব্যথিত করিতেছে, একজন আমার পরম পূজ্যপাদ পিতৃদেব, অপর আমাদের গ্রামবাসী আমার পরম স্নেহভাজন স্বর্গীয় প্রভাতচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। আমার দুর্ভাগ্য—পিতৃদেবের জীবিতাবস্থায় তাঁহার আদেশে রচিত এই পুণ্য ইতিহাস তাঁহার চরণকমলে অর্পণ করিতে পারিলাম না। আর প্রভাত, সে আমার ছাত্র ও সুহৃদ উভয়ই ছিল। এই বিক্রমপুরের ইতিহাসের জন্য তাহার কতই না আগ্রহ ছিল। যেদিন বিক্রমপুরের ইতিহাস প্রেসে দিই, সেদিন তাহার নয়নে যে উজ্জ্বল প্রফুল্লতার বিকাশ দেখিয়াছিলাম, মুদ্রিত গ্রন্থখানি তাহার হস্তে অর্পণ করিয়া আর সে আনন্দ লাভ করিতে পারিলাম না। প্রভাত, প্রভাতী-তারার মত তাহার অপাপ-বিদ্ধ সরল সুন্দর হৃদয় লইয়া যৌবনের বসন্ত প্রভাতে সেফালীর ন্যায় ঝরিয়া গিয়াছে। আজ দু'বিন্দু অশ্রুর তীব্র-তাড়নায় আমার অন্তরের অন্তস্থল পর্য্যন্ত ব্যথিত হইতেছে!

বহু ভাষা এবং ইতিহাসবিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমার এই সামান্য পুস্তকের ভূমিকা লিখিবার ভার লইয়া আমায় যে কৃতজ্ঞতা ও স্নেহ-পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা প্রকাশের ভাষা আমার নাই।

যদি গ্রন্থ মধ্যে কেহ কোনও ভ্রমপ্রমাদ দর্শন করেন, তাহা আমাকে জানাইলে ভবিষ্যৎ-সংস্করণে কৃতজ্ঞতার সহিত সংশোধন করিয়া দিব। দেশের লোকের নিকট আশা ও উৎসাহ পাইলে শীঘ্রই বিক্রমপুর-কাহিনী ও বিক্রমপুরের পল্লীবিবরণ লইয়া উপস্থিত হইবার বাসনা আছে।

বিক্রমপুরের ইতিহাসকে পরিষদ্ গ্রন্থাবলীভুক্ত করা হইল। ইতি

পোঃ মূলচর—মুন্সীবাড়ী
মহেন্দ্র-কুটীর—জিঃ ঢাকা
৩০শে আশ্বিন, ১৩১৬

বিনীত নিবেদক
শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

দ্বিতীয় সংস্করণের কথা

ত্রিশ বৎসর পরে 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। ১৩১৬ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখে ইহার প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়, আর এই দ্বিতীয় সংস্করণও প্রকাশিত হইল ঠিক্‌ ত্রিশ বৎসর পরে ১৩৪৬ সনের ৩০শে আশ্বিন তারিখে। মানুষের জীবন ক্ষণস্থায়ী, আমার অনেক সময় এইরূপ একটা কথা মনে হইয়াছে বুঝিবা আমার জীবিতকালে এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ আর প্রকাশ করিয়া যাইতে পারিব না, কেন না ত্রিশ বৎসর কাল মানুষের জীবনে বড অল্প সময় নহে।

সেই যৌবনের প্রারম্ভে ২৪।২৫ বৎসর মাত্র বয়সে যে দুঃসাহসিক কার্য্যে হাত দিয়াছিলাম, আবার প্রৌঢ় বয়সে সেই কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত ইহা কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না, তাই সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে মাথা নত করিতেছি।

'বিক্রমপুরের ইতিহাস' যে সময়ে প্রকাশিত হয় সেই সময়ে ঐতিহাসিক বলিয়া যাঁহারা জনসমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই আজ পরপারে চলিয়া গিয়াছেন। আজ তাঁহাদের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

আমার পিতা ও মাতা দুই জনেই "বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রকাশ সম্পর্কে একান্ত উৎসাহী ছিলেন। পিতৃদেব প্রথম সংস্করণের গ্রন্থ প্রকাশের পূর্ব্বেই পরপারে চলিয়া গিয়াছিলেন। আমার মাতাও আজ দশ বৎসর হইল দেহত্যাগ করিয়াছেন। আমার সাহিত্যানুরাগ, আমার জনক-জননীর স্নেহে ও উৎসাহেই পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। আজ 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে যাইয়া তাঁহাদের কথা মনে পড়িতেছে। তাঁহারা পরপার হইতে আমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন বলিয়াই এই কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইলাম।

১৩১৭ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার" ২য় সংখ্যায় ১৩১৬ সালের বঙ্গসাহিত্যের যে বিবরণ প্রকাশিত হয় তাহাতে ইতিহাস ও ভূগোল গ্রন্থসমূহের মধ্যে "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লিখিত হইয়াছিল।

সে সময়ে ইতিহাস আলোচনা সম্পর্কে বিবরণী লেখক অমূল্যবাবু মন্তব্য করিয়াছিলেন, —"বহু প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে রচিত ইতিহাস ছিল না। পুরাণই ইতিহাসের কার্য্য করিত। বৌদ্ধযুগ হইতেই ইতিহাস-রচনা প্রথার প্রবর্ত্তন হইল। কিন্তু তখনও ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয় নাই; তাম্রফলক বা শিলাস্তম্ভই কথঞ্চিৎ সে উদ্দেশ্য সাধন করিত। তাহার পর যখন রীতিমত ইতিহাস রচনা আরম্ভ হইল, তখনও বৈদেশিকদের অনুকরণেই অনুবাদ গ্রন্থ হইল, তাহার মৌলিকতা রহিল না। * * কিন্তু

সুখের বিষয়, আজকাল অনেক মহাত্মাই মৌলিক ইতিহাস রচনা করিয়া ইতিহাস নামের সার্থকতা সম্পাদন পূর্ব্বক বাঙ্গালার কলঙ্ক-মোচনে অগ্রসর হইয়াছেন, বস্তুতঃই তাঁহারা দেশের আন্তরিক ধন্যবাদের পাত্র।"

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় বাঙ্গলাদেশের ঐতিহাসিক গবেষণার যে সূত্রপাত করেন, তাহা বঙ্কিমচন্দ্রের অপূর্ব্ব প্রেরণা বলে সঞ্জীবিত হইয়া বহু কৃতী ঐতিহাসিকের সৃষ্টি করিয়াছিল। সেই সকল মহামনস্বী ব্যক্তিগণের নাম সর্ব্বজনবিদিত।

ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় কৃষ্ণনগর সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতিরূপে "বাংলাদেশে ইতিহাস-চর্চ্চা" নামে যে অভিভাষণ পাঠ করেন, তাহাতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত যাঁহারা বাংলাদেশে ইতিহাস চর্চ্চা করিয়া আসিতেছেন তাঁহাদের কর্ম্মপ্রণালী সম্বন্ধেও যেমন আলোচনা করিয়াছেন, তেমনি তাঁহাদের পরিচয় দিয়া বিশেষ কল্যাণ করিয়াছেন।

ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় সেই প্রবন্ধে "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের উল্লেখ করিয়া আমার ধন্যবাদ-ভাজন হইয়াছেন।

আমি কি-ভাবে প্রথম 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' রচনায় অগ্রসর হই সেকথা পাঠকগণ প্রথম সংস্করণের নিবেদন হইতেই জানিতে পারিবেন।

১৯১০ খৃষ্টাব্দে "বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি" গঠিত হয়। দীঘাপাতিয়ার কুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় উহার প্রতিষ্ঠা করেন। বলা বাহুল্য যে ঐ সমিতির প্রতিষ্ঠার বহু পূর্ব্ব হইতেই আমি বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হই। তখন সময়ে সময়ে কলিকাতা আসিলে "সাহিত্য-পরিষদের" অধিবেশনে দুই একটি প্রবন্ধ পড়িতাম এবং বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাসের যে কত মালমসলা পড়িয়া আছে সে বিষয়ে পরিষদ-গৃহে আলোচনা করিতাম। সে সময়ে মনস্বী রামেন্দ্রসুন্দর, সারদাচরণ মিত্র, নগেন্দ্রনাথ বসু, ব্যোমকেশ মুস্তোফী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ এবং অন্যান্য সুধী ও সাহিত্যানুরাগী ব্যক্তিগণ আমাকে পরম স্নেহের সহিত গ্রহণ করিতেন। আজ সেদিনের কথা মনে পড়িয়া নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হইতেছে। "সাহিত্য-পরিষদের" পরম পণ্ডিত ব্যক্তিগণ আমাকে নানাভাবে উৎসাহিত করিতেন এবং মৎ প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' সেকালের সমুদয় সংবাদপত্র ও মনীষী ব্যক্তিগণ সকলের কাছেই প্রশংসালাভ করিয়াছিল।

সে সময়ে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির কর্ণধার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায়, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বাঙ্গালাদেশের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার জন্য বিক্রমপুর অঞ্চলে অনুসন্ধান কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আমাকে অনুরোধ করেন। স্বর্গত রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও এবিষয়ে বিশেষ করিয়া উৎসাহিত করায় আমি এই কার্য্যে প্রবৃত্ত হই এবং 'অর্দ্ধ-নারীশ্বর' মূর্ত্তি, 'অবলোকিতেশ্বর' মূর্ত্তি প্রভৃতি সংগ্রহ করি। আমার সংগৃহীত মূর্ত্তি, মুদ্রা ইত্যাদি বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালায় সযত্নে সংরক্ষিত

আছে। মূর্ত্তির পরিচয় কিন্তু আমার নাম তাঁহারা উল্লেখ করেন নাই! তবে 'গৌড়রাজ-মালা'র উপক্রমণিকায় সহৃদয় ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লিখিয়াছেন—"বিজয়সেনদেব বরেন্দ্রভূমির সকল স্থানে, বা তাহার বাহিরে কোনও স্থানে, অধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন কিনা, এখনও তাহার বিশ্বাসযোগ্য নিদর্শন আবিষ্কৃত হয় নাই। * * কিন্তু তাঁহার পুত্র-পৌত্রের শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত; জয়স্কন্ধাবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, [মুসলমান অভিযানের প্রথম প্রকোপ প্রতিহত করিয়া] মুসলমান ইতিহাস লেখকগণের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে। তজ্জন্য, বিক্রমপুর অঞ্চলেও তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে। তথায় [অনুসন্ধান সমিতির উপদেশে ও উৎসাহে] শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়, অশেষ অধ্যবসায় বলে, অনেক পুরাকীর্ত্তির নিদর্শন সংগৃহীত করিয়াছেন। বিবরণ মালায়, শিল্পকলায় এবং গ্রন্থমালায় তাহার নানা পরিচয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।" দুঃখের বিষয় ঐ সমুদয় গ্রন্থমালার অধিকাংশই প্রকাশিত হয় নাই।

আমি সে সময়ে এবং তাহার পূর্ব্ব হইতেই ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্য উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের বহু গ্রাম পর্য্যটন করিয়া 'বিক্রমপুরের বিবরণ' নাম দিয়া একখানা গ্রন্থ লিখিয়াছিলাম, তাহাতে যে যে গ্রামে ঘুরিয়াছি, সেই সেই গ্রামের ঐতিহাসিক বিবরণ, শ্রীমূর্ত্তি-পরিচয়, মঠ, মন্দির প্রভৃতির বিস্তৃত বিবরণ সংগ্রহ করিয়া গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম এবং স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের অনুরোধে তাঁহার নিকট উক্ত গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রেরণ করিয়াছিলাম। দুঃখের বিষয় সেই বিবরণমালা মুদ্রিত হয় নাই আর আমি সেই পাণ্ডুলিপিও ফিরিয়া পাই নাই। সে সময়ে উহাতে এমন অনেক গ্রামের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছিলাম যে সমুদয় গ্রাম চিরদিনের জন্য পদ্মা গর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমার আজ এই বলিয়া দুঃখ হইতেছে যদি তাহার একটা নকল রাখিতে পারিতাম তাহা হইলে আমাকে আর অনুতপ্ত হইতে হইত না। সে সময়ে আমি নিজের ক্যামেরা দ্বারা দুই-তিন শত মূর্ত্তি, মঠ, মন্দিরের, মসজিদের ও দৃশ্যাবলীর চিত্র তুলিয়াছিলাম, অনেকদিন পর্য্যন্ত সেই Negative-গুলিও যত্ন করিয়া রাখিয়াছিলাম, কিন্তু একবার প্রবাস হইতে বাড়ী আসিয়া দেখিলাম সেই Negative-এর কাচগুলি পুরমহিলারা ধুইয়া মুছিয়া পরিষ্কার করিয়া দেশীয় লণ্ঠন প্রস্তুতকারীদের নিকট ডজন হিসাবে বিক্রয় করিয়াছেন! আর এলবামের চিত্রগুলি আমার শিশু পুত্রকে ছবি দেখাইবার অছিলায় তাহার দ্বারা বিনষ্ট করা হইয়াছে। আজ আমার পুত্র শ্রীমান্ চন্দ্রশেখর একথা শুনিয়া হয়ত আশ্চর্য্য বোধ করিবে। কিন্তু ইহাই হইতেছে এ দেশের রীতি। কি আর করা!

বন্ধুবর যতীন্দ্রমোহন রায়কে আমার গৃহীত ফোটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত কয়েকখানি ব্লক ব্যবহার করিতে দিয়াছিলাম। সেই ব্লক কয়খানি 'ঢাকার ইতিহাস' প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডে তিনি ব্যবহার করিয়াছেন। প্রেসের গোলমালে আমি সেই ব্লকগুলি আর ফিরিয়া না পাওয়ায় আবার নূতন করিয়া অনেক ব্লক প্রস্তুত করিতে হইয়াছে।

"ঢাকার ইতিহাসে" প্রকাশিত কোরহাটির মনসা ও নৃসিংহ মূর্ত্তিখানি দক্ষিণ বিক্রমপুরের কোনও গ্রামে এখন স্থানান্তরিত হইয়াছে।

সোনারঙ্গ নিবাসী স্বর্গত বৈকুণ্ঠনাথ সেন মহাশয় বিক্রমপুরের একজন প্রকৃত কল্যাণ-কামী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি স্কুলের ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টারের পদে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে নানা-গ্রাম পর্য্যটন করিতেন, পর্য্যটনকালে তিনি বিক্রমপুর হইতে বহু মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া ঢাকা সহরে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। ঐ সকল মূর্ত্তির চিত্র ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তৎপ্রণীত Iconography of Budhist and Brahamanical Sculptors in the Dacca Museum নামক গ্রন্থে প্রকাশ করিয়াছেন। লক্ষ্মণ সেনের ৩য় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত ঢাকা নগরে ডালবাজারের মন্দিরে সংরক্ষিত চণ্ডী মূর্ত্তিও বৈকুণ্ঠবাবুই রামপালের ধ্বংসাবশেষ হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় বলেন :— "The unique four-armed image of Chandi * * was found in the ruins of Rampal in the Dacca district. It was obtained by the late Babu Baikunthanath Sena along with a number of other images, and presented to the late Babu Jivana Chandra Raya who erected a temple for this fine image and installed it there. The temple is situated on the Farasganj road of this town, a little to the east of the Northbroke Hall". এইভাবে বিক্রমপুরের নানা মূর্ত্তি, নানাস্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছে। মহকুমা হাকিমদের মধ্যেও অনেকে ড্রইংরুম সাজাইবার জন্য অল্পবিস্তর মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছেন কিংবা উপহারও পাইয়াছেন।

এই জন্য কাহাকেও কোন অনুযোগ দিবার কিংবা অপরাধী করিবার কারণ নাই। কেন না তৎকালে ঢাকা সহরে কিংবা বিক্রমপুরের কোথাও কোনও চিত্রশালা প্রতিষ্ঠাপিত হয় নাই। আর লোকে সে সময়ে মূর্ত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। তাহারা 'নাক কাটা বাসুদেব' নাম দিয়া সর্ব্বশ্রেণীর মূর্ত্তিকেই সমতুল্য জ্ঞান করিত এবং কোন কোন স্থলে নানারূপ অকল্যাণ কল্পনা করিয়া অন্ধ বিশ্বাসের বশীভূত হইয়া অনেক মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং জলে বিসর্জ্জন দিয়াছে! তারপর দেউলগুলি ও রামপাল অঞ্চল বৈজ্ঞানিক উপায়ে কখন খনন করা হয় নাই, কাজেই কত রত্ন, কত মূর্ত্তি, কত কীর্ত্তি, যে বিক্রমপুরের মৃত্তিকা গর্ভে কিংবা পদ্মানদীর অতলতলে নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে কে তাহার সন্ধান করিবে ?

এখানে একটা কথা অতি বিনীতভাবে বলিতেছি, বিক্রমপুরের কোনও মূর্ত্তির চিত্র-সহ প্রবন্ধ কেহই আমার পূর্ব্বে প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আজ আমার হৃদয় এই বলিয়া আনন্দে ও গর্ব্বে স্ফীত হইতেছে যে, আজ আমাদের বিক্রমপুরবাসী যে সব যশস্বী ঐতিহাসিকদের আবির্ভাব হইয়াছে তাঁহারা নানাদিক দিয়া দেশের ইতিহাসকে জগদ্বাসীর

নিকট গৌরবান্বিত করিয়া তুলিতেছেন। স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্কর, রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী, স্বর্গত আনন্দনাথ রায়, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় এবং বহু তরুণ ঐতিহাসিক দেশের অতীত ইতিহাসকে নানাভাবে নানারূপে সমৃদ্ধ করিতেছেন।

'গিরিশ-প্রতিভা'ও 'Indian Stage', ও "দেশবন্ধুর জীবনী", প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থ রচয়িতা অগ্রজপ্রতিম শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মহাশয় বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী লিখিতে প্রবৃত্ত হইলে আমি তাঁহাকে চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে যাইয়া "বিদ্যাভূষণ লাইব্রেরী" হইতে পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকার ফাইল দেখিতে অনুরোধ করি, হেমেন্দ্রবাবু তথায় যাইয়া যেমন নিজের প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তেমনি আমার জন্যও তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন! আমি তাঁহার নিকট সংবাদ পাইলাম যে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকায় 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' সম্পর্কিত কয়েকটি প্রবন্ধ দেখিয়াছেন। আমি তদনুযায়ী ১৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৩৯, ৩১শে ভাদ্র রবিবার, চাঙ্গড়িপোতা গ্রামে গমন করি এবং 'সোমপ্রকাশের' ফাইল অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, ১২৭৩ সালের ৩০শে মাঘ, ২১শে ফাল্গুন ১২৭৩, ১২ই চৈত্র ১২৭৩, ১৯শে চৈত্র ১২৭৩, ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১২৭৭, তারিখে "বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক সংক্ষিপ্ত বিবরণ" নামে কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। প্রবন্ধগুলির নীচে লেখকের নাম নাই। আমার প্রবন্ধগুলি পড়িয়া কেমন সন্দেহ হইল, মনে হইল যে এ সমুদয় প্রবন্ধ পূর্ব্বে কোথাও পড়িয়াছি! তাই বাড়ী আসিয়া ১২৭৩—১২৭৫ সনে জৈনসার হইতে প্রকাশিত 'পল্লীবিজ্ঞান' নামক মাসিক পত্রিকাখানি খুলিয়া দেখিলাম পল্লী-বিজ্ঞানে [প্রথম ভাগ, ৮ম সংখ্যা। ১২৭৪। ভাদ্র। ইংরাজী ১৮৬৭, সেপ্টেম্বর।]" ঢাকা নর্ম্মাল স্কুলের ছাত্র শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ ঘোষ বিরচিত 'বিক্রমপুরের বিবরণ' শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'সোমপ্রকাশের' প্রবন্ধের সহিত "পল্লীবিজ্ঞানের" প্রবন্ধের কোনও পার্থক্য নাই। যেমন "পল্লীবিজ্ঞানে," তেমনি "সোমপ্রকাশে"ও কোরহাটির অনেক সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। কাজেই 'সোমপ্রকাশের' ও পল্লীবিজ্ঞানের লেখক যে একই ব্যক্তি সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইলাম। 'পল্লী-বিজ্ঞান' অতি অল্পসংখ্যক মুদ্রিত হইত, আর সেকালে "সোম-প্রকাশের" প্রচার বেশী ছিল বলিয়াই বোধ হয় অম্বিকাবাবু তাঁহার প্রবন্ধ ও সংবাদ "সোমপ্রকাশে" প্রকাশ করিতেন। অম্বিকাবাবু পরে তাঁহার লিখিত এই সমুদয় বিবরণ সংগ্রহ করিয়া "বিক্রমপুরের ইতিহাস' নাম দিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে পুস্তিকাখানি আমার নিকট আছে।

অম্বিকাবাবুর জীবিত কালে, তিনি যখন ঢাকা গ্যাণ্ডারিয়াতে বাস করিতেছিলেন, সে সময়ে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম, তিনি সেকালে যে সমুদয় জনপ্রবাদ শুনিয়াছিলেন তাহাই সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। অম্বিকাবাবুর ইতিহাস নামধেয়

'বিক্রমপুরের ইতিহাস' যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন তাঁহারাই আমার কথার তাৎপর্য্য অনুভব করিতে পারিবেন। প্রকৃতপক্ষে বিক্রমপুরের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস লিখিবার চেষ্টা সর্ব্বপ্রথম আমার দ্বারাই হইয়াছিল অপর কেহই ঐদিকে তাহার পূর্ব্বে আর অগ্রসর হন নাই। এই বিষয়টি সাধারণের জানা আবশ্যক বোধেই লিখিলাম।

'সোমপ্রকাশ' ও "পল্লীবিজ্ঞানে" প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি কিংবদন্তীমূলক, কাজেই উহার ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু আছে তাহা সাধারণেই বিচার করিবেন।

টেলার, কানিংহাম, ডক্টর ওয়াইজ, হাণ্টার, ব্র্যাড্‌লিবার্ট ব্লক্‌ম্যান্ প্রভৃতি ঐতিহাসিকগণও অনেকটা কিংবদন্তীর উপরই নির্ভর করিয়াছিলেন।

পরমপণ্ডিত রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়ের "Indo Aryan" নামক গ্রন্থে সেনরাজগণের বংশমালা ইত্যাদি প্রদত্ত হইয়াছিল এবং তিনি লিখিয়াছিলেন—"The Chief seat of their power was at Vikrampur near Dhaka where the ruins of Bullal palace are still shown to travellers." যে বল্লালসেনের কিংবদন্তী লইয়া অম্বিকাবাবু ও প্রসন্নবাবু বায়াদমের কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—সেই বল্লালের সহিত যে বিজয়সেনের পুত্র "প্রত্যক্ষ নারায়ণ স্বরূপ" বল্লালসেনের কোনও সম্পর্ক থাকিতে পারে না তাহা সুধী ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণেব মতে বিজয়সেনের শূর বংশীয়া রাণী বিলাসবতীর গর্ভজাত পুত্র বল্লালসেনের রাজ্যকাল আনুমানিক ১১৫৯- ৮৫ সাল। কাজেই ১৪৮৩ বা ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আবির্ভূত বা মৃত বাবা আদমের সহিত সেনবংশের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ নৃপতি বল্লালের কোন সম্পর্কই থাকিতে পারে না। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"ঢাকা জেলায়, বাবা আদমের সমাধির শীর্ষদেশে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি অনুসারে, উহা ৯১৩ হিজরায়, জমাদি-উস্-সানী মাসের সপ্তম দিবসে (১৫ই অক্টোবর, ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে) নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই শিলালিপি স্বর্গীয় ডাক্তার ব্লক্ (Dr. Theodor Bloch) কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল, ইহা অদ্যাবধি প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।"

"বিক্রমপুরের ইতিহাসের" এই প্রথম খণ্ডে মুসলমান-বিজয় পর্য্যন্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ হইয়াছে। প্রথম তিনটি অধ্যায়ে সাধারণ বিবরণ, প্রকৃতি-পরিচয়, এবং জনসংখ্যা জাতি ও ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছি। চতুর্থ অধ্যায় হইতে ইতিহাস সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে, সে সম্পর্কে যতদূর সম্ভব প্রাচীন পুথিপত্র, তাম্রশাসন, প্রাচীন মুদ্রা এবং প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণের মতামত ও তৎসম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছি। খড়্গ চন্দ্র-বর্ম্ম ও সেনরাজবংশের সময় হইতে যে ইতিহাসের ধারা প্রাচীন বিক্রমপুরের [গৌড়-বঙ্গের] স্বাধীনতার ইতিহাসকে গৌরবব্যঞ্জক করিয়া তুলিয়াছে, তাহা শুধু বিক্রমপুরবাসীর নহে, সমগ্র বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরব করিবার মত বটে। **বিক্রমপুরের**

ইতিহাস সুধু একটি পরগণার ইতিহাস নহে, ইহা বঙ্গেরই ইতিহাস। যে 'বঙ্গ' শব্দ সমস্ত দেশকে বঙ্গদেশ নামে অভিহিত করিয়াছে এবং সমস্ত দেশের অধিবাসীকে বাঙ্গালী নামের অধিকারী করিয়াছে সে দেশের ইতিহাসই বিক্রমপুরের ইতিহাস।

দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞানের জীবন-বৃত্তান্ত আমি অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। এই মহামনীষী পণ্ডিত সম্পর্কে যেখানে যাহা গ্রহণযোগ্য পাইয়াছি, তাহাই উপযুক্ত ভাবে আলোচনা করিয়া গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি।

"বিক্রমপুরের ইতিহাস" এতদিন পরে প্রকাশ করিবার প্রধান কারণ, প্রথম সংস্করণের প্রকাশক ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্সের দোকানখানি দৈব-দুর্বিপাকে উঠিয়া যাওয়ায় আমাকে বড়ই নিরাশ হইতে হইয়াছিল। তারপর ভাবিয়াছিলাম যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ আবিষ্কারের জন্য অপেক্ষা করাও প্রয়োজন। কিন্তু দেখিতে দেখিতে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল, আমাকেও নানা অবস্থান্তরের ভিতর পড়িয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া কলিকাতা আসিতে হইল। তারপর কলিকাতায়ও স্থায়ী ভাবে বাস করিতে পারিলাম না। বাঙ্গালা ভাষায় ছেলেদের বিশ্বকোষ 'শিশু-ভারতী' সম্পাদনের জন্য কয়েক বৎসর এলাহাবাদে ছিলাম। এলাহাবাদ হইতে ফিরিয়া আসিয়া পুরানো দপ্তর খুলিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম। "বিক্রমপুরের ইতিহাস" পুনরায় প্রকাশ করিতেছি এই মর্ম্মে সংবাদপত্রেও বিজ্ঞাপন প্রচার করিলাম, কিন্তু তাহার ফলে তেমন ভাবে কোনও সাড়া পাই নাই। তাহাতেও নিরাশ না হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

এই সময়ে আমাকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে এবং দেশহিতৈষণার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে পরম দানশীল ঐতিহাসিক ও সুপণ্ডিত এবং কলিকাতা লাহা পরিবারের গৌরবস্বরূপ ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমলাচরণ লাহা এম, এ, বি, এল, পি, এইচ, ডি, ত্রিপুরা জেলার চুন্টা গ্রামনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ দানশীল এবং এম্পায়ার অব ইণ্ডিয়া জীবনবীমার কর্ণধার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অবিনাশচন্দ্র সেন, বিক্রমপুর সম্মিলনী সভার প্রেসিডেন্ট বিখ্যাত ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (মিঃ বি, সি, চ্যাটার্জ্জি), রেঙ্গুণ-প্রবাসী অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি একাউন্টেণ্টে জেনারেল রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্র-মোহন রায়, শ্রীযুক্ত অবনীকান্ত সেন সাহিত্যবিশারদ, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার ঘোষ, এলাহাবাদ প্রবাসী অবসর প্রাপ্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ (চব্বিশপরগণা নিবাসী) শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌহাটি-প্রবাসী রাজা রাজবল্লভের বংশধর স্বনামধন্য রায় কালীচরণ সেন বাহাদুর, স্বর্গত রায় শশাঙ্কমোহন ঘোষ বাহাদুর, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী, ডক্টর অমরপ্রসাদ দাশগুপ্ত, শ্রীযুক্ত এস, দাসগুপ্ত, শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ বসু, শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, রায়সাহেব শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রমোহন পাল-চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় (মিঃ এস, এন, চ্যাটার্জি ব্যারিষ্টার), শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রকুমার

দত্তগুপ্ত, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ বিদ্যাভূষণ, শ্রীযুক্তা স্নেহলতা সেন, শ্রীযুক্ত সুরেশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় (জমিদার কালীপাড়া), শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র তালুকদার, শ্রীযুক্ত মোহিনী-মোহন তালুকদার, শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রমোহন পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত নারায়ণচন্দ্র পালচৌধুরী, বিক্রমপুর হরগঙ্গা কলেজ প্রতিষ্ঠাতা—শ্রীযুক্ত আশুতোষ গাঙ্গুলি, রায়বাহাদুর ভুবনমোহন গাঙ্গুলি, মিঃ কে, ডি, ঘোষ, শ্রীযুত যামিনীকান্ত গুপ্ত, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শক্তি ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যক্ষ মথুরামোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত সুধাংশুভূষণ ঘোষ, শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত প্রদ্যোতকুমার সেন, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত মনোমোহন সেন, ডাক্তার জিতেন্দ্রনাথ বসু, শ্রীযুক্ত শ্যামেন্দ্রলাল পাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নরহরি ভট্টাচার্য্য, ডাক্তাব যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, এম, বি, শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যয়, শ্রীযুক্ত শরদিন্দু গুপ্ত, শ্রীযুক্ত তারাপদ ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ গুহরায়, রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার সেন অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট, শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বিশ্বাস, শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র দাশগুপ্ত, রায়বাহাদুব ভুবনমোহন দাশগুপ্ত, শ্রীমান্ আবদুল বারি, শ্রীযুক্ত গুণদাচরণ সেন, শ্রীযুত মৌলবি আবদুল হাসিম বিক্রমপুরী, এম, এল, এ. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিজয়কুমার সরকার, রাযবাহাদুর শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসন্ন ঘোষ (অবসর প্রাপ্ত ম্যাজিষ্টেট) ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত কামখ্যাচরণ রায়, শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নিখিলচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র সরকার, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত নিত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ড, শ্রীযুত হেমেন্দ্রমোহন পাল চৌধুরী, ডক্টর এন, আর, ঘোষ, পণ্ডিত মোহিনীমোহন শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত সূর্য্যকুমার গুহ, রায় বাহাদুর জ্ঞানেন্দ্রচন্দ্র গুহ, শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বসু, শ্রীযুক্ত মহাদেব বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রচন্দ্র দাশ গুপ্ত, মিঃ এস্, আর. দাশ (ব্যারিষ্টার) শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, মৌলবী এম, এন, হোসেন, শ্রীযুক্ত যদুনাথ রায় ও শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ রায় (জমিদার ভাগ্যকূল), শ্রীযুক্ত রসিকলাল ঘোষ, কুমার প্রমথনাথ রায় (ভাগ্যকূল), ডক্টর স্নেহময় দত্ত, ডক্টর আর, আমেদ, শ্রীযুক্ত বিনোদবিহারি পাল চৌধুরী, ডক্টর এন, সি, বারড়ী, শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ বল ও দক্ষিণ বিক্রমপুর নিবাসী আলোক-চিত্র-শিল্পী শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাইন প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। এই সব দেশ-প্রাণ ব্যক্তিগণ আমার পুস্তকের অগ্রিম গ্রাহক হইয়া ও কেহ কেহ এককালীন অর্থসাহায্য দ্বারা আমাকে অনুগৃহীত করিয়াছেন। ইঁহাদের বদান্যতা ও সদাশয়তা আমার নিকট চিরদিন স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। বিক্রমপুরের গৌরব দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের ভ্রাতা তেলিরবাগ গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লরঞ্জন দাশ (মিঃ পি, আর, দাশ) ব্যারিষ্টার এবং স্যার চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পৌত্র ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ আমাকে আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

বিক্রমপুরের কলমা গ্রাম নিবাসী স্নেহাস্পদ চিত্রকর ও ফোটোআর্টিষ্ট শ্রীমান্ চিত্তরঞ্জন দাস, হলদিয়া নিবাসী শ্রীমান্ গোপীবল্লভ সাহা, ইছাপুরা নিবাসী শ্রীমান ভুবনমোহন পাল প্রভৃতি চিত্রশিল্পীগণ আমার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বিক্রমপুরের মঠ, মন্দির, শ্রীমূর্ত্তি, হাট, বন্দর, লোকজন, প্রাকৃতিক দৃশ্য প্রভৃতির প্রায় পাঁচশতেরও অধিক আলোকচিত্র তুলিয়া দিয়া আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ইঁহারা চিত্রগ্রহণ করিতে যাইয়া কোথাও সযত্নে অভ্যর্থিত হইয়াছেন আবার কোন কোন গ্রামে রাত্রিতে থাকিবার স্থানটুকু পর্য্যন্ত পান নাই ! ঝড়বৃষ্টি মাথায় কবিয়া প্রান্তবে, খালে ও বিলে ভ্রমণ করিয়া ইহারা আমার উপদেশে নানারূপ কঠিন কার্য্য কবিয়াছেন। এইভাবে আলোকচিত্র সংগ্রহ করিতেও বহু অর্থ ব্যয় হইয়াছে। এইসব আলোকচিত্র-শিল্পীগণ দেশহিতৈষণার বশবর্ত্তী হইয়াই চিত্রগ্রহণের কার্য্যে আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। আজ ইঁহাদিগকে আমি আন্তরিক আশীর্ব্বাদ করিতেছি, ইঁহারা দীর্ঘজীবী হইয়া দেশের কল্যাণ করুন।

প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক, "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায়, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব ভাইস্ চ্যান্সেলার এবং মাতৃভাষার উন্নতিকামী প্রখ্যাতনামা মহাপ্রাণ মনস্বী ডক্টর শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র ও প্রসিদ্ধ অধ্যাপক ও ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত ভূপতিচরণ শাস্ত্রী এম, এ. আমাকে সর্ব্বদাই উৎসাহিত করিয়াছেন, শ্রীমান্ জিতেন্দ্রনাথ রায়, তরুণ ঐতিহাসিক শ্রীমান্ নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, আমার ছাত্র শ্রীমান্ জয়শঙ্কব বন্দ্যোপাধ্যায়, আড়িয়ল চিত্রশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ, শ্রীযুক্ত বিনোদিনীকান্ত সেন, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত রোহিনীকুমার সেন, বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত, শ্রীমান্ অমূল্যপ্রসাদ চন্দ, শ্রীযুক্ত শ্যামাকান্ত গুহ ও মোঃ সৈয়দ এম্‌দাদ আলী ও শ্রীমান্ ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রভৃতি দেশহিতৈষী উৎসাহী ব্যক্তিগণ প্রয়োজনীয় গ্রন্থ ও ও বিবিধ তথ্য পুস্তিকা ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাকে উৎসাহিত করিয়াছেন।

আমি 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রকাশের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি যে, ইহা কত বড় কঠিন কাজ! তারপর এইরূপ ব্যয়সাধ্য ব্যাপারে কত বড় অর্থের প্রয়োজন! এইজন্য ধারাবাহিকভাবে অতি দ্রুত মুদ্রণকার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে নাই। সময় সময় নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি। সেই সময়ে দেবদূতের ন্যায় আসিয়া আমার প্রীতিভাজন বন্ধু বিক্রমপুর কান্দাপাড়া নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম, বি মহোদয় আমাকে সঙ্গে লইয়া দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়াছেন, গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন এবং কিছুতেই যেন আমি হাল ছাড়িয়া না দেই সেইজন্য কতই না উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। আমরা কোথাও নিরাশ হইয়াছি, কোথাও বা সাফল্য লাভ করিয়াছি। সেজন্য আমাদের দুঃখ করিবার কিছুই নাই। এই ইতিহাস প্রকাশের সহিত তাঁহার

ঐকান্তিক চেষ্টা, যত্ন, উৎসাহ ও উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়। নিজের কার্য্যের ক্ষতি করিয়াও তিনি আমার জন্য অক্লান্তভাবে গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্রের মধ্যেও ছুটাছুটি করিয়াছেন। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি তিনি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া যশস্বী ও সুখী হউন।

আমার শ্রদ্ধাভাজন আত্মীয় ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহোদয় আমাকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, "শুভকার্য্যের সহায় স্বয়ং ঈশ্বর—কাজেই আপনি নিরাশ হইবেন না।" বৃদ্ধ বয়সে তাঁহার সাহিত্য-সেবায় অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন দেখিয়া আমার প্রাণেও উৎসাহ-দীপ্তি প্রভান্বিত হইয়াছে। বরেন্দ্র- অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা, ঢাকা চিত্রশালা, বিক্রমপুর চিত্রশালা এবং সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত আশুতোষ-মিউজিয়াম স্থাপিত হওয়ায় ঐতিহাসিক গবেষণার ও অনুশীলনের পক্ষে যথেষ্ট সুযোগ হইয়াছে। ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের যৌবনে এত সুযোগ ছিল না। তখন বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালা, ঢাকা মিউজিয়াম ও কলিকাতা সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালা—রমেশ-ভবন প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা মাত্র চলিতেছিল। আমার সংগৃহীত দ্বাদশ-ভুজ-শোভিত অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি আজিও রমেশ-ভবনে শোভা পাইতেছে। ঢাকা মিউজিয়াম, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির চিত্রশালা, সাহিত্য পরিষদের চিত্রশালা এবং আশুতোষ মিউজিয়মেও আমার প্রদত্ত মূর্ত্তি ইত্যাদি সংরক্ষিত আছে।

একদিন বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন "গ্রীনল্যাণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে; মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে; কিন্তু যে দেশে গৌড়-তাম্রলিপ্তি সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, সে দেশের ইতিহাস নাই!" সৌভাগ্যক্রমে কালীপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, নিখিলনাথ রায় স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি বাঙ্গালার ইতিহাস লিখিতে যত্নবান হইয়াছিলেন। পণ্ডিত রজনীকান্তের 'গৌড়ের ইতিহাস' দুই খণ্ড প্রকাশিত হইবার পর রাখালবাবুর বাঙ্গালার ইতিহাস দুই খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের 'গৌড়রাজমালা' ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেনও 'বৃহৎ বঙ্গ' নামে দুই খণ্ডে বাঙ্গালার বিস্তৃত ইতিহাস লিখিয়াছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার স্বনামধন্য ঐতিহাসিক ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় আমাদের দেশের মনস্বী ব্যক্তিবর্গের সহযোগিতায় বাঙ্গালাদেশের একখানি বৃহত্তম ইতিহাস প্রকাশ করিতে উদ্যোগী হইয়া বাঙ্গালী মাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। তাঁহার এই শুভ সঙ্কল্প জয়যুক্ত হউক। ডক্টর রমেশচন্দ্রের দ্বারা বাঙ্গালার গৌরব পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হউক ইহাই কামনা করি।

"বিক্রমপুরের ইতিহাসের" প্রথম সংস্করণের ভূমিকা লেখক শ্রদ্ধাভাজন বন্ধুবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় সৌভাগ্যক্রমে এই সংস্করণেও আমাকে নানাবিষয়ে সাহায্য করিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

প্রথম সংস্করণের সহিত প্রত্যেক বিষয়েই বর্ত্তমান সংস্করণের পার্থক্য অনুভূত

হইবে। তাহা পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন। বিক্রমপুর কোলাপাড়া নিবাসী বিলাত-প্রত্যাগত চিত্রশিল্পী শ্রীমান্ পশুপতি ঘোষ বিক্রমপুরের ইতিহাসের জন্য কয়েকখানা ব্লক বিনামূল্যে প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন, সেজন্য তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-গ্রন্থাবলী হইতেও আমি সময় সময় গ্রন্থ ইত্যাদির দ্বারা সাহায্য পাইয়াছি। শ্যামপুকুরের "সমাজপতি-স্মৃতি-সমিতি" আমাকে সর্ব্বদাই প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদির দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মুদ্রণ কার্য্য ১৯৩৬ সালে আরম্ভ হইয়া ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে শেষ হইল। ইহার কারণও যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি। রঙপুর বারের অন্যতম প্রসিদ্ধ উকীল আমার বৈবাহিক শ্রীযুক্ত চণ্ডীচরণ রায়-চৌধুরী মহাশয় স্বর্গত মহিমাচন্দ্র মজুমদার প্রণীত "গৌড়ে ব্রাহ্মণ" নামক পুস্তক খানি সংগ্রহ করিয়া দিয়া উপকৃত করিয়াছেন। এলাহাবাদ ও কলিকাতার ইণ্ডিয়ান প্রেসের কর্ত্তৃপক্ষগণ আমাকে বিশেষ উদারতার সহিত সাহায্য করিয়াছেন বলিয়াই এত বড় বিরাট গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হইল।

বিক্রমপুরের ন্যায় জনবহুল প্রাচীন স্থানের ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য্য, কথা-প্রবচন, উপকথা, খ্যাতনামা পণ্ডিতগণের ও কৃতী ব্যক্তিগণেব জীবনী প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করা সহজ নহে। এজন্য আমরা ইতিহাসেব দ্বিতীয়খণ্ডে পাল-চন্দ্র খড়্গ বর্ম্ম সেনরাজদের সময়ের শাসনতন্ত্র, সংস্কৃতি, ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্য, উপাসক-সম্প্রদায়ের কথা, পাঠান-মোগল-ব্রিটিশ রাজত্বে দেশের অবস্থা, সামাজিক পরিবর্ত্তন, ধর্ম্ম-সংস্কার, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা সাহিত্যের উন্নতি, শিল্পের ক্রম পরিবর্ত্তন, সেকালের ও একালের কথা আলোচনা করিব।

ডক্টর বিমলাচরণ লাহা মহাশয় আমাকে রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটিতে যাইয়া যাহাতে সেখানকার লাইব্রেরী হইতে আবশ্যকীয় গ্রন্থাদি দেখিতে পারি ও আলোচনা করিতে পারি তদ্বিষয়ে লাইব্রেরীর কর্ত্তৃপক্ষকে পত্র দিয়া যে উপকার করিয়াছেন তাহা তাঁহার ন্যায় সুধী এবং দানশীল মাহাত্মারই যোগ্য হইয়াছে। উক্ত লাইব্রেরীর লাইব্রেরিয়ান শ্রীযুক্ত বলাইবাবু আমাকে সর্ব্বদা পুস্তকাদি দিতে তৎপর হইয়া বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এসিয়াটিক সোসাইটির অবৈতনিক সম্পাদক ডক্টর শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহ মহাশয় ভোজবর্ম্ম দেবের তাম্রশাসনের ব্লক দুইখানি ও মুদ্রার প্রতিলিপি হইতে ব্লক প্রস্তুত করিতে অনুমতি দিয়া কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। ডক্টর মেঘনাদ সাহা আমাদের বঙ্গের একজন কৃতী সন্তান, তিনি আমার এই ইতিহাস-প্রণয়নে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন।

যাঁহারা আমার এই ইতিহাস প্রণয়নে একান্ত অন্তরঙ্গ ভাবে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে আমার অকৃত্রিম সুহৃদ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রলাল চন্দ মহাশয়ের নাম শ্রদ্ধাও প্রীতির সহিত স্মরণীয়। নগেন্দ্রলালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয় ১৩১৭ সালে। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইবার পর তিনি আমার সহিত পরিচিত

হন। তারপর আমি যখন 'বিক্রমপুর' পত্র সম্পাদন করি, আড়িয়লের ও হলদিয়ায় কাগজীদের হস্তনির্ম্মিত কাগজ দ্বারা "বিক্রমপুরের" মলাট মুদ্রিত করিতে থাকি তখন তিনি সর্ব্বদা ঐ কার্য্যে উৎসাহিত করিয়াছেন।

তিনি আমার সঙ্গে বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে কখনও নৌকায়, কখনও পদব্রজে ঘুরিয়াছেন, কতদিন দারুণ বর্ষা—নিশীথে আকাশ হইতে ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি পড়িতেছে, আমরা নৌকার ছইয়ের নীচে বসিয়া আছি। অন্ধকার রাত্রিতে মাঝি দিশেহারা হইয়া বন্যার প্লাবনের মুখে অজানা পথে অগ্রসর হইয়াছে, নিশ্চিন্ত ও নির্ভীক পথপ্রদর্শক নগেন্দ্র-লাল আমাদিগকে লক্ষ্য পথে লইয়া গিয়াছেন। বন্ধুবর নগেন্দ্রলাল "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি এই কথা জানিতে পারিয়া আবার প্রৌঢ় বয়সে যুবজনোচিত আগ্রহের সহিত আমাকে নানারূপে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহার ইতিহাসানুরাগ একান্ত প্রশংসনীয়। তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত হলদিয়া 'দুর্গা পুস্তকাগার' হইতেও অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ইত্যাদি দিয়া আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। নীরব কর্ম্মী নগেন্দ্রলালের সহায়তা না পাইলে আমি অনেক স্থানীয় সংবাদই অবগত হইতে পারিতাম না। আমি বন্ধুবরকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না। "বিক্রমপুর" পত্রিকা ছয় বৎসর কাল বাঁচিয়াছিল, সেই ছয় বৎসর কাল বিক্রমপুরের গ্রাম্য-বিবরণ নিয়মিতভাবে উহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহারই ফলে বিক্রমপুরের বহু গ্রামের বিবরণ সম্বলিত বিক্রমপুরের বিবরণ প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২৬ ও ১৩২৮ সালে প্রকাশ করি। উহাতে উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের বহু গ্রামের বিবিধ পরিচয় ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের ও পণ্ডিতদের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। বিক্রমপুরের বিবরণ প্রথম খণ্ড আমার নিকট মাত্র দুই কপি আছে, দ্বিতীয় খণ্ড একখানিও নাই। উহার একখানি যদি কাহারও নিকট থাকে তাহা পাইলে আমি উপকৃত হইব।

স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় 'গৌড়রাজমালার' উপক্রমণিকায় একটি অতি সত্য কথা লিখিয়াছেন—"রাজা, রাজ্য, রাজধানী, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং জয়-পরাজয়, ইহার সকল কথাই ইতিহাসের কথা। তথাপি কেবল সেই সকল কথা লইয়াই ইতিহাস সঙ্কলিত হইতে পারে না। বাঙ্গালীর ইতিহাসের প্রধান কথা—বাঙ্গালী জনসাধারণের কথা। ভারত-বর্ষের জনসাধারণের পক্ষে তাহাকে একমাত্র কথা বলিলেও, অত্যুক্তি হইবে না। কারণ, ধর্ম্মবিশ্বাসই অধিকাংশ কার্য্যের গতি নির্দ্দেশ করিয়াছে; ধর্ম্মের জন্য দেব মূর্ত্তি গঠিত হইয়াছে, দেবমূর্ত্তির জন্য বিচিত্র দেবালয় নির্ম্মিত হইয়াছে, দেবালয়ের প্রচলিত অর্চ্চনা-প্রণালীর জন্য উপচার-সংগ্রহের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছে, দেবলোকের প্রীতি-সম্পাদন আশায় জলাশয় খনিত হইয়াছে, পান্থশালা চিকিৎসালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, বিবিধ বিদ্যালয়ে শাস্ত্রালোচনা প্রচলিত হইয়াছে, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য-ব্যাপারে উপার্জ্জিত অর্থ, গ্রাসাচ্ছাদনের প্রয়োজন সাধিত করিয়া, দেব-কার্য্যেই উৎসর্গীকৃত হইয়াছে।

ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সঙ্গে যে সকল আচার-ব্যবহার জড়িত হইয়া পড়িয়াছে, তাহার সাহায্যে বাঙ্গালীর জাতিগত পরিচয় লাভ করিবার সম্ভাবনা আছে। কোন্ পুরাকাল হইতে, কিরূপ ঘটনাচক্রে, এদেশের অধিবাসিবর্গ তাহাদিগের শিক্ষা দীক্ষার এবং আচার-ব্যবহারের প্রভাবে বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, তাহার কথাই প্রধান কথা।"

বিক্রমপুরের ইতিহাসকে তথা বাঙ্গলার ইতিহাসকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিতে হইলে এই দিকে লক্ষ্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। চন্দ্র-বর্ম্ম ও সেন রাজাদের অধিকৃত বিক্রমপুর-অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মও যেমন আপনার প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তেমনি হিন্দুধর্ম্মের বিভিন্ন মতও এখানে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সেজন্যই এত বিভিন্ন শ্রেণীর মূর্ত্তি আমরা বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র দেখিতে পাইতেছি। আমাদের সেই ইতিহাস সযত্নে অনুসন্ধান করিতে হইবে। আমরা দ্বিতীয় খণ্ডে ঐ বিষয়ে চিত্রাদি সহ আলোচনা করিব। এইখানে সুধু প্রয়োজনানুরূপ বিভিন্ন দেবমূর্ত্তির চিত্র মুদ্রিত করিয়াছি ও প্রয়োজনানুরূপ পরিচয় দিয়াছি।

আমি এই বহু ব্যয় সাপেক্ষ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া যখন নিরাশ হইয়া পড়িয়াছি, তখন আমার সহধর্ম্মিণী ও পুত্রকন্যাগণ নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন এবং আমার পুত্রবধূ কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী বি, এ, পাণ্ডুলিপি লেখনে ও কন্যা কল্যাণীয়া প্রতিভা সেন এম, এ, ও জামাতা শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্র সেন এম, এ, সময় সময় দুষ্প্রাপ্য পুস্তক ইত্যাদি সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন। লোনসিং নিবাসী স্বর্গত রাজবিহারী দাস মহাশয় বৃদ্ধ বয়সেও আমাকে পত্রাদি লিখিয়া উৎসাহিত করিয়াছিলেন। ঈশ্বর তাঁহার আত্মার কল্যাণ বিধান করুন। তবে একথা সত্য যে নানাকার্য্যব্যস্ততার মধ্যেও আমাকেই একা সমুদয় কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে হইয়াছে!

কলিকাতা করপোরেশনের প্রধান শিক্ষা-সচিব স্বর্গত ডক্টর সত্যানন্দ রায়, ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বসু এম, এ স্নেহভাজন সুহৃদ্ ডক্টর শ্রীযুক্ত বিমানবিহারী মজুমদার, সাহিত্য-সমালোচক ও প্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী ও শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার মহাশয় আমাকে এই ইতিহাস প্রকাশ সম্পর্কে নানাভাবে উৎসাহিত করিয়াছেন। এই সুযোগে তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি।

স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের নাম স্মরণ করিতে যাইয়া আজ প্রাণের মধ্যে গভীর শোক-বেদনা অনুভব করিতেছি। কি 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' রচনা সম্পর্কে, কি "শিশু-ভারতী"র কোনও চিত্র ইত্যাদি সংগ্রহ ব্যাপারে যখনই তাঁহার নিকট কোন বিষয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করিয়াছি, তখনই প্রীতিভাজন বন্ধুবর স্বভাবসিদ্ধ হাস্য-শ্রীমণ্ডিত মুখে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া কার্য্য-সম্পন্ন করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রবাসী বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের ইতিহাস শাখার সভাপতির রূপে পাটনার অধিবেশনে বলিয়াছিলেন—

"দেশাত্ম বোধের উন্মেষের সহিত সমগ্র ভারতে আজ প্রাচীন ইতিহাস ও কৃষ্টির প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসীর ন্যায় বাঙ্গালীও তাহার অতীত জানিতে চায়। জানিতে চায় বাঙ্গলা দেশ কত প্রাচীন, বাঙ্গালী জাতি কত প্রাচীন, বাঙ্গলায় সভ্যতা কত প্রাচীন—এই সকল প্রশ্ন স্বভাবতঃই মনে উদিত

হয়। * * কিন্তু বাঙ্গালীর ইতিহাস রচনার সময় এখনও আসে নাই, কয়েকটি তাম্রশাসন, ভগ্নমূর্ত্তি বা মুদ্রার সাহায্যে যথাযথ ইতিহাস রচনা হয় না। তজ্জন্য প্রত্নতত্ত্ব অনুসন্ধান, ধ্বংস স্তূপ খনন ও পরীক্ষার প্রয়োজন।"
সমস্ত বাঙ্গালাদেশের পক্ষে যেমন একথা কয়টি প্রযোজ্য, তেমনি আমাদের বিক্রমপুরের পক্ষেও তাহাই প্রযোজ্য। কিন্তু এ কার্য্যে কে হস্তক্ষেপ করিবে? কে শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী রামপালের সন্নিহিত দেউল ও পুষ্করিণী খনন করিবে? এই কার্য্যে আজ যদি ভাগ্যকুলের ধনকুবের জমিদারবর্গ অগ্রসর হন, তাহা হইলে রামপালের দীঘি খনিত হইয়া, দেউলবাড়ী খনিত হইয়া আবার এক বৃহৎ ও সুন্দর নগর গড়িয়া উঠিতে পারে। দেশের এই মহৎ কার্য্যে, ইতিহাস উদ্ধারের জন্য তাঁহারা একার্য্যে অগ্রসর হইবেন কি? সে শুভদিন কি আসিবে না?

Director of Land Records এর Personal Assistant সোনারঙ্গ নিবাসী বন্ধুবর শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র রায় মহাশয় আমাকে F. D Ascoli সঙ্কলিত "Final report on the survey and settlement operations in the District of Dacca 1910 to 1917." এবং সংস্কৃত কলেজের প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় Census Report ইত্যাদি গ্রন্থ দ্বারা সাহায্য করিয়াছেন। বিখ্যাত মানচিত্র প্রস্তুতকারক শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমার দাশ গুপ্ত মহাশয় শ্রীবিক্রমপুর রামপালের মানচিত্রখানি প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। এজন্য আমি তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

প্রতিভাজন বন্ধুবর ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বিক্রমপুরের একজন কৃতী সন্তান। তাঁহার ছাত্রজীবন হইতেই আমার সহিত তাঁহার পরিচয়। বিক্রমপুরের ইতিহাস সংগ্রহে, মূর্ত্তি পরিচয়ে এবং নব নব তথ্য সম্বলিত প্রবন্ধ ও "Iconography of Budhist and Brahmanical sculptures in the Dacca Museum" নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া তিনি ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের নিকটই সুপরিচিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার গ্রন্থ ও প্রবন্ধাদি হইতে যেমন সাহায্য পাইয়াছি, তেমনি চিত্র ইত্যাদি দ্বারাও তিনি আমাকে সাহায্য করিয়াছেন। বিক্রমপুরের এই সুসন্তানকে আমি অন্তরের সহিত অভিনন্দিত করিতেছি।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি কথা বলিয়াই আমার বক্তব্য শেষ করিব। ১৩৩৮ সালের ৩রা শ্রাবণ তারিখে শ্রীযুক্ত হিমাংশুমোহন চট্টোপাধ্যায় "বিক্রমপুর" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। তাঁহার ভূমিকা লিখিয়াছেন ভূতত্ত্ববিদ্ মনস্বী পার্ব্বতীনাথ দত্ত মহাশয়। কিন্তু একান্ত বিস্ময়ের বিষয় এই যে তাঁহার লিখিত ভূমিকায় আমার নামটি পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই। কতকগুলি বিষয়ে আমি হিমাংশুবাবুকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলাম, তাহাতে তিনি আমাকে ১৩৪১ সালের ২৯শে ভাদ্র একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন যে—

আপনি "বিক্রমপুরের ইতিহাস" লিখিয়া আমাদের বিক্রমপুরের যুগ পরিবর্ত্তন করিয়া দিয়াছেন। বিক্রম-পুরবাসী স্বয়ং আপনার নিকট ঋণী। আমার বইখানা প্রণীত নয়—ইহা সঙ্কলিত। ইহা আপনার নাম

সর্ব্বত আদর্শ রাখিয়া লিখনী সঞ্চালন করিয়াছি—বোধ হয় লিখিত উপক্রমণিকার তিন পৃষ্ঠায় দেখিয়া থাকিবেন। আপনার আদেশ ও অনুমতি পত্র পাইয়াই আপনার পুস্তকসমূহ হইতে উদ্ধৃত করিতে সাহসী হইয়াছি। * * ইত্যাদি।"

বিক্রমপুরের ইতিহাস, প্রকাশিত হয় ১৩১৬ পালে, বিক্রমপুর পত্রিকা ১৩২০ সাল হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। কেদার রায় (বার ভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠবীর) বিক্রমপুরের বিবরণ দুই খণ্ড প্রকাশের তারিখও ভূমিকাতে উল্লেখ করিয়াছি। আমার পুস্তকাদি ও বিক্রমপুর বিষয়ক বহু প্রবন্ধাদি প্রকাশের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে হিমাংশুবাবু 'বিক্রমপুর' প্রকাশ করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে আর অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন। জানিনা ইহার প্রয়োজনীয়তা কি ছিল!

আমি যে সকল বিদেশী ও স্বদেশবাসী গ্রন্থকারের রচনা হইতে সাহায্য পাইয়াছি, এই সুযোগে আন্তরিকভাবে তাঁহাদের প্রতি ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। আমার একান্ত অনুরোধে বন্ধুবব শ্রীযুক্ত ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত বিজয় সেনের দেওপাড়া লিপির অনুবাদ করিয়া দিয়া অনুগৃহীত কবিয়াছেন। উহা পরিশিষ্টে সন্নিবেশিত হইল। ঐ লিপি ও তাঁহার বঙ্গানুবাদ ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই বিশেষ উপকারে আসিবে বলিয়া মনে কবি। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় আমার লিখিত যে সমুদয় প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ আমাকে সে সকল ব্লক প্রদান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। আশা করি সুধীবর্গ এবং আমাব দেশবাসী গ্রন্থখানিব প্রতি সহানুভূতির সহিত দৃষ্টি করিয়া ভবিষ্যত সংস্করণে যাহাতে সম্পূর্ণ নির্ভুল হয় তৎপ্রতি মনোযোগী হইবেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ বিক্রমপুর সম্মিলনীর দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি রূপে ১৩২৩ সালের পৌষ মাসে ডোমসার গ্রামে যে অভিভাষণ পাঠ করেন তাহার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমার মনে হয় দেশবন্ধুর এই বাণী প্রত্যেক বিক্রমপুরবাসী স্মরণ করিয়া ধন্য হইবেন ও গর্ব্ব অনুভব করিবেন। তিনি বলিয়াছিলেন :—

"যে দেশেই থাকি না কেন, যত বিদেশই ঘুরিয়া বেড়াই না কেন, যখনি মনে করি, আমি বিক্রমপুরবাসী, তখনই প্রাণে প্রাণে একটা গর্ব্ব অনুভব করি। বিক্রমপুর যে আমার শরীরের শিরায় শিরায়—আমার অস্থিমজ্জাগত। বিক্রম-পুরের শত শত কাহিনী যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনের মধ্যে জড়াইয়া গিয়াছে। আমরা যে কিছুতেই ভুলিতে পারি না যে আমরা বিক্রমপুরবাসী। এই যে ভাব, যাহা সকল ভাব, সকল ভাবনা, সকল চিন্তা, সকল সাধনার মধ্যে আপনাকে জানাইয়া দেয়; এই যে স্মৃতি, যাহা ফুলের সঙ্গে জড়ান গন্ধের মত আমাদের জীবনে জড়াইয়া আছে; এই ভাবও এই স্মৃতিকে সর্ব্বদা জাগ্রত দেবতার মত

আমাদের হৃদয়-মন্দিরে জাগাইয়া রাখিতে হইবে। * * যেমন সমস্ত বাঙ্গালা দেশের একটা চিরন্তন বাণী আছে, আমাদের বিক্রমপুরেরও সেইরূপ একটা বিশিষ্ট বাণী আছে। আমরা কাণ পাতিয়া তাহা শুনিতে চাই। সে বাণী শুধু আমাদের জন্যে। কর্ম্মক্ষেত্রে সে বাণীকে সার্থক করিতে হইলে সে বাণী বুঝ। চাই--শুনা চাই, তাহাকে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করা চাই।”

স্বর্গত ননিগোপাল মজুমদার মহাশয় তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে বাঙ্গলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে কতকগুলি মূল্যবান কথা বলিয়াছেন, সেই সকল কথা দ্বারা তিনি প্রমাণ করিতে চেষ্টা পাইয়াছিলেন যে এখনও এদেশের ইতিহাস্ লিখিবার সময় হয় নাই। একথা আমরা শিরোধার্য্য করিয়া স্বীকার করিয়া লইতেছি; বাঙ্গালার মৃত্তিকার অভ্যন্তরে যে বিরাট ঐতিহাসিক তত্ত্বের খনি আছে—তাহার মূল্য কে না স্বীকার করিবে? সেই লুপ্ত রত্নোদ্ধার করা বহু ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ। আমরা একথাও মানিয়া লইতেছি যে, এই মূল্যবান উপকরণ রাশি সংগৃহীত না হওয়া পর্য্যন্ত এদেশের কোন ইতিহাসই পূর্ণাঙ্গ হইবে না। অন্যদেশে সাধারণতঃ গভর্ণমেণ্টের সাহায্যে এইরূপ সংগ্রহকার্য্য সম্পাদিত হইয়া থাকে, এদেশের সরকার যে সেরূপ কিছু করেন নাই, তাহা বলিতেছি না, কিন্তু সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় ও সামরিক ব্যাপার লইয়া তাঁহারা এরূপ বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন যে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য আমরা গভর্ণমেণ্টের নিকট সেরূপ কোন উদ্যমের সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

আমাদের জাতীয় উদ্দীপনা অনেক সময় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলন্ত ভাষায় ফুটিয়া উঠিয়া অকালে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়। দেশের কোন গঠনমূলক কার্য্যে জাতীয় সাহায্য দুর্ল্লভ। এদেশে এমন কোন সহানুভূতিপরায়ণ শিক্ষিত বড় লোক নাই, যাহারা লুপ্ত ঐতিহাসিক তথ্য উদ্ধারের ব্রত গ্রহণ করিতে পারেন। কিছুদিন হইল লালগোলার মহারাজা ও দীঘাপাতিয়ার মধ্যম কুমার শরৎকুমার রায় মহাশয় বঙ্গদেশের ইতিহাস উদ্ধার-কল্পে অনেক অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ধ্বংস স্তূপ ইত্যাদি করিয়া এইরূপ কার্য্য বঙ্গদেশের নানাস্থানে পরিচালনা ও সম্পাদন করিতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন তাহা কে দিবেন?

সুতরাং ঐতিহাসিক উপকরণ সংগ্রহ নিঃশেষ করিয়া বাঙ্গলার ইতিহাস লেখা সুরু করিতে হইলে সেরূপ ইতিবৃত্ত আর লিখিত হইবে না, আমাদের মিউজিয়ামগুলির দ্বার-দেশে তীর্থকাকের মত অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে। এদিকে শত শত কাগজপত্র ও প্রাচীন দলিল এবং পুঁথি বৎসর বৎসর অগ্নিদাহে, শিশু ও কীটদিগের অত্যাচারে, জল-প্লাবনে ও কুসংস্কারের কবলে পড়িয়া ধ্বংস পাইতেছে। একদিকে বৃথা আশার কুহকে প্রতীক্ষায় সময় খোয়াইয়া আমরা নিঃস্ব হইব, অপর দিকে যাহা হাতে আছে তাহা উপেক্ষা করিয়া হারাইব। ইতিহাস-লক্ষ্মীর কে পূজা করিবে? সংস্কৃত শ্লোকে আছে, মধুর অভাবে গুড় ও বিল্বপত্রের অভাবে দূর্ব্বাদল দিয়া পূজা সারিতে হয়। এক্ষেত্রে পূজারীরও তাহাই করিতে হইবে। তিনি কুশাসনে বৃথা বসিয়া থাকিতে পারেন না।

আমি প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া যে উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছি, সূক্ষ্মদর্শীর কাছে তাহাও নগণ্য বলিয়া মনে হইতে পারে; প্রতি বৎসরই নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়া প্রাচীন সিদ্ধান্তের স্বল্পতা ও ক্রটী-বিচ্যুতি প্রমাণ করিয়া দিতে পারে, কিন্তু সমুদ্রের বিরাটত্ব কল্পনা করিয়া বনমার্জ্জারেরা হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকে নাই, সেতুবন্ধের সময় তাহারা নিজ নিজ ক্ষুদ্র শক্তির সম্যক প্রয়োগ করিয়া সেই মহাকার্য্যের সহায়তা করিয়াছে। আমার এই ইতিহাসের সমগ্র অভাব ও ক্রটি আপনারা সেই চক্ষেই দেখিবেন। আমি এই ক্ষেত্রে ঐরাবত হস্তী নহি, সামান্য কাঠ-বিড়ালী মাত্র,—আপনারা এই পুস্তকের গুণাগুণ বিচার করিবার সময় সেই কথাটি ভুলিবেন না। বরং ইহার পরে যদি কোন ঐতিহাসিক মৎ সংগৃহীত উপাদান হইতে কিঞ্চিৎ সাহায্য গ্রহণ করিয়া বঙ্গীয় ইতিহাসের একটি পূর্ণাঙ্গ ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর সৌধ নির্ম্মাণ করেন, তবেই আমার সমগ্র শ্রম সার্থক মনে করিব।

দ্বিতীয় খণ্ড 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'' শীঘ্র প্রকাশিত করিবার ইচ্ছা রহিল। বিস্তারিত নির্ঘণ্টও দ্বিতীয় খণ্ডের সহিত মুদ্রিত হইবে।

মুন্সীবাড়ী—মহেন্দ্র-কুটির পোঃ মূলচর—ঢাকা
পি ৬৫১এ মহানির্বাণ রোড, পোঃ কালীঘাট,
৩০শে আশ্বিন ১৩৪৬, ইংরাজী ১৭ই অক্টোবর ১৯৩৯

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বঙ্গদেশ ও বিক্রমপুর

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকৃতি-পরিচয়

তৃতীয় অধ্যায়

জনসংখ্যা, জাতি ও ধর্ম্ম

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন ইতিহাস

পঞ্চম অধ্যায়

স্বাধীন বঙ্গরাজ্য—রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিক্রমপুরে স্বাধীন বর্ম্মরাজগণ—রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর

সপ্তম অধ্যায়

স্বাধীন সেনরাজবংশ—বিজয়সেন—বিক্রমপুর

অষ্টম অধ্যায়

সেন রাজত্বের শেষ যুগ—মুসলমান-বিজয়

নবম অধ্যায়

রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর—রামপাল

চিত্রসূচী

মানচিত্র

[বিশেষ দ্রষ্টব্য—রঘুরামপুর খননে প্রাপ্ত শ্রীমূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদির চিত্র অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রকুমার সেন মহাশয়ের গৃহীত আলোকচিত্রের Negatives হইতে পরিগৃহীত। ২৪৬ পৃষ্ঠায় বেজগাঁ গ্রামের নামের স্থানে ভ্রমক্রমে হজগাঁ হইয়াছে। পাঠকবর্গ শুদ্ধ করিয়া পড়িলেই হইবে। হেরুক মূর্ত্তির চিত্র ১১২ পৃষ্ঠায় এবং ২০০ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত হইয়াছে। মুদ্রাকর-প্রমাদে উভয় স্থলেই হেরুকা হইয়াছে। মূর্ত্তিটির নাম হেরুক। শ্রীমান্ পবিত্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় প্রুফ দেখিতে সময় সময় সাহায্য করিয়াছেন সেজন্য তিনি আমার ধন্যবাদার্হ।]

প্রাচীন বিক্রমপুর।
১৭৮১ খৃষ্টাব্দে সার্ভেয়ার জেনারেল জেমস্ রেনেল্ এফ,আর,এস
কর্ত্তৃক অঙ্কিত বিক্রমপুরের প্রাচীন মানচিত্র হইতে-
শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্র নাথ গুপ্ত-প্রণীত
বিক্রমপুরের ইতিহাসের নিমিত্ত সঙ্কলিত
চাঁদপুর
মেঘনা নদী
সাদকপুর
রাণীগাঁও
কান্তিকপুর
বুহার
রাজাবাড়ী
সেরাজাবাদ
মাকোহাটি
কেদারা
মুলফৎগঞ্জ
করাতীকল
নবীপুর
কান্দাপাড়া
রাজনগর
খিলগাঁও
দিগাবিপাড়া
বদনবালী
বাগদিয়া
ধানকুনিয়া
বাগটিয়া
বাধানগর
মহম্মদপুর
জাফরাবাদ
চৌরগঙ্গা
গোপালগঞ্জ
চান্দেরচর
সেরাজাদি
শ্যামপুর
ঢাকা
ব্রহ্মপুত্র নং
মীরকাদিম
মীরগঞ্জ
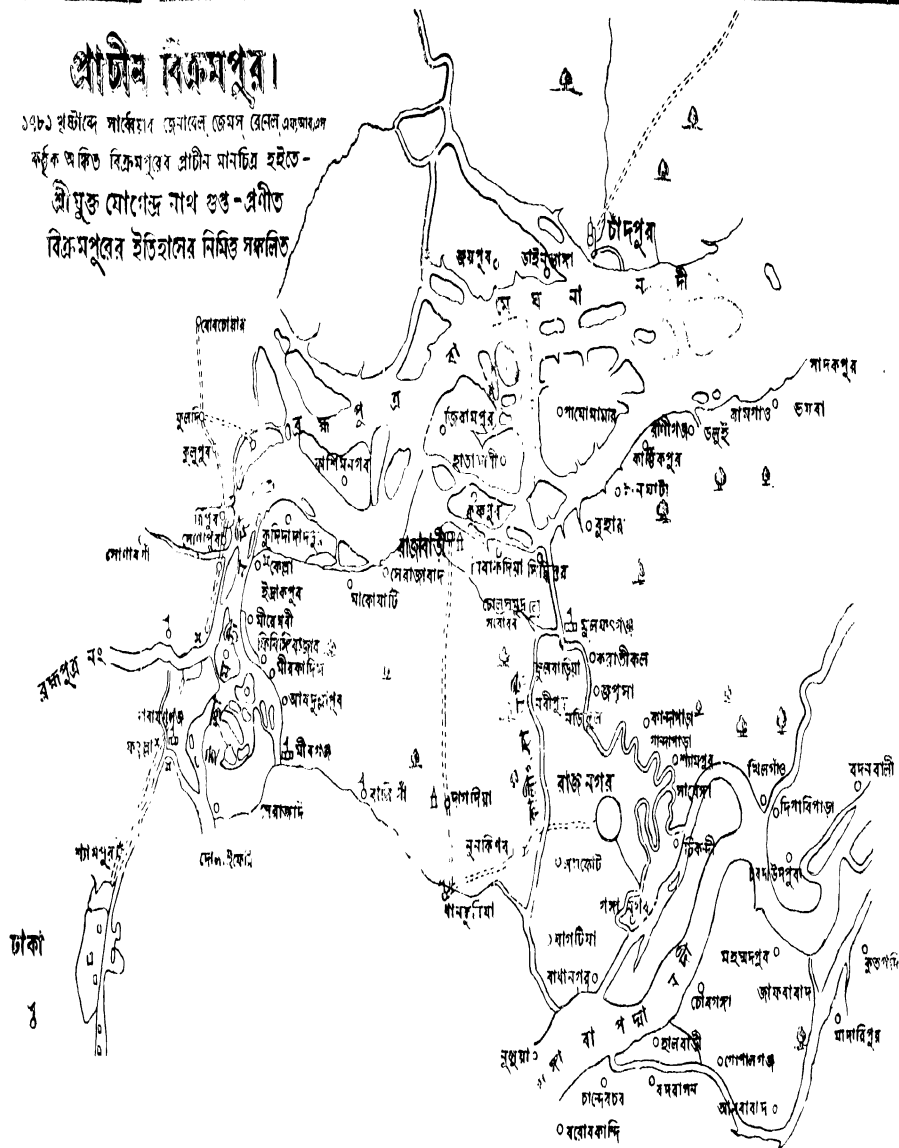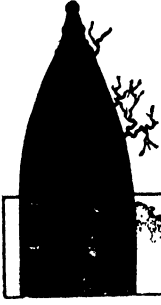
প্রথম অধ্যায়

বঙ্গদেশ ও বিক্রমপুর

বৈদিক যুগে যখন আর্য্যগণ প্রথমে ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন, তখন তাঁহারা পশ্চিমে সুলেমান গিরিশ্রেণী এবং পূর্ব্বে পবিত্র-সলিলা গঙ্গা-যমুনার পুণ্য-সঙ্গম, উত্তরে তুষার-মণ্ডিত শুভ্র হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী হইতে দক্ষিণে সিন্ধু-সঙ্গম পর্য্যন্ত প্রকৃতির এই লীলা-নিকেতনের মধ্যেই তাঁহাদের বাসস্থান সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। আর্য্যগণের অধিকৃত এই ভূমিখণ্ডই আর্য্যাবর্ত্ত নামে অভিহিত। তাঁহাদের আগমনের পূর্ব্বে এই সকল স্থান অনার্য্য—অধিবাসীদের কর্ত্তৃক অধিকৃত ছিল। আর্য্যগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া অসভ্য প্রাচীন অধিবাসিবৃন্দ বন হইতে বনান্তরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল।

বৈদিক যুগ

বৈদিকযুগে আর্য্যগণ আর্য্যাবর্ত্তে বাস করিতেন বলিয়া যে ইহার বহির্ভূত, অন্য কোনও প্রদেশের নাম অবগত ছিলেন না, তাহা নহে, কারণ ঋগ্বেদের ঐতরেয় আরণ্যকে (২।১।৩) সর্ব্ব প্রথমে **বঙ্গ** নাম দেখিতে পাওয়া যায়। যথা :—

বঙ্গদেশের প্রাচীনত্ব

> "ইমাঃ প্রজাস্তিস্রো অত্যায় মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি।
> বঙ্গা-বগধাশ্চেরপাদাস্তন্যা অর্কমভিতো বিবিশ্র ইতি।"

অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসিগণ, মগধবাসিগণ এবং চের জনপদবাসিগণ, এই ত্রিবিধ প্রজাই কি দুর্ব্বলতা, কি দুরাহার ও বহু অপত্যতায় কাক, চটক ও পারাবত সদৃশ।

ইহা দ্বারা সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, ঐতরেয় আরণ্যক রচনাকালে বঙ্গ, মগধ ও চের—এই তিন জাতিকে আর্য্যগণ দৌর্ব্বল্য, দুরাহার ও বহু অপত্যতার জন্য কাক, চটক ও পারাবতের ন্যায় জ্ঞান করিতেন। বঙ্গ, বঙ্গদেশের নাম। মগধ সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে নানারূপ মতভেদ দেখা যায়। বগধ হয় মগধের প্রাচীন নাম অথবা বগধ ও চের অর্থে বগধ নামক জাতি এবং চের জাতি, অথবা দেশ বিশেষের নাম কিনা সে বিষয়ে মতভেদ দেখা যায়। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের মতে এই তিনটি শব্দের অর্থ 'বঙ্গ' জাতি, 'বগধ' জাতি ও 'চের' জাতি। বঙ্গ শব্দের সর্ব্ব প্রাচীন উল্লেখ ঐতরেয় আরণ্যকেই প্রথম পাওয়া যায়।

বঙ্গের প্রাচীনতম উল্লেখ

ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে বৈদিকসাহিত্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ঋক, যজুঃ, সাম, অথর্ব্ব—এই চারি বেদের প্রত্যেক বেদের **মন্ত্র** এবং **ব্রাহ্মণ** এই দুইটি প্রধান ভাগ। বেদের মন্ত্র ভাগ **সংহিতা** নামে অভিহিত। ঋগ্বেদ-সংহিতার ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে পুণ্ড্র এবং অন্ধ্রগণকে শবর এবং পুলিন্দগণের সহিত দস্যুজাতির মধ্যে গণনা করা হইয়াছে। যথা :—

এতেঽন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রাঃ শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যু দস্যো বহবো ভবন্তি বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠা। ৭।১৮

অথর্ব্ব-বেদ-সংহিতার পঞ্চম কাণ্ডে অঙ্গ ও মগধদেশের নাম আছে। তাহাতে এইরূপ আছে, যে জ্বর আমাদিগকে পীড়ন করিতেছে, সেই জ্বর মগধ ও বঙ্গদেশে যাইয়া আশ্রয় গ্রহণ করুক। অথর্ব্ব-বেদ-সংহিতা অনেকটা পরবর্ত্তীকালের রচনা বলিয়া কিথ্ (Keith) প্রভৃতি পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

অথর্ব্ববেদ-সংহিতা

সংস্কৃত-সাহিত্যে বিন্ধ্যপর্ব্বতবাসী বর্ব্বর জাতিনিচয়কে শবর, পুলিন্দ, প্রভৃতি নাম দেওয়া হইয়াছে। বর্ত্তমানকালে এই সকল জাতি সাঁওতাল, কোল, ভীল নামে পরিচিত। শবর এবং পুলিন্দগণের সহিত একত্র দস্যুর সামিল বলিয়া গণনা করা হইয়াছে বলিয়াই যে পুণ্ড্রগণ অর্থাৎ বরেন্দ্র প্রদেশের প্রাচীন অধিবাসিগণ শবর, পুলিন্দদের মত বর্ব্বর ছিলেন এইরূপ মনে করিতে পারা যায় না।

বয়স হিসাবে বেদের ব্রাহ্মণখণ্ডের পরে সংস্কৃত গ্রন্থের মধ্যে বেদাঙ্গের অন্তর্গত **কল্পসূত্র**। বৌধায়নের কল্পসূত্রের অন্তর্গত ধর্ম্মসূত্রে এইরূপ ব্যবস্থা আছে, যদি কেহ **পুণ্ড্র**, **বঙ্গ** এবং **কলিঙ্গগণের** দেশে গমন করে, তবে তাহাকে দেশে ফিরিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিয়া শুদ্ধ হইতে হইবে। উড়িষ্যার অন্তর্গত পুরী জেলা এবং পুরীর দক্ষিণে অবস্থিত গঞ্জাম জেলা প্রাচীনকালে **কলিঙ্গ** নামে পরিচিত ছিল। কলিঙ্গ দেশ

কল্পসূত্র ও বাঙ্গলাদেশ

উড্র, কোলিঙ্গ (আধুনিক গঞ্জাম) মুখ্য কলিঙ্গ ইত্যাদি ভাগে সম্মিলিত ছিল। একটি মহানদী ও দামোদর নদের মধ্যবর্ত্তী অংশ ও অপরটি মহানদী ও গোদাবরীর মধ্যবর্ত্তী ভাগ।

আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য প্রদেশের লোকের বঙ্গ-বিদ্বেষ

পুণ্ড্র-বঙ্গ-যাত্রীর জন্য বৌধায়নের এই প্রায়শ্চিত্তবিধি অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রেও আছে। সুতরাং শ্রুতির বা বেদের এবং স্মৃতির বা ধর্ম্মশাস্ত্রের বচন-বিচার করিলে দেখা যায়, প্রাচীনকালে এক সময় আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য ভাগের লোকেরা **বাঙ্গলার অধিবাসিগণকে বর্ব্বর** মনে করিত এবং বাঙ্গলায় যাওয়া-আসা পাপজনক মনে করিত।

শ্রুতি-স্মৃতি ব্রাহ্মণসম্প্রদায়ের শাস্ত্র। অব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের (অর্থাৎ) যাহারা ধর্ম্ম-বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতির অনুসরণ করে না তাহাদের) শাস্ত্রেও দেখা যায়, প্রাচীনকালে একদিকে বিহার (মিথিলা, মগধ, অঙ্গ) এবং অন্যদিকে বাঙ্গলা (পুণ্ড্র, সুহ্মা, বঙ্গ) এই দুই দেশের লোকের মধ্যেও বিশেষ পরিচয় বা যাওয়া আসা ছিলনা।

রামায়ণ ও মহাভারতে বঙ্গের বহুল উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বাল্মীকির রামায়ণের বয়স আনুমানিক খৃ: পূ: ৫০০ অব্দ এবং মহাভারতের রচনাকাল আনুমানিক খৃ: পূ: দ্বিতীয় শতাব্দী। এই দুই গ্রন্থে ও বঙ্গের নাম অনেকবার উল্লিখিত হইয়াছে। বাল্মীকির

রামায়ণ ও মহাভারত

রামায়ণে বঙ্গদেশের যে উল্লেখ আছে, তাহাতে বঙ্গকে ছোটজাতি বলিয়া মনে হয় না, কেননা সেখানে বিদেহ, মলয়, কাশী, কোশল, প্রভৃতি বড় বড় জাতির সহিত উহার উল্লেখ দেখা যায়। যথা :—

> সুহ্মান্ মাল্যান্ বিদেহাংশ্চ মলয়ান্ কাশিকোশলান্।
> মগধান্ দণ্ড-কুলাংশ্চ বঙ্গানঙ্গাংস্তথৈচ। কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড। ৪০ অ:। ২৫ শ্লোক।

মহাভারতের আদি, সভা, উদ্যোগ প্রভৃতি প্রায় প্রতি পর্ব্বেই বঙ্গের উল্লেখ আছে। এবং কেন এদেশের নাম বঙ্গ হইল সে উপাখ্যানও রহিয়াছে।

বৌধায়ন ধর্ম্ম সূত্রে লিখিত আছে, যিনি আরট, কারস্কর, পুণ্ড্র, সৌবীর, বঙ্গ, কলিঙ্গ ও প্রাণ্ন দেশে ভ্রমণ করিবেন, তাঁহাকে পুনস্তোম বা সর্ব্বপৃষ্ঠা ইষ্টি করিতে হয়।

মনুসংহিতায়ও বঙ্গদেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। মনুর মতে—

> অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্র-মগধেষু চ।
> তীর্থযাত্রাং বিনা গচ্ছন্ পুনঃ সংস্কারমর্হতি॥

অযোধ্যাকাণ্ডের দশম সর্গে আছে—আমার পৃথিবীতে অধিকার আছে, সুসমৃদ্ধ দ্রাবিড়, সিন্ধু, সৌবীর, কোশল, কাশী, সৌরাষ্ট্র, মৎস্য, বঙ্গ, অঙ্গ, মগধ এবং দক্ষিণ রাজ্য প্রভৃতি সমুদয় রাষ্ট্রই আমার অধীন এবং ঐ সকল জনপদে অজাবিক, ধন ও ধান্য প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য জন্মিয়া থাকে। তুমি সেই সকল দ্রব্যের মধ্যে যে দ্রব্য লইতে বাসনা কর, আমি তোমাকে প্রদান করিব।

বলিরাজার পুত্রগণের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। অঙ্গের নামে **অঙ্গদেশ,** বঙ্গের নামে **বঙ্গদেশ,** কলিঙ্গের নামে **কলিঙ্গদেশ,** পুণ্ড্রের নামে **পুণ্ড্রদেশ** ও সুহ্মের নামে সুহ্মদেশ। *

মহাকবি ভাসের কাব্যে, অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিতে, পাণিনির বৃত্তি ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য প্রভৃতিতে, গৌড়-বঙ্গের নামের উল্লেখ আছে। এই ভাবে আমরা ভারতের প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে **বাঙ্গলা দেশের প্রাচীনত্বের কথা জানিতে পারি।** বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, হরিবংশ এবং ভাগবতেও বঙ্গের নামোল্লেখ আছে।

বৈদিক যুগ, মহাকাব্যের যুগ এবং পৌরাণিক যুগ—এই তিন যুগ হইতেই বঙ্গের নাম সুপরিচিত। কিন্তু সে কালে বঙ্গের সীমা কিরূপ নির্দ্দিষ্ট ছিল, তাহার মীমাংসা করা সুকঠিন।

৩২৬ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে মেসিডনের অধীশ্বর দিগ্বিজয়ী সেকেন্দর (Alexander) যখন পঞ্চনদ অধিকার করিয়া বিপাশা-তীরে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার শিবিরে "প্রাসিই" এবং 'গণ্ডরিডয়' নামক দুইটি রাজ্যের সংবাদ পঁহুছিয়াছিল। সেকেন্দরের ইতিবৃত্ত লেখকগণ যে ভাবে এই দুইটি রাজ্যের বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা হইতে "গণ্ডবিডয়" সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য সংগ্রহ করা সুকঠিন।

ইহার কিছুকাল পরে, গ্রীক্‌দূত মেগাস্থিনিস্ পাটলিপুত্র নগরে মৌর্য্য-সম্রাট্ চন্দ্রগুপ্তের সভায় আগমন করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্র-নগরে যে জনপদের রাজধানী ছিল, মেগাস্থিনিস্ তাহাকে 'প্রাসিই' [প্রাচ্য] বলিয়া অভিহিত করিয়া, উহার পূর্ব্ব দিকে 'গঙ্গরিডি' নামক আর একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। গ্রীক্ লেখকগণের উল্লিখিত "গঙ্গরিডয়" এবং 'গঙ্গবিডি' অভিন্ন বলিয়াই অনুমিত হয়।

* মহাভারতে লিখিত আছে—মহারাজা বলি দীর্ঘতমা নামক মহর্ষির ঔরসে স্বীয় পত্নী সুদেষ্ণার গর্ভে পঞ্চপুত্র লাভ করেন। উহাদের নাম অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, পুণ্ড্র ও সুহ্ম। ইহাদের নামে পাঁচটি দেশের নাম হইয়াছে। দীর্ঘতমা বেদোক্ত বিখ্যাত ঋষি। দীর্ঘতমা সুদেষ্ণা দেবীকে বলিতেছেন :—

"অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মাশ্চ তে সুতাঃ
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতা ভুবি।

মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১০৪।৫০

এই আখ্যানটি পরবর্ত্তী কালে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হওয়া অসম্ভব নয়!

মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে প্রাগ্‌জ্যোতিষেশ্বর ভগদত্ত, দুর্য্যোধনের সাহায্যে গিয়াছিলেন। **বাঙ্গলার** অধিবাসী তাম্রলিপ্ত, পৌণ্ড্র, মৎস্য প্রভৃতির লোকেরা সে যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিল। তাহারা অনার্য্য মধ্যে গণ্য হইয়াছে। বাঙ্গলা সে সময়ে অনার্য্য ভূমি। এবিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচিত হইয়াছে।

মেগাস্থিনিসের লিখিত ভারতবর্ষের বিবরণ-সম্বলিত মূল 'ইণ্ডিকা' গ্রন্থ এখন আর দেখিতে পাওয়া যায় না। পরবর্ত্তী লেখকগণ তাহার যে সকল অংশ আপন আপন গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাই এখন আমাদের অবলম্বন (২) ডিওডোরস্ মেগাস্থিনিসের অনুসরণ করিয়া, লিখিয়া গিয়াছেন,—গঙ্গা নদী—"গঙ্গরিডই দেশের পূর্ব্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া সাগরে পতিত হইয়াছে। গঙ্গরিডই-নিবাসিগণের অসংখ্য বৃহদাকার রণ-হস্তী আছে। এই নিমিত্ত তাঁহাদের দেশ কখনও কোন বিদেশীয় রাজা কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই। কারণ, অন্যান্য দেশের অধিবাসীরা গঙ্গারিডই-গণের অসংখ্য এবং দুর্জ্জয় রণহস্তি-নিচয়কে ভয় করে। (৩)" বাঙ্গলার যে অংশ ভাগীরথীর পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তাহা এখন "**রাঢ়া**" নামে অভিহিত। প্রাচীনকালে এই প্রদেশ "**সুহ্ম**" নামে পরিচিত ছিল। 'রাঢ়া' নামটিও প্রাচীন "আচারাঙ্গ-সূত্র" নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত প্রাচীন জৈন-গ্রন্থে (১।৮।৩) "লাঢ়া" বা রাঢ়াদেশ উল্লিখিত আছে। "গঙ্গরিডই" রাজ্য যে রাঢ়াদেশেই সীমাবদ্ধ ছিল, এমন মনে হয় না। কারণ, কেবল রাঢ়াদেশের অধিপতির পক্ষে পরাক্রান্ত মগধ-রাজের সহিত প্রতিযোগিতা করিয়া স্বাধীনতা রক্ষা করা সম্ভব হইত না। বাঙ্গলার অপর দুইটি বিভাগ,—**পুণ্ড্র**, [বরেন্দ্র] এবং **বঙ্গ**,—নিশ্চয়ই, "গঙ্গরিডই-রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল। অন্যান্য ঐতিহাসিকেরাও এই মতের সমর্থন করিয়া আসিতেছেন।*

আমরা এ সমুদয় প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে যে 'বঙ্গ' দেশের নাম পাই—সে সময়ে **বঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গকেই** বলিত। পূর্ব্ববঙ্গ শব্দের অর্থ পূর্ব্ব বা প্রাচীন বঙ্গ অথবা পূর্ব্বদিকে

* গৌড়রাজমালা—১-২ পৃষ্ঠা—রায়বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত। (১) McCrindle's Invasion of Alexander the Great (Westminister, 1893) (২) McCrindles Ancient India as Described by Megasthenes and Arrian (Calcutta, 1877) (৩) McCrindles Megasthenes P. P. 33-34

We learn from the classical writers that the country of Gangaridae, i. e., Bengal, formed a part of the dominions of the king of the Prasi, i e. Magadha, as early as the time of Agrammes, i e., the last Nanda king. A passage of Pliny clearly suggests that the "Palibothri" dominated the whole tract along the Ganges. That the Magadhan kings retained their hold on Bengal as late as the time of Asoka is proved by the testimony of the Divyavadana and of Hiuentsang who saw stupas of that monarch near Tamralipti and Karnasuvarna (in West Bengal), in Samatata (East Bengal) as well as Pundravardhana (North Bengal) Kamrupa (Assam) seems to have lain outside the empire. The Chinese pilgrim saw no monument of Asoka in that country. Political History of Ancient India by Dr. H. C. Roy Chowdhury, M.A. Ph. D. Page 210-11.

অবস্থিত দেশকে বুঝায়। প্রকৃতপক্ষে যে বঙ্গ হইতে সমগ্র বঙ্গদেশের নাম হইয়াছে, তাহা বঙ্গ সমতট বা পূর্ব্ববঙ্গকেই বুঝাইতেছে।

মহাবংস গ্রন্থে বঙ্গরাজ্য এবং ইহার রাজা সীহবাহুর উল্লেখ আছে। সীহবাহুর পুত্র বিজয়, লঙ্কায় একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। মিলিন্দপ্রশ্ন হইতে আমরা জানিতে পারি যে, নাবিকেরা নৌযানে বঙ্গদেশে গমন করিত। "অঙ্গুত্তর নিকায়" গ্রন্থে বঙ্গজাতির উল্লেখ আছে। 'দীপবংস' গ্রন্থে ও এই বঙ্গজাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। **বঙ্গ এবং আধুনিক পূর্ব্ববঙ্গ অভিন্ন**। পূর্ব্বে ইহা সমস্ত দেশকে বুঝাইত না, যেমন বর্ত্তমানে বুঝায়।*

প্রয়াগের অশোকস্তম্ভ-গাত্রে উৎকীর্ণ কবি হরিষেণ বিরচিত প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়কাহিনী বর্ণিত আছে। এই প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্ত ['সমতট-ডবাক-কামরূপ-নেপাল কর্ত্তৃপুরাদি-প্রত্যন্ত নৃপতিভিঃ] প্রত্যন্ত প্রদেশের নৃপতিগণ কর্ত্তৃক ["সর্ব্বকর দানাজ্ঞা-করণ প্রণামাগমন-পরিতোষিত প্রচণ্ড শাসনস্য "] সর্ব্বকরদান-আজ্ঞাকরণ, প্রণাম এবং আগমনের দ্বারা পরিতুষ্ট প্রচণ্ড শাসনকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। এতদিন পর্য্যন্ত 'ডবাক্' বলিতে ঢাকাকে বুঝাইত। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, ডবাক্ বলিতে কামরূপের অধিকাংশ প্রদেশকে বুঝাইত। সমতট (বঙ্গ) এবং ডবাক্ ব্যতীত বাঙ্গলার অন্যান্য অংশ পুণ্ড্র [বরেন্দ্র, উত্তরবঙ্গ এবং রাঢ়] গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূ'ত ছিল।

বিক্রমপুর সমতটের অন্তর্ভূ'ত। বৌদ্ধযুগে পূর্ব্ববঙ্গকেই সমতট বলা হইত। এখন কথা হইতেছে সমতট বলিতে পূর্ব্ববঙ্গের কতটা ভূ-ভাগকে বুঝাইত। নবম শতাব্দীতে বঙ্গোপসাগরের তটব্যাপী কতকগুলি স্থান সমতট বলিয়া পরিচিত ছিল। চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান্‌চায়ঙ্গের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠে অবগত হওয়া যায় যে তখন বিক্রমপুর সমতটাখ্যা প্রাপ্ত স্থানসমূহের অন্তর্ভূ'ত ছিল। সে সময়ে বঙ্গদেশ নিম্নলিখিত ভাবে বিভক্ত ছিল :—

সমতট বিক্রমপুর

১। চম্পা—ভাগলপুর জেলা।

২। কাজঙ্গলা—সাঁওতাল পরগণার উত্তর পূর্ব্ব সীমা, রাজমহলের চারি দিকের অংশ লইয়া অবস্থিত ছিল।

৩। পুণ্ড্রবর্দ্ধন—মালদহের কতকাংশ, এবং রাজসাহী ও বগুড়া জেলা।

৪। **সমতট**—যশোহরের কতকাংশ, ফরিদপুর, খুলনা, বাকরগঞ্জ, ঢাকা এবং ত্রিপুরা জেলা। 'সমতট' সম্বন্ধে নানারূপ মতভেদ চলিয়া আসিতেছে।

* বৌদ্ধযুগের ভূগোল—৪২ পৃষ্ঠা। ডাক্তার শ্রীবিমলাচরণ লাহা এম,-এ, বি, এল, পি, এইচ, ডি।

৫। **তাম্রলিপ্ত**—চব্বিশপরগণা ও মেদিনীপুর জেলার কতকাংশ।

৬। **কর্ণ-সুবর্ণ**—বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশ এবং মধ্যভাগ ও সমগ্র মুর্শিদাবাদ জেলা। ইউয়ান্‌চায়ঙ্গ তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণে সে সময়ে ঐ সব রাজ্যে কে কে রাজত্ব করিতেন, সে বিষয়ে কোন কথা বলেন নাই। (১) মিঃ বিভারেজ তৎপ্রণীত বাখরগঞ্জের ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, সমতটাখ্যার পূর্ব্বে বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগ পর্য্যন্ত সমুদ্র বিস্তৃত ছিল; মধ্যে মধ্যে কেবল দুই একটি দ্বীপের ন্যায় স্থান লোকচক্ষুর দৃষ্টিগোচর হইত। ইদিলপুর, চন্দ্রদ্বীপ, সাহাবাজপুর, হাতিয়া, সনদ্বীপ প্রভৃতি যে এইরূপ চড়া পড়িয়া উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ।

মিনহাজ-ই-সিরাজ তৎপ্রনীত "তবকাৎ-ই-নাসিবি" নামক পুস্তকে সমতটকে কোন স্থানে সনকট, কোথা বা সাকাট বা সকাট এবরূপ লিখিয়া গিয়াছেন। সমতট সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রকারের মতই হউক না কেন, বিক্রমপুব যে সমতটের অন্তর্ভূর্ত ভূ-ভাগ ছিল, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ করিবার কারণ দেখিতে পাইতেছিনা।

বিক্রমপুর অতি প্রাচীন স্থান। যে সময়ে নবদ্বীপ, সোণারগাঁ, ঢাকা, সপ্তগ্রাম প্রভৃতি স্থান সমূহের নাম জনসাধাবণের নিকট পরিচিত হয় নাই, তাহারও অতিপূর্ব্বে বিক্রমপুব শিক্ষায় সভ্যতায় ও উন্নতিতে সর্ব্বজন পরিচিত ছিল। মুর্শিদাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি স্থান বিক্রমপুবের বহু পবে খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্ব

এখন দেখিতে হইবে বিক্রমপুর নাম কত দিনের প্রাচীন? বিক্রমপুরের নামোৎপত্তির সম্বন্ধে নানারূপ কিংবদন্তী প্রচলিত। কিংবদন্তীর সহিত ইতিহাসের কোনরূপ সম্বন্ধ নাই! আমরা তাম্রশাসনে বিক্রমপুবের নাম যে সময় হইতে পাইতেছি সে সময় হইতেই বিক্রমপুবের নামের প্রাচীনত্ব নির্ব্বিবাদে গ্রহণ করিতে পারি। তথাপি আমরা এখানে অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকাগণের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য কিংবদন্তীমূলক 'বিক্রমপুব' নামোৎপত্তির কাহিনীও এখানে কিছু কিছু লিপিবদ্ধ করিলাম। এগুলি যে একেবারেই প্রমাণসহ নহে, তাহা বুদ্ধিমান পাঠক মাত্রেই বুঝিতে পারিবেন।

বিক্রমপুর নাম কতদিনের প্রাচীন?

(Imperial Gazetteer of India P. 360.)

'বান্ধব'—ষষ্ঠ খণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা, ১২৮৯।

বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল প্রবাদ বাক্য প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে "বিক্রম-ভূপবাসত্বাৎ বিক্রমপুরমতো বিদুঃ" ইহাও অন্যতর।

বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র এইরূপ একটি জন-প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, ভ্রাতা ভর্ত্তৃ-হরির সহিত কোনও কারণে রাজা বিক্রমাদিত্যের মনোমালিন্য হয়, তাহাতে তিনি দুঃখিত হইয়া সহোদরের উপর রাজ্যভার অর্পণান্তর দেশ-ভ্রমণে বহির্গত হন, এবং সাগরতীরবর্ত্তী সমতট প্রদেশের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া কিছুদিনের জন্য তথায় অবস্থিতি করেন। তাঁহার নামানুসারে উহাই বিক্রমপুর আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে। এই বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ সন্দেহ হয়, কারণ 'বিক্রমাদিত্য' বলিতে আমরা কাহাকে বুঝিব ? ভারতবর্ষের ইতিহাসে ত আর এক জন বিক্রমাদিত্য ছিলেন না ! *

"বিপ্রকুলকল্পলতিকা" পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সেনবংশীয় রাজন্যবর্গের পূর্ব্ব পুরুষ অর্থাৎ নিভুজসেন, বীরসেন প্রভৃতি দাক্ষিণাত্য প্রদেশ হইতে বঙ্গপ্রদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের বংশধর বিক্রমসেনই বিক্রমপুর নগর স্থাপয়িতা। (২) 'বিপ্রকুলকল্পলতিকার' এই উক্তির মধ্যে যে কোনরূপ ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে, তাহা মনে হয় না। কেননা সেনবংশীয় নৃপতিদের যে বংশতালিকা আমরা তাম্রশাসন ইত্যাদির অনুসরণ করিয়া পাইতেছি, তাহাতে মনে হয় যে, 'বিপ্রকুলকল্পলতিকার' এই উক্তি প্রমাণ সহ নহে।

কেহ কেহ বিক্রমাঙ্ক চালুক্য বিক্রমাদিত্যকে বিক্রমপুরের নামোৎপত্তির সংস্রবে টানিয়া আনিতেছেন। এই বিক্রমাদিত্য গৌড় ও কামরূপের রাজাদের পরাজিত করিয়া বিক্রমপুর নগরী প্রতিষ্ঠা করেন, ইহাই তাঁহাদের মত। বিহ্লন, চালুক্য বিক্রমাদিত্যের যে জীবনচরিত প্রণয়ন করেন, তাহার নাম বিক্রমাঙ্কচরিত। গৌড় ও কামরূপ অভিযান ব্যতীত তাঁহার সেনাপতি কলিঙ্গ, বঙ্গ, মরু, গুর্জ্জর, চের ও চোলপতিকে, চালুক্যপতির অধীন করিয়াছিলেন। বিক্রমাদিত্যের সেনাপতি কর্ত্তৃক 'বিক্রমপুর' নামক নগর প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহাই হইতেছে ইঁহাদের মত। বিক্রমাদিত্য বিক্রমাঙ্ক (১০৭৬-১১২৬) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন, কাজেই ইঁহার সহিত বিক্রমপুর নামোৎপত্তির যোগ থাকিতে পারে বলিয়াও অনেকের অনুমান। এই অনুমানের মূলে কোন সত্যই নাই, কেন নাই তাহাও আমরা বলিতেছি।

* Hunter's statiscal account of Bengal P. 11 8.

পল্লীবিজ্ঞান-প্রথমভাগ পঞ্চম সংখ্যা। ১২৭৪। জ্যৈষ্ঠ। ইংরাজী ১৮৬৭, জুন ঢাকা কলেজের ছাত্র বাবু প্রসন্নচন্দ্র গুহ বিরচিত রামপালের বিবরণ। ৯ পৃষ্ঠা।

সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থে আমরা **'বিক্রমণীপুর'** নাম দেখিতে পাই, বিক্রমণী হইতে বিক্রমপুর নাম ও হইতে পারে। এইগুলি আনুমানিক সিদ্ধান্ত মাত্র। আবার কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে **বিক্রমপুরী বিহার** হইতে বিক্রমপুরের নাম হইয়াছে। তেঙ্গুরের মতে বিক্রমপুরী বিহার বঙ্গদেশে (মগধের পশ্চিমে) অবস্থিত ছিল। নামের মিল দেখিয়া মনে হয় যে উহা পূর্ব্ববঙ্গের (ঢাকা বিভাগ) বিক্রমপুর নামক স্থানে অবস্থিত ছিল। এবং জায়গাটির নাম বিহারটির নাম দুই-ই ধর্ম্মপালের বিক্রমশিলার অপর নাম হইতে হইয়াছিল। এই ধর্ম্মপালই বাঙ্গলা-দেশের একমাত্র রাজা যাঁহার বিক্রমশীলদেব নাম ছিল এবং তিনি যে পূর্ব্ববঙ্গের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। *

বিক্রমণীপুর
বিক্রমপুর

এখন কথা হইতেছে যে বিক্রমপুরী বিহারের চিহ্ন কোথায়? বিক্রমপুরের নানা স্থানে প্রাপ্ত অসংখ্য বৌদ্ধ মূর্ত্তি হইতে একথা সুস্পষ্ট সপ্রমাণ হয় যে, বিক্রমপুরে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। আমরা যদি এখন বিক্রমপুরের স্তূপগুলি এবং দেউল-বাড়ী সমূহ খুঁড়িতে পারিতাম তাহা হইলে এ বিষয়ে সন্ধান সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবার সম্ভাবনা ছিল। ধর্ম্মপাল বাঙ্গালী রাজা ছিলেন, তিনি বাঙ্গালী জাতির শ্রেষ্ঠ দিগ্বিজয়ী নৃপতি ছিলেন; এই বাঙ্গালী বীর-সম্রাটের রাজশক্তি সুদূর উত্তর-পশ্চিমাংশের সীমান্ত প্রদেশ গান্ধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন—তিনি মগধ, বারেন্দ্র ও বঙ্গে তিনটি বিহার স্থাপন করেন। পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরী বিহার প্রতিষ্ঠা তাঁহার পক্ষে স্বাভাবিক। এই বিক্রমপুরী বিহারেই কুমারচন্দ্র, যিনি আচার্য্যঅবধূত নামে পরিচিত, যিনি বৌদ্ধ তান্ত্রিক

* The Vihara of Vikrampuri, which according to the *Tangyur* was situated in Bengal which is to the west of Magadha (*Vihara de Vikrampuri du Bengale, dans le Magadha oriental*), appears from the coincidence of names to have been located in Vikrampura of East Bengal (Dacca District). It also appears plausible that both the tract and the Viahara received their names from that of Dharmapala, alias Vikramsila, the only known king of Bengal with the appellation of "Vikrama" who again had for certain exercised his imperial sway over East Bengal (Indian Culture—Buddhist Viharas of Bengal—Vol 1 No 2. Nalininath Das Gupta Page 230)

ভারতবর্ষ, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪১, ৯৬২—৯৭০। Phayre's History of Burma P. 138 and J A. S. B 1868 P. 107 Patikera-ka is alone responsible for at once reminding one acquainted with the old Bengali ballads, celebrating the doings of king Gopichandra or Govichandra of the city of Patikara in Bengal. * * * Sir Arthur Phayre identifies it with "Vikrampura" which was near Dacca,

"দেবকুল" শব্দ হইতে "দেউল" শব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। 'দেবকুলিকা' শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র দেউল বা মন্দির। অধ্যাপক কিল্‌হর্ণ 'দেবকুলিকাকে' ক্ষুদ্র দেবমন্দির [Small temple] বলিয়াই ব্যাখ্যা করিয়া গিয়াছেন।—গৌড়লেখমালা-ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন। ২৫ পৃষ্ঠা।

২

গ্রন্থের টিকা করিয়াছিলেন তিনি ঐখানে বাস করেন। উত্তরবঙ্গের পাহাড়পুরের স্তূপ, মাহেঞ্জোদোরের অপূর্ব্ব আবিষ্কারের মত যে ঐতিহাসিক কীর্ত্তি ও গৌরব প্রকাশ করিয়াছে, তেমনি বিক্রমপুরের স্তূপগুলির খনন কার্য্য পরিসমাপ্ত হইলে বাঙ্গলার ইতিহাসের পৃষ্ঠা নবীন আলোকে উদ্ভাসিত হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন, শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসন ও সেনরাজাদের যে সকল তাম্রশাসন আমরা পাইয়াছি তাহাতে বিক্রমপুরকে, '**শ্রীবিক্রমপুর**' নামে অভিহিত দেখিতে পাই। শ্রীবিক্রমপুরের নাম একজন বাঙ্গালী রাজাই দিয়াছিলেন এই বিশ্বাস আমাদিগকে আনন্দ দেয় এবং তাহার প্রমাণ ও উপেক্ষণীয় নহে। কাজেই নবম শতাব্দী হইতেই আমরা বিক্রমপুরের নাম পাইতেছি। বিক্রমাঙ্কচালুক্য কিংবা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য প্রভৃতির নাম হইতে শ্রীবিক্রমপুব নামের উৎপত্তি হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্ত যে সমীচীন নহে, তাহা সন তারিখের বিচারের দিক দিয়াও বুঝিতে পারা যায়। বিক্রমাঙ্কচালুক্যের রাজত্বকালের পূর্ব্ব হইতেই '**বিক্রমপুর**' নাম প্রচলিত হইয়াআসিতেছে। এখন আমাদিগকে বিক্রমপুরী বিহারের অনুসন্ধান করিতে হইবে। সে অনুসন্ধানের ফল প্রকাশিত হওয়ার আশা ভবিষ্যতের গর্ভে লুকায়িত রহিয়াছে। কাজেই নদী-মেখলা-বন-রাজিনীলা রম্যাভূমি আমাদের জন্মভূমি **শ্রীবিক্রমপুর**,—এই গৌববময় নামে কবে কোন্ যুগ হইতে আখ্যাত হইতে থাকে তাহা সঠিক নির্ণয় করা সুকঠিন।

এখানে গৌড় দেশেব কথা বলিতেছি। কেননা গৌড়দেশ বলিতে সেকালে এক বিস্তৃত দেশকে বুঝাইত। বিক্রমপুব গৌড়দেশের অন্তর্ভূত ছিল কিনা এখানে প্রসঙ্গতঃ সে বিষয়ের আলোচনা কবিব। বঙ্গদেশেব অধিবাসীদিগকে প্রাচীন কালে '**গৌড়**' বলা হইত। আবার 'গৌড়' শব্দ জনপদ অর্থেও ব্যবহৃত হইত। অনেক প্রাচীন গ্রন্থে যথা, মৎস্য, লিঙ্গ, কূর্ম্ম, বায়ু, আদিপুরাণে ও কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'ও বাৎসায়নের 'কামসূত্রে' গৌড় নামটি পাওয়া গিয়াছে। গৌড়দের আদিম নিবাস সম্বন্ধে মতভেদ আছে কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে 'গৌড়' নামের দ্বারা ভাগলপুরের পূর্ব্বস্থিত রাজমহল পর্ব্বতমালার অপর পারেব দেশকে বুঝাইত। এই দেশটি অনেকগুলি অংশে বিভক্ত ছিল—যথা পুণ্ড্রবর্দ্ধন বা উত্তর বঙ্গ, কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলা) সমতট (আধুনিক ঢাকা, ফরিদপুর ও কুমিল্লা জেলা) তাম্রলিপ্ত (আধুনিক তমলুক)। মৌখরিরাজ ঈশানবর্ম্মার হরাহা লিপিতে গৌড়দিগকে 'সমুদ্রাশ্রয়' বলা হইয়াছে। অর্থাৎ সমুদ্র তাহাদের আশ্রয় ছিল। ইহা হইতে বুঝা যায় যে তাহারা সামুদ্রিক জাতি ছিল। কালিদাস ও বাঙ্গালীদিগকে 'নৌসাধনোদ্যত' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। অর্থাৎ রণতরী ছিল তাহাদের যুদ্ধের সাধন। তাহারা জলপথে রণপোতের সাহায্যে যুদ্ধ করিত। সেকালে

গৌড়দেশ ও বিক্রমপুর

বাঙ্গালীরা জাহাজে করিয়া জলপথে অনেক দূর দেশে বাণিজ্যের নিমিত্ত যাওয়া আসা করিত। আবার তাহারা সমুদ্রপারে উপনিবেশ ও স্থাপন করিয়াছিল। সিংহল, যবদ্বীপ, ব্রহ্ম, শ্যাম, প্রভৃতি দেশে এখনও তাহাদের সে সমুদয় প্রাচীন কীর্ত্তি বিদ্যমান রহিয়াছে।

চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গৌড়দেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়দেশের রাজ্যগুলি স্বাধীন হইয়াছিল। তাহা ফরিদপুরে প্রাপ্ত চারিটি লিপি হইতে তিনজন স্বাধীন রাজার কথা জানিতে পারা যায়। ইহাদের নাম ধর্ম্মাদিত্য, গোপচন্দ্র ও সমাচারদেব। এই তিনজন রাজার রাজ্য সীমার বিষয় কিছুই নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—সম্ভবতঃ তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ ছাড়া উত্তর ও মধ্যবঙ্গেও শাসন করিতেন। গোপচন্দ্র, ধর্ম্মাদিত্যের সিংহাসন আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু একথা নিশ্চয় করিয়া বলিবার কোনও উপায় নাই যে সমাচারদেব ধর্ম্মাদিত্যের পূর্ব্বে অথবা গোপচন্দ্রের পরে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

এই তিনজন রাজা ছাড়া জয়নাগ নামক আর একজন গৌড়াধিপের বিষয় লিপি-প্রমাণের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। জয়নাগ মহারাজাধিরাজ উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজধানী কর্ণসুবর্ণে ছিল। আর্য্য মঞ্জুশ্রী মূলকল্পে একজন জয়নাগ নামক রাজার উল্লেখ আছে। মনে হয় লিপির জয়নাগ ও গ্রন্থোক্ত জয়নাগ অভিন্ন।

ষষ্ঠ শতাব্দীতে বাঙ্গলা দেশ অনেক ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের মধ্যে পরস্পর যুদ্ধ-বিগ্রহ লাগিয়াইছিল। এবং এই সমস্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে দেশটি প্রায় উজাড় হইয়া গিয়াছিল।

কাজেই আমরা দেখিতে পাইলাম যে ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড়দেশের যে তিনজন স্বাধীন রাজার নাম পাই তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহাদের রাজ্য উত্তর ও মধ্য বঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল ইহাতে এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে বিক্রমপুর সেই সময়ে গৌড়দেশের অন্তর্গত থাকিলেও স্বাধীন রাজাদের শাসনাধীন ছিল।—বিক্রমসেন নামে গৌড়ের একজন রাজার নাম পাওয়া যায়। কথাসরিৎসাগর, বিদ্বন্মোদতরঙ্গিনীও তন্ত্র-বিভূতি গ্রন্থে বিক্রমসেনের নাম পাওয়া যায়। অনেকে অনুমান করেন, এই বিক্রমসেন বিক্রমপুরে রাজধানী স্থাপন করিয়া তাহার নাম দিয়াছিলেন বিক্রমপুর। এই বিক্রমসেন বিপ্রকল্পলতিকা গ্রন্থে উল্লিখিত বিক্রমসেন কিনা বলা কঠিন। বিক্রমপুর নাম কথাসরিৎসাগরেও পাওয়া যায়। বিক্রমসেনের সহিত বিক্রমপুর নামের ইতিহাস যদি আমরা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ নাও করি, তথাপি বাঙ্গলা দেশ বা বঙ্গের অন্তর্গত বিক্রমপুর বা পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীন রাজ্য যে সুবিস্তৃত গৌড় রাজ্যের অন্তর্ভূর্ক্ত ছিল, এ সত্য আমরা সহজ ভাবেই গ্রহণ করিতে পারি। পরবর্ত্তী কালে বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসন দ্বারা সিদ্ধান্ত

হইয়াছে যে বর্ত্তমান ঢাকা জেলার অনেকাংশ ও ফরিদপুর জেলার কতকাংশ তৎসময়ে বিক্রমপুর নামে অভিহিত হইত।

বিক্রমপুরের চারিদিক বেড়িয়াই নদী। নদ-নদী বেষ্টিত এই উচ্চ ভূমিতে যে সকল রাজবংশীয়েরা রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহারা যে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ছিলেন সে বিষয়ে কোন ও সন্দেহ নাই। ডাক্তার শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন,—হরিকেলামণ্ডলের ভাবী ভূপতিদিগকে সম্বোধন করিয়া সর্ব্ব প্রথম যিনি এই অঞ্চলে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন, রাজধানীর নাম তিনি বর্দ্ধমানপুর বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হরিকেল রাজলক্ষ্মীর আধার ছিলেন যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র, তাহার পুত্র শ্রীচন্দ্রের অদ্যাবধি চারিখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাম্রশাসনগুলির আবিষ্কার স্থান এবং ঐ গুলিতে উল্লিখিত গ্রামের অবস্থান পর্য্যালোচনা করিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়, বর্ত্তমান ঢাকা, ফরিদপুর বরিশাল জেলা লইয়া তাঁহার রাজ্য গঠিত ছিল। তাঁহারই তাম্রশাসনে রাজধানীর নাম প্রথম **বিক্রমপুর** বলিয়া উল্লিখিত দেখা যায়।"—আমরা শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতে রাজধানীর যে উল্লেখ পাই সেই বিক্রমপুর নাম হইতে সমগ্র ভূভাগের নাম বিক্রমপুর হইয়াছে বলিয়া আমরা নির্ব্বিবাদে প্রামাণিক সত্য রূপে গ্রহণ করিতে পারি। শ্রীচন্দ্রদেবের পরে বর্ম্ম রাজগণ প্রায় এক শতাব্দীকাল এবং সেন বংশীয় নৃপতিরাও প্রায় এক শতাব্দীকাল বিক্রমপুরে রাজত্ব করিয়াছেন। বর্ম্মরাজগণের এবং সেন রাজগণের তাম্রশাসনেও বিক্রমপুর রাজধানীর উল্লেখ রহিয়াছে—সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাত ইত্যাদি। অতএব বিক্রমপুর নাম যে প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন তাহা আমরা তাম্রশাসনের সাহায্যেই প্রমাণ করিতে পারিতেছি। এখন আমরা সুদৃঢ় ভাবে এই কথা বলিতে পারি যে বিক্রমপুর নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে যত প্রকারের কিংবদন্তীই প্রচলিত থাকুক না কেন, সে সকল আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারিলেও তাম্রশাসনের দ্বারা বিক্রমপুর নামের যে পরিচয় পাইতেছি তাহাই হইতেছে প্রকৃত প্রমাণ এবং সে হিসাবে **'বিক্রমপুর'** নাম প্রায় সহস্র বৎসরের প্রাচীন এবং তাহা ঐতিহাসিক সত্য। বিক্রমপুর নামের উৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা যে কথা বলিলাম, তাহা হইতে পাঠকগণ নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন।

১। বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি সম্পর্কে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে কোনওরূপ ঐতিহাসিক সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না।

২। পালবংশীয় নৃপতি ধর্ম্মপালের নির্ম্মিত 'বিক্রমপুরী বিহার' হইতেও বিক্রমপুরের নামোৎপত্তি হইতে পারে। এবিষয়ে লামা তারনাথ রচিত তিব্বতের ইতিহাস বা তেঙ্গুর আমাদের প্রমাণ। তারনাথ ষোড়শ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন, কাজেই তাঁহার লিখিত বিবরণীতে যদি আমরা আস্থা স্থাপন নাও করি, তথাপি শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতে

যে বিক্রমপুর নাম পাই, সেই বিক্রমপুর রাজধানীর নামানুযায়ী সমগ্র বিক্রমপুরের নাম হইয়াছে এবং তাহাই আজ পর্য্যন্ত চলিয়া আসিতেছে।

বিক্রমপুরের সীমা—শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনগুলি যে যে স্থান হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতে যে সমুদয় গ্রামের নাম রহিয়াছে তাহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীচন্দ্রদেবেব রাজ্য ফরিদপুর ও বরিশাল জেলা লইয়া বিস্তৃত ছিল। বর্ম্মবাজগণ, সেন রাজগণ প্রভৃতির রাজত্বকালে এবং বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বীব কেদাবরায়েব রাজত্বকালে বিক্রমপুব রাজ্যের সীমা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে বিংশতী শতাব্দী অর্থাৎ বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত নদ-নদীর গতি পরিবর্ত্তনের সহিত বিক্রমপুব একান্ত বিপর্য্যস্ত হওযাব জন্য দিন দিনই ইহার সীমার পরিবর্ত্তন হইতেছে,—হয়ত ভবিষ্যতে আরও হইবে। বিক্রমপুরের সীমা-পদ্মা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদীর আক্রমণে প্রতিবৎসর যে ভাবে হ্রাস পাইতেছে তাহাতে অদূর ভবিষ্যতে বিক্রমপুবেব ক্ষুদ্র ভূখণ্ড একেবাবে বিলুপ্ত হওয়াও অসম্ভব নহে।

বর্ত্তমান সময়ে পদ্মার ভীষণ আক্রমণে বিক্রমপুব যেমন হতশ্রী এবং পূর্ব্ব-গৌবব-বিভব শূন্য হইয়াছে, পূর্ব্বে এইরূপ ছিল না। তখন প্রাকৃতিক বৈষম্য হেতু বিক্রমপুব দুইভাগে বিভক্ত হয় নাই।

থাকবস্ত জরিপ হওয়ার পূর্ব্বে অর্থাৎ যখন রণভাওয়াল হইতে সমুদ্রতীব পর্য্যন্ত একটা ম্যাপ বা মানচিত্র প্রস্তুত হয়, তখন কীর্ত্তিনাশার (পদ্মা) কোনও উল্লেখ উহাতে ছিল না। পূর্ব্বে অল্প পরিসবা কালীগঙ্গা নদী বিক্রমপুবের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হইয়া শিল্প-বাণিজ্যেব উন্নতি কল্পে এবং খাদ্য দ্রব্যাদির প্রাচুর্য্য বিধানে যথেষ্ট সাহায্য কবিত। উহার তীরবর্ত্তী পল্লীসমূহের শ্যামল সৌন্দর্য্য ও শস্যশ্যামলক্ষেত্রনিচয়ের মনোমোহন দৃশ্য বিক্রমপুরকে বিদেশী পর্য্যটকের নিকট স্বর্ণ-কীরিট-মণ্ডিতা কমলার আবাসভূমি বলিয়াই প্রতিপন্ন করিত। সে শোভা-সম্পদ, সর্ব্বধ্বংসকারিণী পদ্মাব তবঙ্গ-প্রহাবে কবি কল্পনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। তখন পশ্চিমে পদ্মা, পূর্ব্ব-উত্তরে ধলেশ্বরী, দক্ষিণ দিকে আরিয়ল নদী ও কৃষ্ণসলিল মেঘনাদ নদের সম্মিলিত সাগরাংশ—এই চতুঃসীমাবর্ত্তী স্থানই বিক্রমপুব নামে সর্ব্বজন পরিচিত ছিল।

জপসা নিবাসী কবি লালা রামগতি রায তাঁহার রচিত 'মায়াতিমিবচন্দ্রিকা', নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন—

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্ব্বেতে প্রচার।
পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর।
ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্‌জ্ঞানী বিস্তর॥

বিক্রমপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ইহাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর পূর্ব্বে পশ্চিমে আনুমানিক প্রায় ত্রিশ চল্লিশ মাইল দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণ প্রায় আট দশ মাইল প্রশস্ত যে ভূমিখণ্ড ছিল তাহা রাক্ষসী পদ্মা নিজ কুক্ষিগত করিয়া বিক্রমপুরের ক্ষীণ কলেবরকে ক্ষীণতর করিয়া ফেলিতেছে। এই প্রায় দুই শত বৎসরের মধ্যে কত পল্লী কত দেব মন্দির, কত মঠ—মসজিদ প্রভৃতি প্রাচীন কীর্ত্তি যে পদ্মার বুকে অদৃশ্য হইয়াছে তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে পদ্মার গতি পরিবর্ত্তনের জন্য বিক্রমপুরের দক্ষিণ ভাগ ঢাকা জেলা হইতে পৃথক হইয়া যায়। ১৮৭১ খৃঃ অঃ ১৭ই জুনের গভর্ণমেণ্টের বিজ্ঞাপন অনুসারে ঐ সনের ১ লা আগষ্ট হইতে রাজনগর, জপসা, কোয়রপুর, নড়িয়া, লোনসিংহ, কাৰ্ত্তিকপুর, ফতেজঙ্গপুর, নগর, বিঝারী, পণ্ডিতসার, কেদারপুর, মুলফৎগঞ্জ, পালং পোড়াগাছা, কুড়াশী, পাড়গাও প্রভৃতি ৪৫৮ খানা গ্রাম সহ **দক্ষিণ বিক্রমপুর** বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্ভূত হয়। এই গ্রামগুলি মুলফৎগঞ্জ থানার অধীন ছিল। ১৮৬৬ সালের পূর্ব্বেই মুলফৎগঞ্জ থানার শাসন সংক্রান্ত কার্য্য বাকরগঞ্জ জেলার ম্যাজিষ্ট্রেটের অধীনে ন্যস্ত করা হইলেও কার্য্যতঃ তাহা হয় নাই। অধিবাসীবৃন্দের তুমুল আন্দোলনের ফলে মুলফৎগঞ্জ সহ মাদারীপুর মহকুমা ১৮৭৪ খৃঃ অব্দে ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভূত হয়। *

উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর

উত্তর বিক্রমপুরের পশ্চিম দিক দিয়া পদ্মার যে শাখা উত্তরবাহিনী হইয়া প্রবাহিত উহা দিঘলী (পূর্ব্ব লৌহজঙ্গের নিকটে) বন্দরের পশ্চিম সীমা দিয়া ঘোড়দৌড় (গ্রাম) কনকসার, কোরহাটি, খরিয়া, হলদিয়া, গয়ালীমান্দ্রা, দক্ষিণ পাইকসা, লেনপুর, শ্রীনগর ষোলঘর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া বহিয়া যাইয়া পুটিমারার নিকট হইতে একটি শাখা-পথে আলমপুর, শেখরনগর এবং রাজনগর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছে। অপর একটি শাখা হাসাড়া, মোহনগঞ্জ প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া ধলেশ্বরী নদীর সহিত যাইয়া মিলিত হইয়াছে। এই সলিলপ্রবাহ উত্তর বিক্রমপুরকে প্রধানতঃ **পূর্ব্ব ও পশ্চিম বিক্রমপুর** এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। এইটিই উত্তর বিক্রমপুরের সর্ব্ব বৃহৎ **হলদিয়ার খাল** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। পদ্মার গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রসিদ্ধ খালটির স্রোতোবেগ মন্দীভূত হইয়া স্থানে স্থানে ভরিয়া যাইতেছে।

শেখরনগরের প্রবাহটিই অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত ও গভীর। জ্যৈষ্ঠ ও কার্ত্তিক মাসে হাসাড়ার খালে যখন জল কম থাকে, তখন শেখরনগরের খাল দিয়াই গহেনার নৌকা ও লঞ্চ ইত্যাদি যাতায়াত করে। এই জলপথের দুই ধারে অনেক প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত।

* ঢাকার ইতিহাস—প্রথম খণ্ড, ১৫-১৬ পৃষ্ঠা—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়

বিক্রমপুরের সীমান্তবর্ত্তী নদ-নদী গুলির বিষয়ে আলোচনা করিয়া পরে খাল ও বিল ইত্যাদির কথা বলিব। বিক্রমপুরের উত্তর সীমা ধলেশ্বরী নদী যবুনার একটি শাখা নদী। ধলেশ্বরী ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত সলিমাবাদ নামক স্থানের নিকট হইতে যবুনা হইতে বহির্গত হইয়াছে। এই নদীর গতিপথ এইরূপ :—প্রথমতঃ দক্ষিণবাহিনী হইয়া পরে আবার পূর্ব্ববাহিনী হইয়া উত্তর দিকে যাইয়া পুনরায় দক্ষিণ ও পূর্ব্বদিকে মাণিকগঞ্জ পর্য্যন্ত আসিয়া ক্রমে সাভার পর্য্যন্ত পূর্ব্বদিকে প্রবাহিত হইয়াছে এবং সাভার হইতে ফুলবেড়িয়ার কতকটা দক্ষিণে আসিয়া বুড়িগঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে ক্রমে রোহিতপুব, কুচিয়ামোড়া, পাথরঘাটা এবং রামকৃষ্ণদীর পথে পাইনার দক্ষিণ দিকে সিংদহ নামক একটি শাখানদীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সঙ্গম স্থান হইতে পশ্চিমদী, সরাইল, কোণ্ডা, প্রভৃতি স্থান দিয়া পূর্ব্ব দিকে প্রবাহিত হইয়া শীতললক্ষ্যা, ধলেশ্বরী এবং মেঘনা একত্র মিলিত হইয়াছে। এই তিনটি নদীর সঙ্গম স্থান অত্যন্ত বিশাল। এই সঙ্গম স্থান **কলাগাছিয়া** নামে পবিচিত। মুন্সীগঞ্জ, কমলাঘাট ফিরিঙ্গীবাজার, রিকাবীবাজার, মিরকাদিম, আবদুল্লাপুর, তালতলা, ফুবসাইল, বয়রাগাদী প্রভৃতি স্থান ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। বিক্রমপুবের উত্তর সীমা ধলেশ্বরী বা ধবলেশ্বরী নদী এই ভাবে বিক্রমপুরের উত্তর দিক্ দিয়া প্রবাহমানা।

নদ ও নদী

মেঘনাদ বা মেঘনা—নদ বিক্রমপুরের পূর্ব্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত। মেঘনাদ নদ ময়মনসিংহ জেলার পূর্ব্ব সীমা দিয়া প্রবাহিত হইয়া ঢাকা জেলাব পূর্ব্ব ও উত্তর সীমানায় ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। সেখান হইতে মেঘনাদের সলিলরাশি দক্ষিণ দিকে বহিয়া চলিয়াছে। এই নদ ত্রিপুবা ও ঢাকা জেলার সীমা বিভাগ করিয়াছে। মেঘনাদ নদ ঢাকা জেলার দক্ষিণ-পূর্ব্ব-কোণে আসিয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে।

মেঘনাদ নদীর পূর্ব্ব তীর ত্রিপুবা জেলাব অন্তর্ভূত। পশ্চিম তীরে বিক্রমপুর অবস্থিত। মেঘনার পশ্চিমাংশে বিস্তৃত চরাভূমি, সেই চরাভূমির পশ্চিমে একটী নদী বা জলপ্রণালী প্রবাহমানা। এই জল প্রণালীটি বেভিনিউ সার্ভে ম্যাপ এবং বর্ত্তমান সেটেলমেণ্টের মানচিত্রে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত (Old bed of Brahmaputra) নামে উল্লিখিত। এই নদীটি মুন্সীগঞ্জ মহকুমার পূর্ব্বদিকে ধলেশ্বরীর সহিত মিলিত হইয়াছে এবং ক্রমশঃ আঁকিয়া বাঁকিয়া কাটাখালির মুখ হইতে দক্ষিণ দিকে, পূর্ব্বে রাজাবাড়ীর নিকট, বর্ত্তমান সময়ে পুবাণ দীঘির-পাড়ের কাছে আপনার প্রবাহধারা পদ্মার সহিত মিলিত করিয়াছে। এই নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীরে অনেক গুলি প্রসিদ্ধ গ্রাম অবস্থিত। মুন্সীগঞ্জের দিক্ হইতে কেওয়ার, মহাকালী, মাকুহাটি (মাকুহাটির খাল এখানে ব্রহ্মপুত্রের এই প্রাচীন খাতের সহিত মিলিত হইয়াছে।) ঘাসীরপুকুরপাড়, সেরাজাবাদ, পুরুয়া, কামারখাড়া (স্বর্ণগ্রাম) মূলচর,
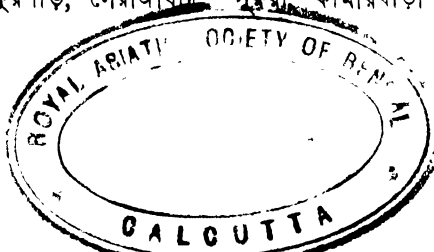
দীঘিরপাড়, বাহেরক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রামগুলি এই নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত। এই নদীকে বর্ত্তমান সময়ে কেহই ব্রহ্মপুত্র বলে না। সাধারণতঃ দীঘিরপাড়ের গাঙ্গ, মূলচরের গাঙ্গ, সেরাজাবাদের গাঙ্গ, (নদী) বলিয়া থাকে।

এই নদী যে ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত ছিল, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বলা যাইতে পারে যে— রেভিনিউ সার্ভেম্যাপে, ইহা ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাত বলিয়াই লিখিত রহিয়াছে, বর্ত্তমান সেটেলমেণ্টের মানচিত্রে ও ঐরূপ লিখিত হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ—এই নদীতীরে একটি তীর্থ স্নান আছে, এই ঘাটটি **যোগিনীঘাট** নামে পরিচিত। লাঙ্গল-বন্ধ ও পঞ্চমীঘাটে যে তারিখে তীর্থ স্নান হয়, এখানেও ঠিক সেই তারিখে লোকে তীর্থস্নান করিয়া থাকে।

কখন কোন্ সময়ে কি ভাবে ব্রহ্মপুত্রের গতি পরিবর্ত্তনের জন্য এই প্রবাহের সৃষ্টি হইয়াছিল তহা বলা কঠিন। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন,— "ব্রহ্মপুত্রের এই দিকস্থ প্রবাহ কোন্ সময়ে কলাগাছিয়ার উত্তরাংশের নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, তাহা সুনিশ্চিতরূপে নিরূপণ করা সহজ সাধ্য নহে। এগারসিন্ধুর দক্ষিণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মপুত্রের প্রবাহ শুষ্ক হইয়া যাওয়ায় নদী পূর্ব্ববাহিনী হইয়া আইরল খাঁ বা আড়িয়াল খাঁ নদীর মধ্য দিয়া আসিয়া প্রথমতঃ নরসিংদীর নিকটে, পরে ভৈরববাজারের নিম্নে, মেঘনাদের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। কিয়ৎকাল পর্য্যন্ত ধলেশ্বরীই ব্রহ্মপুত্রের প্রধান প্রবাহ থাকায়, উহার প্রাচীন শুষ্ক খাত কর্ত্তনের সুবিধা হইয়াছিল।"

পদ্মা বা কীর্ত্তিনাশা—বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুরের যে অংশ ভেদ করিয়া পদ্মা মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছে, অনেকের মতে পদ্মার গতি বিক্রমপুরের পশ্চিম দিক পরিত্যাগ করিয়া মরা পদ্মা নামে এক প্রবলাংশ যাহা প্রায় শত বৎসর মধ্যে উদ্ভব হইয়া প্রাচীন কালীগঙ্গা নদীর বিলোপ সাধন করিয়াছে, উহা **কীর্ত্তিনাশা** নামে পরিচিত।

মেজর রেণেলের অঙ্কিত ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের মানচিত্র হইতে দেখা যায়, পূর্ব্বে পদ্মা নদী বিক্রমপুরের অনেকটা পশ্চিম দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইয়া ভুবনেশ্বরের সহিত মিলিত হইয়াছিল। সে সময়ে "**কীর্ত্তিনাশা**" বা' 'নয়া ভাঙ্গনী' নামে কোনও নদী ছিল না। বিক্রমপুরের রাজনগর ও ভদ্রেশ্বর গ্রামের মধ্যে একটি অপ্রশস্ত জলপ্রণালী মাত্র বিদ্যমান ছিল।

১৮১৮ খৃঃ অব্দে পদ্মানদীর প্রধান স্রোতঃ রেণেলের কালীগঙ্গার খাতে প্রবাহিত হইত। রেণেল কালীগঙ্গার নামোল্লেখে ভুল করিয়াছেন। গঙ্গানগর হইতে লড়িকুল এবং মুলফৎ-গঞ্জের মধ্য দিয়া চণ্ডীপুর পর্য্যন্ত প্রবাহিত নদীর নাম **কালীগঙ্গা**। তিনি উহার উত্তরের নদীটিকে কালীগঙ্গা বলিয়াছেন। যাহা হউক, ১৮১৮ খৃঃ অব্দে পদ্মার প্রধান স্রোতঃ রেণেলের কালীগঙ্গার খাতে প্রবাহিত হইত। এই পরিবর্ত্তন ক্রমে ক্রমে ঘটিয়াছিল। এমন কি ১৮৪০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত পদ্মা দক্ষিণ বিক্রমপুরের পশ্চিম দিক্ দিয়াই প্রবাহিত হইত।

এই নদী তখনও পদ্মা নামে এবং নূতন নদীটী কীর্ত্তিনাশা নামে অভিহিত হইত। এই নূতন নদীটি বাস্তবিক পক্ষে রেণেলের তথা কথিত কালীগঙ্গার বিস্তৃতি মাত্র। এই সময় হইতেই প্রকৃত পক্ষে দুইটি নদীর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। ব্রহ্মপুত্র, কীর্ত্তিনাশার সাহায্যে পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া মেঘনাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ করিল। ফলে সম্পূর্ণ অভিনব স্থান দিয়াই নদী প্রবাহিত হইল। রেণেলের উল্লিখিত কালীগঙ্গার প্রকৃত নাম ছিল নয়া-নদী রথখোলা। এই পরিবর্ত্তন ক্রমে ক্রমে ঘটিয়াছিল। কোন নদী অকস্মাৎ জলে ভরিয়া যাওয়া সম্বন্ধে সাধারণতঃ যেরূপ জনশ্রুতি থাকে এ বিষয়ে তদ্রূপ কোনও জনশ্রুতি নাই, এমনকি ১৮৪০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বহু পরিমাণে জল দক্ষিণ বিক্রমপুরের পশ্চিম দিকস্থ গঙ্গা-নগরের নিকটবর্ত্তী পুরাতন খাতেই প্রবাহিত হইত। রেণেলের উল্লিখিত কালীগঙ্গার প্রকৃত নাম **নয়ানদী রথখোলা** ছিল। উহার অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বেও কোন নদী এই যোজকের সহিত মিলিত হয় নাই। কীর্ত্তিনাশার স্রোত খুব প্রবল ছিল এই জন্যই সে কালে লোকে ইহার নাম দিয়াছিল '**কীর্ত্তিনাশা সর্ব্বনাশা**'। [কেন না কীর্ত্তিনাশা (পদ্মা) বক্ষস্থলকে বিদীর্ণ করিয়া বিক্রমপুরকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে, কত কীর্ত্তি-কলাপ উদরসাৎ করিয়াছে কি বলিব !] *

গঙ্গা ও মেঘনা নদীর তলের (লেভেল) পার্থক্য বোধ হয় ইহার কারণ। ইহাতে মেঘনা নদীর আপাততঃ কিছু অসুবিধা হইয়াছিল। **রাজাবাড়ীর** দক্ষিণ পূর্ব্বে রেণেল কর্ত্তৃক পোম্মানারা নামক প্রকাণ্ড চর বিধৌত হইয়া যাওয়ায় মেঘনা নদীর দ্বারা উত্তর দিকস্থ দ্বীপগুলি ভরাট হইতে লাগিল। এইরূপে প্রকাণ্ড একটী যোজক উৎপন্ন হইল। এদিকে কীর্ত্তিনাশা নদী মেঘনার পশ্চিম তীর ভাঙ্গিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু নূতন নদীর গতি স্থির ছিল না। স্রোতের প্রবলতা বশতঃ ১৮৩০ খৃঃ অব্দে রেণেলের মুলফৎগঞ্জ বিধৌত করিয়া নদী এক মাইল দক্ষিণে প্রবাহিত হইতে থাকে। ১৮৪০ খৃঃ অঃ হইতে মেঘনা প্রবল রূপ ধারণ করিতে আরম্ভ করে; এবং নূতন নদী উত্তরে সরিয়াছে দেখিয়া বোধ হয় যে, গঙ্গার স্রোতঃ উত্তর পূর্ব্বদিকে প্রবল ছিল। এই নূতন নদী হইতে মেঘনার পশ্চিম পার পর্য্যন্ত দক্ষিণ দিকে প্রকাণ্ড চর পড়িয়া দ্বীপের চরের সহিত সংযুক্ত হয়। এত বেশী চর পড়িয়াছিল যে, কীর্ত্তিনাশার মুখ বন্ধ হইয়া যাওয়ায়, ইহা অন্য দিক্ দিয়া প্রবাহিত হইবার সুযোগ অনুসন্ধান করিতেছিল। সুরপুর হইতে পাঁচচরের ধার দিয়া প্রায় ভদ্রাসন পর্য্যন্ত **কীর্ত্তিনাশা** পুনরায় উহার পুরাতন খাত দিয়া প্রবাহিত হইতে লাগিল। এখানেও ইহার উত্তর-দক্ষিণ-প্রবণতা পুনরায় প্রকাশ পায় এবং গতি চাঞ্চল্য বশতঃ ইহাও **খাগুটিয়া**

* পল্লীবিজ্ঞান ৫ সংখ্যা ১২৭৪ জ্যৈষ্ঠ। ইংরাজী ১৮৬৭, জুন।

গ্রাম বিধ্বস্ত করে। ইহাতে রাজনগর হইতে মূলফৎগঞ্জ পর্য্যন্ত আর একটী নদীর সৃষ্টি হয়। এই সময় (১৮৫৮—৬০ খৃষ্টাব্দে) মেঘনা নদীর সহিত নূতন নদীর সঙ্গমস্থলে পশ্চিম তীরে নূতন নদীতে যে চর উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহা প্রকাণ্ড আকার ধারণ করে। পদ্মা নূতন পথে বাহির হইতে চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই। নূতন নদী খুব ভরাট হইতে আরম্ভ করিল এবং কীর্ত্তিনাশার মূল স্রোতঃ ইহার পূর্ব্ব গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হইয়াছিল। মেঘনার স্রোতঃ প্রাবল্যে কীর্ত্তিনাশা নূতন পথে প্রবাহিত হইতে পারে নাই। ১৮৬৬ খৃঃ অব্দে কীর্ত্তিনাশা রাজনগরের পূর্ব্বদিকস্থ নূতন পথে পুনরায় প্রবাহিত হয়। বেগ এত অধিক হইয়াছিল যে, কীর্ত্তিনাশা আর একবার পূর্ব্ব মূর্ত্তি ধারণ করিয়া মেঘনার পশ্চিম তীরস্থ নূতন চর বিধৌত করিয়া ফেলে। ১৮৭১ খৃঃ অঃ রাজনগরের সমস্ত কীর্ত্তি নদীগর্ভে বিলুপ্ত হয়। কিন্তু নদীর দক্ষিণদিক্‌গামী ভাঙ্গন বড় সুবিধাজনক হইয়াছিল না। ১৮৮৬—৮৭ খৃঃ অব্দে নুরিকুল এবং জপ্‌সা দেবমন্দিরাদি সহ নদীগর্ভে সম্পূর্ণ ভাবে বিলীন হইয়া যায়। উহারই কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে তারপাশা, বাঘিয়া, কাঁচাদিয়া, কালীপাড়া, লৌহজঙ্গ, পোড়াগাছা, বিলাসপুর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ স্থানগুলি কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হয়। বর্ত্তমান তারপাশা নাম্নীয় স্থান হইতে নদীর উত্তর-তীর-ব্যাপী-চর পদ্মার ও মেঘনার সঙ্গম পর্য্যন্ত বিস্তৃত হওয়ায়, দক্ষিণ পারের রাজনগর (চর) পুনরায় নদীগর্ভস্থ হওয়ার সম্ভব হইয়া দাঁড়াইয়াছে। *

আর একটী নদী যেন কৃষ্ণনগর, গঙ্গানগর, ডোমসার, পালঙ্গ আঙ্গারিয়া প্রভৃতি স্থানের মধ্য দিয়া কীর্ত্তিনাশা ও আড়িয়ল খাঁর সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে। রাজনগর পদ্মার কুক্ষিগত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে কীর্ত্তিনাশার বুকে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটিত। ১২৭৩। চৈত্র। ইংরাজী ১৮৬৭। মার্চ্চ মাসের 'পল্লীবিজ্ঞানের' স্থানীয় সংবাদাবলীতে দেখিতে পাই—"বহর হইতে কয়েক ব্যক্তি রাজনগর যাইতেছিল, কীর্ত্তিনাশা নদীতে নৌকা ডুবিয়া ৫ জন মানুষ প্রাণ হারাইয়াছে। নদীর প্রকৃত বেগের সময় আসিতে না আসিতেই কীর্ত্তিনাশার এত পরাক্রম। পদ্মা কীর্ত্তিনাশায় সচারচরই এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে।"

সে দিন হইতে পদ্মা নদীর ভীষণ আক্রমণের হাত হইতে আজ পর্য্যন্তও বিক্রমপুরবাসী নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই। এই নদী প্রথমে 'রথখোলা,' পরে 'ব্রহ্মবধিয়া' পরে কাথারিয়া এবং সর্ব্বশেষ কীর্ত্তিনাশা নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই কীর্ত্তিনাশার প্রভাবেই এখন উত্তর বিক্রমপুর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর দুই ভাগে বিভক্ত হইয়াছে।

* পূর্ব্ববঙ্গের নদী পরিবর্ত্তন—আনন্দনাথ রায়, প্রতিভা, ১ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা ১৪৬—১৪৮ পৃষ্ঠা।
Canalisation in Munshiganj by Mr F. D. Ascoli, I.C.S.

পদ্মানদীর চর

এই খানে প্রসঙ্গ-ক্রমে 'রথখোলার' কথা বলিতেছি। এ বিষয়ে নানারূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত। কেহ বলেন, বিক্রমপুরের জমিদার নয়পাড়ার চৌধুরীগণের রথের ভারে রাস্তার উপর চাকার দাগ পড়িয়া গঙ্গা হইতে মেঘনা পর্য্যন্ত জল প্রবাহিত হওয়ায় ঐ দাগ খালরূপে পরিণত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন, চাঁদরায় কেদার রায়ের রথচক্রের দাগেই যে খালের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহাই রথখোলার খাল নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এখানে পদ্মার প্রবাহ পরিবর্ত্তনের কারণ সম্বন্ধে বলিব। ১৭৮৭ খৃষ্টাব্দের প্রবল বন্যার জন্য ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহের পরিবর্ত্তন হয়। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে মেজর রেণেল ঢাকার উত্তরাংশেই ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদ নদের সম্মেলন দর্শন করিয়াছিলেন। আইন-ই-আকবরি

পদ্মার প্রবাহ পরিবর্ত্তনের কারণ

গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে ষোড়শ শতাব্দীতে উহাই ব্রহ্মপুত্রের মূল স্রোতঃ ছিল। রেণেলের জরীপের প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দীকালমধ্যে ব্রহ্মপুত্রের প্রধান স্রোতঃ ঢাকার পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত হইয়া জাফরগঞ্জের নিকটে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছিল। এই সম্মিলিত প্রবাহ রেণেলের উল্লিখিত নালা ও ফরিদপুরের অন্তর্গত পাচ্চরের মধ্যস্থিত পদ্মার প্রাচীন খাত পরিত্যাগ করিয়া ইতিহাস-প্রসিদ্ধ **রাজাবাড়ী মঠের** কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল রাজাবাড়ীর মঠ পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। রেণেলের জরীপ সময়ে এই সম্মেলন স্থান পদ্মা মেঘনাদের সম্মেলন স্থান হইতে সোজাসুজি উত্তরে অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বোক্ত নালা হইতে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত মেন্দিগঞ্জ নামক স্থান পর্য্যন্ত নদীর প্রবাহ প্রায় ১২০ মাইল দীর্ঘ হইবে। উহা দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিক হইতে ঠিক্ দক্ষিণ দিকে পরিবর্ত্তিত হইয়া বিক্রমপুরের অন্তর্গত চণ্ডিপুরের দিকে গিয়াছিল (দৈর্ঘ্য প্রায় ২০ মাইল); রেণেলের ম্যাপের (২৩° নিরক্ষ) শ্রীরামপুর যোজকের মধ্য দিয়া নয়াভাঙ্গনী নামে একটি নূতন নদীর উদ্ভব হইয়া মেঘনাদকে পদ্মার প্রাচীন প্রবাহের সহিত মিলিত করিয়া দিয়াছে। ১৮০০ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে উহা মেঘনাদ হইতে উৎপন্ন হইয়া পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ মধ্যে আসিয়া পতিত হইয়াছে।

১৭৮৭ খৃঃ অব্দের বন্যার ফলেই যে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদের প্রাচীন প্রবাহের পরিবর্ত্তন সংঘটিত হইয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। প্রকৃত পক্ষে এই জলপ্লাবন হেতুই যে ঢাকার উত্তর হইতে বর্ত্তমান ফরিদপুর জেলার দক্ষিণ পর্য্যন্ত ভূভাগের প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় ও অনিষ্ট সংঘটিত হইয়াছে, তাহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ভীষণ জলপ্লাবনের ফলেই নয়াভাঙ্গনী নদীর সৃষ্টি হইয়াছে, এতৎ সাপক্ষে প্রমাণাবলি অত্যন্ত প্রবল থাকায়, তিস্তানদীই যে ভয়ানক পরিবর্ত্তনের মূলীভূত কারণ এইরূপ অনুমান প্রমাণসিদ্ধ হইতেছে।

রাজনগর পরগণা সাধারণতঃ পাদ্মা ও কালীগঙ্গা নদীর সঙ্গমস্থলের দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত ছিল। এই কালীগঙ্গা নদী খুলিয়া যাওয়ায় ১৮১৮ খৃঃ অঃ মধ্যে পদ্মা নদী মেঘনাদ নদে প্রবেশ লাভ করিবার অভিনব পথ প্রাপ্ত হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে এই অভিনব পথটিই স্বনামধন্যা **কীর্ত্তিনাশা**। যে সময়ে তিস্তা ও ব্রহ্মপুত্রের অধিকাংশ সলিলরাশি যবুনার মধ্য দিয়া জাফরগঞ্জের নিকট পদ্মার সহিত সম্মিলিত হইতেছিল, তৎসময় হইতে এইরূপ পরিবর্ত্তন সম্পূর্ণতা লাভ করিতে ত্রিশবৎসর অতিবাহিত হইয়াছিল।

পূর্ব্বে পদ্মানদী ফরিদপুর জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বাখরগঞ্জ জেলার মেন্দীগঞ্জ থানার অন্তর্গত কন্দর্পপুরের সন্নিকটে মেঘনাদের সহিত মিলিত হইত। এই প্রাচীন প্রবাহ এখন **ময়নাকাঁটা** ও **আড়িয়াল খাঁ** নামে পরিচিত। পদ্মার গতি পরিবর্ত্তন অতি বিচিত্র। উহার মধ্যে এমন সমুদয় চরের উদ্ভব হয় যে, কোন ষ্টীমার সপ্তাহকাল পূর্ব্বে যে স্থান অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, তাহার পরের সপ্তাহেই আবার সে স্থান অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। পূর্ব্বে যে স্থান ক্ষীণ তোয়া ছিল, উহাই আবার গভীর হইয়া পড়িয়াছে দেখা যায়। পদ্মা বা পদ্মাবতীর নাম ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দৃষ্ট হয়। উহাতে পদ্মাবতী গঙ্গার শাখানদী বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে! ব্রহ্মবৈবর্ত্ত ও দেবীভাগবতে ইহাকে স্বতন্ত্র নদী বলা হইয়াছে। *

পদ্মার প্রাচীন প্রবাহ

বিক্রমপুরের সীমার কথা বলিয়াছি, এইবার খালের কথা বলিব। **তালতলার খাল** বিক্রমপুরের বিশেষ প্রসিদ্ধ।

এই খাল বহরের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া বালিগাঁও, সিলিমপুর, কোরাল, বাকাইচাল ফেগুনাসার, মালখানগর ও তালতলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া ধলেশ্বরীতে যাইয়া মিশিয়াছে। এই বিখ্যাত খালটি বা পয়ঃপ্রণালীটির জন্যই ধলেশ্বরী হইতে পদ্মায় যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে। এই খালটি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ দ্বিতীয় খাল। ইহা বিক্রমপুরকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। হলদিয়ার ও তালতলার এই প্রসিদ্ধ খাল দুইটি প্রধানতঃ উত্তর বিক্রমপুরকে পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব্ব বিক্রমপুর এই তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছে। পশ্চিম বিক্রমপুর হইতে পূর্ব্ব ও মধ্য বিক্রমপুরের আয়তন অনেকটা বেশী হইবে। তালতলার খালের জন্য ধলেশ্বরী হইতে পদ্মার চলাচলের পথ সুগম হইয়াছে। কীর্ত্তিনাশা ও মেঘনাদ নদ ঘুরিয়া যাওয়া অপেক্ষা এই পথ প্রায় কুড়ি পঁচিশ মাইল সোজা। বরিশাল প্রভৃতি ভাটী অঞ্চলের মহাজনগণের নৌকা এই পথে

খাল, বিল ইত্যাদি

* বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৩১ অধ্যায়ে পদ্মা-গঙ্গা সঙ্গম তীর্থস্থান বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

সহজেই ঢাকা যাইতে পারে। কে এই খালটিকে খনন করাইয়াছিলেন, সে কথা বলা কঠিন। জন প্রবাদ এইরূপ যে সুপ্রসিদ্ধ মহারাজা রাজবল্লভের পুত্র রাজা রামদাস দেওয়ান কর্ত্তৃক এই খাল প্রথমতঃ খনন করা হইয়াছিল। তাঁহার সময়ে ঐ খাল দিয়া স্বীয় আবাস ভূমি রাজনগর হইতে ঢাকা আসিতে এবং ঢাকা হইতে রাজনগর যাইতে পারিতেন। যে সকল লোক নৌকাযোগে কীর্ত্তিনাশা নদী দিয়া ঢাকা প্রভৃতি স্থানে আইসে, তাহাদিগকে বাহির নদী দিয়া প্রায় দুই তিন দিনের পথ ঘুরিয়া আসিতে হয়। কাজেই এই খালটি বিক্রমপুরের একটি প্রসিদ্ধ খাল। আমাদের মনে হয় রামদাস দেওয়ান কিংবা মহারাজা রাজবল্লভ এই খালের সংস্কার করিয়াছিলেন মাত্র। কারণ এই খালের উপরকার ইষ্টক-নির্ম্মিত পুলটি অনেকদিনের পুরাণো এবং বল্লালী আমলের বলিয়া পরিচিত। পুলটি ভগ্ন। এই জন্যই মনে হয় যে তালতলার খালটীর সংস্কার মহারাজ রাজবল্লভ কিংবা দেওয়ান রামদাস করিয়া থাকিবেন। *

তালতলার খাল

এইবার মীরকাদিমের খালের সম্বন্ধে বলিতেছি। বিক্রমপুরের বিশেষতঃ উত্তর বিক্রমপুরবাসী সকলেই এই খালটির নাম জানেন। মীরকাদিমের খাল বর্ত্তমান রেকাবী-বাজারের নিকটে ধলেশ্বরী নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া মোকামখোলা নামক স্থানে মাকুহাটীর খালের সহিত মিশিয়াছে। প্রাচীন কালে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণে ইছামতী নদী প্রবাহিত ছিল, এবং ইছামতী নদী হইতেই খাল বাহির হইয়াছিল। এখন ইছামতী ধলেশ্বরীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। তালতলার খালের সম্বন্ধে রাজবল্লভ ও রামদাস দেওয়ানের সহিত খনন সম্পর্কে যেরূপ একটা জনপ্রবাদ প্রচলিত রহিয়াছে, মীরকাদিমের খালের সম্বন্ধে সেইরূপ কোন কিংবদন্তী প্রচলিত নাই।

মীরকাদিমের খাল

খালের উপরের প্রধান কীর্ত্তি একটি হিন্দু আমলের তিন খিলানযুক্ত প্রকাণ্ড ইটের পুল। জনপ্রবাদ বলে, পুলটী বল্লালসেনের নির্ম্মিত। পাইকপাড়া ও আবদুল্লাপুর গ্রামের উভয় সীমায় পুলটি উত্তর দক্ষিণে দীর্ঘ খালকে পূর্ব্ব পশ্চিমে দীর্ঘ হইয়া অতিক্রম করিয়াছে। পুলটী যে রাস্তাকে স্বীয় দেহের উপর দিয়া এই ভাবে খাল অতিক্রম করিয়া লইয়া গিয়াছে, সেই রাস্তা মীরকাদিমের খালের তিন মাইল

* Tradition states that the Taltola khal wss excavated by Raja Raj Ballava in the middle of the 18th century. This is not a fact as the bridge upon it is many years older. If it was excavated by the Raja, it was clearly impossible to keep it open as it was already bolted up by the British Government to allow the passage of large boats in the river. Canalisation in Munshigunj by Mr. F. D. Ascoli, তালতলার পুল সম্বন্ধে জানিতে পারি যে—It is said to have been built by Raja Ballal Sen before the conquest of Bengal by Mahammadans. List of Ancient Manuments in the Dacca. Division Page 26. Published by authority.

দূরে সমান্তরালে অবস্থিত তালতলার খাল অতিক্রম করিয়াছে এবং তথায়ও ঠিক এইরূপ আরেকটী ইটের পুল আছে। সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এই পুল দুইটী কে কবে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। পুল দুইটী যে অতি প্রাচীন, দেখিবা মাত্রই সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না। গাঁথুনী আগাগোড়া ইটের কোথাও পাথর ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু ইটের গাঁথুনীই বজ্রের মত দৃঢ়। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের বিখ্যাত ভূমিকম্পে ইহার বিশেষ কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। এই খালটী সম্বন্ধে ডাঃ শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে ১০৭৫ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি কোন বৎসর মীরকাদিমের খাল খনিত হইয়াছিল কাজেই এই খালের বয়স প্রায় নয়শত বৎসর হইতে চলিল, সেই হিসাবে তালতলা খালের বয়সও এইরূপ হওয়া অসম্ভব নয়। এই খালটী ধলেশ্বরী নদী হইতে বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্রের প্রাচীন খাতে বা সেরাজাবাদের নদীতে পড়িয়াছে।

ধলেশ্বরী নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া যে খালটী চুড়াইনের মধ্যস্থল ভেদ করিয়া আরিয়ল বিলে যাইয়া মিশিয়াছে তাহা 'চুড়াইনের খাল' নামে খ্যাত। উহার অপর একটী শাখা সেরাজদিঘার পূর্ব্বে প্রান্তে লুপ্ত অবস্থায় আছে।

এই সমস্ত স্বাভাবিক ও খনিত পয়ঃপ্রণালী গুলি হইতে বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালের উদ্ভব হইয়াছে। সে সমুদায় খালের নাম যে যে গ্রামের মধ্য দিয়া চলিয়া গিয়াছে সে সে গ্রামের নাম অনুযায়ী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে; যেমন বেতকার খাল, বজ্রযোগিনীর খাল, কামারখাড়ার খাল, বাঘিয়ার খাল, হাসাড়ার খাল। বিক্রমপুরের প্রায় প্রত্যেক গ্রামের মধ্যভাগ ও সীমা ধৌত করিয়া এ সমুদয় খাল প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। খালের সংখ্যা বেশী বলিয়া বিক্রমপুরের ভূমির উর্ব্বরা শক্তি অত্যন্ত বেশী। এই সমস্ত ছোট ছোট খাল গুলিকে চল্‌তি ভাষায় 'ঝোরাখাল' বলে।

হল্‌দিয়া, তালতলা, মীরকাদিম এই তিনটী প্রসিদ্ধ খাল হইতে বহু-সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঝোরাখাল বাহির হইরা বিক্রমপুরের অভ্যন্তরস্থ গ্রামগুলিকে ও হাটে-বন্দরে চলাচল ও বাণিজ্য পণ্য বহনের সুবিধা করিয়াছে। এই সমস্ত খালে জোয়ার ভাঁটায় জল কমে ও বাড়ে। জোয়ারের সময়ে মাল বোঝাই বড় বড় নৌকা ও যাতায়াত করিতে পারে। এই প্রকার যে সব খালগুলি দ্বারা লোকের যাতায়াত ও ব্যবসায় বাণিজ্যের সুবিধা হইয়া থাকে সেইরূপ কতকগুলি খালের বিবরণ দেওয়া গেল।

হল্‌দিয়ার খাল—এই খাল হইতে যে সকল খাল বহির হইয়াছে তাহার পরিচয় দিলাম।

(ক) লৌহজঙ্গের নিকট হইতে ইহার যে শাখা পূর্ব্বগামিনী হইয়া গাউদিয়ার নিকটে তালতলার খালে মিশিয়াছিল, তাহা পদ্মার ভাঙ্গনে পদ্মার সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

(খ) দিঘলী হইতে উৎপন্ন হইয়া একটী শাখা পূর্ব্ববাহিনী হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া ঘোরদৌড় হইতে উত্তরবাহিনী হইয়া বেজগাঁ, ভোগদিয়া, মসদাগাঁও আটিগাঁও প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া দক্ষিণ চারিগাঁয়ের নিকট অন্য "ঝোরা খালে" পতিত হইয়াছে। ইহার পারে বেজগাঁ, ভোলদিয়া, আটিগাঁও ও দক্ষিণ চারিগাঁও-এর হাট বাজার অবস্থিত।

(গ) ঘোড়দৌড় গ্রামের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বগামিনী হইয়া কিয়দ্দূর অগ্রসরের পর উত্তরবাহিনী হইয়া একশাখা ধীৎপুরের মধ্য দিয়া বিলে পড়িয়াছে, অপর শাখা মসদগাঁও ভেদ করিয়া উত্তর দিকে যাইয়া গ্রামের সহিত মিশিয়াছে।

(ঘ) কনকসারের পূর্ব্বসীমা স্পর্শ করিয়া একশাখা ধীৎপুরের মধ্য দিয়া এবং কনকসারের বন্দরের পশ্চিম প্রান্ত ধৌত করিয়া নাগেরহাটের মধ্য দিয়া অপর শাখা নাগেরহাটের নিকট একটি ক্ষুদ্র খালে যাইয়া মিশিয়াছে। **নাগেরহাট বন্দর** ইহার পারে অবস্থিত। নাগেরহাটে বহু কুম্ভকারের বাস; এ খাল দ্বারা তাহাদের ব্যবসায়ের প্রভূত উপকার সাধিত হয়।

(ঙ) এই খাল হইতে উৎপন্ন দু'টী অপ্রশস্ত জলধারাকে লোকে **"কালীগঙ্গা"** ও **"পোড়াগঙ্গা"** বলে। প্রথমোক্তটী কোরহাটী ও খরিয়া গ্রামের মধ্য দিয়া ভাওয়ারের নিকট পদ্মায় মিশিয়াছে। এটীকে "কালীগঙ্গা" বলে, পুরাতন **থাক-নক্সায়** ও এই জলধারাটী **"কালীগঙ্গা" বলিয়া বর্ণিত ও চিহ্নিত** হইয়াছে।

(চ) হলদিয়া গ্রামের উত্তর প্রান্ত স্পর্শ করিয়া একটি অপ্রশস্ত জলধারা পূর্ব্বগামিনী হইয়া নাগেরহাট, দক্ষিণ চারিগাঁও, ভবানীপুর, জৈনসার প্রভৃতি গ্রামের ভিতর দিয়া মধ্যপাড়ার নিকট একটী ক্ষুদ্র পয়ঃপ্রণালীর সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্রোতোধারাটীই "পোড়াগঙ্গা" নামে পরিচিত। ইহার পারে নাগেরহাট, দক্ষিণ চারিগাঁ, ভবানীপুর প্রভৃতি বন্দর অবস্থিত; হলদিয়া হইতে নৌকাযোগে মাল বহনে সুবিধাজনক খাল।

(ছ) হলদিয়ার খালের পশ্চিমপার হইতে শিমুলিয়া বন্দরের পূর্ব্ব সীমা ভেদ করিয়া খরিয়া গ্রামের ভিতর দিয়া কোরহাটী ও খরিয়া হইতে আগত "কালীগঙ্গার" সহিত মিলিত হইয়া ভাওয়ারের নিকট পদ্মায় মিশিয়াছে।

(জ) সাতঘরিয়ার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া মৌছার ভিতর দিয়া কাজিরপাগলায় মিশিয়াছে।

(ঝ) তারপাশার নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া হারিয়ামুন্সীর ভিতর দিয়া বিলে পতিত হইয়াছে।

(ঞ) গয়ালী মান্দ্রার দক্ষিণ হইতে উৎপন্ন হইয়া পূর্ব্বগামিনী হইয়া কুকুটীয়ার মধ্য দিয়া বিলে মিশিয়াছে।

(ট) গয়ালী মান্দ্রার পশ্চিম হইতে পশ্চিমবাহিনী হইয়া কাজিরপাগলার খালে যাইয়া মিশিয়াছে।

(ঠ) দক্ষিণ পাইকসার উত্তর সীমানা ভেদ করিয়া এক শাখা কাজিরপাগলা, দোগাছি, কোলাপাড়া প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া বিলে পতিত হইয়াছে। অপর শাখা দক্ষিণ পাইকসার উত্তর সীমানা স্পর্শ করিয়া পশ্চিমবাহিনী হইয়া বিলে যাইয়া মিশিয়াছে। প্রথমোক্ত ধারাটীর তীরে কাজিরপাগলা, দোগাছি এবং কোলাপাড়া বন্দর অবস্থিত।

(ড) শ্রীনগরের দক্ষিণ প্রান্ত ধৌত করিয়া শ্যামসিদ্ধির মধ্য দিয়া আঁকিয়া-বাকিয়া বক্রাকৃতি ভাবে রাড়ীখালের উত্তর দিয়া আরিয়ল বিলে মিশিয়াছে।

(ঢ) পদ্মানদীর ভাঙ্গনীর জন্য অনেক সময় চর পড়িয়া নূতন নূতন পয়ঃপ্রণালীর সৃষ্টি হইয়া থাকে। বর্ত্তমানে এইরূপ একটি জলপ্রণালীর নাম করা যাইতে পারে উহা কলমার নিকট হইতে বাহির হইয়া পুরাণ দীঘিরপাড়ের নিকট যাইয়া পদ্মার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই সব পয়ঃপ্রণালী পদ্মার প্রকোপে পুনরায় নূতন চর ভাঙ্গিয়া গেলে আবার মূল পদ্মার সহিত মিলিত হইয়া যায়।

এই ভাবে তালতলার খাল ও মীরকাদিমের খাল হইতেও অনেক 'ঝোরাখালের' উৎপত্তি হইয়াছে। বিক্রমপুরের নিম্নভূমিকে উচ্চ করিয়া না লইলে বাড়ীঘর ইত্যাদির নির্ম্মাণ কার্য্য চলিতে পারে না। তাবপর যাতায়াতের জন্য ও খালের প্রয়োজনীয়তা খুব বেশী। কি ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য, কি গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে যাইবার জন্য ও খালের আবশ্যক। এইজন্য বিক্রমপুরের প্রত্যেক গ্রামের প্রান্ত দিয়া কিংবা মধ্য দিয়া খাল আছে ঐ সব খালের নাম গ্রামের নাম অনুসারেই হয়। যেমন আউটসাহীর খাল, বাঘিয়ার খাল, বেত্‌কার খাল, বজ্রযোগিনীর খাল এইরূপ। সে সমুদয়ের নাম করা অনাবশ্যক বোধে আর নাম লিখিলাম না। প্রধান কয়েকটী খালের কথাই বলিলাম।

বর্ষাকালে বিক্রমপুরের গহেনার নৌকা ও ছোট ছোট লঞ্চগুলি প্রধান প্রধান খাল গুলির মধ্য দিয়াই মুন্সীগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা যাতায়াত করে। জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্য ভাগ হইতে কার্ত্তিক মাসের মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত মাত্র পাঁচ মাস কাল খালের ভিতর দিয়াই গহেনা, লঞ্চ ইত্যাদি যাতায়াত করিতে পারে। কার্ত্তিকের মধ্যভাগ হইতে জ্যৈষ্ঠের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত অবশিষ্ট সাত মাস সময় ঢাকা, মুন্সীগঞ্জ ও নারায়ণগঞ্জ-গামী গহেনাগুলি পদ্মা, মেঘনা, শীতল-লক্ষ্যা ঘুরিয়া ধলেশ্বরী ও বুড়ীগঙ্গার পথে ঢাকা পৌছে। **দক্ষিণ বিক্রমপুরের** খালগুলির মধ্যে ভোজেশ্বর, ঘড়িসার, নড়িয়ার, মহিষখোলার, নওপাড়ার, গোয়ালমারীর, গোয়ালার, পিঞ্জিরির, ফতেপুর, গোয়াখালী, ঘাগরের, বিনোদপুর বা চিকন্দীর, রাজগঞ্জ বা পালঙ্গের খাল ও বিলরুট প্রসিদ্ধ।

বিক্রমপুরের বিলের মধ্যে **আইরল** বিল বিশেষ প্রসিদ্ধ। তাহার দক্ষিণ প্রান্তে মাইজ-পাড়া, কোলাপাড়া উত্তরে শ্রীধরখোলা, বারুইখালি এবং সেকেরনগর বা শেখরনগর। পশ্চিমে নারিশা গ্রাম, পূর্ব্বপ্রান্তে দয়হাটা, হাসাড়া, গাঁদিঘাট, প্রাণীমণ্ডল বা পরাণীমণ্ডল প্রভৃতি গ্রাম। এই বিলটীর দৈর্ঘ্য পূর্ব্বে পশ্চিমে ১২ মাইল এবং দক্ষিণে প্রস্থ প্রায় ৭।৮ মাইল হইবে। অতি প্রাচীন কালে বিক্রমপুরের অধিকাংশ ভূখণ্ড যে এই আরিয়ল বিলের গর্ভে ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। এখন অনেক স্থান গ্রামরূপে পরিণত হইলেও আইরল বিল বিক্রমপুরের এক তৃতীয়াংশ স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই বিলে বর্ষার সময়ে কুমীরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হয়, এবং ঝড় উঠিয়া বিলের জলে এমন ঢেউ উঠে যে বিলের মধ্যে নৌকা থাকিলে জীবনের আশা বড় কম থাকে। এই বিলটিকে ছোট খাট হ্রদ বলা যাইতে পারে।

বিল

ঢাকা জেলার বিলগুলির মধ্যে আয়তন ও প্রশস্ততায় আইরল বিলই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। অনেকে অনুমান করেন যে সম্ভবতঃ রাজসাহীর **চলন বিল** এবং ঢাকার **আইরল বিলেই** অতি প্রাচীন কালে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম হইয়াছিল। পরে উভয় নদীর প্রবাহ পরিবর্ত্তন হেতু এই স্থান শুষ্ক হইয়া প্রকাণ্ড বিলে পরিণত হইয়াছে।

আড়িয়ল বিল বা চূড়াইন বিল ছাড়া আরও কয়েকটী ছোট ও বড় এবং মাঝারি রকমের বিল আছে। এখানে তাহাদের নাম করিলাম :—

(ক) কদম বিল—হলদিয়া ও নাগেরহাটের মধ্যস্থলে অবস্থিত। পৌষ-সংক্রান্তি দিনে এই বিলে বহুলোকে মৎস্য ধরে।

(খ) জিয়াস্ বিল।

(গ) হাসাড়ার বিল—এই বিলকে চূড়াইন বিলের একটি অংশ বলিলেই হয়। এইরূপ আরও অনেক ছোট ছোট বিল আছে। সে সমুদয় সাধারণতঃ যে যে গ্রামের কাছাকাছি অবস্থিত ঠিক্ সেই সেই গ্রামের নামেই পরিচিত হইয়া থাকে।

দক্ষিণ বিক্রমপুরে **ঢোলসমুদ্র** বিশেষ বিখ্যাত। ইহা ফরিদপুরের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে অবস্থিত। এক সময়ে ইহার আয়তন ৮ মাইল ছিল, পরে বর্ষার সময়ে প্রায় দুই মাইল জলপূর্ণ থাকিত। বর্ত্তমান সময়ে গ্রীষ্মকালে এই বিল প্রায় শুষ্ক হইয়া যায়। এতদ্ব্যতীত বিল হাতিমোহনা ২॥০ মাইল দীর্ঘ ও ২ মাইল প্রশস্ত ছিল। কাজলারবিল, বাঘিয়াবিল, কোটালিপাড়ার উত্তর। রামশীলা দীঘি, বড়য়া ইত্যাদি। এই সমুদয় বিল ক্রমশঃই শুকাইয়া আসিতেছে।

বাঙ্গালা দেশ পলিমাটীর দেশ। ভূতত্ত্ববিদ্গণের মতে ভারতবর্ষের অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিতে গেলে ইহার বয়স অনেক কম। কম বলিয়াও একেবারে নেহাৎ কম

নহে। কেননা বাঙ্গালাদেশের উত্তর, দক্ষিণ-পশ্চিম ও দক্ষিণপূর্ব্ব সীমান্তে অনেক প্রাচীন ভূমি রহিয়াছে। এমনকি চট্টগ্রামের পার্ব্বত্য প্রদেশে, যে সমুদয় প্রত্ন প্রস্তর যুগের শিলা-নির্ম্মিত অস্ত্র শস্ত্রাদি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা অনুমান করেন যে, দক্ষিণাপথবাসী আদিমমানবগণের সহিত উত্তরাপথবাসী প্রাচীন মানবজাতির ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। মান্দ্রাজেও বাঙ্গালায় আবিষ্কৃত প্রত্ন-প্রস্তর যুগের অস্ত্র সমূহের সাদৃশ্য কেবল আকারগত নহে, অনেক সময়ে উভয় দেশে আবিষ্কৃত অস্ত্রের পাষাণ একই জাতীয়। * এ সকল হইতে সপ্রমাণ হয় যে আমাদের জননী বঙ্গভূমি নবীনা হইলেও একেবারে নবীনা নহেন তিনি বেশ প্রবীণা।

ভূমির আকৃতি ও প্রকৃতি

বিক্রমপুর বলিয়া নহে, পূর্ব্ববঙ্গ নদীমাতৃক স্থান এবং বিক্রমপুর ত একেবারেই নদী-মেখলা। একজন ইংরাজ লেখক বিক্রমপুরের যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সর্ব্বতোভাবে সত্য:—Encircled in a network of rivers where Ganges and Buriganga, Megna, Ishamutti and Brahmaputra meet, lies ancient Kingdom of Vikrampur. * * Everywhere the influence of the great rivers has made itself felt in the story of Vikrampur. Silted up by them in days gone by, when the world was young, it is practically an island set in their midst. Having brought it into being, they made of it their Special Care. * নদ-নদী পরিবেষ্টিত বিক্রমপুরের উপর নদ-নদী তাহার ইতিহাস প্রতিদিন লিখিয়া যাইতেছে। সেই কবে কোন্ যুগে কোথাও নদী শুকাইয়া গিয়াছে কোথাও নদীর স্রোতোধারা বেগে প্রবাহিত হইয়াছে। বিক্রমপুর একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ বিশেষ। এজন্যই বিক্রমপুর ও বাঙ্গালার অন্যান্য স্থানের ন্যায় পলিমাটির দেশ। নদী তটরেখা হইতে সাধারণত: ইহার উচ্চতা অল্প। বর্ষার প্লাবনে সারা বিক্রমপুর সাত সাগরের এক সাগরে পরিণত হয়, সুধু জল-জল-জল। মাঝে মাঝে শ্যামল-তরু-গুল্ম-পরিশোভিত বনরাজিপরিবেষ্টিত পল্লীগ্রামগুলির, সবুজ ধান্য-ক্ষেত্রের তরঙ্গায়িত সৌন্দর্য্য দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়। বৎসরের প্রায় অর্দ্ধেক সময় বিক্রমপুরের অধিকাংশ ভূ-ভাগ জলমগ্ন থাকে।

* V. Ball—Stone implements found in Bengal, Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1865, p.P. 127—28. স্বর্গীয় রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত,—বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম খণ্ড।—৬—৭ পৃষ্ঠা

* Dacca—The Romance of an Eastern Capital by F. B. Bradley Birt Page 16.

বিক্রমপুরের ভূমি সমতল নহে। কোথাও উচ্চ, কোথাও নীচ। এমন কোন কোন স্থান আছে যে স্থানে বর্ষার জলপ্লাবন ও পৌছাইতে পারে না। যেমন রামপাল, বজ্রযোগিনী, পাইকপাড়া প্রভৃতি গ্রাম। পূর্ব্ব বিক্রমপুরের ভূভাগ পশ্চিম বিক্রমপুর হইতে উচ্চ। পশ্চিম বিক্রমপুরের মধ্যে পদ্মার তটভূমির নিকটবর্ত্তী স্থানগুলি অপেক্ষাকৃত উচ্চ। আরিয়লবিল পশ্চিম বিক্রমপুরে অবস্থিত, এজন্য ইহার চারিদিকে যে সমুদয় স্থান আছে, সে গুলি নিম্নভূমি।

ভূভাগের বৈচিত্র্য

পূর্ব্ব বিক্রমপুরের মৃত্তিকা খুব উর্ব্বরা। রামপাল ও মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানে ভূমি উচ্চ এবং মৃত্তিকা পীতবর্ণ। এজন্য ঐ স্থান কদলী উৎপাদনের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। সেখানকার দুধসাগর, অমৃতসাগর, অগ্নিশ্বর, সবরী, চিনিচম্পা, কবরী, আট্যা, কানাইবাঁশী প্রভৃতি কদলী খুবই বিখ্যাত এবং দেশ-বিদেশে ইহার চালান হইয়া থাকে। রামপালের মূলা ও বিশেষ বিখ্যাত। পূর্ব্বে বিক্রমপুরে কপির চাষ হইত না। বর্ত্তমান সময়ে রামপাল, মুন্সীগঞ্জ ও তাহার চারিপাশের গ্রামে গ্রামে বহু ফুলকপি, বাঁধা কপি ও গোল আলুর চাষ হইতেছে। এখানকার কচু ও উৎকৃষ্ট। আখের (ইক্ষু) চাষ ও বেশ ভাল হয় এবং এখানে যে উৎকৃষ্ট আখিগুড় হয় উহা 'রামপালের আখিগুড়' নামে প্রসিদ্ধ। মুন্সীগঞ্জে এজন্য বহু আখমাড়াই কল মজুত থাকে। এক সময়ে রামপালের চৌগাড়ার (নালা ডোবা) অন্ত ছিল না সেখানকার সুগভীর চৌগাড়া দেখিলে ভয় হইত। এখন তাহা ভরাট হইয়াছে। সে সমুদয় উচ্চ স্থানে নানাবিধ শস্য উৎপাদিত হয়। বিশেষতঃ রামপালের কলা, মূলা, বাইগণ (বেগুণ) সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। ইক্ষু ও খর্জ্জুরের রসে তথায় অধিক পরিমাণে অতি উপাদেয় গুড় উৎপন্ন হয়। এমন মিষ্ট ও পরিষ্কৃত গুড় কোথাও বড় দৃষ্ট হয় না। এখানে তেঁতুল ও শিমুল তুলা অনেক জন্মিয়া থাকে।

মৃত্তিকার গুণাগুণ ও কৃষি

মধ্য বিক্রমপুরের পানিয়া, খিলগাঁও, তন্তর, দক্ষিণ চারিগাঁও প্রভৃতি স্থানে উৎকৃষ্ট পাট জন্মে। পানের 'বোরো' বা বরোজ এ অঞ্চলেই বেশী। পানের বরোজে—পটল, মরিচ, প্রভৃতি ও উৎপন্ন হয়।

পশ্চিম বিক্রমপুরের মৃত্তিকা উর্ব্বরা বটে কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ফসল উৎপন্ন হয় না। ধান, পাট, কায়ন, তিল প্রধান ফসল।

বিক্রমপুরের সমগ্র ভূ-ভাগের মৃত্তিকাই আটালে বা (১) আটালিয়া, (২) দোয়াসা (বিল ও ঝিল প্রভৃতির নিকটবর্ত্তী মৃত্তিকাই এই শ্রেণীভুক্ত) এই মৃত্তিকা সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণের হয়। সম্ভবতঃ উদ্ভিজ্জ পদার্থ মিশ্রিত থাকার দরুনই এইরূপ হইয়া থাকে।

(৩) বালুকাময় যেমন চরভূমি এবং নদীর তটদেশের ভূ-ভাগ। পশ্চিম বিক্রমপুরের কোন কোন স্থানে বিশেষ হলদিয়ার মৃত্তিকা অত্যন্ত বালুকাময়। অথচ পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গ্রামের মাটিই আটালিয়া ও দোয়াসা। হলদিয়া গ্রামে এক ফুট মাটি খুঁড়িলেই গভীর বালুকাময় স্তর পাওয়া যায়, এ জন্য এখানে উৎকৃষ্ট জলাশয় যেমন দীঘি, পুষ্করিণী ইত্যাদি খনন করা অসুবিধাজনক।

মৃত্তিকার প্রকার ভেদ

আরিয়ল বিলের পাড়ে স্থানে স্থানে এবং রাড়িখালের গ্রামের মৃত্তিকার উদ্ভিজ্জ পদার্থের সংমিশ্রণ থাকাতে উহার মৃত্তিকা ঘোরতর কৃষ্ণবর্ণ। এখানে অনেক সময় মৃত্তিকা খননে মহিষের সিং ইত্যাদি পাওয়া যায়।

পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী প্রভৃতি নদীতে বহুচর আছে। কোন চরই বড় একটা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না। পুরাতন চর ভাঙ্গিয়া নূতন চরের সৃষ্টি হয়। এই সমুদয় নূতন চর দখল করিতে ভূম্যধিকারীদের মধ্যে অনেক সময়ই দাঙ্গা-হাঙ্গামা হইয়া থাকে। উহাতে খুন জখম পর্য্যন্ত হয়। বহরের চৌধুরী জমিদারদের সহিত ভাগ্যকূলের কুণ্ডুদের চর দখলি খুন জখমের কথা আজও লোকের মুখে মুখে প্রবাদের মত শোনা যায়। প্রত্যেক চরেরই এক একটী নাম থাকে। সাধারণতঃ জমিদারদের নামানুযায়ী চরের নাম হয়, যেমন মিত্রের চর, কুণ্ডুর চর, চরজজিরা এইরূপ। এ সমুদয় চরে মুসলমানদের বসতি বেশী। অনেক নমঃশূদ্রও আছে। বর্ত্তমান সময়ে ভাগ্যকূল হইতে দুয়ালী পর্য্যন্ত একটি বিস্তৃত চর পড়িয়াছে তাহাতেই 'পদ্মার ভাঙ্গনি' অনেক কমিয়াছে, নতুবা এত দিনে আরও বহু গ্রাম পদ্মার অতলতলে নিমজ্জিত হইত। এই সমুদয় চরে ধান, পাট, মুগ, আখ জন্মে এবং আখের গুড়ও চরেই জন্মে। দুধ ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। পদ্মার তীরবর্ত্তী বন্দরগুলিতে যথা,—ভাওয়ার, খরিয়া, দিঘলী, কলমা, দীঘিরপাড় প্রভৃতি স্থানে চরের দুধ ও অন্যান্য উৎপন্ন দ্রব্য প্রচুর আমদানী হয়। চরের লটা বা লঠা ঘাস—গরুর প্রধান পুষ্টিকর খাদ্য। চরে একজাতীয় ছোট ছোট ঝাউগাছ জন্মে, ঐগুলি সাধারণতঃ 'বুনো বা বউনা ঝাউ' নামে পরিচিত। ইহা জ্বালানি কাঠরূপে ব্যবহৃত হয়।

চরাভূমি

বিক্রমপুরের কোন স্থানেই বর্ত্তমান সময়ে গভীর বন-জঙ্গল নাই। কিন্তু একদিন ছিল। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে বিক্রমপুরের অবস্থা কিন্তু এইরূপ ছিল না, তখন বিক্রমপুরের অধিকাংশ গ্রামই বনাকীর্ণ ছিল।—যেরূপ উত্তর পারে, তেমনি দক্ষিণ পারের গ্রাম সমূহ ও ঐ প্রকার বনাকীর্ণ ছিল। সেকালের 'পল্লীবিজ্ঞান' পত্রে লিখিত আছে—"সমুদয় বিক্রমপুরের গ্রাম সংখ্যা যত, ব্যবহার জন্য পুষ্করিণী তাহার শতাংশের একাংশ নাই। একে নানাপ্রকার বনারণ্য এবং বৃক্ষাদিতে বিশুদ্ধ বায়ু অবরোধ করিতেছে, তাহাতে

বন-জঙ্গল

উত্তম পানীয় জল একেবারে অভাব বলিলে হয়। কোন মাঠ কি ক্ষেত্র মধ্যে দাঁড়াইলে চারিদিকে দৃষ্টি করিলে কেবল অরণ্যময়ই দেখা যায়। তাহাতে যেন লোকালয় আছে তাহার লক্ষণ কিছুই দর্শন হয় না। পূর্ব্বাংশে রামপাল, মহাকালী ইত্যাদি, উত্তরে ইছাপুর, শিয়ালদী, বয়বাগাদী প্রভৃতি, দক্ষিণে কীর্ত্তিনাশার পারে জপ্‌সা, ভোজেশ্বর প্রভৃতি স্থান এমন কি সে অঞ্চলগুলিই মনে করিলে আমাদের এ লেখা অবস্থা সম্মত কি না প্রতীত হইবেক। রামপালের ও তন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম ও পথ ঘাটগুলির অবস্থা শতবর্ষ পূর্ব্বে কিরূপ ছিল, তাহাও এখানে বলিতেছি:—আহা কি আক্ষেপ। পূর্ব্বে যেখানে রাজা ও রাজপরিবারদের অধিবাস ছিল, যে স্থানে সর্ব্বদা শান্তিজনিত চতুরঙ্গক জয়-ধ্বনিতে কর্ণকুহরকে আমোদিত করিত সেখানে ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভীষণ পশ্বাদিতে বসতি করিতেছে, আর সেই চতুরঙ্গক জয়ধ্বনি কর্কশ অসুখকব শৃগালধ্বনিতে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ব্বে যে সমস্ত বর্ত্ম দিয়া নানাদেশ বিদেশীব লোক অহর্নিশি গমনাগমন কবিত এইক্ষণে তাহা দিয়া নানাজাতীয় পশুচয় বিচরণ করিতেছে। * * রামপালের দীঘির পশ্চিম পার দিয়া উত্তরে ধলেশ্বরী খাড়ি (রিকাবীবাজারেব খাড়িব সম্মুখস্থ গুদারাঘাট) হইতে প্রায় সরলভাবে দক্ষিণাভিমুখে রাজাবাড়ী থানা পর্য্যন্ত বৃহৎ একটি রাজপথ সোজা দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নাম রামপালের দরজা। উক্ত দরজার পরিসর অন্যূন ৩০ হাত হইবে। কথিত আছে, বল্লালসেন ঐ দরজা নির্ম্মাণ কবাইয়া লোকের গমনা-গমনেব অসুবিধা নিবারণ কবিয়াছিলেন। উহার আধুনিক অবস্থার বিষয় স্মরণ হইলে, অন্তঃকরণে দুঃখের উদ্রেক হয়। সম্প্রতি উল্লিখিত রাজবর্ত্মের দুইপাশে প্রঘোব জঙ্গল সমূহ বৃহৎ বৃহৎ অশ্বত্থ, পাকুর, তেঁতুল, শিমূল, খর্জ্জুব প্রভৃতি বৃক্ষবাজিতে পরিপূর্ণ, মধ্য-স্থলে এক হাত পরিসরবিশিষ্ট যে একটু পথ আছে, তাহাও আবার ইষ্টক, কণ্টক ও বৃক্ষের মোটা মোটা শিকড়াদিতে আবৃত রহিয়াছে। ঐ স্থান দিয়াই লোকেরা গতায়াত করিয়া থাকে। আব প্রোক্ত জঙ্গল মধ্যে অনেক হিংস্র-প্রাণী বাস করিয়া থাকে। এতদ্দ্বারা জনগণের যে, কি পর্য্যন্ত অসুবোধেব সম্ভাবনা, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। যিনি একবার রামপালের পথ দিয়া গমনাগমন করিয়াছেন, তিনিই বুঝিতে পারিয়াছেন যে রামপালের পথ কীদৃশ দুর্গম ও ভয়ঙ্কর। তিনি আর নির্ভাবনায় ঐ স্থান দিয়া চলাচল করিতে পারে না। * * পল্লীগ্রামগুলি প্রায়ই গাঢ় জঙ্গলাকীর্ণ তাহাতে প্রয়োজনীয় বায়ুর সঞ্চালন দূরে থাকুক, শারদীয় শুক্লপক্ষের রজনীও কৃষ্ণপক্ষের তামসী নিশার ন্যায় বোধ হয়'।"

ইংরাজ রাজত্বের প্রথম অবস্থায়ও বিক্রমপুর বনাকীর্ণ ছিল। এমনকি দস্যু-তস্করের ভয় ও ছিল যথেষ্ট। সেই সময়ে গভীর বনাকীর্ণ গ্রাম্যপথে চলাচল অত্যন্ত কষ্টকর

ছিল। সেই সময় রামপাল দিয়া কেহ একাকী গমন করিতে পারিত না। এমনকি অনেক লোক একত্র হইয়া না যাইলে বিনষ্ট হইত। এখানে একটি সত্য ঘটনা বলিতেছি।—প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বে এক দিবস কোন ব্রাহ্মণ আপন একজন আত্মীয়াকে ডুলিতে আরোহণ করাইয়া রামপাল দিয়া আসিতেছিল। পথিমধ্যে পথ গমনহেতু পরিশ্রান্ত হইয়া বিশ্রামলাভার্থ তথায় কোন ছায়াময় স্থানে বসিয়াছিল, এমন সময়ে হঠাৎ কয়েকজন দস্যু শান্তমূর্ত্তি পরিধান করিয়া ভদ্রবেশে তাহাদের সমীপে উপস্থিত হয়। এবং প্রথমে ডুলি মহারত (ডুলিবাহক) দিগকে বিবিধ অনুনয় বিনয় করিয়া নৌকা উত্তোলনের ছলে কোন গুপ্তদেশে লইয়া যাইয়া বধ করিল, পরে ব্রাহ্মণকেও কোন কার্য্যের ভান করিয়া কোন গোপনীয় স্থানে আনয়ন করিয়া বিনাশ করে। ব্রাহ্মণ—কন্যা ইহার টের পাইয়া স্বীয় প্রাণরক্ষার্থ দৌড়িতে দৌড়িতে কোন ইক্ষুবনস্থ এক বৃদ্ধ মুসলমানের পা ধরিয়া পড়ে এবং তৎবিষয়ক যাবতীয় বিবরণ অবগত করায়। ইহাতে তাহার প্রাণরক্ষা হয়। এই প্রকার অনেকানেক নিদারুণ ঘটনা ঘটিয়াছে।

আমরা বর্ত্তমান সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ পারেব যে ভূভাগকে বিক্রমপুর নির্দ্দেশ করিতেছি পূর্ব্বে বহু বিস্তীর্ণ ভূভাগ লইয়া উহার সংস্থিতি ছিল, পরে উহার নানা স্থান নানা বিভিন্ন পরগণায় পরিগণিত হইয়াছে। পূর্ব্বে কার্ত্তিকপুর, ইদিলপুর, পারজোয়ার, ঢাকার উত্তরাংশ ও বিক্রমপুরের অন্তর্গত ছিল। তিন চারিশত বৎসর পূর্ব্বে ঐ পরগণাগুলির কোন অস্তিত্ব ছিল না। ইদিলপুরে প্রাপ্ত সেনরাজগণের একখানা তাম্রশাসন এশিয়াটিক জার্নেলের প্রথম অংশের ৮০ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে লিখিত আছে "বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগ প্রদেশে প্রশস্ত * লতা * ঘোড়াঘটক পূর্ব্বে * স * একা * ধীগ্রাম সীমা দক্ষিণে শঙ্কর বসাগোবিন্দ বলাস্ত ভূসীমা পশ্চিমে * ইত্যাদি এই তাম্রশাসনে 'লতা' ও 'ধীগ্রাম' বলিয়া যে দুটী স্থানের পরিচয় আছে উহা যে বর্ত্তমান ইদিলপুরের অন্তর্গত লতা ও ধীপুর গ্রাম তদ্বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ নাই। শ্যামলবর্ম্মার তাম্রশাসনে নাগরকুণ্ডী, সামন্তসার, লঙ্কাচুয়া ও ধীপুব নামের উল্লেখ আছে। ঐ সকল শাসনপত্রের কোথাও ইদিলপুর বা কার্ত্তিকপুরের নামোল্লেখ নাই। যে সকল নাম বিক্রমপুরের অন্তর্গত বলিয়া তাম্রশাসনে রহিয়াছে, বর্ত্তমান সময়ে কিন্তু ঐ সকল স্থান ঐ দুই পরগণার অন্তর্গত দেখা যায়।

বিক্রমপুরের পরগণা বিভাগ

উপরে যে দুইখানা শাসনপত্রের কথা উল্লেখ করা হইল, উহা প্রায় আট নয়শত বৎসরের পূর্ব্বের বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। অতএব স্বীকার করিতে হইবে, **ইদিলপুর** ও **কার্ত্তিকপুর** এই দুইটি পরগণা বিভাগেরও বহু পরে উৎপন্ন হইয়াছে।

সাহান্‌সাহ আকবর বাদশাহের রাজত্বকালে ১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে রাজা টোডরমল্ল দ্বারা বঙ্গদেশ উনিশটি চাকলায় বিভক্ত হয়। এই সময় সরকার সোণারগাঁর অন্তর্গত চারিটি মহালের মধ্যে ইদিলপুর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। আমাদের বিশ্বাস বিক্রমপুরের অংশ হইতেই অন্যান্য নূতন পরগণার ন্যায় এই সময়ে কার্ত্তিকপুর, সুজাবাদ ও ইদিলপুর নামে দুইটি পৃথক পরগণা নির্দ্দেশ করা হয়। এইরূপে বাখরগঞ্জের অন্তর্গত প্রাচীন বাক্‌লা চন্দ্রদ্বীপ হইতে বহু বিভিন্ন পরগণার উৎপত্তি হইয়াছে। মিঃ বিভারেজ তদীয় বাখরগঞ্জের ইতিহাসে উহা স্পষ্ট উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুজাবাদ ও ইদিলপুর এই দুইটি নাম যে মুসলমান নামের সহিত সম্বন্ধ ও জড়িত তাহাতে অনুমাত্র সংশয় নাই। অতএব হিন্দুরাজত্বে উহা বিক্রমপুর বলিয়াই পরিচিত ছিল।

রাজ্য পরিবর্ত্তনের সহিত দেশের বিভাগেরও পরিবর্ত্তন হয়। সেনরাজগণের সময়ে বিক্রমপুরের পরিধি যতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য ঘটিয়াছে। তৎপরে নবাবী আমলে এই বিক্রমপুর মধ্যেই আবার **আরঙ্গাবাদ, রাজনগর** ও **বৈকুণ্ঠপুর** প্রভৃতি তিনচারিটী পরগণার সন্নিবেশ হইয়াছে। ১৮৫৭ খ্রীঃ অঃ হইতে ১৮৬০ পর্য্যন্ত গেষ্ট্রেল ও ডেলীকর্ত্তৃক যে সার্ব্বে হয়, তাহাতে দেখা যায় বিক্রমপুর পরগণাকে তিনভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ৮।৯নং **মকিমাবাদ**। **১০ নং বিক্রমপুর**। ১৩।১৪নং **রাজনগর** ও **বৈকুণ্ঠপুর**। এই তিন খণ্ডের মধ্যে ৮, ৯ ও ১৩, ১৪ নং এই দুই বিভাগে বিক্রমপুর ব্যতীত অপর কয়েক পরগণার জমিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ৮।৯ নম্বরে মকিমাবাদ ও আরঙ্গাবাদের মধ্যে উত্তর বিক্রমপুরে দত্তপাড়া, সেকেরনগর, হাসারা, বীরতারা, ষোলঘর, দেওভোগ, শ্রীনগর, মাইজপাড়া, কামারগাঁ, পাটাভোগ, বেজগাঁ, পরাণীমণ্ডল, কয়কীর্ত্তন, নাগরভাগ, কুমারভোগ মেদিনীমণ্ডল, হল্‌দিয়া, ইছাপাশা, বাজপুর, দেড়শত, ভাওয়ার, মাওয়া, কাওয়ালীপাড়া, কোঁয়রপুর প্রভৃতি বিক্রমপুরের বহু গ্রাম সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কীর্ত্তিনাশা নদীর দক্ষিণ তীরবর্ত্তী স্থান সমুদয় ১৩।১৪ নম্বর রাজনগর ও বৈকুণ্ঠপুর এই দুই বিভাগের অন্তর্গত থাকায় সর্ব্বসাকুল্যে বিক্রমপুর নামেই অভিহিত হইয়া থাকে। কীর্ত্তিনাশার দক্ষিণ তীরস্থ স্থানগুলি সম্প্রতি ফরিদপুরের অন্তর্গত হওয়ায় উহা 'দক্ষিণ' বিশেষণ বিশিষ্ট হইয়া **দক্ষিণ বিক্রমপুর** নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। কিন্তু বিক্রমপুরবাসী কেহই পরিচয় প্রদান কালে মকিমাবাদ, আরঙ্গাবাদ বা রাজনগর, বৈকুণ্ঠপুরের নাম করেন না। প্রকৃত রাজনগর গ্রামবাসীরাও বাড়ী রাজনগর, পরগণা বিক্রমপুর বলিয়া পরিচয় দিয়া আসিতেছেন। রাজবিধান কাগজ পত্রেই নিবদ্ধ আছে। বাখরগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বিস্তৃত বাক্‌লা (চন্দ্রদ্বীপ) পরগণার বহু খর্ব্বতা সাধন হইলেও তত্রত্য পণ্ডিতগণ, যাঁহারা বিভিন্ন পরগণায় বিভক্ত স্থান সমূহে বাস করিতেছেন তাঁহারাও সগর্ব্বে বাক্‌লার পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় প্রদান করিতে কুণ্ঠিত হন না।

দক্ষিণ বিক্রমপুরান্তর্গত **শ্রীপুর** নগরে সুপ্রসিদ্ধ চাঁদরায় ও কেদাররায়ের রাজধানী ছিল। এতদ্ভিন্ন সঙ্কট নামক স্থানে, সমতটের সদর স্থান ছিল। সমতটকে বৈদেশিক লেখকগণ কেহ সনকট কেহ কেহ সকাট বা সাকাট লিখিয়া গিয়াছেন। এ বিষয় পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। উচ্চারণের বৈষম্যবশতঃ বিক্রমপুর-বাসিগণ উহাকে সঙ্কট বা সমকট বলিতেন। (১) সমগ্র বেহার প্রদেশ মধ্যে যেমন একটি খণ্ড স্থানের নাম বেহার, সেইরূপ সরকার খলিফেতাবাদ, ফতেয়াবাদ, পূর্ণিয়া প্রভৃতির মধ্যে কয়েকটি খণ্ড স্থানের ও ঐরূপ নাম ছিল, যাহা তৎকালীন সেই সেই বিভাগের সদর স্থান বলিয়া পরিগণিত হইত। এই সমকট (সমতট) ও তদ্রূপ সমগ্র সমতটের সদর স্থান ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। এক সময়ে এই সমকটের নিম্ন দিয়া সমুদ্র প্রবাহিত থাকাও অসম্ভব নয়। ১৭৬৪ খ্রীঃ অঃ মেজর জেমস্ রেণেল গঙ্গা (পদ্মা) ব্রহ্মপুত্র বা মেঘনার সার্ব্বে উপলক্ষে যে মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তন্মধ্যে এই স্থানটীর নাম প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রায় একশত বৎসর অতীত হইল দক্ষিণ বিক্রমপুরের এই প্রসিদ্ধ স্থানটী ও তন্নিকটবর্ত্তী গোবিন্দমঙ্গল, খাগুটিয়া প্রভৃতি গ্রামগুলি নদী-প্রবাহে ভগ্ন হইয়াছে। রেণেলের মানচিত্রে যে সকল প্রাচীন মঠ ও মন্দিরের পরিচয় আছে তাহাতে খাগুটিয়ার একটি মঠ, রাজনগরের দুইটি মঠের ও একটি জলাশয়ের চিত্র এবং জপসার একটি মঠের চিত্র আছে। জপ্‌সার মঠটির পাশে লেখা রহিয়াছে, Japsa pagoda seen in both rivers. এই মঠ পদ্মা ও মেঘনা হইতে দেখা যায়।

এতদ্ভিন্ন উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুরের নিম্নলিখিত স্থানগুলি কীর্ত্তিনাশা দ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে। রাজনগর, জপসা, তারপাসা' রুপটা, ভোজেশ্বর, লড়িকুল, কানারগাঁ, আকসাইল, সোণারদেউল, গঁজনাইপুর, পোড়াগাছা, মূলপাড়া, মূলনা, দেভোগ, খিলগাঁ, খারচাকা, বক্সীবাজার, রাজপাশা, রাউতপাড়া, পশ্চিমপাড়া, নারিকেলতা, পশাইল, কান্দাপাড়া, রণক, নবিপুর, শ্যামপুর, বিলাসপুর, আমবাড়িয়া, দক্ষিণ সিমলিয়া, পারগাঁ, গাগৈরজোড়া, দিয়াপাড়া, হাসেরকান্দী, চণ্ডীপুর, বউলাসার, হাতারভোগ, গোপালপুর, মজগুন্নী, ছয়পাড়া, গোকুলগঞ্জ, গোড়াইল, করণগাঁ, মাইজপাড়া, বাসগাঁ, একান্দল, লক্ষ্মীপুরা, সাড়া, দগরী, আকিয়াধল, কাউলিপাড়া, বহর, কোমরপুর, দীঘিরপার, বাহেরক, বেহের-পাড়া প্রভৃতি বহু গ্রাম পদ্মার বা কীর্ত্তিনাশার কুক্ষিগত হইয়াছে ও হইতেছে। কাজেই এখনও যথার্থভাবে প্রত্যেক গ্রামের নাম বলা সুকঠিন।

বিক্রমপুরের গ্রামের নাম রহস্য ও নাম পরিবর্ত্তন—আমাদের দেশের গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস অনেক স্থলেই অজ্ঞাত ; এবিষয়ে কাল্পনিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত কোন কোন স্থলে প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হওয়া অসম্ভব। একটা কিছু অর্থ ব্যতীত

গ্রামের নাম হয় না। কালে লোকমুখে শুদ্ধ নাম বিকৃত ও সংক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। তখন নামের অর্থ পাওয়া দুষ্কর হয়, নাম একটা সংকেত মাত্র হয়। এমন গ্রামও আছে, যাহার জন্ম অবজ্ঞায়, নামও ঘৃণায় বিকৃত, কিন্তু পরে শুদ্ধ ও সংস্কৃত হইয়াছে। (২) বিক্রমপুরের গ্রামের নাম এইভাবে নির্দ্দেশ করায় অনেকেরই গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে একটা সাধারণ ধারণা জন্মিবে। সেই ভাবেই কতগুলি গ্রামের নাম লিখিলাম। যথা :—

গ্রাম হইতে গাঁ বা গাঁও—বালিগাঁ, মাইজগাঁও, শাসনগাঁও, দত্তগাঁও, কুড়িগাঁও, বেজগাঁও, পানগাঁও, কামারগাঁও, ব্রাহ্মণগাঁও, খিলগাঁও, গারুড়গাঁও, বিদগাঁও, বান্দেগাঁও, বড়সাতগাঁও, খৈরগাঁও, চাঁদগাঁও, দিয়াগাঁও, ছয়গাঁও, আটিগাঁও, পাঁচগাঁও, তিনগাঁও, হাজিগাঁও, কয়গাঁও ও পাড়াগাঁও।

নগর—রাজনগর, রাজানগর, নগর, শ্রীনগর, সেকেরনগর, বা (শেখরনগর) মালখাঁনগর, গিরিনগর, বলাইনগর, কানাইনগর, নয়ানগর।

সং দ্বীপ—মূল অর্থ দুইদিকে জল-বেষ্টিত ভূমি। চারিদিকে জল-বেষ্টিত হইলেও দ্বীপ।—পাশের ভূমি হইতে উচ্চ হইলেও দ্বীপ, এই প্রকার দ্বীপকে হিন্দীতে টিবা, বা টিলা বলে। বিক্রমপুরের 'দী' ও দীয়া শব্দাত্মক গ্রাম সমূহ ঐ সকল দ্বীপের অস্তিত্ব প্রদান করিতেছে। যথা :—

হল্‌দিয়া, রাজদীয়া, গড়িদীয়া, কাঠাদিয়া, মালপদীয়া, কাঁচাদিয়া, পাউলদিয়া, রাণাদিয়া, ভোগদিয়া, বাইদিয়া. গোবরদী, শিয়ালদী, চামারদি, বিবনদি, আলদি, বয়রাগাদী, চিকনদী, কাকদী, অজদী', পরাশরদি, মরিচাদি, রাউদিয়া, তিলরদি, দুশলদিয়া, শ্যামসিদ্‌দি, ভোজদিয়া, সিন্দুরদি, পাচলদিয়া, রামকৃষ্ণদি, লতপ্‌দী, রাজাদিয়া, কাকালদিয়া, খরিয়া, ভোগদিয়া ইত্যাদি।

পুর (সং) যথা—ভবানীপুর, শ্রীপুর, ধীতপুর, কাদিরপুর, সমসপুর, চৈত্তপুর, ইছাপুর, বাপুর, কুসুমপুর, কমলাপুর, মামুদপুর, মজিদপুর, সিলিমপুর, ষোলপুর, তন্তিপুর, গৌরীপুর, লক্ষ্মীপুর, খিজিরপুর, ধীপুর, সৈদপুর, কুমুদপুর, মধুপুব, সুয়াসপুর, গোবিন্দপুর, শিবরামপুর, তাজপুর, শিকারপুর, সোন্দলপুর, গোপালপুর, মোহনপুর, ঘনশ্যামপুর, আলমপুর, শ্রীধরপুর, লস্করপুর, মামুদপুর, বিনোদপুর, উত্তররায়পুব, দক্ষিণরায়পুর, দেবীপুর, রাজপুর, কামারপুর, কাজলপুর, মসিমপুর, মহিষপুর, ক্ষুদিদাদপুর।

সার—সাগর, সায়র, বিক্রমপুরেব প্রত্যেক গ্রামেই দীঘির সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। ইহার কারণ বিক্রমপুরের ন্যায় নিম্নস্থানে লোকালয় গঠনোপযোগী উচ্চভূমির অভাব-

মোচনার্থ এককালে বহুসংখ্যক জলাশয় খনিত হইয়াছিল। এই জলাশয়গুলি এতদঞ্চলে 'সার' নামে খ্যাত। সার নামে বিক্রমপুরে বহু গ্রামের নামোৎপত্তি হইয়াছে। যথা— কনকসার, মহীসার (মাঐসার) জৈনসার, দেওসার, পঞ্চসার, নন্দনসার, সামন্তসার, বেজনীসার, কাকইসার, কান্দনীসার, গপাইসার, ঘড়িসার, পণ্ডিতসার, অনন্তসার, মিঠুসার, ফেগুণাসার, পৌসার, কৈবর্ত্তসার, মামাসার, * ইত্যাদি।

পাড়া (সং পাটক) গ্রামের অর্দ্ধভাগের নাম পাটক (হেমচন্দ্র) পাট হইতে ওড়িয়া মরাঠি দ্রাবিড়ি পেট-প্রায়ই বাণিজ্যস্থান। পল্লী হইতে পাড়া নহে। পাড়াগাঁ পাটক ও গ্রাম। পল্লী-ক্ষুদ্রগ্রাম-(মেদিনী) পল্লী-গ্রাম-পল্লী ও গ্রাম।

পাইকপাড়া, পুরাপাড়া, কাজিপাড়া, সাপাড়া, তেলিপাড়া, মধ্যপাড়া, নাহাপাড়া, সুরপাড়া, বড়ওপাড়া, পশ্চিমপাড়া, দ্বীপাড়া, কর্কটপাড়া, কুশারিপাড়া, বেহেরপাড়া, আটপাড়া, আরধিপাড়া, গাউপাড়া, হাটেরপাড়া, চারিপাড়া, দামপাড়া, ভাটপাড়া, করপাড়া, নপাড়া, পুরাপাড়া, চৈতপাড়া, হরপাড়া, রসিতপাড়া, পোটাপাড়া, সুয়াপাড়া, মাইজপাড়া, রাড়িপাড়া, কান্দাপাড়া, খালপাড়া, কালিঙ্কিপাড়া, গণকপাড়া, কোলাপাড়া, খিদিরপাড়া, আবিরপাড়া।

তলা—(সং তল অধোভাগ-তলি) তালতলা, চাচইরতলা, বেলতলি, কাঁঠালতলি, ঘোলতলি, চাপাতলি, বৌলতলি, ছাইতানতলি, নিমতলি, আমতলি ইত্যাদি।

চর—(চড়াভূমি-নদীর মধ্যে কিংবা পরে উত্থিত ভূমি) মূল-চর, চরডুমরখোলা, তিপিরচর, ইমামচর, চরবিশ্বনাথ, সাতুরচর, চরমর্দ্দন ইত্যাদি।

খাল—(সং খল্ল-গর্ত্ত, কিংবা সংখাত-খাই খাল ও খালা ব্যুৎপত্তিতে এক। খাল-বিশিষ্টস্থান-খালি)—কেউটখালি, গোয়ালখালি, বারৈখালি, রাড়িখাল, খালপাড়, তুলসিখালি, কুমারখালি, মহেশখালি ইত্যাদি।

(১) বিক্রমপুর ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা। (২) অধ্যাপক রায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়বাহাদুর, এম্-এ, গ্রামের নামের উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিয়াছিলেন। আমরা এখানে তাঁহারি প্রদর্শিত পন্থানুসারে বিক্রমপুরের গ্রামের নামোৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলাম। (৩) 'প্রবাসী' ১৩১৭, আশ্বিন। ১ম খণ্ড ৬ষ্ঠ সংখ্যা। (৪) শ্রীযুক্ত হরিপ্রসন্ন দাশগুপ্ত মহাশয় ও 'বিক্রমপুর' পত্রের ৪র্থ বর্ষের ১২শ সংখ্যায় এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলেন।

* কতকগুলি সার বা জলাশয় অদ্যাপি নিজ নামে পরিচিত রহিয়াছে। অধিকন্তু তাহাদের নামের পশ্চাতে একটী দীঘি শব্দ যুক্ত হইয়া গিয়াছে। দশলক্ষের নাদিমসার দীঘি, শিমুলিয়া-নন্দাইসার দীঘি, বিয়নীয়ায় চান্দাসার দীঘি, রাণিহাটির কণাসার দীঘি, সোণারঙ্গের জয়ব্রহ্মসার দীঘি, মাঐসারের মহীসার দীঘি ইত্যাদি।

গঞ্জ—(সংগঞ্জ আকর, মদিরাগৃহ-হেমচন্দ্র) ফার্সীগঞ্জ অর্থে বাণিজ্য স্থান) মুন্সীগঞ্জ ধর্ম্মগঞ্জ।

কান্দ-কান্দি—(স্কন্ধ শাখা হইতে) ভূমিখণ্ডের শাখা কান্দি।—বিক্রমপুরের কতক গ্রামের নাম কান্দা বা কান্দি নাম সংযুক্ত উহার অপর অর্থ নদী তীরস্থ উচ্চভূমিকে ও বুঝায়। যথা :—বীরকান্দি, বেহারকান্দি, গোরকান্দা, ষোলকান্দা ইত্যাদি।

হাট বা হাটি—(সং-হট্ট) যথা—নাগেরহাট, গদীহাট, মুন্সীরহাট, মাকুহাটী, সেনহাটি, সিংহেরহাটি, রাণীহাটি, বেজ্রেরহাটি, জগন্নাথহাটি, কোরহাটি ইত্যাদি।

বাটী-বাড়ী—(সং আবৃতস্থান, ঘেরা বা যায়গা বাট-প্রাচীর। প্রাচীরবেষ্টিত স্থান ওবাট ও বাটি।) বাটী হইতে বাড়ী যথা :—রাজাবাড়ী, বল্লালবাড়ী, কেদারবাড়ী, দেউলবাড়ী, টঙ্গীবাড়ী, এতদ্ব্যতীত গড়, চক, বেড়, ঘর, বাজার, খাড়া, কুল, বতী ঘাট, বন্দ, ভোগ, আ, ইয়া, উয়া মণ্ডল বিল, দহ, অল্, আলি ইত্যাদি শব্দ নামের শেষে যুক্ত হইয়া গ্রামের নাম হইয়াছে।

আবার বিক্রমপুরের বহু গ্রামের নাম হইতে উহার মুসলমান প্রাধান্য বুঝা যায়। তাহার ও কয়েকটির নামোল্লেখ করিলাম।—যথা :—সেরাজাবাদ, সেরাজদিখা, নবীর পুকুর পাড় (নৈরপুকুর পাড়) ইসাপুব, ইছাপুর, কাজিরপাগলা, কাজিরকস্‌বা, কাজীবাড়ী। বান্দেগাঁও, মালখানগর, রাড়িখাল, আলমপুর, তাজপুব, রসুনিয়া, ইদ্রাকপুর (মুন্সীগঞ্জ) মোল্লাবাড়ী, নুরপুর, কাজিকস্‌বা, মীরকাদিম, নগরকস্‌বা, আবদুল্লাপুর, মামুদপুর, ইত্যাদি। আবার কয়েকটী গ্রামের নামের মধ্যে বিশেষত্ব ও দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন, কলিকাল, পয়সা, কলিকাতা ইত্যাদি।

বিক্রমপুরের কতকগুলি গ্রামের পুরাতন নাম ও পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। উহা দ্বারা কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ হইয়াছে। ফলে প্রাচীন স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া ঐ সকল গ্রাম নূতন নাম ধারণ করিয়া একরূপ অপবিচিত হইয়াছে। উহাহরণ স্বরূপ কতিপয় গ্রামের নাম এখানে উল্লেখ করিলাম। যথা—কামারখাড়া—স্বর্ণগ্রাম, ফুরসাইল—ফুল্লশালী, চামারদী—চম্পকদী, সোণারটং—সোণারঙ্গ, মাঐসার, মহীসার, সেকেরনগর—শেখরনগর।

আমদানী ও রপ্তানী—উত্তর পশ্চিম প্রদেশ, কলিকাতা, আসাম, পাবনা, ফরিদপুর, মুর্শিদাবাদ, ডিব্রুগড়, শ্রীহট্ট, ত্রিপুরা, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে সর্ব্বদা বিস্তর পণ্যবাহী বাণিজ্য-তরণী সমূহ বিবিধ নদ-নদী অতিক্রম করিয়া পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরী এবং ইছামতী প্রভৃতি নদ নদীতে পতিত হইয়া তথা হইতে বহরের খাল

ধানকুনিয়ার খাল, হল্‌দিয়ার খাল এবং মীরকাদিম প্রভৃতি বহু খাল অতিক্রম করিয়া বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

আমদানী :—কলিকাতা হইতে সোনা, রূপা, লোহা, কাপড়, ছাতা, জামা, জুতা ও মনোহারী দ্রব্য; উত্তর পশ্চিম-প্রদেশ হইতে ডাইল, গুড় ও ভূষিমাল; গয়া হইতে গুড়; রেঙ্গুন ও চাটগাঁও হইতে ফারাই কাষ্ঠ ও আতপ তণ্ডুল; আসাম-আলিপুর-দুয়ার, ভাতখাওয়া, গৌরীপুর, বিলাসপাড়া, জুগীখোপা, বগ্‌রীবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চল হইতে শাল-কাষ্ঠ ও এণ্ডি, তসর, মুগা প্রভৃতি; বরিশাল ও বাখরগঞ্জ হইতে চাউল, ডাইল, নারিকেল, গুড়, শ্রীহট্ট হইতে মুলিবাঁশ, কমলা, খলপা; ত্রিপুরা হইতে মুলি ও কাঠ; রংপুর ও পূর্ণিয়া হইতে তামাক; নোয়াখালী হইতে নারিকেল, সুপারী, চিকনাই; যশোহর, তারপুর, গাজিপুর ও কেশবপুর হইতে চিনি গুড়; গোয়ালন্দ ও রাণীগঞ্জ হইতে কয়লা; ডিব্রুগড়, শিবসাগর হইতে বেত প্রভৃতি বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দরগুলিতে আমদানী হইয়া থাকে।

রপ্তানী—বিক্রমপুর হইতে পিত্তলের বাসন, জোলার কাপড়, ছিট ও লুঙ্গী, পাট, চামড়া, ঘৃত, মৎস্য ও মৃন্ময় বাসন প্রভৃতি বহুল পরিমাণে বিভিন্ন প্রদেশে রপ্তানী হয়; লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, ব্রাহ্মণগাঁ, দিয়াগাঁ প্রভৃতি গ্রামে পিত্তলের উৎকৃষ্ট বাসন প্রস্তুত হয়, প্রতি দিন লৌহজঙ্গ ষ্টেশন হইতে এই সমস্ত বাসন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হইয়া থাকে। নাগেরহাট ও শ্রীনগর প্রভৃতি স্থানের কুম্ভকারগণের প্রস্তুত পুতুল জন্মাষ্টমীর মিছিলের সময় ঢাকাতে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়। এতদ্ব্যতীত মুন্সীগঞ্জের (রামপালের) কলা ও মূলা; সেরেজদিঘার পাতক্ষীর ও ঘৃত প্রভৃতি মীরকাদিম ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের পান, ঘোলঘর, হাসাড়া, শ্রীনগরের ডেঙ্গার কই মৎস্য পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহে রপ্তানি হয়। পূর্ব্বে রামপালের পাতিল গুড় নানা স্থানে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে রপ্তানি হইত; কিন্তু ইক্ষুর চাষ হ্রাস প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে এখন উক্ত গুড় দ্বারা স্থানীয় অভাব পূরণ হইতেছে না। দেশীয় কুলুর ঘানিতে অল্পাধিক পরিমাণ তৈল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

দেশান্তর হইতে গমনাগমন—বিক্রমপুরের বিদেশাগত ব্যবসায়ীর সংখ্যা নিতান্ত কম নয়; ইহারা বিক্রমপুরের বাণিজ্য প্রধান স্থানে স্থায়ী এবং অস্থায়ী ভাবে দোকান করিয়া ব্যবসার কার্য্য করিয়া থাকে।

ফরিদপুর জেলার সাহাগণ বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ বন্দর সমূহে স্থায়ী দোকান করিয়া বাতাসা ও কদমা প্রস্তুত করিয়া থাকে।

'বাইদা' বা বেদে নামক একশ্রেণীর পার্ব্বত্য অসভ্য জাতীয় লোক বিক্রমপুরের বাণিজ্য-বন্দর সমূহের নিকট নৌকাযোগে বসবাস করিয়া থাকে, ইহাদের স্ত্রী-পুরুষ উভয়

সম্প্রদায়ই ব্যবসায়ে বিশেষ দক্ষ; ইহারা হাটে-বাজারে দোকান পাতিয়া এবং 'গাওয়ালে' বহির্গত হইয়া, মনোহারী দ্রব্য বিক্রয় করে। ইহারা নদী, খাল, বিল হইতে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণ ঝিনুক সংগ্রহ করিয়া বিক্রয় করে, ধোপাগণ এই ঝিণুক দ্বারা চূণ প্রস্তুত করে এবং শিল্পিগণ ইহার দ্বারা বোতাম, চেইন ও নানাবিধ সৌখিন দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে।

প্রতি বৎসর শীতের প্রাক্কালে বিক্রমপুরের বন্দর সমূহে পশ্চিম দেশীয় ধুনকর, চামার, ক্ষৌরকার, মাটিয়াল (যাহারা মাটি কাটার কাজ করে) ও বেহারা আসিয়া থাকে; ইহারা শীতের কয়েক মাস নিজ নিজ ব্যবসায় কার্য্য শেষ করিরা দেশে ফিরিয়া যায়। মুন্সীগঞ্জ ও লৌহজঙ্গ প্রভৃতি বন্দরগুলিতে পশ্চিমা ক্ষৌরকারগণও সর্ব্বদাই থাকে; পশ্চিম দেশীয় কুলিগণও সর্ব্বদা বাণিজ্য প্রধান স্থানে থাকিয়া ব্যবসা চালায়। বেহারাগণ বর্ষার সময় দেশে চলিয়া যায়। শ্রীহট্ট-জেলার নমঃশূদ্রগণও এখানে বেহারার কার্য্য করিতে আসিয়া পাকে।

প্রতি বৎসর বর্ষার সময় কুমিল্লা ও ত্রিপুরা অঞ্চলের বহু সংখ্যক ধীবর, শিং মৎস্য ধরিবার জন্য বিক্রমপুরের গ্রামে গ্রামে আসিয়া থাকে। ইহাদের শিং মৎস্য ধরিবার প্রণালী এক অভিনব প্রকারের। ইহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 'চাই' পাতিয়া যেরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া মৎস্য ধরে সেরূপ কৌশল বিক্রমপুরের ধীবরগণ পরিজ্ঞাত নহে। ইহারা ৩।৪ মাস এই ব্যবসায় করিয়া আশ্বিন মাসে দেশে ফিরিয়া যায়। বিক্রমপুরে ইহারা **'চাইয়া'** বলিয়া পরিচিত।

পারজোয়ার অঞ্চলে নমঃশূদ্রগণ বিক্রমপুরের বন্দর সমূহ হইতে ঢাকা মুন্সীগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে গহনার বা গহেনার নৌকা পরিচালন করিয়া থাকে। কুলিরা সাধারণতঃ সমস্তই পশ্চিম দেশীয়।

ফসল কাটার সময় বহু সংখ্যক মুসলমান মজুর এই স্থান হইতে পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে ধান কাটিতে যায়।

বিক্রমপুরের কুম্ভকারগণ মৃন্ময় তৈজস পত্রাদি বোঝাই করিয়া পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহে "গাওয়ালে" বা গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিতে বহির্গত হয়; ইহারা হাঁড়ি পাতিলের বিনিময়ে ধান্য সংগ্রহ করিয়া থাকে; এখন অন্য জাতীয় লোকেও এই ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে।

পথ ঘাট ও যাতায়াত—বাণিজ্য প্রধান স্থান হইতে ঢাকা, মুন্সীগঞ্জে যাতায়াতের গহেনার নৌকা আছে; প্রায় প্রাত্যক বন্দরেই সর্ব্বদার জন্য 'কেরাইয়া' বা 'ভারাটিয়া' নৌকা থাকে। নদী তীরবর্ত্তী স্থান সমূহে ষ্টীমার ষ্টেসন বা জাহাজ ঘাটা

আছে; কলিকাতা অঞ্চল হইতে সাধারণতঃ মহাজনগণের মালপত্র, জাহাজ ও নৌকা যোগেই আইসে। সংবাদ প্রেরণের জন্য প্রায় প্রত্যেক বন্দরেই ডাকঘর আছে; তার ঘরের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নয়। মোট বহিবার জন্য পশ্চিমা কুলি পাওয়া যায়। মহাজনগণের মাল সরবরাহের জন্য "খয়ার" দিনে ঘোড়া পাওয়া যায়।

ব্যবসায়ী—বণিক, তিলি, কুণ্ডু ও সাহাগণই বিক্রমপুরের প্রধান ব্যবসায়ী। ভাগ্যকুলের কুণ্ডু পরিবার ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়া ক্রোড়পতি হইয়াছেন, ইঁহাদের নিজেদের কয়েকখানা জাহাজ কলিকাতা হইতে মাল বোঝাই করিয়া পূর্ববঙ্গের বাণিজ্য প্রধান স্থানে যাতায়াত করে।

বিক্রমপুরে এক শ্রেণীর ব্যবসায়ী আছে, কোনও হাটে বাজারে বা বাণিজ্য বন্দরে তাহাদের স্থায়ী দোকান নাই। ইহারা, যশোহর, ফরিদপুর, বরিশাল প্রভৃতি অঞ্চল হইতে চাউল, ডাইল, মরিচ, হলুদ, গুড় ও তরিতরকারী প্রভৃতি ক্রয় করিয়া আনিয়া কোন মহাজনের নিকট বিক্রয় করিয়া থাকে, ইহাকে ভাসানি' কাজ বলে। আর এক শ্রেণীর :ব্যবসায়ী পরিদৃষ্ট হয়, ইহারা গাওয়ালে বহির্গত হইয়া লবণের বিনিময়ে মৌচাক সংগ্রহ করে; পানিয়া, তস্তর ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে উৎকৃষ্ট মধু পাওয়া যায়।

বিক্রমপুরের ধীবরগণের মৎস্যের ব্যবসায় বহু দূরদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ইহারা পদ্মানদীতে, ধলেশ্বরী ও মেঘনাতে বিবিধ প্রকারের জাল ফেলিয়া মৎস্য ধরিয়া থাকে। পৌষ মাস হইতে চৈত্র বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত ইহারা পদ্মার নানাস্থানে 'জগৎবেড়' জাল ফেলিয়া যেরূপভাবে মৎস্য ধরে তাহা দর্শনযোগ্য; এই জাল ৩।৪ মাইল স্থান ব্যাপিয়া ফেলা হয় এবং সপ্তাহকাল ধরিয়া উহার মৎস্য ধরা চলিতে থাকে; সময় সময় প্রতি বেড়ে ৩।৪ হাজার হইতে ৫ হাজার টাকা মূল্যের মৎস্য ধরা পড়ে। এই সমস্ত মৎস্য সাধারণতঃ কলিকাতাতেই অধিক পরিমাণে প্রেরিত হয়। বর্ষার সময়ে ধীবরগণ ভীষণতরঙ্গসঙ্কুল পদ্মা নদীতে ঝড়ের মধ্যেও যেরূপ সুকৌশলে ও অবলীলাক্রমে নৌকা পরিচালনা করিয়া ইলিস মৎস্য ধরে, তাহা বাস্তবিকই দর্শনযোগ্য। পদ্মার ইলিস মৎস্য খুব সুস্বাদু।

হাট ও বাজারের বিবরণ—বিক্রমপুরের হাট বাজারগুলির একটী বিশেষত্ব এই যে, এখানে বিশেষ বিশেষ জিনিষ ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য বিশেষ বিশেষ হাট, বাজার প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে; ধানকুনিয়ার হাট, ভাওয়ারের হাট, শ্রীনগরের হাট, সেরেজদিঘার হাট, হাসারার বাজার কচ্ছপ (বা কাউটা) ও ছাগ বিক্রয়ের জন্য; মুন্সীগঞ্জ, ভীলাকাণ্ডি, করিমগঞ্জ, ভিরুজর্খা, দেউলভোগ, ইমামগঞ্জ, কেদারপুর প্রভৃতি হাট গরু বিক্রয়ের জন্য;

গোয়ালীমান্দ্রার হাট

এখানে বড় ঢাকার শাঁখের কাজ বিক্রয় হয়

খরিয়ার মালবস্তী

যে বেদেরা নৌকায় বসতি করে তাহাদের সেই নৌকাগুলিকে বেদের বহর বলে। মালেরা স্থায়ী ভাবে ঘর বাড়ী করিয়া কেহ কেহ বা মাচাঙ্গ করিয়া বাস করিয়া থাকে। তাহাদিগের বসতি স্থানকে মালবস্তী বলে। খরিয়ার মালবস্তীতে প্রায় দুই হাজার মাল বাস করে। এখন ইহারা জমি বন্দোবস্ত নিয়া স্থায়ী উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। কলমা গ্রামেও একটি মালবস্তী আছে। এক সময়ে বিয়াইনার খালে এবং মাধুহাটির খালেও ইহাদের বহর থাকিত।

ভরাকৈর, কলমা ও আরিয়লের হাট নৌকা বিক্রয়ের জন্য; ধানকুনিয়া, ভাওয়ার ও শ্রীনগরের হাট, ঘাসও বাঁশ বিক্রয়ের জন্য; খরিয়া ও শিমুলিয়ার হাট কারিকরের কাপড় বিক্রয়ের জন্য; হলদিয়া, কনকসার, দীঘিরপাড় ও তালতলা প্রভৃতি বন্দরগুলি কাঠ বিক্রয়ের জন্য, শ্রীনগর, লৌহজঙ্গ, শেখেরনগর, দেউলভোগ, ভাওয়ার প্রভৃতি বন্দর, আবগারী জিনিষ বিক্রয়ের জন্য এবং হলদিয়ার বন্দর লৌহ-ব্যবসায়ের নিমিত্ত প্রসিদ্ধ। লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, শ্রীনগর, রাজানগর, সেরেজদিঘা প্রভৃতি বন্দরগুলিতে পাট, পাথুরিয়াকয়লা, লবণ ও কেরোসিন তেলের বিস্তৃত কারবার আছে; ধানকুনিয়া বিশেষ করিয়া বাঁশ ও ধানের জন্য বিখ্যাত, আবদুল্লাপুর ও মীরকাদিম বন্দরে আড়তদারী ক্রয়-বিক্রয়ের বিস্তৃত দোকান আছে। পূর্ব্বে রাজানগর, সেরেজাবাদ, ইছাপুরা ও হাঁসাইল প্রভৃতি স্থানে নীলের কুঠী বিদ্যমান ছিল কিন্তু এখন সে সমস্ত বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে।

ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ, ধানকুনিয়া, বহর, হলদিয়া, আবদুল্লাপুর, ফিরিঙ্গীবাজার, রিকিববাজার বা রেকাবীবাজার, মীরকাদিম, মুন্সীগঞ্জ, দীঘিরপাড়, তালতলা ও সেরাজদিঘা প্রভৃতি বন্দরগুলি বিক্রমপুরের মধ্যে প্রধান আমদানী ও রপ্তানীর স্থান।

লৌহজঙ্গের ন্যায় বাণিজ্যপ্রধান স্থান, নারায়ণগঞ্জের পর পূর্ব্ববঙ্গে আর নাই; কিন্তু এই প্রাচীন বন্দরটী বিগত ১৩২৬ সনের মধ্যে বর্ষার জলপ্লাবনে ভীষণ তরঙ্গসঙ্কুল পদ্মানদীর কুক্ষিগত হওয়াতে সম্প্রতি স্থানান্তরে নূতন বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কোমরপুর কাঠের কারবারের একটী প্রসিদ্ধ স্থান ছিল, এই বন্দরটীও পদ্মারগর্ভে বিলীন হইয়াছে; এখন কোমরপুর গ্রামের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত নাই। কোমরপুরের সন্নিকটবর্ত্তী উয়ারী গ্রামে অল্পদিন যাবত একটি বন্দর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে বহর একটী সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল, এস্থানের চৌধুরীদের দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ ছিল এবং বহর একটী বাণিজ্যপ্রধান স্থান ছিল। এই স্থানটী দশ বারো বৎসর হয় রাক্ষসী 'কীর্ত্তি-নাশা' নিজ কুক্ষিগত করিয়াছে। তালতলার বন্দরটী ধলেশ্বরী নদীর তীরে অবস্থিত, কতিপয় বৎসর যাবৎ ধলেশ্বরীও পদ্মার ন্যায় ভাঙ্গিয়া ইহার আয়তন অনেক খর্ব্ব করিয়াছে।

বিক্রমপুরের প্রায় সমুদয় প্রসিদ্ধ বন্দরগুলিই নদী অথবা খালের পাড়ে অবস্থিত।

পদ্মাতীরে—ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ বা তারপাশা, দীঘিরপাড় ও বহর।

ধলেশ্বরী তীরে—তালতলা, মীরকাদিম, আবদুল্লাপুর ও মুন্সীগঞ্জ।

ইছামতী তীরে—সেরেজদিঘা বা সেরাজেদিঘা, বাহিরঘাটা ও বাড়ৈখালি প্রভৃতি বন্দর অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ খালগুলির তীরে ও বহু বন্দর রহিয়াছে।

বিক্রমপুর নগরী—রামপাল এক সময়ে বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী ছিল,ইহার সমৃদ্ধির সময় এস্থানে ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায়ী ও শিল্পীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল, অদ্যাপিও তাহার বিশিষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। যেমন শাঁখারীবজার, পানহাট্টা প্রভৃতি।

দ্বাদশ ভৌমিকের অন্যতম ভৌমিক চাঁদ রায়ও কেদাররায়ের রাজধানী শ্রীপুর নগরী ষোড়শ শতাব্দীতে একটী প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দর ছিল; বিদেশী পর্য্যটকগণও তাঁহাদের স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে শ্রীপুরের উন্নতিশীল বাণিজ্যাদির বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন; শ্রীপুর নৌ-শিল্পের কেন্দ্রস্থান ছিল, এস্থানে একটী পোতাশ্রয় ছিল; শ্রীপুরে আগ্নেয়াস্ত্র পর্য্যন্তও নির্ম্মিত হইত। ইংরাজ-রাজত্বের প্রথম অবস্থায় গভর্ণমেণ্টের বাণিজ্যশুল্ক আদায়ের আফিস ঐ স্থানে বিদ্যমান ছিল।

মহারাজ রাজবল্লভের রাজনগরে 'রাজসাগর' নামক একটা হ্রদের উত্তর তীরে 'রাজসাগরের হাট' নামক রাজনগরের সুবিখ্যাত বন্দর ছিল। বন্দরের ভিতরে বহু রাস্তা এবং নানাবিধ পণ্যদ্রব্যের দোকান ছিল; সে কালের সভ্যতা এবং রুচি অনুযায়ী এই হাটে সমুদায় দ্রব্যই পাওয়া যাইত। এই বন্দরটী সর্ব্বদাই জন-কোলাহল-মুখরিত থাকিত। এ সম্বন্ধে পরেও আলোচনা করা যাইবে।

কালীপাড়া (বা কাওলীপাড়া), নপাড়া প্রভৃতি স্থান এক সময়ে বিশেষ বিখ্যাত ছিল; উহা এখন পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে, উক্ত উভয় স্থানই তৎকালে প্রসিদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র এবং সমৃদ্ধিশালী জনপদ ছিল।

ওজন—বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র জিনিষের ওজন প্রায় সমান; স্থানে স্থানে অন্যরূপও দেখা যায় কিন্তু ৮০ তোলার ন্যূন কোথাও সের ধরা যায় না, তবে পাইকারী ও খুচরা ভেদে ওজন সাধারণতঃ ৮০, ৮২ এই দ্বিবিধ প্রকারের; কিন্তু তাহাও সর্ব্বত্র সমান নহে, স্থানে স্থানে ৮২৷৴০ আনা, ৮৪৷৴০ আনা এবং ৯০ তোলায়ও সের ধরা হয়, সেরেজদিঘা ও মীরকাদিম বন্দরে গুড় ক্রয়-বিক্রয়ের কালীন ৮০ তোলায় সের ধরা হইরা থাকে। পাইকারী ক্রয়-বিক্রয় কালীনও ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আনীত জিনিষের ভিন্ন ভিন্ন ওজনে ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ হইতে আনীত জিনিষের ওজন সর্ব্বত্র ৮২ তোলায়, কিন্তু কলিকাতা হইতে আমদানী সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যই ৮০ তোলায় সের ধরা হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত পাইকারী ক্রয়-বিক্রয় কালীন কোন কোন জিনিষের মণ প্রতি ৴০ পোয়া হইতে ৴৷০ সের পর্য্যন্ত বেশী দেওয়া হয়; ইহাকে 'চলক' বা 'লাভান' বলে; এবং প্রতি ৫৴ মণ জিনিষের উপর ৴৷০ বেশী দেওয়া হয়, ইহাকে 'চাইলা' বলে। সুটুকি 'সোরা' মাছ বিক্রমপুরের সর্ব্বত্রই ওজন দরে বিক্রীত হয়।

বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য বন্দর

পদ্মানদীর তীরে যে সমস্ত হাট ও বন্দর অবস্থিত, সে সকলের মধ্যে নিম্নলিখিত স্থান কয়েকটি প্রধান।

ভাগ্যকুল—এস্থানে পাট ও কাঠের আমদানী হয় এবং রপ্তানীও হইয়া থাকে।

যশাইলদা—জোলাদের প্রস্তুত বস্ত্রাদি প্রচুর বিক্রয় হয় এবং কাঠের ব্যবসায়ের জন্যও প্রসিদ্ধি আছে।

মাওয়া—কাঠ ও মুলিবাঁশ বিক্রয় হয়। বাজার ও হাট হিসাবেও প্রসিদ্ধি আছে।

লৌহজঙ্গ—বর্ত্তমান সময়ে ইহা তারপাশা নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। বিক্রমপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণিজ্যকেন্দ্র। লৌহজঙ্গের প্রাচীন বন্দর কয়েক বৎসর হইল পদ্মার কুক্ষিগত হইয়াছে। এখানে পাটের আড়ত, বেত, খলফা, তৈল, বাঁশ প্রভৃতি বিক্রয় খুব বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। তা-ছাড়া এখানে মনোহারী দোকান, মিঠাই ও কাপড়ের দোকান, মোজা, গেঞ্জি, সোডাওয়াটারের কল, ঔষধালয় ও পুস্তকবিক্রয়ের দোকান আছে। যুগীদের নির্ম্মিত বস্ত্রাদি করগেট টিন ও কাঠ এখানে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়।

দীঘিরপাড়—প্রসিদ্ধ হাট। পদ্মানদীর গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। সম্প্রতি এই প্রসিদ্ধ বন্দরটি উত্তর দিকে সরিয়া যাইয়া কান্দারবাড়ী ও মূলচর গ্রামের নিকটবর্ত্তী পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ তীরে অবস্থিত। এই হাটে সর্ব্বপ্রকার দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। বিশেষ করিয়া কাঠ ও মাছ। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে মৎস্য কলিকাতা অঞ্চলে রপ্তানী হইয়া থাকে। অধুনা ইহার নিকটবর্ত্তী স্থানেই বহর নামক ষ্টীমার ষ্টেশন অবস্থিত।

ধলেশ্বরী নদী তীরে—অবস্থিত নিম্নলিখিত হাট, বাজার ও বন্দরগুলি প্রসিদ্ধ:—

তালতলা—প্রসিদ্ধ বন্দর। এখন উহার অধিকাংশ ধলেশ্বরী নদীর কুক্ষিগত হইয়াছে। পাট, কাঠ ও অন্যান্য সমুদয় প্রয়োজনীয় জিনিষই এখানে পাওয়া যায়।

মীরকাদিম—বর্ত্তমান সময়ে উত্তর বিক্রমপুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর। সরিষার তেলের আড়তদারী দোকান এখানে অনেক। কলিকাতার প্রায় সমুদয় তেলের কলের এজেন্সী এখানে রহিয়াছে। তেলের কারবারে শ্রেষ্ঠ বন্দর। এখানে রবি-শস্যের আড়তধারী অনেক দোকান আছে। মীরকাদিমের এই প্রসিদ্ধ বন্দরে লক্ষ লক্ষ টাকার দ্রব্যাদি আমদানী হয়, এখানে অনেক প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী আছেন। তাহারা নানাস্থানে কারবার করেন।

ফিরিঙ্গিবাজার—প্রাচীনকালে পর্ত্তুগীজ ফিরিঙ্গিদের একটি প্রসিদ্ধ বসতিস্থান ও বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল।

মুন্সীগঞ্জ—মহকুমা সহর। প্রাচীন নাম ইদ্রাকপুর। এখানে রামপালের বিবিধ শাক-সব্জী ও ফল-মূল, কলা ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হইয়া থাকে।

মুন্সীরহাট—এখানে নানা প্রকার শস্যেরও আমদানী হয়। চর অঞ্চলের মুসলমান ক্রেতা ও বিক্রেতার সংখ্যা খুব বেশী হইয়া থাকে।

ইছামতী নদীর তীরে—সেরাজদিঘা প্রসিদ্ধ বন্দর। পাটের আড়ত। পাথুরিয়া কয়লা, লবণ প্রভৃতির প্রচুর পরিমাণে আমদানী হয়।

বাড়ৈখালি—এখানে কই মাছ এবং প্রচুর শাকআলু বিক্রয় হয়।

খালের পাড়ের হাট বাজার—হলদিয়া একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। পূর্ব্বে বন্দরটি কালিপাড়ার জমিদারদের অধীনে ছিল। অধুনা ইহা গভর্ণমেণ্টের অধিকৃত। লৌহ ব্যবসায়, কাঠের থল, জোলাদের কাপড় ইত্যাদি বিক্রয়েব জন্য প্রসিদ্ধ।

গয়ালী-মান্দ্রা—হলদিয়ার এক মাইল দূরে অবস্থিত। মহারাজ রাজবল্লভসেন গয়া যাইয়া গয়ালীদিগকে নিষ্কর ব্রহ্মোত্তর দান করিয়াছিলেন। এজন্য মান্দ্রার সহিত গয়ালী শব্দ সংযোজিত হইয়াছে। রাজবল্লভের তাম্রলিপিখানা এখনও গয়ালীদের নিকট সযত্নে রক্ষিত আছে। এখানে বহু সংখ্যক 'রিসি' জাতির বাস। ইহাদের সংগৃহীত প্রচুব পরিমাণে অসংস্কৃত চামড়া প্রতি বৎসর বিদেশে বপ্তানী হইয়া থাকে। এস্থানে আসাম হইতে আনীত শাল কাঠেব প্রধান বাণিজ্য স্থান।

শ্রীনগর—শ্রীনগর-জমিদার বংশের স্থাপয়িতা ইতিহাস প্রসিদ্ধ লালা কীর্ত্তিনাবায়ণ শ্রীনগব গ্রামের পত্তন কবেন এবং চতুর্দ্দিকে পরিখা খনন কবতঃ সুদৃঢ় বাসভবন প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠিত অতিথিশালা তাঁহাব অক্ষয়-কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। শ্রীনগরের হাট প্রসিদ্ধ। এখানে ববি ও বুধবার হাট হয় এবং বহু সংখ্যক স্থায়ী দোকান আছে। এখানে থানা, ডাক ও তারঘর, রেজেষ্টারী আফিস ও ফৌজদারী বিচারালয় আছে, একজন অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট বিচারালয়ের কার্য্য সম্পন্ন কবেন। এখান হইতে ঢাকাতে গহেনা নৌকা চলাচল করে। পূর্ব্বে এই বন্দরে প্রতি বৎসর প্রায় ৩।।০ লক্ষ টাকার পাট খরিদ বিক্রয় হইত। এখন তাহা ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে। এস্থান বর্ষায় সর্ব্বদা পণ্যদ্রব্য-পরিপূর্ণ তরণী-সমাকীর্ণ থাকে। শ্রীনগরের "রথেব মেলা," প্রসিদ্ধ। শ্রীনগর হইতে একটী রাস্তা মুন্সীগঞ্জ পর্য্যন্ত গিয়াছে। শ্রীনগর পত্তন করিয়া কীর্ত্তিনারায়ণ স্বীয় বাসভবনের চতুর্দ্দিকে বিপৎকালে আত্মরক্ষার্থ যে চারিটী বুরুজ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহার ভগ্নাবশিষ্ট এখনও বিদ্যমান থাকিয়া লুপ্ত গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে, এই বুরুজে দিবারাত্র সশস্ত্র প্রহরী নিযুক্ত থাকিত। কতিপয় বিগ্রহ স্থাপনও তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি।

দেউলভোগ—মঙ্গলবার ও শনিবার হাট মিলে, গরু বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানে

আবগারী দোকানও আছে। শ্রীনগর হইতে এ স্থানের ব্যবধান অতি অল্প মাত্র। এখানে একটী খোঁয়াড় আছে।

ষোলঘর—প্রত্যহ বাজার মিলে, ব্যবসা, বাণিজ্যে এ স্থান তত উন্নত নয়, স্থায়ী দোকান অনেকগুলি আছে। ষোলঘর বাজারে অনেক কাঁশারীর দোকান আছে। এ স্থান হইতে অনেক কাঁশার বাসন অন্যত্র রপ্তানী হয়। এখানে পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। রথ ও মনসা পূজার দশমী উপলক্ষে খুব বড় মেলা হয়। এখানে স্বর্ণরৌপ্যাদি অলঙ্কার প্রস্তুতের জন্য অনেক সুনিপুণ শিল্পী আছে। এ স্থানে কালীবাড়ী আছে। জষ্টিস সার চন্দ্রমাধব ঘোষ এই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ষোলঘর বিক্রমপুরের একটী দীর্ঘিকাবহুল গ্রাম। এই স্থানে উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়, দাতব্যচিকিৎসালয় ও ডাকঘর আছে। রেনেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রে এইস্থানের উল্লেখ আছে। এখান হইতে ঢাকাতে গহেনা নৌকা চলে। ষোলঘরের 'ডাঙ্গার' কইমৎস্য ও 'কাজীবাড়ীর' আম বাঙ্গলাদেশের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ।

হাঁসাড়া—হাঁসাড়ার বাজার খুব প্রসিদ্ধ। স্থায়ী দোকান অনেক আছে। নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামের লোক হাঁসাড়ার বাজার করেন। মহাত্মা পদ্মলোচন ঘোষ মহাশয় তদীয় মাতার স্মৃতিরক্ষার্থ বহু অর্থ ব্যয় করিয়া এখানে একটী দাতব্যচিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠাপিত করিয়া অক্ষয়-কীর্ত্তি সঞ্চয় করিয়াছেন। এখানে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় ও ডাকঘর আছে। হাঁসাড়ার আলমগাজীর দরগা ও দীঘি খুব প্রসিদ্ধ। চৌধুরিগণের স্থাপিত শিবলিঙ্গ ও পঞ্চরত্নমঠ এতদঞ্চলে বিশেষ খ্যাত।

মোহনগঞ্জ—পাটের গুদাম আছে; হাট ও খুব প্রসিদ্ধ। স্থায়ী দোকান ঘরও কম নয়। ঢাকার গহেনা এই বন্দরের নিকট দিয়া যায়, এজন্য এখানে স্বতন্ত্র গহেনা নাই।

রাজানগর—এখানে দুইটী হাট। পাটের ব্যবসায়ই প্রধান ছিল। এখানে লক্ষ লক্ষ টাকার পাট ক্রয়-বিক্রয় হইত। এখানে ডাকঘর আছে। রাজানগর একটী প্রসিদ্ধ ভদ্রপল্লী।

হল্‌দিয়ার খালের শাখাপ্রশাখা অনেক গুলি; উক্ত শাখা খালের তীরে যে সমস্ত বন্দর, হাট বা বাজার অবস্থিত আছে; দক্ষিণ দিক হইতে আরম্ভ করিয়া তাহাদের পরিচয় প্রদান করিলাম।

ধানকুনিয়ার খালের তীরে অবস্থিত—(একটি শাখা ধানকুনিয়া বন্দরের ঠিক দক্ষিণ দিক ঘেঁষিয়া পূর্ব্বদিকে চলিয়া গিয়া গাউদিয়ার নিকটে তালতলার খালে প্রবেশ লাভ করিয়াছে।)

গাউদিয়া—হাট প্রসিদ্ধ; রেণেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানটী 'ধাউদিয়া' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এখানে ডাকঘর আছে।

কলমা—এই হাটটী নৌকা বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ; এই গ্রামের একটী বটবৃক্ষ 'কালাপাহাড়' বৃক্ষ বলিয়া সুপরিচিত; জনপ্রবাদ এই যে হিন্দুবিদ্বেষী মোশ্লেম সেনাপতি কালাপাহাড় হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি ধ্বংস করিতে করিতে এই স্থানে আসিয়া উক্ত বৃক্ষ মূলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করেন, তদবধি উহা 'কালাপাহাড় বৃক্ষ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। এখানে উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, ডাকঘর প্রভৃতি আছে।

বেজগাঁয়ের খাল—এই খালটি ঘোড়দৌড়ের নিকট হইতে উৎপন্ন হইয়া দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া একশাখা বেজগাঁ ও অপর শাখা ভোগদিয়া গ্রামে গিয়াছে।

বেজগাঁ—বাজার প্রসিদ্ধ; কতকগুলি স্থায়ী দোকানও আছে। এই বন্দরে সহমরণের একটী স্মৃতিস্তম্ভ আছে, উহা **'সতী ঠাকুরুণের মঠ'** বলিয়া প্রসিদ্ধ। মুন্সীবাড়ীতে বহু দেবালয়ের ভগ্নাবশেষ ও অর্দ্ধভগ্ন মন্দির ইত্যাদি দেখা যায়। এখানে ডাকঘর আছে। এখানে একটী ব্রাহ্মমন্দির আছে, ব্রাহ্মগণ সেখানে উপাসনাদি করিয়া থাকেন। রথ উপলক্ষে এখানে একটী মেলা হয়। মেলায় বহু জনসমাগম হইয়া থাকে।

ভোগ্‌দিয়ার খাল—পয়সা, মাইজগাঁও প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া খিদিবপাড়ার মধ্যস্থিত বিলের মধ্যে যাইয়া পড়িয়াছে; উহার পাড়ে :—নিম্নলিখিত হাটগুলি প্রসিদ্ধ।

ভোগদিয়া—সোম ও শুক্রবার হাট মিলে; ধান বিক্রয়ের প্রধান হাট; কতকগুলি স্থায়ী দোকান ও আছে। এখানে একটী খোঁয়াড় আছে।

খিদিরপাড়া—সপ্তাহে দুই দিন, মঙ্গলবার ও শনিবার দিবস হাট হয়; এখানে প্রচুর পাট জন্মে। ডাকঘর আছে; এই গ্রামের বাসুদেব জাগ্রত বিগ্রহ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

ভাওয়ারের খালের তীরে—(এই খালটী হল্‌দিয়া বন্দরের পশ্চিম দিক হইতে উৎপন্ন হইয়া শিমুলিয়া, ভাওয়ার প্রভৃতি গ্রাম ভেদ করিয়া পদ্মার নিকট কোমরপুরের খালের সহিত মিলিত হইয়াছে।)

পূর্ব্বদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম-দক্ষিণ দিকে :—

শিমুলিয়া—হাট খুব প্রসিদ্ধ; সপ্তাহে একদিন,—মঙ্গলবার হাট বসে; জোলার কাপড় বিক্রয়ের প্রধান কেন্দ্র স্থান। প্রতি হাটবারে কয়েক হাজার টাকা মূল্যের কাপড় বিক্রয় হয়। পার্শ্ববর্ত্তী জেলা সমূহের পাইকারগণ এই হাট হইতে কাপড় ক্রয় করিয়া স্ব স্ব জেলায় প্রেরণ করিয়া থাকে। এই হাট ভাগ্যকুলের কুণ্ড ও হল্‌দিয়ার পোদ্দারদের অধিকারভুক্ত। শিমুলিয়ার কৃষ্ণকিশোর পোদ্দার ব্যবসায়ে অর্থশালী হইয়া এতদঞ্চলে খুব খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন; দাতব্য চিকিৎসালয়

ও মধ্যইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা তাঁহার অন্যতম কীর্ত্তি। ইনি এক সময়ে খুব প্রতাপশালী ছিলেন। এই হাটের পশ্চিম দিক হইতে একটী ক্ষুদ্র খাল কুমারভোগ ও কাজিরপাগলা গ্রামের মধ্য দিয়া কোলাপাড়া গ্রামে পড়িয়াছে। খালের পাড়ে ছোট বড় গ্রাম আছে।

ভাওয়ার—রবিবার ও বৃহস্পতিবার হাট হয়; এই হাট বাঁশ, লটাঘাস, ছাগ ও কচ্ছপ বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ; আবগারী দোকানও আছে। এখানে বহু সংখ্যক স্থায়ী দোকান ঘর আছে, গোয়ালা ও সাহাগণ এই বন্দরের প্রধান ব্যবসায়ী। পদ্মার সন্নিকটে বলিয়া এই হাটে প্রচুর ইলিশ মৎস্য পাওয়া যায়!

পোড়াগঙ্গার তীরে অবস্থিত—[হলদিয়া বন্দরের উত্তরে সীমাবদ্ধ হইয়া এই খাল নাগেরহাট, জৈনসার, শিলিমপুর প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া তালতলার খালের সহিত সম্মিলিত হইয়াছে। গ্রীষ্মকালে নৌ-বাহন-যোগ্য জল থাকে না।]

পশ্চিমদিক হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ব্বদিকাভিমুখে:—[নাগেরহাট, দক্ষিণ চারিগাঁও, নওপাড়া, ভবানীপুর, জৈনসার, মধ্যপাড়া, আউটসাহী, শিলিমপুর, শুবচনী।

নাগেরহাট—একটী প্রসিদ্ধ বাজার; স্থায়ী দোকান অনেক আছে, এখানে জোলাগণ তাঁতে কাপড় প্রস্তুত করে, ভিন্ন ভিন্ন দেশে উক্ত কাপড় রপ্তানী হয়। রথ উপলক্ষে একটী মেলার অধিবেশন হয়। মাঘীসপ্তমী দিবস একটী মেলা হয়। এই বাজারের পূর্ব্বদিক ঘেঁষিয়া একটী খাল কনকসারের খালের সহিত মিশিয়াছে। এই গ্রামের কুম্ভকারগণ মৃৎ-শিল্প গঠনে সিদ্ধহস্ত, তিলক পালের শিল্পনৈপুণ্যের খ্যাতি প্রবাদ বাক্যের ন্যায় যথা তথায় শ্রুত হওয়া যায়। আধুনিক যুগে তাঁহার অধস্তন পুরুষদের মধ্যে কেহ কেহ শিল্পের যেরূপ নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন তাহা দেশের গৌরবের বিষয়। প্রসন্ন পালের নামও প্রসিদ্ধ।

দক্ষিণচারিগাঁও—হাট প্রসিদ্ধ, মঙ্গলবার ও শুক্রবার হাট মিলে; ধান্যের প্রধান বাণিজ্য স্থান। রেণেল তাঁহার দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানকে 'দক্ষিণচারগাঁও' বলিয়া লিখিয়াছেন। এখানকার লেবু ও তবিতরকারী দেশবিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

নওপাড়া—সপ্তাহে দুই দিন বুধ ও শনিবার হাট হয়। এই গ্রাম দক্ষিণচারিগাঁও হইতে পাঁচ সাত মিনিটের ব্যবধান মাত্র। নওপাড়ার পাট উৎকৃষ্ট; খুব খ্যাতি আছে। এখানে খুব ভাল ফসল উৎপন্ন হয়।

ভবানীপুর—সোম ও শুক্রবার হাট হয়। **মধ্যপাড়া**—রবি ও বুধবার হাট মিলে।

আউটসাহী—দৈনিক বাজার হয়। **শিলিমপুর**—হাট প্রসিদ্ধ; নিকটবর্ত্তী বহু গ্রামের লোক এই হাটে আসে। এখানে কতকগুলি স্থায়ী দোকান আছে।

শুবচনী—হাট প্রসিদ্ধ। এইখানে প্রতি বৎসর একটি মেলাও হইয়া থাকে।

কুকুটীয়ার খালের ধারে অবস্থিত। গয়ালী—মান্দ্রার পূর্ব্বদিক হইতে উৎপন্ন হইয়া কুকুটিয়া গ্রামের মধ্যে যাইয়া মিশিয়াছে।

কুকুটিয়া—দুইটী হাট; একটী পুরাণ হাট বলিয়া প্রসিদ্ধ। ডাকঘর ও উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় আছে। কুকুটীয়ার বুড়াশিবের বাড়ী প্রসিদ্ধ। অনেক লোক দর্শনার্থ আসে।

কাজিরপাগলার খালের পারে অবস্থিত। গয়ালী মান্দ্রার পশ্চিম হইতে উৎপন্ন হইয়া গ্রামের মধ্যে গিয়াছে।

কাজিরপাগলা—বাজার প্রসিদ্ধ; স্থায়ী অনেক দোকান আছে। সাহাগণই প্রধান ব্যবসায়ী। উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এখান হইতে ঢাকা মুন্সীগঞ্জে গহনা নৌকা যায়।—এখানকার বাজারে স্থায়ী দোকানও আছে।

কোলাপাড়া বা ঘোষের কোলাপাড়া—গ্রামে দুইটী হাট মিলে। গ্রামের উত্তর ভাগকে কোলাপাড়া এবং দক্ষিণ অংশকে ঘোষের কোলাপাড়া বলা হয়।

সমাসপুর—কয়েক বৎসর যাবত একটি নূতন হাট জমিয়াছে; এখানে কেবল মুসলমানের বসতি। মুসলমানেরা বেশ উৎসাহের সহিত ইহার উন্নতিকল্পে যত্নবান্।

নাগরভাগের খালের পারে অবস্থিত। গয়ালী মান্দ্রার মাইল দেড়ক উত্তরে যাইয়া একটী শাখা নাগরভাগ গ্রামের মধ্যে মিশিয়াছে। নিম্নলিখিত হাট ও বাজার প্রসিদ্ধ।

নাগরভাগ—সোম ও শুক্রবার হাট মিলে, দুধ, মাছ, তরিতরকারী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। এ গ্রামে বহু ব্রাহ্মণের বসতি। শিক্ষিত পল্লী।

শেখেরনগরের খালের তীরে অবস্থিত। পুটিমারার নিকট হইতে এক শাখা শেখেরনগর গ্রামের পার্শ্ব দিয়া ধলেশ্বরীতে পড়িয়াছে।

শেখেরনগর—হাট প্রসিদ্ধ। দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপিত হইয়াছে; ডাকঘর আছে। রেণেলের দ্বাদশ ও ষোড়শ সংখ্যক মানচিত্রে এস্থানের উল্লেখ আছে, তিনি এই স্থানকে 'সেখীনগর' বলিয়া লিখিয়াছেন। এ গ্রাম বিক্রমপুরের একটি উন্নত পল্লী।

তালতলার খালের তীরস্থ বন্দর—এই খাল ধলেশ্বরী হইতে উৎপন্ন হইয়া মালখাঁনগর, বালিগাঁও প্রভৃতি গ্রামের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া বহরের নিকট পদ্মার সঙ্গে মিশিয়াছে। একটী প্রকাণ্ড ইটের পুল, খালের উপরের প্রধান কীর্ত্তি।

রায়পুরা—এই বন্দরটী খাস গভর্ণমেণ্টের পত্তনে; পাট ক্রয়-বিক্রয়ের বাণিজ্য স্থান; এই বন্দরটী তালতলার খুব নিকটে। এ গ্রামে প্রাচীন কীর্ত্তি আছে।

বালিগাঁও—হাট প্রসিদ্ধ; রেণেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে ডাকঘর আছে। হাটটিরও বেশ খ্যাতি আছে।

গৌরগঞ্জ বা দহরি—মীরকাদিমের খালের তীরস্থ বন্দর।—এই খাল রিকাবী-বাজারের কিঞ্চিৎ পশ্চিমে ধলেশ্বরী নদী হইতে উৎপন্ন হইয়া মোকামখোলা নামক স্থানে মাকুহাটীর খালের সহিত মিলিত হইয়াছে। এই খালটীও বোধ হয় সেনবংশের কোন রাজা খনন করিয়াছিলেন। এ সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা যায় না।

টঙ্গিবাড়ী—হাট প্রসিদ্ধ, পান ও তরকারী প্রধান বাণিজ্যদ্রব্য। এখানে থানা ও ডাকঘর আছে। এই গ্রামটিতে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আছে।

মীরকাদিমের খালের শাখা-প্রশাখা অনেকগুলি, উক্ত শাখা খালের পারে যে সমস্ত বন্দর, হাট বা বাজার আছে তাহাদের বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

মাকুহাটীর খালের তীরবর্ত্তী বন্দর :—এই খালটী টঙ্গিবাড়ীর মাইল খানেক দক্ষিণে মীরকাদিমের খাল হইতে উৎপন্ন হইয়া মাকুহাটি গ্রাম ভেদ করিয়া পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদে মিশিয়াছে।

কাটাখালি—এখানে অনেকগুলি পাটের গুদাম আছে। পূর্ব্বে প্রায় চার পাঁচ লক্ষ টাকার পাট বিক্রয় হইত। পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদ ও কাটাখালি খালের সঙ্গম স্থানে অবস্থিত।

মাকুহাটী—সেরেজাবাদ

মাকুহাটি—এখানকার বাজার ও হাট প্রসিদ্ধ; বন্দরে অনেক স্থায়ী দোকান আছে। রেণেলের সপ্তদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানের উল্লেখ আছে। উহাতে বানান করা হইয়াছে Maquady। এক সময়ে এখানে প্রচুর পরিমাণে তাঁতের 'মাকু' বিক্রয় হইত। 'মাকু' বিক্রয়ের হাট বলিয়া ইহা মাকুহাটি নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে। এই হাটটির অবস্থান বড় সুন্দর। মাকুহাটির খাল ও ব্রহ্মপুত্র নদ যেখানে মিলিত হইয়াছে, ঠিক্ তাহারই সংযোগ স্থলে এই হাটটি অবস্থিত। নদীর অপর পার, চর অঞ্চল হইতে এখানে বহু লোকের সমাগম হইয়া থাকে।

সেরেজাবাদ—রেণেলের মানচিত্রে Sarajabad এইরূপ লিখিত আছে। সাধারণতঃ এই স্থানের নাম স্থানীয় জনসাধারণ সেরেজাবাজ এইরূপ উচ্চারণ করিয়া থাকেন। হাটটি প্রসিদ্ধ; এক সময়ে এখানে নীলের কুঠী ছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। সুধারাম বাউলের আখ্‌ড়া উল্লেখযোগ্য। **পুরা** বা **পুরুয়া** গ্রামে একটী নূতন হাট বসিয়াছে। সেরেজাবাদ ও পুরুয়া এই দুইটি গ্রামই পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের তীরে অবস্থিত।

আরিয়লের খালের পারে অবস্থিত বন্দর

(মীরকাদীম ও মাকুহাটি খালের সঙ্গমস্থল হইতে উৎপন্ন)

আরিয়ল—নৌকা বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ হাট; এখানে পূর্ব্বে প্রচুর পরিমাণে কাগজ প্রস্তুত হইত, এখনও কাগজ তৈয়ারী হয়। আরিয়লে পাঁচ ছয় শত মোসলমানের বসতি।

কাগজ প্রস্তুতকারক বলিয়া ইহারা 'কাগজি' নামে সুপরিচিত; এখন ইহারা বঙ্গের নানাস্থানে দপ্তরীর কার্য্য করিয়া জীবিকানির্ব্বাহ করিতেছে। এখানে ডাকঘর আছে।

সোনারঙ্গের খালের পারে অবস্থিত ঃ—

(মীরকাদিমের খালের শাখা)

সোনারঙ্গ—একটী বাজার; ডাকঘর ও তার আফিস আছে। উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, এবং দুইটী প্রাচীন দেউলবাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। সোনারঙ্গের যুগ্মমঠ দর্শনযোগ্য। পূর্ব্বে এখানে একটী মুদ্রাযন্ত্র ছিল। এখানে চৌদ্দহাজারি নামক একটী পল্লী আছে।

দইধার মার বাজার—শাখা খালের পারে এই বাজারটি অবস্থিত। এখানে নিয়মিত ভাবে বাজার মিলে।

ভীরুজখাঁর খালের তীরস্থ হাট ঃ—

সানিংহাটী গ্রামের পশ্চিম দিক হইতে আরম্ভ হইয়া ভাওয়ারের হাটের দক্ষিণপ্রান্ত ঘেঁষিয়া কোমরপুরের খালে মিশিয়াছে।

ভীরুজখাঁ—গরু বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ হাট; এখানে খোঁয়াড় আছে।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খালের তীরস্থ বন্দর বা হাট বাজার ঃ—

হাঁসাইল—হাট প্রসিদ্ধ; এক সময়ে নীলের কুঠী বিদ্যমান ছিল; ডাকঘর আছে।

ভরাকৈর—স্বনামপ্রসিদ্ধ খালের তীরে অবস্থিত। ডিঙ্গী নৌকা বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ। ডাকঘর আছে। ভদ্রপল্লী। বহু শিক্ষিত ভদ্রলোকের বাস।

কামারখাড়া—বাজার আছে। গৃহীর নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পাওয়া যায়।

বজ্রযোগিনী—মীরকাদিমের একটী শাখা খালের তীরে অবস্থিত; বাজার প্রসিদ্ধ। একটী প্রাচীন স্থান। এই গ্রামে বহু প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্থানেই বৌদ্ধতান্ত্রিক অদ্বিতীয় জ্ঞানী দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে তার ও ডাকঘর আছে। উচ্চইংরেজী বিদ্যালয়ও রহিয়াছে। ইহা প্রাচীন রাজধানী বিক্রমপুরের (রামপালের) অন্তর্ভূক্ত।

সানিহাটি—পদ্মা হইতে উৎপন্ন শাখা খালের তীরে অবস্থিত ছিল; এখানে তিনটি বাজার মিলিত। দরজী, লোহা, কাপড়, ডাইল ও চাউলের স্থায়ী দোকান ছিল। এখানে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। কয়েক বৎসর হইল এই গ্রাম পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

বড় রাস্তা কিংবা গ্রামের ভিতর যে সমস্ত বন্দর বা হাট বাজার

ব্রাহ্মণগাঁও—লৌহজঙ্গের সন্নিকটবর্ত্তী; এইখানে পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হইত। অনেক কাঁশারীর বাস ছিল। প্রত্যহ বাজার মিলিত। কয়েকখানা স্থায়ী

দোকানও ছিল। ব্রাহ্মণগাঁয়ের ঘোষবাবুরা একসময়ে খুব প্রতাপান্বিত ছিলেন। ইহাদের নির্ম্মিত 'ঠাকুরদালান' বা 'দুর্গামণ্ডপ' একটী দেখিবার জিনিষ ছিল। এখানে উচ্চইংরেজী বিদ্যালয় ও ডাকঘর ছিল। কয়েক বৎসর হইল ইহ পদ্মাগর্ভে বিলুপ্ত হইয়াছে।

কুমারভোগ—চন্দ ভূম্যধিকারীগণ এই বাজারের স্থাপয়িতা, হল্‌দিয়ার মাইল খানেক পশ্চিমে অবস্থিত, এখানে চাউল, ডাল, কাপড় প্রভৃতির স্থায়ী দোকান আছে।

মাইজপাড়া—শ্রীনগর থানার অন্তর্গত, সোম ও শুক্রবার হাট হয়, হাট প্রসিদ্ধ; মাইজপাড়ার কালীবাড়ী প্রসিদ্ধ। ডাকঘর আছে। এখানে একটী জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল। রথ উপলক্ষে এখানে একটী মেলার অধিবেশন হয়। **রাড়ীখাল**—বাজার হয়। রেণেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রে এই স্থানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রম ও ডাকঘর আছে। **বাসাইল**—খালের ধারে গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস। অনেক টোল আছে, এজন্য এস্থানকে টোলবাসাইলও বলে। ডাকঘরের মোহরে শেষোক্ত নামই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। বাজার প্রসিদ্ধ। রেণেলের দ্বাদশ সংখ্যক মানচিত্রে বাসাইলের উল্লেখ আছে। **বীরতারা**—শ্রীনগরের সন্নিকটে। রবি ও বৃহস্পতিবার হাট মিলে। চৈত্র সংক্রান্তিতে একটী বড় মেলার অধিবেশন হইয়া থাকে। এখানে ডাকঘর আছে। প্রতিদিন বাজারও বসে। **সিংপাড়া**—বাজার প্রসিদ্ধ, অনেক স্থায়ী দোকান আছে। শ্রীনগর হইতে যে সড়ক মুন্সীগঞ্জ গিয়াছে তাহার পার্শ্বে অবস্থিত। **ইছাপুরা**—তালতলা হইতে যে রাস্তা শ্রীনগর গিয়াছে তাহার পার্শ্বে কয়েকখানা স্থায়ী দোকান আছে। নিত্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় দ্রব্যই মিলে। এখানে ডাক ও তার আফিস, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে। এক সময়ে এখানে নীলের কুঠী বিদ্যমান ছিল। **ভদ্রর**—শ্রীনগর থানার অন্তর্গত। বাজার প্রসিদ্ধ। অনেক স্থায়ী দোকান আছে। এখানে ঘানিতে উৎকৃষ্ট তৈল প্রস্তুত হয়। **বিবন্দী**—পূর্ব্বে এখানে হাট মিলিত; এখন বাজার হয়। এ-গ্রামের বাসুদেব প্রসিদ্ধ। পুরোহিত বাড়ীতে রজত-নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকে। এখানে অল্প দিন যাবৎ ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের একটী পুষ্করিণী খনিত হইয়াছে। **ইমামগঞ্জ**—শ্রীনগর থানায়; গরু বিক্রয়েরজন্য প্রসিদ্ধ। **বেজেরহাটী**—রসুনিয়ার সন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম। হাট প্রসিদ্ধ। **তারাটিয়া**—লৌহজঙ্গের সন্নিকটবর্ত্তী; বাজার প্রসিদ্ধ। **ভীলাকান্দি**—রাজাবাড়ীর থানার অন্তর্গত; গরু বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ হাট। **করিমগঞ্জ**—রাজাবাড়ী থানায়, (বর্ত্তমান দীঘিরপাড়) গরু বিক্রয়ের হাট। **পঞ্চসার**—মুন্সীগঞ্জের অনতিদূরে; বাজার মিলে; গুড় প্রস্তুত হয়; প্রচুর পান উৎপন্ন হয়। **খালিপাশা**—মুন্সীগঞ্জের সন্নিকটে; হাট হয়। পান, তরিতরকারী প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। **গারুরগাও**—হাট হয়।

দক্ষিণ বিক্রমপুরের হাট, বাজার ও বন্দর

চিকন্দী—এখানে গব্য ঘৃত এবং ক্ষীরের আমদানী প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে। গঙ্গানগরের-ক্ষীর ও ঘৃতের খ্যাতি আছে। **পণ্ডিতসার**—বাজারে পুস্তকের দোকান। প্রেস এবং কাঠের 'খল' রহিয়াছে। এখানে অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাস।

পালং—প্রসিদ্ধ হাট ও বাজার। এখানে অনেক দোকান—পশারী, কাঁশারীদের দোকান, মনোহারী দোকান ইত্যাদি বহুবিধ দ্রব্যাদির আমদানী হইয়া থাকে। **কাঞ্চনপাড়া**—এখানে ধান, চাউল খেজুর গুড়ের প্রচুর আমদানী ও রপ্তানী হইয়া থাকে। **মাঐসার** বা মহীসার—শ্রীশ্রী৺দিগম্বরীতলা তীর্থস্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ। এখানে সপ্ত দিবসব্যাপী একটি মেলা হয়। **সেনের বাজার**—খেজুরীগুড় বিক্রয়ের জন্য বিখ্যাত। **বুড়ীরহাট**—বিক্রমপুরের দক্ষিণ প্রান্তে অবস্থিত। এই হাটে গরু, নৌকা, উলুখড়, ঘাস ইত্যাদি খুব বেশী বিক্রয় হয়। **নরিয়া**—প্রসিদ্ধ হাট ও বন্দর। দক্ষিণ বিক্রমপুরের মধ্যে ইহা একটি প্রসিদ্ধ স্থান । এখানে বহু ধনীব্যবসায়ীর বাস।—প্রাচীন নরিয়ার সীমা, দৈর্ঘ্যে-উত্তরে আরাফুলবাড়িয়া হইতে দক্ষিণে খৈয়ারবিল পর্য্যন্ত অনুমান পাঁচ ছয় মাইল ও পশ্চিমে মুলপাড়া হইতে পূর্ব্বে কেদারপুর ও চণ্ডিপুরের পশ্চিম অর্থাৎ বর্ত্তমান মুলফৎগঞ্জের খালের পশ্চিম পাড় পর্য্যন্ত অনুমান সাড়ে তিন মাইল। রেণেলের মানচিত্রের সহিত তুলনা করিলে দেখা যায় যে—বর্ত্তমান সময়ে প্রাচীন নরিয়ার আট ভাগের একভাগ মাত্র ভূমি আসলিতে অবশিষ্ট আছে, বাকী সকলই পদ্মার চরের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। নরিয়ার ঘটকবংশীয়দের প্রাচীন ইতিহাস প্রসিদ্ধ। উহা যথাস্থানে আলোচিত হইবে।—উত্তর ও দক্ষিণ বিক্রমপুর প্রাকৃতিক বিপ্লবে, নানাভাবে দিন দিনই বিপন্ন হইয়া পড়িতেছে, তাহার ফলে হাট বাজার ও বন্দরের, নানারূপ রূপান্তর ও স্থানান্তর ঘটিতেছে। কাজেই স্থান পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বের প্রসিদ্ধিরও হ্রাস পাইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকৃতি—পরিচয়

বিক্রমপুর নদী মাতৃক দেশ হইলেও ইহার ভূ-ভাগ সর্ব্বত্র সমতল নহে একথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি। এজন্য স্বাস্থ্য সম্বন্ধেও ইহার বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। কোন কোন স্থান বিশেষ স্বাস্থ্যকর, আবার কোন কোন স্থান একান্ত অস্বাস্থ্যকর। জল-বায়ু জমির উর্ব্বরতা ও নিম্নতার জন্যও ঐরূপ হয়। শতবর্ষ পূর্ব্বে বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য কিরূপ ছিল, দেশের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা বলিতেছি। সেকালের সংবাদপত্র ও সরকারি রিপোর্ট হইতে তাহা বিশদভাবে জানিতে পারা যায়।—তদানিন্তন একজন লেখক বিক্রমপুরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বলেন—তথায় ক্রমাগত কতিপয় দিবস অবস্থান করিলে মাতঙ্গকল্প সুস্থকায় বীর পুরুষকেও পীড়াগ্রস্ত এবং দিন দিন ক্ষীণদেহ ও হতবীর্য্য হইয়া একেবারে শ্রীহীন হইতে হয়। আইরল, মালদা, ধীপুর, রাউতভোগ, যশোলঙ্গ, কাঠাদিয়া, কেয়াব, নয়না, কামারখাড়া প্রভৃতি গ্রাম সমূহ ইহাব উৎকৃষ্ট উদাহরণস্থল। এই নিমিত্ত উল্লিখিত স্থানগুলি অত্যন্ত বিরলবসতি হইয়া রহিয়াছে। তাদৃশ অল্প জনাকীর্ণ স্থানেও বিকটমূর্ত্তি পীড়াদেবীর মন্দ প্রভাব লক্ষিত হয় না। এমন গৃহ অতি অল্প, যাহাতে দুই একজন রুগ্ন, সুতরাং শয্যাগত ও শান্তি সুখ-বঞ্চিত দৃষ্ট না হয়।—পল্লীগ্রামগুলি প্রায়ই গাঢ় জঙ্গলাকীর্ণ, তাহাতে প্রয়োজনীয় বায়ুর সঞ্চালন দূরে থাকুক, শারদীয় শুক্লপক্ষের রজনীও কৃষ্ণপক্ষের তামসী নিশার ন্যায় বোধ হয়। জঙ্গলের মধ্যবর্ত্তী পল্লী-সমূহের মধ্য দিয়া অতিশয় সংকীর্ণ পয়ঃ-প্রণালী সকল বহিয়া গিয়া গ্রাম্য পুষ্করিণীর সহিত মিশিয়াছে, ঐ সকল পয়ঃ-প্রণালী ও পুষ্করিণীগুলি সর্ব্বদাই 'সেওলায়' (শৈবাল) আবৃত আছে। গ্রীষ্মকালের প্রারম্ভে বৃক্ষাদির গলিতপত্র মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে, বর্ষাকালের ঐ সকল পত্র ও অন্যান্য নানা প্রকার আবর্জ্জনা বৃষ্টির জলে ধৌত হইয়া পুষ্করিণী ও পয়োনালে তাহারই স্রোত বহিতে থাকে, জল ঈষৎ লালের সহিত কৃষ্ণবর্ণ মিশ্রিত চমৎকার! একপ্রকার রঙ্গে রঙ্গিন হয়। তাহা এইরূপ সমল যে সংস্কার করিয়া লইলে একসের জলের মধ্যে তিন পোয়া নির্ম্মল জল পাওয়া কঠিন হয়।—স্বাস্থ্যের নিদান যে জল-বায়ু তাহা বৎসরের অধিককাল যে স্থানে দূষিত থাকে, তথায় যে যৎকিঞ্চিৎ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করা যায় তাহা আশ্চর্য্য! বাস্তবিক অনেককে নানা প্রকার রোগগ্রস্ত হইয়া কষ্টে জীবন যাপন করিতে হয়, অকাল মৃত্যুর সংখ্যা ও কম নহে,

বিক্রমপুরের জলবায়ু

অনেকে 'গুল' ধারণ করিয়া হস্তে বা পায়ে একটি নরদামা খুলিয়া দিয়া শরীরকে দশদ্বার বিশিষ্ট করিয়া রাখেন।

১৮৪০ খৃঃ অঃ ঢাকার তদানিন্তন সিবিলসার্জ্জন ডাঃ টেইলার বিক্রমপুরকে ঢাকা জেলার একটি প্রধানতম অস্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।* ইহা শতবর্ষ পূর্ব্বের কথা। বর্ত্তমান সময়ে বিক্রমপুরের কোন গ্রামেই বড় একটা বনজঙ্গল দেখিতে পাওয়া যায় না। পথ, ঘাট, খাল, পুষ্করিণীর উন্নতি, দাতব্য চিকিৎসালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং নলকূপের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় কলেরা প্রভৃতি ব্যাধির প্রকোপ অনেক হ্রাস পাইয়াছে।—কিন্তু শ্রীনগর থানার অন্তর্ভূত গ্রামের লোকের যেরূপ জলকষ্ট মুন্সীগঞ্জ বিভাগের তদ্রূপ নহে। কয়েক বৎসর গত হইল শ্রীনগর বিভাগে ওলাউঠা রোগে বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। এবং প্রতি বৎসরই হইয়া থাকে। দূষিত জলপান করাই যে তাহার মুখ্য কারণ তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। বিক্রমপুরের এতদঞ্চলে ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে পুকুর, ডোবা, খাল ইত্যাদি শুকাইয়া যাইয়া জলের এইরূপ দুর্দ্দশা ঘটে। সময় সময় দুরারোগ্য ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি সংক্রামক ব্যাধির আক্রমণে বহু লোকের প্রাণনাশ হইয়া থাকে। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে যে সকল গ্রাম বনাকীর্ণ ও লোকজন-সমাগম-হীন ছিল, এখন তাহা জন-মুখরিত ঘন বসতিপূর্ণ সমৃদ্ধ পল্লীতে পরিণত হইয়াছে।

বিক্রমপুরের জল-বায়ুর ঋতুবিশেষে পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে। বর্ষার সময় দেশের চরম দুরবস্থা হয়। নদ, নদী, খাল, বিল, পুষ্করিণী, মাঠ, ঘাট সমুদয় জলে পূর্ণ হইয়া বিক্রমপুরকে দ্বীপের ন্যায় করিয়া তোলে। তখন সর্ব্বত্র জলে জলময় হয়। বাড়ীতে, উঠানে এমন কি কোন কোন স্থলে গৃহের মেজেতে পর্য্যন্ত জল উঠে। তখন উপরেও জল-ধারা, নিম্নেও জলের প্লাবন, কাজেই বিক্রমপুরবাসীদিগকে দারুণ ক্লেশের মধ্য দিয়া দিনাতিপাত করিতে হয়। এমনকি, অনেকের গৃহের মধ্যে জল উঠায় বাধ্য হইয়া তাহাদিগকে বংশ ও কাষ্ঠাদি নির্ম্মিত মঞ্চের উপর বাস করিতে হয়। অতি বর্ষা-নিবন্ধন সময় সময় শস্যাদি বিনষ্ট হইয়া দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি করে।

উদ্ভিজ্জ ও শস্য সম্বন্ধে আমরা প্রথম অধ্যায়ে ও সংক্ষেপে কিছু বলিয়াছি। ধলেশ্বরী ইছামতী, মেঘনা ও পদ্মা নদীর জন্য বিক্রমপুরের শস্যোৎপাদিনী শক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। এজন্য এখানে প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ শস্য উৎপন্ন হয়। আশুধান বিক্রমপুরের সাধারণ লোকের অতি প্রিয়। এবং প্রধান উপজীবিকা বলা যাইতে পারে। আশুবর্ষা, আশুধান্যের পুষ্টি সাধন করিয়া থাকে।

উদ্ভিজ্জ শস্য

* 'পল্লীবিজ্ঞান' ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ। মি এস্‌কলি সাহেব বলেন—In 1840 the civil surgeon of Dacca described Bikrampur as one of the most unhealthy parts of the District.

এতদ্ব্যতীত হৈমন্তিক ধান্য (আমন ধান্য) হেমন্তকালে ইহা কাটা হয় বলিয়া ইহার নাম হৈমন্তিক। সর্ষপ, কুসুম্ভ, যব, তিল, কলাই, পাট, কার্পাস, কালিজিরা, ধনিয়া, তামাক, সুপারি, মেথি, শণ, চিনাই, করলা, প্রভৃতি নানা জাতীয় ফসল জন্মিয়া থাকে।

বিক্রমপুরের লোকের প্রধান খাদ্য চাউল। ময়দা, আটা প্রভৃতি ও ব্যবহৃত হয়, তবে তাহা বিদেশ হইতে আসিয়া থাকে। বিক্রমপুরে সাধারণতঃ নানা প্রকার ধান্যের চাষ হইয়া থাকে। তবে প্রধানতঃ চারি প্রকারের ধান্যের চাষই প্রচলিত। যথা—আউস, আমন, দিঘা, রোয়া। এই বিভিন্ন জাতীয় ধান যথাক্রমে বিঘা প্রতি ১০/, ২৫/ ১৫/ ৩০/ ১২/ ২৫/ এবং ১৫/ ২৫/ মণ পর্য্যন্ত জন্মে। পৌষের শেষ ভাগ হইতে চৈত্রের প্রথমভাগ পর্য্যন্ত তিনমাস ব্যতীত আর সকল মাসেই বিক্রমপুরের কৃষকেরা ধান কাটিয়া ঘরে আনে। ধানের নানা প্রকার সুন্দর সুন্দর নাম ও জাতিভেদ আছে। যেমন উড়িজাল, কালমানিক চিনিশঙ্কর, জমির ফুল প্রভৃতি চল্লিশ প্রকার। আউস ধান্য এবং অঘুনিয়া, ইদা, কালাসোণা, পাইনকাইজ, প্রভৃতি আশী প্রকারের আমন ধান্য। ধলদিঘা, আশ্বিনী, কার্ত্তিকসাইল প্রভৃতি প্রায় বিশ রকমের দীঘাধান এবং কালাবোরা, গইন্দারি, জামালভোগ প্রভৃতি কয়েক প্রকারের রোয়া ধান উৎপন্ন হয়। এখানে ধান সম্বন্ধে একটা সাধারণ কথা বলিতেছি। সমগ্র ভারতবর্ষে দশ হাজার রকম আমন জাতীয় ধানের চাষ হয়। বাঙ্গলা দেশে আমন ধানের সংখ্যাও চারি হাজারের কম নহে।—এখানে বাঙ্গালার কোথায় কোন্ জেলায় কত রকমের ধানের চাষ হয় তাহার একটু উল্লেখ করিলাম। সুন্দরবন জঙ্গলমহলে ২৫।৩০ রকম। মেদিনীপুরে ৩০।৩২ রকম। যশোহরে ৬২ রকম, ঢাকা ও বরিশালে শতাধিক রকম, ২৪ পরগণা, নদীয়ায় ৬০।৬২ রকম, হুগলী, বর্দ্ধমান, পুর্ণিয়ায় ৭০।৭২ রকম, রাজসাহী, পাবনা প্রভৃতি অঞ্চলে ২৫।৩০ রকম। আসামেও বহু রকম ধানের আবাদ হয়। বাঙ্গলার আমন ধানের মধ্যে, কার্ত্তিক শাল, ঝিঙ্গাশাল, ইন্দ্রশাল, হাতিশাল, কামিনীশাল, বাগতুলসী, নাগড়া, দাউদখানী বা দাদখানী, কাটারিভোগ, বাদশাভোগ, সমুদ্রবালি, বাঁশমতী প্রভৃতি প্রধান। বাঙ্গলাদেশে যে কত প্রকার আউসধান আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ঢাকা, ময়মনসিংহ, রঙ্গপুরে বহু প্রকার আউসের আবাদ হয়। আউস ধানের মধ্যে দুর্গাভোগ, কেলেরোয়ে, কেলেবোগরা, লক্ষ্মী-পারিজাত, লক্ষ্মীপুরা, রাজশাই, শালাই, সীতাহার, সূর্য্যমণি, সূর্য্যমুখী প্রভৃতি প্রধান।

বোরো ও জলিধান।—বোরো ধানকে আমন বা আউশ কিছুই বলা যায় না। ইহা উহাদের মাঝামাঝি এক প্রকার মোটা ধান। জলী ধানকে আউশের শ্রেণীতে ফেলা যাইতে পারে। কাজেই আমরা দেখিতে পাইলাম, বাঙ্গলাদেশে বিভিন্ন জেলায় যে ধান জন্মে, তাহার অনেকটা বিক্রমপুরেও জন্মিয়া থাকে। ইহার

যারা, বিক্রমপুরের চাষীদের কৃষির প্রতি অনুরাগও তাহাদের গৌরবই প্রকাশ পাইতেছে।

বিক্রমপুরে ধান উৎপন্ন হইলেও অধিবাসীর পক্ষে উহা পর্য্যাপ্ত নহে। বরিশাল ও বাগেরহাট অঞ্চলে এক প্রকার সরু পাতলা ধান জন্মে, উহা হইতে সেখানকার লোকেরা এক জাতীয় সিদ্ধ চাউল প্রস্তুত করে। এই সিদ্ধ চাউল "বালাম" নামক একপ্রকার সে দেশীয় নৌকায় বোঝাই হইয়া দেশে দেশে বিক্রয়ার্থ যায়, উহা 'বালাম চাউল' নামে পরিচিত। বিক্রমপুরের প্রত্যেক হাটে ও বন্দরে প্রতি বৎসর হাজার হাজার মণ বালাম চাউলের আমদানি হয়। এবং বিক্রমপুরের মধ্যবিত্তাবস্থাপন্ন এবং ধনী ব্যক্তিরা বেশীর ভাগই বালাম চাউলের ব্যবহার করেন। খুলনা অঞ্চলের এক প্রকার সাদা, মোটা আতপ চাউল প্রস্তুত হয় উহাকে লোকে 'ভাটিয়াল চাউল' বলে। এই সিদ্ধ বালাম ও ভাটিয়াল আতপের বিক্রমপুরে খুবই প্রচলন আছে। বিক্রমপুরে এক সময়ে অত্যধিক পরিমাণে **পাটের** চাষ হইত।

বিবিধ উদ্ভিদ

তরকারীর মধ্যে শিম, বেগুন, কলা, মূলা, আলু, কচু, লাউ, কুমড়া, ঝিঙ্গা, উচ্ছে, মিষ্ট কুমড়া, চাল কুমড়া, কাক্‌রোল, পানিকচু বা জলকচু, ঘেচু, শাকআলু, নানা জাতীয় ডাটা, পালংশাক, গিমিকুমড়া, হেলেঞ্চা, হিঞ্চি, রসুন, খেসারী শাক, পেঁয়াজ, পুঁই প্রভৃতি প্রচুর জন্মে। আজকাল গোলআলু, পটল, টমেটো, এবং নানাবিধ কপি, শালগম প্রভৃতির ও চাষ বিক্রমপুরে হইয়া থাকে।

ফলবান্ বৃক্ষ—ফলের মধ্যে আম, কাঁঠাল, নারিকেল (খুব বেশী নহে) তাল, খেজুর, ফুট, ক্ষিরাই, শশা, কাউ, জম্বুরা, (বাতাবী লেবু), আমজাম, কালজাম, তেঁতুল, আমলকি, কলা, নানা জাতীয় আনারস, লেবু-জামির, পেয়ারা (গয়া বা গইয়া) লট্‌কা, লিচু, জামরুল (আমরুল) চালতে, জলপাই, করঞ্চা, (করজা), বেল, খদির, গাব, ডহুয়া, (ডেউয়া) ডেফল, কুচই, ময়না, বথই, নানাজাতীয় লেবু, কামরাঙ্গা, বিলাতি আমড়া, লকেট, ডালিম, সপেটা, বিলাতি গাব, বিলেতি বেগুন (টোমেটো), পেঁপে উল্লেখযোগ্য। কতকগুলি বিদেশী ফল এ দেশের হইয়া গিয়াছে যেমন—মর্ত্তমান বা মর্ত্তবান কলা (মার্ত্তাবানদ্বীপ), বাতাবি লেবু (ব্যাটাভিয়া সহর), পেঁপে (পাপুয়া দ্বীপ) আতা, নোনা প্রভৃতি প্রধান।

ফুল—নানা জাতীয় জন্মে। যথা :—গাঁদা, (গেন্ধা), যূঁই, বেলী, মালতী, অপরাজিতা, চাঁপা, সুবর্ণকলিকা, গন্ধরাজ, দোপাটি, কামিনী, শেফালী, টগর, বক, সাদাজবা, লালজবা, বকুল, চাঁপা, কনকচাঁপা, কাঁটালে চাঁপা, আকন্দ, করবী রক্ত ও শ্বেত, ঝুম্‌কো জবা (পঞ্চমুখী) শাপলা, কুমুদ, পদ্ম ইত্যাদি। রজনীগন্ধা, সূর্য্যমুখী, গোলাপ, কাঠগোলাপ, শ্বেতগোলাপ; বিলেতি মেহেদি, হলদে করবি, ভেরাণ্ডা লালভেরেণ্ডা, মুকুট ফুল, রজনীগন্ধা, প্রভৃতি

অনেক গুলি ফুল বিদেশ হইতে ভারতে ও বাঙ্গালা দেশে আসিয়াছে। লালভেরেণ্ডা রাস্তার পাশে জন্মিয়া থাকে। Sir Joseph Hooker ইহার সন্ধান করিতে পারেন নাই। কাজেই ১৮৫০ খৃষ্টাব্দের পরে ইহা এই দেশে আসিয়াছে এইরূপ অনুমান করা যায়। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে ইহা বাঙ্গলাদেশে দেখা যাইতনা।

বন ফুল—এখানে বিক্রমপুরের কয়েকটি বন ফুল সম্বন্ধে বলিতেছি। পিঠক্ষীরা,—পিঠানি (গম্ভীরা) সমস্ত সরু সরু ডালের অগ্রভাগে ফুলের ছড়া ঝুলিয়া পড়ে। ফুলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেখিতে সুন্দর নয়, গন্ধ নাই। ফুলের পাপড়ী ও সবুজ পুষ্পাভরণ এক বলিয়া বোধ হয় ও একটি ফুলে তিনটি করিয়া থাকে। পুং কেশর অনেক গুলি। ফুলের বিশেষত্ব এই যে পুষ্পরেণু প্রচুর পরিমাণে হয় ও চেষ্টা করিলে অনেক গুলি একত্র করা যায়। **পলাশ**—বিক্রমপুরে এই গাছ খুব বেশী হয় না। কারণ ইহা জলপ্লাবিত স্থানে জন্মে না। পলাশ ফুল যখন ফোটে তখন তাহার লোহিত শোভা সকলের মনোরঞ্জন করে। ফোটা অবস্থায় গাছ, পাতা-শূন্য অবস্থায় থাকে। এইগাছ Leguminosae বা সীম্বিক জাতীয়। পলাশ গাছের ন্যায় শাল্মলী বা শিমূল গাছ ও ফুল ফুটিলে গাছগুলি বাস্তবিকই শোভন ও সুন্দর হয়। বিক্রমপুরে শিমূল গাছ খুব বেশী দেখা যায়। এই সমুদয় গাছে সচরাচর মাঘ মাসেই ফুল ফোটে। তখন চারিদিকে লালে লাল হইয়া যায়, এবং সত্য সত্যই মনে হয়—"আগুণ লেগেছে বনে বনে।"

বনফুল

মাঘ ও ফাল্গুন মাসে চূত-মুকুল-সৌরভে বিক্রমপুরের বনস্থলী প্রমোদিত হইয়া থাকে। **উড়িআম** ফুলগুলি ক্ষুদ্র, নূতন পাতা ও ফুল একত্র হয়, গন্ধ পাওয়া যায় না। **গোলাপ-জাম** ফুলগুলি বড় হয় ও দেখিতে সুন্দর হইয়া থাকে। পুংকেশরগুলি লম্বমান হইয়া ফুলের শোভা বৃদ্ধি করে। **কাউগাছ**—চৈত্র মাসে ফুল হয়। এই জাতীয় গাছ পশ্চিম বঙ্গে বেশী দেখা যায় না। বিক্রমপুরে খুব বেশী জন্মে। এই গাছের ফুল গোলাপী রঙের হয় এবং বেশ দৃঢ় ও চতুষ্কোণ। ইহার ফল বর্ষাকালে পাকে এবং খাইতে অম্লমধুর। **লটকা**—ফুলগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র। পুং স্ত্রী দুইজাতীয় ভিন্ন ভিন্ন গাছে জন্মে। ফল জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়ে জন্মে, স্বাদ অম্লমধুর। বরুণ (বন্নুয়া-বউনা)—বরুণ গাছগুলি নূতন পাতার উপর শাদা শাদা ফুলের গুচ্ছ দ্বারা আবৃত হইয়া শোভা বৃদ্ধি করে। গাছ তীক্ষ্ণ ত্বকবিশিষ্ট, ছাল, পাতা, ফল সকলই তীক্ষ্ণ। এ গাছের ছাল আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধে ব্যবহার হয়। ফুলগুলি গুচ্ছে গুচ্ছে জন্মে। ফুলের চারিটি পাপড়ী ও চৌদ্দটি পুং কেশর ও ও গর্ভকেশর। বর্ষাকালে বিস্তর ফল হয়, এই ফল কোন কাজে লাগে না। এই গুলি পচিয়া শুধু পুকুর ও খালের জল নষ্ট করে। এই ফলের ব্যবহার সম্বন্ধে গবেষণা আবশ্যক।

ভাঁইট—(ভাণ্ডিল) সুন্দর শুভ্র ফুলগুলি; পাঁচটি পুষ্পাবরণ, পাঁচটি পাপ্‌ড়ী নিম্নভাগযুক্ত হইয়া চুঙ্গির আকারে গঠিত। পুং কেশর চারিটি এবং গর্ভকেশর দু'টি। গন্ধ বেশ মিষ্টি। এই গাছ আয়ুর্ব্বেদীয় অনেক ঔষধে ব্যবহৃত হয়। আস্বাদ তিক্ত। পথে ঘাটে প্রচুর জন্মে।

চৌক-উদানী—গাছের পাতা ছিঁড়িয়া বোটার রস চক্ষের পাতার উপর দিলে চোখ উঠা রোগ হয় না। ফুলগুলি ক্ষুদ্র গোলাপী রঙ্গের, দেখিতে সুন্দর, গন্ধ নাই, গাছগুলি সুপারি বাগানে ও অন্য উচ্চ ভূমিতে জন্মে।—অনেকগুলি করিয়া ফুল এক এক গুচ্ছে হয়। **গাব**—ফুলগুলি ঘটীর আকৃতি, দেখিতে বেশ সুন্দর, ছোট ছোট। গাছগুলি ঘনপত্রাবৃত বলিয়া ইহার চারিদিকটা একেবারে অন্ধকারময় হয় বলিয়া লোকে এই গাছ বড় ভালবাসে না। বিক্রমপুরের অজ্ঞ লোকের যত কিছু ভূতের ভয়, তাহা এই গাছকে আশ্রয় করিয়া জন্মিয়া থাকে। এই গাছ, দক্ষিণ ভারত হইতে বাঙ্গলাদেশে আসিয়াছে। **সোণাল** (কবিরাজদের সোণামুখী) সাধারণ ভাষায় ইহা 'কানাইলড়ী' নামে পরিচিত। সমস্ত বৃক্ষটি ফুলের একটি ঝাড়ের মত দেখায়। দ্বিপ্রহরের প্রখর রৌদ্রের সময় ইহার সৌন্দর্য্য অতুলনীয় হয়। এই ফুলের গন্ধ নাই, কিন্তু তার বর্ণের ও পরিচয়ের সৌন্দর্য্য অতি চমৎকার। এই গাছ সচরাচর জন্মে না। মধ্যে মধ্যে দেখা যায়। ইহার ফুলগুলি লম্বা ছড়া। এইগুলিকে চল্‌তি ভাষায় কানাইলড়ি বলে। **জারুল**—এই বৃক্ষ বিক্রমপুরে যেখানে সেখানে জন্মে। তক্তার জন্য এই গাছের ব্যবহার খুব বেশী। যত রকম বৃক্ষ আছে, তন্মধ্যে জারুলই তক্তার জন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। এই গাছ চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরার পাহাড়েও জন্মে এবং সেখানেও কাঠের দিক্ দিয়া ইহা প্রসিদ্ধ। এই গাছে যখন ফুল ফোটে তখন গাছগুলি দেখিতে বড় সুন্দর দেখায়। ফুলগুলি সাধারণতঃ গোলাপী রঙ্গের ও তদ্দাবা প্রায় সমস্ত বৃক্ষটি আবৃত হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইতে হয়।

হিজল—এই গাছ বাঙ্গলার অন্যান্য অনেক স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায় না। বর্ষার জলপ্রবাহে ইহার বীজ সঞ্চালিত হইয়া আপনা হইতে এই গাছ জন্মে। অতএব স্থানীয় অবস্থামতে এই গাছ বিক্রমপুরের সর্ব্বত্রই দেখা যায়। ইহারা খালের পাড়ে, গড় ও মাঠে মাঠে জন্মিয়া থাকে। লম্বমান ছড়াতে ফুল হয়। সাধারণতঃ গোলাপী রঙ্গের ফুল। কোন গাছের ফুল কম গোলাপী রঙ্গের ও কোনটাতে প্রায় সাদা মত হয়। ফুলগুলি আপনা আপনি বা মক্ষিকার বা বাতাসের স্পর্শ মাত্রে ঝরিয়া পড়ে। বৃক্ষেরতল কি স্থলে কি জলে এই ফুল ঝরিয়া পড়িয়া ফুলের শয্যা পাতিয়া দেয় এবং মৃদু সৌরভে চারিদিক প্রমোদিত হইতে থাকে। **মোত্রা**—এই 'গাছড়ার' বেতি দিয়া পাটী তৈয়ারী হয়। চট্টগ্রাম অঞ্চলে ইহাকে "পাটীপাতা" বলে।

গড়ের পাড়ে ও 'কোলা' প্রভৃতি স্থানে বিস্তর জন্মে। ইহার ফুলগুলি খুব সাদা, জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রচুর পরিমাণে ফুটিয়া মোত্রাবনকে সুন্দর সুদৃশ্য করিয়া তোলে। উদ্ভিদ্‌বিদগণের এই ফুল পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

কচুরী—পানাজাতীয় একপ্রকার উদ্ভিজ্জ। কয়েক বৎসর যাবৎ বিক্রমপুরে আসিয়া ছাইয়া পড়িয়াছে এবং তথাকার জলপথ সকল প্রায় বন্ধ করিয়াছিল। এইগুলি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বাড়িয়া জলপথ বন্ধ করিয়া দেয়, পুকুর ইত্যাদি আবৃত করিয়া ফেলে ও বর্ষা বেশী হইলে ধানক্ষেত ইত্যাদি আবৃত ও নষ্ট করে। বাস্তবিক ইহা বিক্রমপুরের এক নূতন প্রবল শত্রু। যদিও নবাগত কচুরী পানা এমন শত্রু (পূর্ব্বে এক রকম কচুরী এদেশে ছিল, এখনও আছে তাহা এত বৃদ্ধি হইত না বা অনিষ্টকর ছিল না) কিন্তু যখন এই কচুরী 'বন' ফুলে ফুলে প্রস্ফুটিত হয় তখন দেখিতে খুব সুন্দর হইয়া থাকে। গুচ্ছে গুচ্ছে ফুলগুলি সবুজপত্র মধ্যে দাঁড়াইয়া দর্শকের আনন্দদায়ক হয় ও কচুরীর অনিষ্টকারিতা ভুলাইয়া দেয়। কচুরীপানা ব্রেজিল হইতে এদেশে আসিয়াছে। কিভাবে আসিল সে সম্বন্ধে নানারূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত। সম্প্রতি কচুরীপানা বিক্রমপুর হইতে দূর করিবার জন্য একজন বিশেষ সরকারী কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইয়াছেন। আশা করা যায় এইবার কচুরী দেশছাড়া হইবে।

কাঠ জলকী—এই গাছ আষাঢ় মাসের প্রথম ভাগে ফুলে ফুলে ভরিয়া উঠে। ফুল ফোটে অসংখ্য। সাধারণ চক্ষে দেখিতে সৌন্দর্য্য বেশী নাই, কারণ বর্ণ সুন্দর নয়; গন্ধ ভাল। কিন্তু ফুলগুলি উদ্ভিদতত্ত্ব-বিদের পরীক্ষার যোগ্য। চারিটী পুষ্পাবরণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্র বা বৃতির (sepals) সমষ্টিমাত্র। উহার মধ্যে নয়টি দস্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অনেক সংখ্যক পুংকেশর (stamens) বহন করিতেছে। ফুলের পাপড়ী গর্ভ-কেশর সাধারণ পরীক্ষায় দেখা যায় না।

লজ্জাবতী—"লতা লজ্জাবতী" উদ্ভিদ রাজ্যে চমৎকার সৃষ্টি। তাহার ফুলগুলি দেখিতেও খুব সুন্দর। গোলাপী রঙ্গের গোলাকার ফুলগুলি গন্ধশূন্য; এক একটী 'ফুল' কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের সমষ্টি কতকটা কদম্ব ফুলের ন্যায়। লজ্জাবতীর ক্ষুদ্র নিবিড় বন বহু পুষ্প-কুটীরে বড় সুন্দর দেখায় ও নিকটে বসিলে মক্ষিকাগণ কেমন সুন্দরভাবে আত্মকার্য্যচ্ছলে প্রকৃতির কার্য্য করিতেছে দেখিয়া পুলকিত হইতে হয়। লজ্জাবতীর পত্র ও পত্রদণ্ডগুলি স্পর্শে বা সমীরণ স্পর্শে জড়সড় হইয়া পড়ে, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই তাহা সকৌতুকে দেখিয়া থাকে। কিন্তু ঐ লতার অন্য-ভাগ ও ফুল ও ফুলের দণ্ড সেরূপ জড়সড় হয় না। ইহা বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষার উপযুক্ত বিষয়।

কদম্ব—বর্ষার সময়ে বিক্রমপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইতেছে কদম্ব। কদম্ব বোধ হয় ভারতবর্ষের কোন স্থলেই অপরিচিত নয়! যাহা হউক বিক্রমপুরে কদম্ব গাছ বহুল পরিমাণে জন্মে। গাছগুলি সুবিধামত স্থানে হইলে সুদীর্ঘ ও সরলভাবে বহু শাখাপ্রশাখা যুক্ত হইয়া দণ্ডায়মান হয় এবং যখন গাছ ভরিয়া ফুল ফোটে, তখন অত্যন্ত সুন্দর দেখায়। ফুলগুলি সাধারণের চক্ষে বড়ই সুন্দর এবং উদ্ভিদ্‌বিদের নিকট ও তাহা খুবই আদরের হওয়ারই কথা। এক একটি কদম্ব-গোলক অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুলের সমষ্টি। তাহার উপরের একস্তর শুভ্র অসংখ্য গদা-সদৃশ সুন্দর পুষ্পভাগ, দ্বিতীয় পীতবর্ণ অংশ, তৃতীয় স্তর হরিৎ পুষ্পভাগ ও চতুর্থ কেন্দ্রভাগ, দৃঢ়, একটি গোলক। কিন্তু তাহা ফুল বা বীজ নহে। ফুলের গন্ধ মৃদু, রৌদ্রের দিনে গাছেব নিকটবর্ত্তী স্থান গন্ধে আমোদিত হয়। ছেলেমেয়েদের খেলার ফুলের মধ্যে কদম্বই প্রধান। অতি বৃষ্টিতে ফুল নষ্ট হইয়া যায়, রৌদ্র হইলে এবং দিন বেশ পরিষ্কার থাকিলে ফুল বেশী হয়। **কেলীকদম্ব**—জাতীয় কদম্ব বৃক্ষের ফুল এই সাধারণ জাতীয় কদম্বের মত হইলেও আকারে অনেক ক্ষুদ্র হয়। ফুলের আকারে প্রকারে গঠন একই প্রকারের। *

এইভাবে আমরা বিক্রমপুরের নানাস্থানে নানা জাতীয় ফুল ও ফল দেখিতে পাই। সে সমুদয়ের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া সম্ভবপব নহে। কিন্তু এ বিষয়ে বিক্রমপুরের উৎসাহী তরুণ উদ্ভিদ্‌বিদগণের আলোচনা করা কর্ত্তব্য।

বৃক্ষাদির মধ্যে—ফলবান্ বৃক্ষের নাম পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন এখানে সাধারণ ভাবে পুনরায় বলিলাম, ইহাতে দ্বিরুক্তি হইলেও বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে। আম, বট, অশ্বত্থ, পাকুড়, শিমুল, জারুল, উড়িয়াম, পলাশ, হিজল, বরুণ (বউনা) ছায়াতন, (সপ্ততাল-সপ্তপর্ণী) পারুল, পিঠক্ষীরা, রয়না (রণা) কবই, পাকুরকানী; যজ্ঞ-ডুমুর, গাম্ভারী, গণিয়ারী, পিপুল, নাওসোনা, কদম্ব, শিরীষ, পয়াই, মান্দার দুই রকমের হয়। কাঁটা মান্দার এবং পালা মান্দার। কাইপলা (জিকা) ইহা হইতে আঠা হয়। গোলাপজাম, কালজাম প্রভৃতি গাছের নাম করা যাইতে পারে। বাঁশ ও বেত এক সময়ে বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র খুব অধিক পরিমাণে দেখা যাইত এখনও আছে। সাধারণতঃ বিক্রমপুরে চার পাঁচ রকমের বাঁশ দেখিতে পাওয়া যায়, যেমন—বড়া, তল্লা, মুলি ইত্যাদি। খাল ও ঝোরাখালের মধ্য দিয়া নৌকাপথে চলিতে গেলে কবির কথা মনে পড়ে,—'কোথাও বাঁশের ঝাড় এলিয়ে পড়েছে।'

* আমরা বিক্রমপুরের বনফুল সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় লেখক শ্রীযুক্ত জগন্মোহন সরকার মহাশয়ের নিকট ঋণী। তিনি আমার অনুরোধক্রমে মৎ সম্পাদিত 'বিক্রমপুর' পত্রিকায় ১৩২২, ১৩২৩ সালে এ বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন।

বাঁশের ঝোপ একেবারে খালের উপর বাঁকিয়া পড়িয়া নৌকা চলাচলের পথ রুদ্ধ করিয়া ফেলে। বেতসকুঞ্জের ত কথাই নাই। বেতের করাতের মত অগ্রভাগ নৌকার ছই ইত্যাদি আটকাইয়া ফেলে। এই অভিজ্ঞতা বিক্রমপুরবাসীমাত্রেরই আছে।

বিক্রমপুরের পূর্ব্বাঞ্চলে—বেতকা, বজ্রযোগিনী, পাইকপাড়া, কস্‌বা প্রভৃতি স্থানে ইক্ষু, আদ্রক (আদা) ও হরিদ্রার বেশ চাষ হয়।

পূর্ব্বে বিক্রমপুর যখন বনজঙ্গলাকীর্ণ ছিল, তখন বিবিধ বন্যজন্তুর বাস ছিল এবং তাহারা রীতিমত ভাবে গৃহস্থ ও পল্লীবাসীর প্রতি উৎপীড়ন করিত। ১২৭৪ সালের মাঘ মাসের 'পল্লীবিজ্ঞান' (১৮৬৮ ফেব্রুয়ারী) পত্রিকায় স্থানীয় সংবাদাবলীতে লিখিত আছে—"ইছাপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাঘ্র ভয় হইয়াছে। সন্ধ্যার পূর্ব্বেই বাঘ ডাকে। দুইটি গরু নষ্ট করিয়াছে।"—সেকালের প্রায় সমুদয় সংবাদপত্রেই এইরূপ সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।

পশু-পক্ষী

সেকালের সংবাদপত্রে বিক্রমপুরের বন্য জন্তুর উপদ্রব সম্বন্ধে অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। সে সময়ে সুন্দরবনের রয়াল বেঙ্গল টাইগার (Royal-Bengal-Tiger) ও মাঝে মাঝে দেখা যাইত। বন্য মহিষ, বন্য শূকর প্রভৃতির খুবই অত্যাচার ছিল। এমন গ্রাম ছিল না, যে গ্রামে বন্য শূকরের কথা শুনা যাইত না। সেজন্য গ্রামবাসিগণ নানারূপ অস্ত্রেরও ব্যবহার করিতেন এবং বনাকীর্ণ গ্রাম্যপথে বাহির হইবার সময়ে দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইতেন এবং সঙ্গে শূল, বল্লম, লাঠি প্রভৃতি থাকিত। হিংস্রজন্তু ব্যতীত গৃহপালিত প্রাণীর মধ্যে গোরু, ছাগল, ভেড়া, ঘোড়া, কুকুর, বিড়াল, মহিষ, প্রভৃতি প্রধান। বন্য জন্তুর মধ্যে চিতাবাঘ, খেঁকশিয়াল, ভোঁদর, বানর, (হনুমান দেখা যায় না।) ইন্দুর, কাঠবিড়াল, ছুঁচো, খাটাশ, উদ, (বন্যশূকর বেশী দেখা যায় না। (বেজি, বাঘডাসা, ভাম খরগোশ উল্লেখযোগ্য। **সরীসৃপ** জাতীয় প্রাণীর ভিতর—কেঠো বা কাউঠা, কচ্ছপ বা কাছিম (নিরামিষাহারীরা ব্যতীত বিক্রমপুর অঞ্চলের হিন্দুগণ প্রায় সকলেই পরম পরিতোষের সহিত ইহা খাইয়া থাকে)। শৃগালের দংশন ও শৃগাল কর্ত্তৃক শিশুহরণ ব্যাপার বিক্রমপুরে প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। আমরা এখানে তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিলাম :—

গত বুধবার বেলা অনুমান ৯ ঘটিকার সময় বিক্রমপুর সিরাজদিঘা থানার অন্তর্গত তাজপুর গ্রামের পোদ্দারপাড়ার রাজেশ্বর পোদ্দারের পত্নী জলের ভয়ে তাহাদের ১৪ মাস বয়স্ক কন্যার কোমরে দড়ি বাঁধিয়া বারান্দায় তাহাকে ঘুম পাড়াইয়া রাখিয়া ঘর-কন্নার কাজ করিতেছিল। হঠাৎ কোথা হইতে একটি শিয়াল আসিয়া শিশু কন্যার কোমরের বাঁধন ছিঁড়িয়া তাহার ঘাড়ে কামড়াইয়া ধরিয়া জলপূর্ণ একটা নালা পার হইয়া যায়, অপর বাড়ীর একটি মেয়ে উহা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করায় শিয়াল তাজপুরের খাল পার হইয়া একটা জঙ্গলে প্রবেশ করে। বলাই নামক একটি ছেলে খাল সাঁতরাইয়া পার হইয়া একটা ঝোপের মধ্য হইতে অর্দ্ধমৃত

অবস্থায় ঐ শিশুটিকে উদ্ধার করে। শিয়াল শিশুটির ঘাড়ে, গলায়, পিঠে ও হাতে কামড়াইয়া ক্ষতবিক্ষত করিয়া ফেলিয়াছে। সিরাজদীঘা হাসপাতালে শিশুর প্রাথমিক চিকিৎসা করা হয়; কিন্তু সেখানে শৃগাল বা কুকুরের দংশনের চিকিৎসার বন্দোবস্ত না থাকাতে শিশুকে ঢাকা মিটফোর্ড হাসপাতালে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছে! গত ২ বৎসর পূর্ব্বেও একটী শিশু কন্যাকে শিয়ালে ঘর হইতে লইয়া গিয়াছিল। তাহার আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। [আনন্দবাজার—১৩ই শ্রাবণ ১৩৪৪]

শিয়ালের এইরূপ উৎপাত প্রায় প্রতি গ্রামে প্রতি বৎসর হইয়া থাকে।

গোধিকা—গোসাপ বা গুই সাপ। এই গুই সাপ এক সময়ে বিক্রমপুরে খুব বেশী পরিমাণে ছিল, কিন্তু চামড়ার ব্যবসায়ীগণ গোসাপের চামড়া খুব বেশী মূল্যে ক্রয় করার দরুন, উহার বংশ প্রায় নির্মূল হইয়া আসিয়াছে। গোসাপ—সাপদের পরম শত্রু ছিল, ইহাদের দ্বারা অনেকটা সর্প-ভয় নিবারিত হইত, ইহাদের বংশ প্রায় নির্ম্মূল হওয়ায় এই দিক্ দিয়া যথেষ্ট ক্ষতির কারণ হইয়াছে। টিকটিকি, গিরগিটি, প্রভৃতি নানাজাতীয় সরীসৃপ ও বিক্রমপুরে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। প্রাচীন বাঙ্গালাসাহিত্যে গোধিকার বিষয় বিশেষভাবে উল্লিখিত আছে।

সর্প—বিক্রমপুরে নানা জাতীয় সর্পের বাস। সর্পদংশনে প্রতি বৎসর বহুলোকের মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষে গড়ে প্রতিবৎসর কুড়ি বাইশ হাজার লোকের সর্পদংশনে মৃত্যু হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে বাঙ্গালাদেশেই সব চেয়ে বেশী লোক সাপের কামড়ে মারা যায়। আমাদের দেশে গড় প্রতি, প্রতি বৎসরে প্রায় ১০৫৫৭ লোকের সর্প দংশনে মৃত্যু হয়। বর্দ্ধমান জেলায় সর্প দংশনে সব চেয়ে বেশী লোক মারা পড়ে। প্রতি লক্ষে প্রায় ১৭৫ জন, তার পরে পূর্ব্ববঙ্গের ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। বিক্রমপুরে মৃত্যুসংখ্যা অনুপাতে কম নহে।

বিজয়গুপ্তের মনসার পাঁচালীতে বাঙ্গলাদেশের প্রচলিত অনেক সাপের নাম পাওয়া যায়। যথা:—

ত্রিভুবন মোহ যায় পদ্মার প্রতাপে।
সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিল পদ্মা অজগর সাপে॥
আড়রিয়া বেঁকা নাগে করিল আসন।
পাটেশ্বরী নাগে পদ্মা করিল বসন॥
খইয়াজাতি নাগে পদ্মার হাতের বড় শোভা।
বিঘতিয়া নাগে পদ্মা মাথায় বাঁধে খোঁপা।
কুণ্ডলিয়া নাগে পদ্মার কর্ণের কুণ্ডলী।
জাতিসর্প দিয়া বাঁধে মাথার পুটলী।
শিশরিয়া নাগে পদ্মার ললাটে সিন্দুর।
বিষঝিয়া ঘোড়ানাগে চরণে নূপুর॥

সূর্য্যমণি নাগে পদ্মার শাড়ীর আঁচলী।
ধামু নাগেতে পদ্মার কোমরে কাঁচলী॥

এই সমুদয় জাতীয় নাগ এবং প্রায় সমুদয় বিষধর সর্পই বিক্রমপুরে দেখা যায়। গোখুরা ও কেউটে জাতীয় সর্প—(Proteroglypha). শঙ্খচূড় (King Cobra, Niabungarus Hamadryad), সাধারণ গোখুরা (Niatropudiaus) সাধারণ করেতা (Bungarus caeruleus) কুরসা (Echis carinata) এবং রাসেলস্ ভাইপার (Viper Russell's) প্রধান। এই জাতীয় সর্প অত্যন্ত বিষধর। ইহাদের বিষ এত ভয়ঙ্কর যে ইহারা দংশন করিলে অতি অল্প সময়েই প্রাণান্ত হয়। গোখুরা—এই জাতীয় সর্প অত্যন্ত বিষাক্ত। গোখুরা সাপ লইয়া বেদেরা বা সাপুড়েরা সর্ব্বত্র সাপের খেলা দেখাইতে আসে। এই সাপ বিক্রমপুরে খুব বেশী দেখা যায়। গোখুরা সাপ নানা প্রকারের হয় এবং নানা নামে পরিচিত। যথা—নাগ, কেউটে, বা কেউটিয়া, কালসাপ, জাতিসাপ, কেউসাপ, খইয়ে গোখুরা ইত্যাদি। বাঙ্গালাদেশে কাল গোখুরা সাপকেই কেউটে সাপ বলে। এই সাপের স্বভাব অতি ভীষণ। মানুষ বা অন্য কোন প্রাণী যেমন গোরু, ছাগল, ইত্যাদি কাছে গেলেই এমন ফোঁস্ ফোঁস্ করে ও তাড়া করে যে, পলাইয়া তবে প্রাণ রক্ষা হয়, কেউটে সাপ, ভিজে ও স্যাঁৎসেতে জায়গায় থাকিতেই বেশী পছন্দ করে, ইহারা জলার ধারে ও ধানের ক্ষেতেই বেশীর ভাগ থাকে। সাধারণতঃ দাঁড়াইস বা ডারাস, দুধরাজ, জিঙ্গলাপোড়া (গাছে গাছে বাঁশের ঝোপে তীরের মত বেগে ছুটিয়া যায়) খইনা (খনিয়া), ডোরা বা ধোরা সাপ প্রভৃতি সচরাচর মাঠে, খালে দেখা যায়।

বিক্রমপুরে নানা জাতীয় পক্ষী দেখা যায়। কাক, দাঁড়কাক, ঘুঘু; চড়ুই, টুনি, বউকথা-কও, কোকিল, চিল, বাজ, শকুনি, গৃধিনী, কোড়াল, টিয়া, হরিকেল, ঘুঘু, ঝুটকলি, বক, হাড়গিলা, ডাহুক, পেঁচক, বামশালিক, মাছরাঙ্গা, বন মোরগ, ঢুলি, বাবুই, বুলবুল, পিপি, তিতির, খঞ্জন, কুক্কুট, বেলেহাঁস, পানকাওর, দয়েল, চন্দনা, শালিক, সময় সময় নানা বিদেশী পক্ষীও আসিয়া থাকে যেমন—সারস, সিদ্ধিগুরু, পাণিভোলা। সিদ্ধিগুরু পক্ষী যখন যে গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হয় সেই গ্রামে মারীভয় দেখা দেয় বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। সোণাগঙ্গা পাখী এখন দেখা যায় না।

পক্ষী

বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র দীঘি, পুষ্করিণী, খাল, বিল, নদ ও নদী থাকার দরুন মৎস্যের কোন অভাব নাই। মেঘনা ও পদ্মা ও ধলেশ্বরী নদীতে প্রচুর পরিমাণে ইলিশ মাছ জন্মে। নদ নদী ও বিল পুষ্করিণীতে রোহিত বা রুই, কাতলা, মৃগেল, কালিবাউস, চিতল, আইড়, ভাঙ্গনা, ভেটকী বা (কোরাল, ভাঙ্গনা, এলাঙ্গি, চেলা; মৌরলা, পুটি, ফেসা, চাপিলা, কৈ, খলিসা, সিং, মাগুর, টেংরা, গোলসা, পাবদা, চাঁদা,

মৎস্য

শৌল, গজার, তপ্ সী, পোয়া, বেলে বা বাইলা, বাইম কাচকী, শিলন, বাঁচা, পাঙ্গাস, বোয়াল, চিংড়ী, মুণ্ডড়ে বা চিংড়ী (ইচা) পুটি, সরপুটি, বৃহদাকার খড়্গা মাছ প্রভৃতি মিলে। এত বিভিন্ন জাতীয় ছোট বড় মাছ আছে যে তাহাদের নাম করা কঠিন। বিক্রমপুর হইতে প্রতিবৎর বহু হাজার টাকার মৎস্য বাঙ্গলার নানা স্থানে বিশেষতঃ কলিকাতাতে রপ্তানী হয়।

জলজন্তুদের মধ্যে পদ্মা, মেঘনা, ধলেশ্বরীতে,—কুমীর খুবই দেখা যায়, কিন্তু হাঙ্গর বড় একটা নাই। শিশুক বা চল্‌তি কথায় শুশুক খুব বেশী আছে এবং উহা সচরাচর দেখা যায়। শিশুক মাছ হইতে প্রচুর পরিমাণে তেল পাওয়া যায়। এক একটি শিশুকে আধ মণ হইতে দেড় মণ পরিমাণ তেল হয়। শিশুকের তেল, বাতরোগের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী বলিয়া চিকিৎসকগণ বলিয়া থাকেন।

বিক্রমপুরের যে সকল উদ্ভিদ, ফুল ও ফল এবং ফলবান্ বৃক্ষের নাম করিলাম, তাহার অনেকগুলিই বিদেশ হইতে আসিয়াছে। কোন্ উদ্ভিদটি কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছে, তাহা উদ্ভিদতত্ত্ববিদ বন্ধুবর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত গিরিজা-প্রসন্ন মজুমদার মহাশয় বিক্রমপুরের ইতিহাসের জন্য লিখিয়া দিয়াছেন।

বিদেশাগত উদ্ভিদ

পৈত্রিক বাসস্থান	বাঙ্গলাদেশে উপনিবেশ স্থাপন
আফ্রিকা	তেঁতুল, তাল, গিনিঘাস, অড়হড়, তরমুজ, ভেরেণ্ডা।
আমেরিকা	ভুট্টা, টোমাটো, গোলআলু, রাঙ্গাআলু, পেঁপে, লঙ্কা, টেপারি, তামাক, পেয়ারা, আনারস, আতা, নোনা, বকুল, মিঠাকুমড়া, চিনাবাদাম, হিজলী বাদাম, কচুরীপানা।
গ্রীস ও ইতালী	মসূর, মটর।
চীন	চা, লিচু, কামরাঙ্গা, স্থলপদ্ম, গন্ধরাজ, জবা, আক।
পারস্য ও আফগানি স্থান	পালংশাক, ছোলা, পেঁয়াজ, রসুন, খেজুর।
মালয় দ্বীপপুঞ্জ	নারিকেল, পান, সুপারি, ঝিঙ্গা।
মেসোপোটেমিয়া	যব, গম।
যাবা (যবদ্বীপ) সিংহল	তিল, চালকুমড়া, আম।
ইউরোপ—বেলুচিস্থান	পোস্ত, গোলাপ, বাঁধাকপি মেদি, ডালিম।

এই তালিকা হইতেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে আমাদের দেশের অধিকাংশ বৃক্ষ ও লতার মধ্যে বেশীর ভাগই বিদেশাগত উদ্ভিদ।

তৃতীয় অধ্যায়

জনসংখ্যা, জাতি ও ধর্ম্ম

ঢাকা জেলা বাঙ্গালা দেশের সকল জেলা হইতে জনবহুল। ১৮৭২ খৃঃ অঃ হইতে ১৯৩১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত আদমসুমারির একটা সাধারণ হিসাব দেওয়া গেল, ইহাতে এই জেলার জনসংখ্যা কিরূপ ভাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহার একটা ধারণা জন্মিবে।

ঢাকা জেলার থানার সংখ্যা

১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১	১৯২১	১৯৩১
১২	১২	১৩	১৩	১৩.	৩৫	৩৪

জনসংখ্যা

	১৮৭২	১৮৮১	১৮৯১	১৯০১	১৯১১
প্রতি থানায়	১৫৪,৪১৬	১৭৬,৩৬৩	১৮৬,২০৪	২০৩,৮০৯	২২৭,৭২৩

১৯২১	১৯৩১
৮৯,৩১৩	১০০,৯৫৮

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের বিক্রমপুরের জন্মসংখ্যা ও জনসংখ্যার অনুপাত নিম্নলিখিতরূপ ছিল:—

থানা	লোকসংখ্যা	জন্ম	প্রতি সহস্রে বার্ষিক গড়
শ্রীনগর	৩১৩২৫৮	৪৩৫	১৬'৫৬
মুন্সীগঞ্জ	২৯২৮৪৭	৫৪৮	২২'৪৪
পালং	২৭৯৮৪	৩৪৯	১৪'৭৩
শিবচর	১৩১৮৫২	২০২	১৮'৩৬
মোট	১০১৭০৩১	১৫৩১	

১৯৩১ খৃষ্টাব্দের আদমসুমারিতে বিক্রমপুরের জনসংখ্যা নিম্নলিখিতরূপ দেখিতে পাওয়া যায়:—

উত্তর বিক্রমপুর

মোট—জনসংখ্যা—৯,১৩,৯৩৭ জন।

হিন্দু	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
	১,৫৯,৪০৩	১,৭৪,৭৭৫	৩৩৪১৭৮

উত্তর বিক্রমপুর

মুসলমান	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
	২,০৮,৭১০	২,১৪,০৩৫	৪,২২,৭৪৫
বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী	২,৭০৫	২,০৭৮	৪,৭৮৩

দক্ষিণ বিক্রমপুরের জনসংখ্যা

হিন্দু	পুরুষ	স্ত্রী	মোট
	৩৮,১৭৬	৩৯,৫৭২	৭৭,৭৪৮
মুসলমান	৩৪,৪৭৭	৩৭,৪৪৭	৭১,৯২৪
ভিন্নধর্মাবলম্বী	১,৩৭৪	১,০৮৫	২,৪৫৯

সেন্সাস্ রিপোর্ট বা আদমসুমারির বিবরণ অনুযায়ী দেখা যায় যে মাদারীপুর মহকুমার জনসংখা গোঁসাইরহাট ও শিবচর থানায় হ্রাস পাইয়াছে। ইহার দুইটি কারণ, (১) নদীর ভাঙ্গনী (২) এ থানার কোন কোন অংশ ঢাকা ও ত্রিপুরা জেলার অন্তর্ভূক্ত হইয়াছে। পালং ও রাজৈর প্রভৃতি থানায় জনসংখ্যা ৩·৮ হইতে ৬·৩ শতকরা হিসাবে বৃদ্ধি পাইয়াছে। নরিয়ায় জনসংখ্যা বৃদ্ধির মূলে রহিয়াছে স্থানীয় স্বাস্থ্য-সমৃদ্ধি, সংক্রামক ব্যাধির অভাব এবং পাটের ব্যবসায়ের জন্য নানা স্থানের লোক আসিয়া এখানে বাস করিতেছে এইজন্য। *

ঢাকা জেলার প্রতি বর্গমাইলে সাধারণতঃ ৯৩৫ জন লোকের বাস। টঙ্গিবাড়ী থানায় প্রতিবর্গ মাইলে ৩,০৪৪, লৌহজঙ্গ ৩,২২৮, মুন্সীগঞ্জ ২,৪১৩, শ্রীনগর ১,৮৯৫ হইতে ২০০০ জন লোকের বাস। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্সাস রিপোর্ট বা আদমসুমারির বিবরণীতে দেখিতে পাই সে সময়ে মুন্সীগঞ্জে প্রতি বর্গ মাইলে ১,৫২৬ জন এবং শ্রীনগর থানায় ১,৭৮৭ জন অধিবাসী ছিল। এ সম্বন্ধে সেন্সাস রিপোর্টে মন্তব্য করা হইয়াছিল—Munshiganj—Thana which showed an advance of 20·2 percent in 1891 has now grown by only 10.2 percent, but even this rate of expansion is extraordinary, having regard to

* In the rest of the Subdivision (Madaripur) increases ranging from 3·8 in Rajair police station to 6·3 per cent., in Naria are due to the general healthiness of the locality, its freedom from epidemic diseases and the general prosperity of the Jute trade during the last decade which has attracted settlers for employment.—Census of India, 1931 Volume V. Part Pages 53.

the fact that the thana has a density of 1,526 persons to the mile Srinagar, reached the extraordinary average 1,787 per sq. mile. Census of India 1901. Volme VI. by E A Gait. মুন্সীগঞ্জ ও টঙ্গিবাড়ী থানার জনসংখ্যা হ্রাস হইতে আরম্ভ করিয়াছে, আদমসুমারির ১৯৩১ সনের বিবরণীতে তৎসম্বন্ধে যে মন্তব্য লিখিত হইয়াছে তাহা সুসঙ্গত :—

The decrease in the combined population of Munshiganj and Tangibari police-stations in the Munshiganj subdivision is mainly due to the transfer of Char areas from this police-station to Madaripur and Chandpur subdivisions whilst Tangibari has also suffered from erosion both on the north by the Dhaleswari river and on the south by the Padma. টঙ্গিবাড়ী এবং মুন্সীগঞ্জ থানার জনসংখ্যার সহিত তুলনা করিলে শ্রীনগর এবং লৌহজঙ্গ থানার জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার অধিক। তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া আদমসুমারির বিবরণীতে লিখিত হইয়াছে যে—Srinagar and Lohajang police-stations have also suffered from erosions but the population shows an increase and apparently those persons affected by the erosions have migrated merely to the interior of the police-station altogether.—লৌহজঙ্গ থানার অন্তর্গত অনেক সমৃদ্ধপল্লী নদী গর্ভে নিমজ্জিত হওয়ার ফলে সে সমুদয় গ্রামবাসিগণ নিরাপদ স্থানে বাস করিবার উদ্দেশ্যে বিক্রমপুরের মধ্যবর্ত্তী ভাগ—লৌহজঙ্গ থানায় এবং শ্রীনগর থানার নানা গ্রামে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করাতেই লৌহজঙ্গ এবং শ্রীনগর থানায় জনসংখ্যার তারতম্য বড় একটা হয় নাই। একদিকে ভাঙ্গিতেছে আর এক দিকে গড়িতেছে কতকটা ঐরূপ। এই আদমসুমারির বিবরণী হইতে একটী বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে, তাহা হইতেছে—বিক্রমপুরে এবং সাধারণ ভাবে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানাধিক্য। ইহার কারণ সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

আমরা ইতিহাস হইতে জানিতে পারি যে ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম দিক্ হইতেই মুসলমানেরা ভারতবর্ষে আগমন করেন, সেই হিসাবে উত্তর পশ্চিমের প্রদেশগুলিতেই মুসলমানের সংখ্যা অধিক হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু বাঙ্গলা দেশের জনবিবরণী আলোচনা করিতে যাইয়া আমরা দেখিতে পাই যে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের অনুপাতে বাঙ্গলাদেশে মুসলমানের সংখ্যা অনেক বেশী। আদমসুমারিতে দেখা যায়, নদীয়া, চব্বিশপরগণা প্রভৃতি জেলা অপেক্ষা ঢাকা, ময়মনসিংহ,

বিক্রমপুর ও পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানাধিক্য

ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট প্রভৃতি জেলায় মুসলমানের সংখ্যা অধিক সংখ্যক। মুসলমান অধিকার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে এ দেশে মুসলমানেরা বসতি বিস্তার করিতে আরম্ভ করিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। তারপর কিন্তু সমগ্র বঙ্গদেশ মুসলমান নৃপতিদের অধিকারভুক্ত হইতে যে অনেকদিন লাগিয়াছিল তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু যেমন বাঙ্গলাদেশ তাহাদের অধিকারভুক্ত হইল, তেমনি তাঁহারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের রৌদ্রতপ্ত অনুর্ব্বর ভূখণ্ড অপেক্ষা বাঙ্গলাদেশের উর্ব্বর প্রদেশকেই অধিকতর বাসোপযোগী স্থান বলিয়া উপলব্ধি করিতে লাগিলেন। এই জন্যই ক্রমশঃ বগুড়া, মালদহ, (রাজধানী গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ) স্থানে তাহাদের বসতি বিস্তার হইতে আরম্ভ হইল। একদিকে উপনিবেশ স্থাপন, অন্যদিকে ধর্ম্মপরায়ণ মহাপুরুষগণের উদার মত এবং ধর্ম্মপ্রচারও মুসলমানাধিক্যের অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। শ্রীহট্টের মহাপুরুষ শাহ্ জালাল ৩৬০ জন আউলিয়া লইয়া আসিয়া শ্রীহট্টের নানাস্থানে ধর্ম্মপ্রচার করিতে আরম্ভ করেন। কেবল শ্রীহট্ট জেলার মধ্যেই যে ইঁহাদের প্রভাব সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নহে ; সমগ্র পূর্ব্ববঙ্গে ক্রমশঃ ইঁহাদের দ্বারা ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ে পূর্ব্ববঙ্গে যে সমুদয় সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবার আছেন, তন্মধ্যে এই আউলিয়াগণের বংশীয়দের কোন না কোন ভাবে সম্পর্ক নাই, এমন অতি অল্পই দেখা যায়।

বিজয়ী মুসলমানের ধর্ম্মে তখন বহু লোক দীক্ষিত হইতে লাগিল। হিন্দুজাতি অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ হইলেও, তৎকালে, অর্থাৎ সেই রাষ্ট্রবিপ্লবের যুগে, ধর্ম্মবন্ধন যে শিথিল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ নাই। ......বিশেষতঃ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে নিম্নস্তরের হিন্দুসমাজে ব্যক্তিগত সাধন ভজনের বিশেষ কোনও পথ ছিল, এমনও বোধ হয় না। তান্ত্রিক-দীক্ষা সমস্ত বর্ণের জন্য বিহিত হইলেও, জলচল জাতীয় লোক ভিন্ন অন্য জাতীয়েরা যে ঐ দীক্ষালাভ করিত এরূপ বিবেচনা হয় না।

এই অবস্থায় সমাজের মধ্যে যাহাদের অবস্থা হীন ছিল, তাহারাই দলে দলে নব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া বাদশাহী জাতির মধ্যে পরিগণিত হইতে লাগিল। শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব হওয়ায় এবং নিম্নশ্রেণীর জন্য পবিত্র হরিনামের কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিয়া প্রত্যেক লোকেরই ধর্ম্ম-সাধনের উপায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিলেন বলিয়াই পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু-জাতির অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে, নতুবা ভারতের উত্তর পশ্চিমাংশের ন্যায় মুসলমানের সংখ্যা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইত। পশ্চিমবঙ্গে এইরূপ ভাবে ইসলাম ধর্ম্মের প্রচার সম্বন্ধে বাধা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়।

শ্রীহট্টের শাহজালালের ন্যায়, বিক্রমপুরের বায়াআদম বা বাবা আদম প্রভৃতি মহাপুরুষগণের প্রভাবে সহজেই পূর্ব্ববঙ্গে ইস্‌লাম ধর্ম্ম বিস্তার লাভ করে। নিম্নবর্ণের

লোকেরা ইসলামধর্ম্মে নানা প্রকার সাম্য ভাব দেখিয়াও এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথমতঃ সামাজিক নীতি বড়ই অনুকূল, বহু বিবাহ ও বিধবা বিবাহ প্রচলিত থাকায় তাহাদের অনেকেই সাগ্রহে এই ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিল। ফলে বংশ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তারপর কেবল অধিক পরিমাণে সন্তানোৎপাদন হইলেই যে বংশ বিস্তার হয়, এমন নহে, পুষ্টির নিমিত্ত খাদ্যাদিরও প্রাচুর্য্য চাই এবং তৎকল্পে নূতন উপনিবেশের স্থানও আবশ্যক। পূর্ব্ববঙ্গে তাহার অপ্রতুল ছিল না। পশ্চিম বঙ্গে নূতন আবাদের নিমিত্ত ভূমি অপেক্ষাকৃত বিরল ছিল; কিন্তু পূর্ব্ব-বঙ্গে জঙ্গল ও চরভূমি, অধিত্যকা তখন অধিক পরিমাণে অনধিকৃত ছিল। মুসলমানগণ ঐ সকল স্থান অধিকার করিয়া লইতে লাগিল।

সামাজিক সাম্য

উপনিবেশ স্থাপন বিষয়েও মুসলমানের ধর্ম্ম ও সমাজ-পদ্ধতি অনুকূল। প্রথমতঃ, বিবাহাদিতে হিন্দু সমাজে যেরূপ বহুবিচার, মুসলমানদের মধ্যে তাহা নাই। দুইটী মাত্র ভাই সপরিবারে লোকসমাজ হইতে দূরান্তরিত স্থানে উপনিবিষ্ট হইলেও, একের কন্যা অপরের পুত্রে বিবাহ করিতে পারায় বংশরক্ষা ও বৃদ্ধি বিষয়ে কোনও বাধা থাকে না। দ্বিতীয়তঃ জাতি বিচার না থাকাতে উপনিবিষ্ট মুসলমানগণের মধ্যে ও পার্ব্বত্যজাতীয় লোকদিগের সঙ্গেও বিবাহাদি সম্বন্ধ স্থাপনে কোনও রূপ আপত্তি হইবার কথাই নাই। তৃতীয়তঃ—সাহসিকতা না থাকিলে সুদূর স্থানে উপনিবেশ স্থাপনে প্রবর্ত্তনা জন্মে না।

মুসলমানদের তখন দেশে প্রবল প্রতাপ, এবং ভিন্নজাতীয়দেব মধ্যে অল্প সংখ্যকের অবস্থান হেতু পরস্পর সহানুভূতি খুব প্রবল ছিল। তারপর মুসলমানেরা স্বভাবতঃই হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর সাহসী। পুষ্টিকর বিবিধ খাদ্য ইত্যাদির জন্য ও মুসলমানদের সন্তানোৎ-পাদনেও হিন্দু অপেক্ষা অধিকতর শক্তি প্রদান করিয়াছে। যে জাতির এইরূপ বৃদ্ধি ও বিস্তার হইতেছিল, তাহাদের জনসংখ্যা যে অতিমাত্রায় বৰ্দ্ধিত হইবে, ইহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইবার কোনও কারণ নাই। আবার মুসলমান সমাজে মৃত্যু ব্যতীত ক্ষয়ের ও কোন কারণ ছিল না। কোনও নৈতিক বা সামাজিক অপরাধেও তাহাকে মুসলমান আখ্যা পরিত্যাগ করিতে হয় না।

এদিকে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুসমাজে নানা ক্ষয়ের কারণ বিদ্যমান ছিল। কথায় কথায় সামাজিক নির্য্যাতন চলিত। পশ্চিমবঙ্গে এবিষয়ে একটা মহাসুবিধা বর্ত্তমান ছিল এবং এখনও আছে। পশ্চিমবঙ্গে মাতা ভাগীরথী অনেক অনাচার কদাচার শুধিয়া লইতেন, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে প্রায়শ্চিত্তের এই মহাসুবিধাকর উপায়টি বর্ত্তমান না থাকায় অনেকে ধর্ম্মান্তর গ্রহণে অর্থাৎ মুসলমান হইতে বাধ্য হইত।

মুসলমানেরা এদেশে আসিবার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কেহ পতিত হইলে চণ্ডাল, ডোম, হাড়ি প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর অন্তর্ভূত হইয়া যাইত এবং নিম্নতম শ্রেণীতে কাহারও কোন অপরাধের কারণ ঘটিলে একঘরিয়া হইয়া কষ্টে কাল কাটাইতে হইত। তৎপর দণ্ড দিয়া আপন সমাজে উঠিত। মুসলমানেরা এ দেশে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে পতিত ব্যক্তিরা অনায়াসে সেই সমাজে স্থান লাভ করিতে লাগিল। শ্রীমন্মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের কৃপায় বৈষ্ণবধর্ম্ম বঙ্গে সুপ্রচারিত হইলে পর, পতিত উদ্ধারের পথ অনেকটা পরিষ্কৃত হইল। তারপর দেশে দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি উপস্থিত হইলে যখন নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণ অনাহারে মৃতপ্রায় হইত, তখন অনেকস্থলে সম্ভ্রান্ত মুসলমানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রাণরক্ষা করিত। এবং সপরিবারে মুসলমান হইয়া সেই সমাজের পুষ্টি সাধন করিত। পূর্ব্ববঙ্গে এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছে। তাহার অনেক গল্প আছে।

এখানে আর একটি কারণের ও উল্লেখ করিতেছি। তাহাও বিশেষভাবে প্রণিধান-যোগ্য। বিক্রমপুর ও পূর্ব্ববঙ্গে যখন এইরূপ ধর্ম্মবিপ্লবের সৃষ্টি হইতেছিল, সে সময়ে অনেকে বসতিস্থান পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিলেন। এই সব কারণেও জনসংখ্যা হ্রাস পাইয়াছিল। *

বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা দেশে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক বেশী। সে অনুপাতে বিক্রমপুরেও মুসলমানদের সংখ্যা অধিক। আদমসুমারির বিবরণী হইতে জানা যায় যে বাঙ্গালা দেশে চট্টগ্রাম বিভাগ ও ঢাকা বিভাগেই মুসলমানের সংখ্যা অধিক। † বিক্রমপুরে লৌহজঙ্গ, মুন্সীগঞ্জ ও শ্রীনগর, মুসলমান প্রধান, টঙ্গিবাড়ী ও সেরাজদিঘা থানায় হিন্দুর সংখ্যা অধিক। দক্ষিণ বিক্রমপুরে হিন্দু অপেক্ষা মুসলমানের সংখ্যা অধিক।

বিক্রমপুর পরগণা আকারে বৃহৎ না হইলেও জনসংখ্যার দিক্ দিয়া ইহা বাঙ্গালায় অদ্বিতীয়। বিক্রমপুরে বহুজাতীয় লোকের বাস। হিন্দুদের মধ্যেই বিভিন্ন জাতি ও তাহার

জাতি

শ্রেণী বিভাগ আছে। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ, জেলে, কৈবর্ত্ত, বৈষ্ণব, বারুই, বেদিয়া (বাইদা), বেলদার, ভূঁইমালী, ধোপা, গোপ (গোয়ালা), ঝাল-মাল, যুগী, তেলি (কলু) তিলি, কর্ম্মকার, (কামার), কপালি, রাজবংশী, কুমার

* পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমানের সংখ্যাধিক্য—শ্রীপদ্মনাথ দেবশর্ম্মা—সাহিত্য, ১৯শ বর্ষ, ৬০৮ পৃষ্ঠা।

† Within Bengal they (Muslims) predominate particularly in the Chittagong and Dacca Divisions where they form 73·68 and 70·93 percent of the population respectively and also in the Rajshahi Division where they contribute 62·24 percent, of the population. In the Presidency Division they do not contribute even half of the population, their percentage being 47·20, whilst in the Burdwan Division they amount to only 14·14 percent, of the Total. —Census of India, 1931.

(কুম্ভকার), মাহিষ্য, মালাকর, মাঝি, মুচি, নমঃশূদ্র, নাপিত, পাটনি, শঙ্খবণিক, সাহা, সূত্রধর, স্বর্ণকার, তাঁতি, কাঁসারী, পাটিকার, শিকারী, নর (ঋষি)।

বিক্রমপুরে মুসলমানদের মধ্যে সৈয়দ, সেখ, পাঠান, প্রধান। জোলাদের সংখ্যাই খুব বেশী, তাহারা বর্ত্তমান সময়ে আপনাদিগকে কারিকর বলিয়া পরিচয় প্রদান করে। হিন্দু ও মুসলমানের বিভিন্ন জাতির শ্রেণী বিভাগ তাহার ইতিহাস আলোচনা নানা কারণে অপ্রাসাঙ্গিক বোধে পরিত্যাগ করা হইল। অনুসন্ধিৎসু পাঠক এ সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে জানিতে ইচ্ছা করিলে Census of India, 1931, Volume V. Bengal & Sikkim Part I : Report by A. E. Porter, M. A (oxon) I. C. S. গ্রন্থের Chapter XII. Caste, Tribe and Race পাঠ করিতে পারেন। বিক্রমপুরে প্রচলিত ধর্ম্মের মধ্যে হিন্দু, ইস্‌লাম, ব্রাহ্ম ও খৃষ্টান ধর্ম্মাবলম্বী লোকসংখ্যা রহিয়াছে। তবে হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক।

মুসলমান

ধর্ম্ম

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন ইতিহাস

বাঙ্গালা দেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কথাই সুস্পষ্ট ভাবে জানিবার উপায় নাই; বর্ত্তমান সময়ে এ বিষয়ে কিছু কিছু অনুসন্ধান চলিতেছে। স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' দুইখণ্ড ও রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত 'গৌড়রাজমালা' প্রভৃতি গ্রন্থে প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস উদ্ধার করিবার জন্য বিশেষ যত্ন ও চেষ্টা এবং গবেষণার পরিচয় রহিয়াছে। বাঙ্গালাদেশ নদী-মাতৃক-দেশ। এখানকার জল-বায়ুর প্রভাবে এবং নদীর গতি পরিবর্ত্তন হেতু এবং ধ্বংসলীলার জন্য প্রাচীন কীর্ত্তি অধিকাংশ স্থানেই বিলুপ্ত-প্রায়। যাহা কিছু ঐতিহাসিক নিদর্শন থাকিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে, তাহাও বেশীর ভাগ মৃত্তিকাভ্যন্তরে নিহিত। পাহাড়পুরের স্তূপ খনন করিবার পূর্ব্বে কেহ কি কল্পনাও করিতে পারিয়াছিলেন যে বাঙ্গালায় এইরূপ ঐতিহাসিক কীর্ত্তি থাকা সম্ভবপর। পাহাড়পুর স্তূপ ও মহাস্থানগড় খননের ফলে বাঙ্গালার ইতিহাসের কয়েকটি পৃষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়াছে।

প্রাচীন কথা

ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণের মতে বাঙ্গালাদেশের বয়স খুব বেশী নহে। তবে কিছুদিন পূর্ব্বে বঙ্গদেশের যে প্রদেশে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল, সেই প্রদেশেই নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্র শস্ত্র পাওয়া গিয়াছে। সর্ব্ব প্রথম সিংহভূম জেলায় চাঁইবাসা নগরে নব্য প্রস্তর যুগের অস্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে কাপ্তেন বীচিং (Captain Beching) সিংহভূম জেলায় চাঁইবাসা নগরে ও চক্রধরপুরের আটক্রোশ দূরবর্ত্তী একটী নদীতীরে প্রস্তর নির্ম্মিত ছুরিকা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ভিন্সেণ্ট্ বল্ এই সমস্ত স্থান পরীক্ষা করিয়া স্থির করেন যে, আবিষ্কৃত পাষাণখণ্ডগুলি মানব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত ও ব্যবহৃত অস্ত্র। *

সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক ভিন্সেণ্ট স্মিথ্—ভারতে তাম্রযুগের কথার আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—In northern India the first metal to become known

* (১) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস (২) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1868. P. 177

was Copper. Hundreds of curious implements made of pure Copper have been found in the Central provinces, in old beds of the Ganges near Cawnpore, and in other places from Eastern Bengal to Sind in the kurram valley. * They are supposed to date from 2000 B.c. more or less. উত্তর ভারতে, মধ্যপ্রদেশে, কানপুরের নিকটবর্ত্তী গঙ্গার প্রাচীন খাতে, পূর্ব্ব-বঙ্গে, সিন্ধুদেশে এবং কুরাম উপত্যকায় তাম্রযুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। † পূর্ব্ববঙ্গের কোন্ স্থানে তাম্রযুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছিল, ভিন্সেণ্ট স্মিথ তাহার কোনও উল্লেখ করেন নাই।

বাঙ্গলাদেশের প্রাচীন পুরাতত্ত্ব সম্বন্ধে বর্ত্তমান সময়ে একটি নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা হইতেছে মহাস্থানগড়ের আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত একখানি শিলালেখন। মহাস্থানগড় গ্রামটি বগুড়া সহর হইতে প্রায় আট মাইল দূরে অবস্থিত। সেকালের পৌণ্ড্রবর্দ্ধননগর বর্ত্তমানে মহাস্থানগড় নামে পরিচিত। বগুড়া জেলার করতোয়ার শুষ্ক খাতের উপর অবস্থিত। যোগিনীতন্ত্রে করতোয়া নদী প্রাগজ্যোতিষ রাজ্যের পশ্চিম সীমা বলিয়া গৃহীত হইয়াছে।

পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সীমা

কয়েক বৎসর হইল বঙ্গদেশের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদক অনেক প্রত্ন-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। বগুড়া জেলার মহাস্থান, দিনাজপুর জেলার বাইগ্রাম ও হুগলী জেলার মহানাদ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ খনন করিয়া অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক নিদর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই তিন স্থানে যে খোদিত-লিপি, মন্দির ও অন্যান্য প্রত্ন-চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে, তাহা দেখিয়া মনে হয় ঐগুলি খৃষ্টিয় পঞ্চম হইতে সপ্তম খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। ঐ সময় বাঙ্গালাদেশ কিরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল ইহা দ্বারা তাহা সপ্রমাণ হইতেছে।

মহাস্থানগড়ের আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী অক্ষরে লিখিত শিলালেখখানি ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে নভেম্বর বরু ফকির নামে এক ব্যক্তি পাইয়াছিল। সে সময়ে পূর্ব্ব বিভাগের পুরাতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ মিঃ জি, সি, চন্দ্র উহা পুরাতত্ত্ব বিভাগের জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এখন ঐ শিলালেখনখানি কলিকাতা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। শিলালেখনের অক্ষরগুলি মৌর্য্য যুগের ব্রাহ্মী। এই অনুশাসনটি যে মৌর্য্যযুগের তাহা নিঃসন্দেহ।

মহাস্থানগড়ের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি

(১) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস (২) Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1868. P. 177

† The oxford Students History of India, Page, 24.

প্রথমতঃ এই লেখন খানির বিষয় "বঙ্গবাণী" নামক একখানা বাঙ্গালা দৈনিক পত্রে এবং ১৯৩২ খৃষ্টাব্দের ২২ শে এপ্রিল তারিখের "Liberty" নামক ইংরাজী দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রীযুক্ত ডি, আর ভাণ্ডারকর (D. R. Bhandarkar) এই শিলালেখটির নাম দিয়াছেন "মহাস্থানের মৌর্য্য ব্রাহ্মী লেখমালা" (Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan)। এই অসম্পূর্ণ লিপিখানিতে লিখিত আছে,—

মহাস্থানের বা প্রাচীন বঙ্গের ব্রাহ্মীলিপি

১। নেন সংবংগীয়ান (গলদনস) দুমদিন—(মহা)

২। মাতে। সুলখিতে পুড়নগলতে। এতম্।

৩। নিবহিপয়িসতি। সংবংগিয়ান্ (চ দি) নে (তথা)

৪। ধানিয়ম্ (নিবহিসতি) দ (ং) গাতিয়ায়ি কে—দেবা।

৫। তিয়ায়িকসি। সুঅতিয়াইয়কসি পি গংড (কেহি)

৬। ধানি (য়ি) কেহি এস কোঠাগালে কোশম্ (ভর)

৭। (নীয়)

1. nena [Sa*] va[m*] giy [a] nam [Galadanasa] । Dumadina-[maha*]

2. mate । Sulakhite Pudangalate । e[ta] m

3. [ni*] vahipayisati । Samva [m*] giyanaam [cha di*] ne [tatha*)

4. [dha*] niyam । nivahisati । da [m*] g [a*] tiyay [i*] k [e] d [eva*]

5. [tiya*] [yi] kasi । su-atiyayika [si] pi gamda [kehi*]

6. [dhani*] [yi] kehi esa kothagale kosam [bhara*]

7. [niye].

অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে মহাস্থান লিপি যে সময়ে প্রচারিত হয়, সে সময়ে সাধারণে উক্ত লিপি ব্যবহার করিতে জানিতেন। রাঢ়ী বাঙ্গালায় ব্রাহ্মীলিপি বিশেষ

* Epigraphica Indica vol. XXI. Page 84-85. April 1931. Mauryan Brahmi Inscription of Mahasthan by D. R. Bhandarkar.

প্রচলিত ছিল। বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পাহাড়ের লিপি প্রায় উক্ত প্রকার। শুশুনিয়া শৈল-লিপি বাঁকুড়া জেলায় (বর্ত্তমান) দামোদর তীরবর্ত্তী পোখনার (পুষ্করণানগরী) রাজা চন্দ্রবর্ম্মা কৃত লিপি। এই চন্দ্রবর্ম্মা ছিলেন প্রাচীন শূরভূমরাজ। পুষ্করণা-প্রভু চন্দ্রবর্ম্মার সময়ে শূরভূম ও মল্লভূম পুষ্করণা নামে খ্যাত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়। চন্দ্রবর্ম্মা ছিলেন প্রাচীন বাঁকুড়া (পুষ্করণা রাজ্যের) জেলার প্রধান রাজা। তাঁহার সহিত মাড়-বারের সম্বন্ধ প্রমাণিত হয় না। তবে তিনি মহাসামন্ত ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। এ সম্বন্ধে এখানে অধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই।

ডাঃ ভাণ্ডারকর মহাস্থান লিপির এইরূপ ইংরাজী অনুবাদ করিয়াছেন—"To Galadana (Galardana) of the samvamgiyas............(was granted) by order. The Mahamatra from the highly auspicious Pundranagara will cause it to be carried out. (And likewise) paddy has been granted to the Samvamgiyas. The outbreak (of distress) in the town during (this) outburst of superhuman agency shall be tided over. When there is an excess of plenty, this granary and the treasury (may be replenished) with paddy and the gamdaka coins."

এই শিলালেখখানি হইতে জানিতে পারা যায় যে মৌর্য্য যুগের কোন শাসনকর্ত্তা, (তিনি মৌর্য্যবংশীয় নাও হইতে পারেন,) পুণ্ড্রনগরে অধিষ্ঠিত মহামাত্রকে আদেশ দিয়াছিলেন সংবংগীয়দের (people called Samvamgiyas) দুর্ভিক্ষ-জনিত ক্লেশ দূর করিবার জন্য। সম্ভবতঃ সংবংগীয়রা পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরের মধ্যে কিংবা তাহার আশেপাশে বাস করিত। এই দৈব দুর্বিপাকের নিরাকরণার্থ দুইটি ব্যবস্থা অবলম্বনের কথা ইহাতে আছে। প্রথমটির সম্বন্ধে পরিষ্কার ভাবে বুঝিবার কোন উপায় নাই, কেন না প্রথমটির প্রথম পংক্তিটি বিলুপ্ত হইয়াছে। তবে অনুমিত হয় যে সংবংগীয়দের নেতা গলদন (Galadana) কে গংডক মুদ্রা ঋণ দিয়া সাহায্য করিবে। দ্বিতীয় ব্যবস্থাটি হইতেছে ধানাগার বা গোলাঘর হইতে দুর্ভিক্ষ বা পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ধান্যদান করিবে। পুণ্ড্রনগরের মহামাত্রের প্রতি এই আদেশ প্রতিপালন করিবার জন্য নির্দ্দেশ ছিল। আরও লিখিত ছিল যে—যখন পুনরায় সুদিন আসিবে, তখন ঋণদানের মুদ্রা এবং ধান্য গোলাজাত করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ টাকা এবং ধান প্রত্যর্পণ করিতে হইবে।

মৌর্য্যযুগে বাঙ্গালাদেশের স্থান বিশেষে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করিবার জন্য ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় বঙ্গদেশেও যে রাজারা গোলাঘর নির্ম্মাণ করিতেন, ইহা হইতে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। এখনও ভারতে এইরূপ ব্যবস্থা আছে।

মহাস্থান লিপির সাহায্যে আমরা বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বিষয়ের সন্ধান পাই। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই লিপিখানির প্রথম পংক্তিটি পাওয়া যায় নাই। সম্ভবতঃ উহাতে যে রাজা বা শাসনকর্ত্তা এই লিপির প্রচার করেন, তাহার নাম পাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই লিপির অক্ষর ও ভাষা অশোকের অনুশাসনের অনুরূপ। সম্ভবতঃ এই আদেশ লিপির প্রচার মৌর্য্যবংশীয় কোন নৃপতিই করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশে খৃষ্ট পূর্ব্ব তৃতীয় শতাব্দীতে মাগধী প্রাকৃত প্রচলিত ছিল।

এই লিপি হইতে ইহা অনুমিত হয় যে পুণ্ড্রবর্দ্ধন সে সময়ে মৌর্য্যরাজাদের অধিকারভুক্ত ছিল। এ সময়ে বঙ্গ (বিক্রমপুর) পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্ভূক্ত ছিল না। দুইটি রাজ্যই সমভাবে প্রসিদ্ধ ছিল।

বর্ত্তমান সময়ে **বঙ্গ** বলিতে আমরা সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝিয়া থাকি। এখন রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ, কেহ বলে না। বঙ্গদেশ বা বাঙ্গালাদেশই বলিয়া থাকে এবং তাহা সমগ্র বিভাগকেই বুঝাইয়া থাকে। কিন্তু প্রাচীন কালে বঙ্গদেশ ঢাকা এবং চট্টগ্রাম বিভাগকেই বুঝাইত। হেমচন্দ্র তাঁহার "অভিধানচিন্তামণি" নামক বিখ্যাত গ্রন্থে বঙ্গাস্তু হরিকেলিয়—বঙ্গ বা হরিকেলিয় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিং (Itsing) ইউহিং (Wuhing) প্রভৃতি ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত 'হরিকেল' দেশে আসিয়াছিলেন। ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে রক্ষিত সচিত্র 'অষ্টসহস্রপ্রজ্ঞাপারমিতা' নামক হস্তলিখিত গ্রন্থেও হরিকেলের নাম রহিয়াছে। একাদশ শতাব্দীর চোল শিলালিপি রাজেন্দ্র চোলের তিরুমালই পাহাড়ের লিপি এবং চেদি কর্ণদেবের গোহারোয়া (Goharwa) লিপিতে বঙ্গদেশের উল্লেখ আছে,—যেমন বাঙ্গালা দেশম্। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে **বাঙ্গালা দেশ 'বাঙ্গলা'** নামে পরিচিত হইতে থাকে এবং মুসলমান রাজত্বকালে **বাঙ্গালা** নামে আখ্যাত হয়।*

যে **বঙ্গ** এক সময়ে কেবল পূর্ব্ববঙ্গকেই বুঝাইত, সেই বঙ্গ নাম বর্ত্তমানে সমগ্র বঙ্গদেশকে বুঝাইতেছে। ইংরাজেরা যে Bengal বা বেঙ্গল বলেন তাহার উৎপত্তি হইতেছে **বাঙ্গালা** বা **বাঙ্গলা** শব্দ হইতে। † কাজেই বঙ্গদেশের বাণান সম্পর্কে **বাঙ্গালা, বাঙ্গলা** যে কোন একটিই ব্যবহার করা যাইতে পারে।

* The Vangas By B. C. Law. Page 57: Indian culture July 1934,

† Vanga which at one time meant Eastern Bengal has thus now given its name to the entire province of modern Bengal, and the English rendering of the name is certainly to be derived from old Bangala or Bangla.

(1) In a Nalanda inscription recently edited by Mr. N. G. Majumder (E. p. Ind Vol XXI, Pt. P. p. 91 foll. the name *Vangala desa* appears.

(2) For early references to Vanga, see Leir, Pre Dravidian dans-Inde.

এখন কথা হইতেছে যে বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাসের আরম্ভ কিরূপে করা যাইতে পারে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিক্রমপুরের অতি প্রাচীন ইতিহাসের সহিত গৌড় ও বঙ্গের ইতিহাস বিজড়িত। আবার বাঙ্গালার ইতিহাস যে কেবল বঙ্গদেশ—এখানে বঙ্গদেশ কথাটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করিতেছি। বঙ্গদেশের ইতিহাস কেবল বাঙ্গালাদেশের সীমাতেই আবদ্ধ রাখিলে চলিবে না। ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সহিত এবং ভারত সীমার বাহিরেও নানা স্থানের সহিত বাঙ্গালার ইতিহাসের নানা সম্বন্ধ বর্ত্তমান ছিল। * বিক্রমপুরের ইতিহাসের সহিত প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাসের অখণ্ড যোগ রহিয়াছে। এক সময়ে বিক্রমপুর ছিল প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী, কাজেই বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা না করিলে বিক্রমপুরের ইতিহাস আলোচনা করা যাইতে পারে না। এজন্য আমরা প্রাচীন বাঙ্গালার ইতিহাস ও আলোচনা করিব। সে আলোচনা যেমন সঙ্গত, তেমনি বিক্রমপুরের সহিত তাহা একসূত্রে বদ্ধ। পাঠকগণের পক্ষেও ধারাবাহিকতার দিক্ দিয়া তাহা বুঝিবার পক্ষে সহজ হইবে।

বিগত পঁচিশ বৎসরের মধ্যে "তাম্রপট্টলিপি" ও "শিলালিপি" প্রভৃতি অনেক আবিষ্কৃত হওয়ায় প্রাচীন ভারতেরও বাঙ্গালার ইতিহাসের সম্বন্ধে অনেক নূতন নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে। আমাদের দেশে লিখিত ইতিহাস নাই, এজন্য জনশ্রুতি, প্রাচীন-সাহিত্য, প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য মূর্ত্তি ও মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ হইতে যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহা হইতেই ইতিহাসের মূল তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে হয়।

বৌদ্ধযুগ ভারতের বাহ্য সম্পদের উন্নতির যুগ। ভারতের বিবিধ বৈচিত্র্য, প্রাকৃতিক বিভাগ, জাতি বিভাগ এবং প্রচলিত ধর্ম্ম ও সমাজের পার্থক্য ও প্রভেদ দূর করিয়া দিয়া ভারতীয় সভ্যতাকে ঐক্য সূত্রে বাঁধিবার মূলে এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম্ম যেরূপ মহৎ কার্য্য করিয়াছিল, সেইরূপ কার্য্য এ পর্য্যন্ত কোনও ধর্ম্ম পৃথিবীতে করিতে পারিয়াছে কি না সন্দেহ। এই বৌদ্ধ যুগের প্রভাবেই **বৃহত্তরবঙ্গ ও বৃহত্তরভারত** গড়িয়া উঠিয়াছিল।

(3) History of the Bengali Language by B C. Majumder P P 38-41.

(4) Glimpses of the ancient relation of Bengal with the Tamils are reflected in atleast one place name of ancient Bengal--Tamralipti which was also called Damalipti or Damilitti, i e, the city of the Damala people. The Damalas are the same as the Tamala people or the Tamila and Bengal must have once in ancient days been a home of those people.

H. P. Sastri, Manasi, Vaisakh. 1321 Indian Culture—July 1934. Page 58.

বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গৌতম, বর্ত্তমান বাস্তিজেলার উত্তরে নেপাল তরাইয়ে অবস্থিত প্রাচীন কপিলবস্তু নগরের নিকটবর্ত্তী লুম্বিনী উদ্যানে জন্মগ্রহণ করেন। গৌতম বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্র অধ্যয়ন ও অস্ত্রবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষালাভ করেন, কিন্তু এসকলের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল না। সাংসারিক বিষয়ে তিনি একান্ত উদাসীন ছিলেন। সিদ্ধার্থের পিতা শুদ্ধোদন পুত্রকে সংসারানুরাগী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং এই উদ্দেশ্যে শাক্যদণ্ডপাণি নামে একজন ছোট রাজার যশোধারা [ইনি বিম্বা, গোপা, ভদ্দকসেনা প্রভৃতি নামে ও আখ্যাত হইয়া থাকেন।] নামে এক সুন্দরী ও গুণবতী কন্যার সহিত গৌতমের বিবাহ দেন। ক্রমে তাঁহার একটি পুত্র ও হইল, তখন সিদ্ধার্থের মনে হইল যে তিনি ক্রমশঃই সংসারের মায়াময় আকর্ষণের মধ্যে জড়াইয়া পড়িতেছেন। দুঃখময় সংসারের বিবিধ প্রকারের দুঃখ ও নির্য্যাতন হইতে জীবের পরিত্রাণ সাধনোদ্দেশ্যে একদিন রাত্রিকালে যখন সমুদয় জগৎ নিস্তব্ধ, প্রিয়তমা পত্নী শিশুটিকে কোলে লইয়া নিশ্চিন্ত আরামে নিদ্রা যাইতেছেন, তখন ধীরে-নীরবে কাহাকেও কিছু না কহিয়া তাঁহার একমাত্র বিশ্বস্ত সারথি ছন্দককে সঙ্গে লইয়া বিশ্বমানবের কল্যাণ-কামনায় সিদ্ধার্থ সংসার ত্যাগ করিলেন। সেই তাঁহার 'মহাভিনিষ্ক্রমণ'।

গৌতম সিদ্ধার্থ ও বৌদ্ধ ধর্ম্ম

অতঃপর তিনি কঠোর তপস্যা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শরীরকে যতদূর কষ্ট দিতে হয় দিলেন,—তাঁহাব অস্থি চর্ম্ম সার হইল, তবু অভীপ্সিত ফল লাভ হইল না। এ সময়ে তাঁহার মনে হইল যে শরীরকে কষ্ট দেওয়া বৃথা। এইরূপ অসহায় অবস্থায় তিনি একাকী ভ্রমণ করিতে করিতে গয়ার নিকটবর্ত্তী উরুবিল্ব নামক স্থানে এক বোধিদ্রুম মূলে বসিয়া গভীর ধ্যানে মগ্ন হইলেন। এইখানে তাঁহার জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইল। তিনি প্রবুদ্ধ হইলেন। গৌতম দুঃখময় মানবজীবনেব মুক্তির প্রকৃত সমাধান নির্ব্বাণ লাভের সন্ধান পাইলেন। সেইদিন হইতেই তিনি 'বুদ্ধ' অর্থাৎ 'জ্ঞানী' নামে পরিচিত হইলেন। যে বোধিদ্রুম বা অশ্বত্থ বৃক্ষের নীচে বসিয়া তিনি বুদ্ধত্বলাভ করেন, পরবর্ত্তীকালে সেখানে একটি সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছিল। সেই মন্দির এখনও বর্ত্তমান আছে, ঐ স্থান বুদ্ধগয়া নামে পরিচিত।

গৌতমের বুদ্ধত্বলাভ

বুদ্ধদেব লোকালয়ে ফিরিয়া আসিলেন এবং তাঁহার ধর্ম্মমত প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার ধ্যান ও ধারণার ফলে বিশ্বমানব বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ লাভ করিল। তাঁহার প্রধান কথা এই যে বাসনা ও মোহ দূর করিতে পারিলেই সকল কষ্ট দূর হইয়া যাইবে। বাসনা ও মোহ জয় করিবার যে পথ তিনি প্রদর্শন করিয়াছিলেন তাহাতে তপস্যার বাড়াবাড়ি বা জ্ঞানের বাগজাল ছিল না ; যোগের ঋদ্ধিরও কোন স্থান ছিল না। তিনি লক্ষ্যকে ভুলিয়া উপায়কে লইয়াই থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহার প্রধান কথা এই

ছিল যে—মানুষ মাত্রেই নির্ব্বাণ মুক্তির অধিকারী। সেখানে জাতি বা বর্ণের কোন ভেদ নাই। বুদ্ধদেব উপবাসাদি কঠোর ব্রতসাধন নিষেধ করিয়াছেন এবং আলস্য, আমোদ-প্রমোদ বা ভোগ বিলাসের ও বিরোধী ছিলেন। এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী পথই তাঁহার মতে অবলম্বনীয় ছিল। 'অহিংসা পরমধর্ম্ম' এই বাণীই তাঁহার ধর্ম্মের মূল সূত্র।

আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব্ব ৪৮৩ অব্দে বুদ্ধের দেহত্যাগ হয়। বুদ্ধদেবের মৃত্যু সময় তাঁহার প্রধান শিষ্য আনন্দকে তিনি বলিয়াছিলেন—আমার উপদেশ সমূহ দ্বারাই তোমরা পরিচালিত হইও। এই জন্য বুদ্ধের মৃত্যুর ছয়মাস পরে বৌদ্ধদের মধ্যে যাহারা প্রধান ছিলেন, তাঁহারা রাজগৃহে সমবেত হইয়া (রাজগির) বুদ্ধের যে সব বচন তাঁহাদের স্মৃতি-পথে বর্ত্তমান ছিল সে সমুদয় লিখিয়া ফেলিলেন। এইরূপে বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। এই ধর্ম্মগ্রন্থ (১) বিনয়পিটক (২) সূত্রপিটক (৩) অভিধর্ম্মপিটক এই তিনভাগে বিভক্ত। একসঙ্গে এই তিন পিটক ত্রিপিটক নামে অভিহিত। বর্ত্তমান সময়ে সংস্কৃত, পালি, চীন প্রভৃতি ভাষায় ও ত্রিপিটক দেখিতে পাওয়া যায়। তবে পালিভাষায় লিখিত ত্রিপিটকই প্রধান বলিয়া গণ্য।

বুদ্ধদেবের সময় হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হইলেও সম্রাট অশোকের সময় হইতেই উহা দেশে বিদেশে বিস্তৃত হয়। চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক ৩২৫ খৃঃ পূঃ চাণক্য নামে তিনি তক্ষশিলাবাসী এক ব্রাহ্মণের সাহায্যে মগধের নন্দরাজকে পরাজিত করিয়া মগধের সিংহাসনে বসেন। চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় ক্ষমতাশালী সম্রাট ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতি বিরল। এ সময়ে গ্রীকবীর আলেকজাণ্ডার পশ্চিম ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। তিনি পঞ্জাব হইতে গ্রীকদিগকে পরাজিত ও বিতাড়িত করিয়া সমস্ত উত্তর ভারত জয় করিয়াছিলেন সম্ভবতঃ দাক্ষিণাত্য-প্রদেশের কতকাংশ ও তাঁহার সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। চন্দ্রগুপ্তের রাজধানী পাটলিপুত্র (পাটনা) সে সময়ে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি প্রধান সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল। চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র বিন্দুসার প্রায় খৃষ্ট পূর্ব্ব ৩০০ অব্দে সিংহাসন লাভ করেন। গ্রীক্ ঐতিহাসিকগণ তাঁহার নাম দিয়াছিলেন—অমিত্রখাদ (Amitrochades) বা শত্রুজয়ী। তাঁহার রাজত্বকালে রাজ্যের সর্ব্বত্র অশান্তি উপস্থিত হইয়াছিল। একবার তক্ষশিলায় বিদ্রোহ হওয়ায় বিন্দুসার তাঁহার পুত্র অশোককে ঐ প্রদেশের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। অশোক সহজেই সেই বিদ্রোহ দমন করেন। পরে তিনি উজ্জয়িনীর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায় খৃষ্টপূর্ব্ব ২৭৪ অব্দে বিন্দুসারের মৃত্যু হয়।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য্য

বিন্দুসারের মৃত্যুর পর মহানুভব সম্রাট্ অশোক, মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এ সময়ে কলিঙ্গদেশ, মৌর্য্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত হইয়াছিল। অশোক এক বিশাল সাম্রাজ্যের

অধিকারী ছিলেন। তাঁহার রাজ্য বর্ত্তমান ব্রিটিশ ভারত অপেক্ষা ও বিস্তৃত ছিল। উত্তরে পারস্যের সীমান্ত প্রদেশ, দক্ষিণে মহীশূর রাজ্যের শ্রাবণ বেলগোলা (Sravana Belgola) পর্য্যন্ত। গ্রীসদেশীয় লেখকগণ উল্লেখ করিয়াছেন যে, চন্দ্রগুপ্তের মগধরাজ্যের পূর্ব্ব দিকে 'গঙ্গারিডি' নামে একটি রাজ্য ছিল। তাহার মধ্য দিয়া গঙ্গা প্রবাহিত হইতেন। গঙ্গরিডির কথা প্রসঙ্গ ক্রমে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কলিঙ্গযুদ্ধের পর অশোকের ধর্ম্মমতের পরিবর্ত্তন হয়। অশোক কলিঙ্গ যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রথম জীবনে দেবদেবীর উপাসক (Deva-Worshipper) ছিলেন। কি মানুষ, কি জীবজন্তু হত্যা সম্বন্ধে তাঁহার কোনরূপ দ্বিধা ছিল না। কিন্তু কলিঙ্গযুদ্ধের পর হাজার হাজার লোকের মৃত্যুতে তাঁহার মনের পরিবর্ত্তন ঘটে, সে সময়ে উপগুপ্ত নামক একজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তাঁহার নিকট তিনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন এবং উহা প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। সে সময়ে তিব্বত হইতে সিংহল পর্য্যন্ত বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্গদেশেও সে সময়েই বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল। সম্রাট অশোক বাঙ্গালাদেশের নানাস্থানে স্তূপ বা বৌদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। অশোকের অনুশাসন (পর্ব্বতগাত্রে খোদিত যে লিপি (Rock-Edicts) বা খোদিত লিপি সমূহ হইতে জানা যায় যে তিনি কত বড় মহৎ এবং প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন।

সম্রাট অশোক ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রচার

অশোকের সময়ে যে বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে এখন আর সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। মহাস্থানগড়ের মৌর্য্যব্রাহ্মী শিলালিপি হইতেও প্রমাণিত হইয়াছে যে মৌর্য্যরাজগণের প্রভাব বাঙ্গালাদেশ (ব্যাপক অর্থে) পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এবং বৌদ্ধধর্ম্ম বঙ্গ (পূর্ব্ববঙ্গে) দেশে প্রচারিত হইয়াছিল।

এজন্যই পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। সম্রাট অশোকের পরবর্ত্তী কালেও বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত হইয়াছিল। মৌর্য্য সাম্রাজ্য আনুমানিক খৃঃ পূর্ব্ব ৩২১—১৭৪ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

আনুমানিক খৃষ্ট পূর্ব্ব ২৩৬ হইতে ১৮৫ খৃষ্ট পূর্ব্ব সময় পর্য্যন্ত ধীরে ধীরে মৌর্য্য নৃপতি-গণের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইতে আরম্ভ করিল। মৌর্য্য বংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রথকে তাঁহার ব্রাহ্মণ সেনাপতি পুষ্যমিত্র বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসনে বসিলেন। ইঁহার প্রতিষ্ঠাপিত রাজবংশ শুঙ্গবংশ নামে পরিচিত।

মৌর্য্যরাজগণের পতনের পর ভারতবর্ষের ইতিহাসের ধারা নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নৃপতিগণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছিলেন। উত্তর ভারতে একে একে শুঙ্গ, কাণ্ব প্রভৃতি অনেকেই প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সময়ে

মৌর্য্যরাজাদের রাজত্বকালে দেশের মধ্যে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্মের প্রভাব এবং সভ্যতাও অনেকটা নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। মৌর্য্য নৃপতিরা উদারমতাবলম্বী ছিলেন। তাঁহারা অন্য ধর্ম্মাবলম্বীদের উপর কোন অবিচার করেন নাই। কিন্তু রাজধর্ম্ম বৌদ্ধ বা জৈন হওয়ায় স্বাভাবিক ভাবেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম খর্ব্ব হইতে আরম্ভ করে।

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন ও বোধ হয় মৌর্য্যরাজাদের পুরোহিতবংশীয় ছিলেন। রাজপ্রাসাদে বৈদিক ক্রিয়া-কলাপ লোপ পাইয়াছিল। পুরোহিত-বংশ নামে মাত্র পুরোহিত ছিলেন। পুষ্যমিত্র রাজা হইলে পর ব্রাহ্মণেরা তাঁহাদের পূর্ব্ব গৌরব ফিরিয়া পাইয়াছিলেন।

পুষ্যমিত্রের রাজত্বকালে ভারতবর্ষের ইতিহাসে অনেক কিছু ঘটনা ঘটিয়াছিল। গ্রীকেরা ভারত আক্রমণ করেন—পুষ্যমিত্র সেই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাহুবলের প্রভাবে পুষ্যমিত্র গ্রীক্‌রাজাকে ভারতে গ্রীক্ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্রের রাজধানী পাটলীপুত্র ছিল। তাঁহার সাম্রাজ্য দক্ষিণে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মগধ, তীরভুক্তি, কোশল, অযোধ্যা ইত্যাদি তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। হয়ত উত্তর-পশ্চিমে জলন্ধর তাঁহার রাজ্যের সীমা ছিল। মনে হয়, পঞ্জাব এবং সুরাষ্ট্র ছাড়া সমগ্র **উত্তরাপথই** তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিল।

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ

গ্রীক্‌দের সহিত যুদ্ধে জয়ী হইয়াও বিদর্ভরাজ যজ্ঞসেন বিদর্ভকে পরাজিত করিয়া পুষ্যমিত্র নিজেকে সমগ্র উত্তরাপথের রাজচক্রবর্ত্তী বলিয়া ঘোষণা করিলেন ও নিজের এই প্রাধান্য বা সার্ব্বভৌমত্বের প্রতিষ্ঠার জন্য অশ্বমেধের অনুষ্ঠান করিলেন। অশোক মহারাজা যজ্ঞের পশু বিনাশ নিবারণ করিয়াছিলেন, পুষ্যমিত্র অশ্বমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া যাজ্ঞিক-ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিলেন।

পুষ্যমিত্রের যজ্ঞাশ্ব একদল গ্রীক্ অশ্বারোহী সৈন্য বলপূর্ব্বক ধরিয়াছিল। অশ্বের রক্ষক পুষ্যমিত্রের পৌত্র, বসুমিত্র তুমুল যুদ্ধ করিয়া বুন্দেলখণ্ডের নিকট সিন্ধু-তীরে তাহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন।—পুষ্যমিত্র অনেক বৌদ্ধশ্রমণদিগকে হত্যা করিবার আদেশ প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়া ও তাঁহাদের বিহারগুলিকে পোড়াইয়া দিতেন বলিয়া কথিত আছে। অতিরঞ্জিত হইলেও পুষ্যমিত্র যে বৌদ্ধদের প্রতি অত্যাচার করিতেন, সে বিষয়ে আমরা অস্বীকার করিতে পারি না। ভারতের হিন্দুরাজাদের রাজত্বকালে এইরূপ অত্যাচার হইয়াছে।

পুষ্যমিত্র প্রায় ১৮৫ খৃঃ পূঃ হইতে ১৪৯ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার পরে অগ্নিমিত্র রাজা হন। শুঙ্গ বংশের নবম রাজা ভাগবত বত্রিশ বৎসর রাজত্ব

করিয়াছিলেন। ভাগবতের পরবর্ত্তী নৃপতি দেবভূতি দশ বৎসর রাজত্ব করিবার পর তাঁহার অমাত্য বাসুদেব কাণ্বর হস্তে নিহত হন। এই ভাবে প্রায় ৭৫ খৃঃ পূর্ব্বে শুঙ্গ রাজ্যের পতন হয়।

শুঙ্গ রাজত্বের প্রভাব বঙ্গ রাজ্য পর্য্যন্তও বিস্তৃত ছিল।—তাহার প্রমাণ আমরা পাইতেছি। তবে সে সময়ে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজারাই বিভিন্ন অংশে প্রভাবান্বিত ছিলেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে শুঙ্গ রাজত্বের প্রভাবে এক নব যুগের সৃষ্টি হইয়াছিল।—সে সময়ে বৈদিক ধর্ম্মের নব অভ্যুত্থান হইয়াছিল, সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছিল ও শিল্পকলার উৎকর্ষ সাধন হইয়াছিল। পতঞ্জলি এই সময়ে তাঁহার মহাভাষ্য লিখেন ও ভারতের কারু-শিল্পীরা পাথরেতে কাঠের কাজের অনুকরণ করিয়া সাঁচী ও ভরহুত স্তূপের রেলিং ও তোরণ-দ্বার নির্ম্মাণ করিয়া পৃথিবীতে শিল্পনৈপুণ্যের অত্যুৎকৃষ্ট আদর্শ রক্ষা করিয়া গিয়াছেন। গীতার ধর্ম্ম, জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। এমনকি গ্রীকেরাও ভারতের ভাগবতধর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিলেন ও তাহাতে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন।

শুঙ্গ রাজাদের প্রভাব

কাণ্ব ও আন্ধ্র বংশীয় রাজাদের বিষয়ে আমাদের বিশেষ আলোচনা করিবার নাই।—ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে শক, পহ্লব, কুষণ বা কুষাণ প্রভৃতি রাজগণের প্রভাব নানা সময়ে ভারতের নানা দিকে বিস্তৃত হইয়াছিল।

মৌর্য্যসম্রাট অশোকের পর কুষণ-নৃপতি কনিষ্ক ভারতবর্ষে অসাধারণ প্রভাবশালী হইয়াছিলেন। কনিষ্কের কাল লইয়াও পণ্ডিতদের মধ্যে অনেক দিন ধরিয়া বিতর্ক চলিতেছে। তবে ইহাদের মধ্যে দুইটি প্রধান দল আছে। প্রথম দলের মতে তিনি ৭৮ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনাধিরোহণ করিয়াছিলেন এবং তিনিই শকবংশের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয় দলের মতে তাঁহার রাজ্যের আরম্ভ ১২৫ খৃষ্টাব্দের পরে, এমনকি ১৩৮ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছিও হইতে পারে।

কনিষ্ক রাজা হইবার কিছুকাল পরেই কাশ্মীর রাজ্য অধিকার করেন। কনিষ্ক এখানে অনেক বৌদ্ধবিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন ও কনিষ্কপুর নামক একটি নূতন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগর এক্ষণে সামান্য পল্লীতে পরিণত হইয়াছে। মহারাজ কনিষ্ক পাটলিপুত্রের তদানীন্তন নৃপতিকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজসভার রত্নস্বরূপ বৌদ্ধ শ্রমণ অশ্বঘোষকে লইয়া গিয়াছিলেন।—এই অশ্বঘোষ বৌদ্ধধর্ম্মের ও সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে নানাদিক্ দিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া গিয়াছেন। তিনি দার্শনিক, কবি এবং পরম বিদ্বান্ ও সংসারত্যাগী বৌদ্ধ-ভিক্ষু ছিলেন।

কুষণ রাজা কনিষ্ক

কনিষ্ক নানা দেশ জয় করেন। ভারতবর্ষের নানা স্থানে তাঁহার যে সকল উৎকীর্ণ লিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে, তাঁহার সুবিশাল সাম্রাজ্য পশ্চিমে সুংলিং পর্ব্বতশ্রেণী হইতে পূর্ব্বে পাটলীপুত্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে বিন্ধ্যগিরি তাঁহার রাজ্যের সীমা ছিল। খাসগড়, ইয়ারখন্দ, খোটান বা ফিবিস্তান, বাহ্লীক, কাবুল, পঞ্চনদ, সিন্ধু, মথুরা, কৌশাম্বী, বারাণসী, পাটলীপুত্র, ইত্যাদিও তাঁহার সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল।

কনিষ্কের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। মহারাজা অশোকের পরেই কনিষ্কের নাম বৌদ্ধ-জগতে গৌরবের সহিত উল্লিখিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার অদম্য উৎসাহেই বৌদ্ধধর্ম্ম মধ্য ও উত্তর এশিয়ায় প্রচারিত হইয়াছিল। এ সময়ে ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম নিষ্প্রভ হইয়া পড়িয়াছিল। বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সঙ্ঘের বিজয়-বাণী আবার চারিদিকে বিঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু এ সময়ে বৌদ্ধদের মধ্যে বিভিন্ন দলের সৃষ্টি হইয়াছিল।—তাঁহার সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের মধ্যে **হীনযান ও মহাযান** এই দুইটি বিরোধী দলের সৃষ্টি হয়। মহাযান মতাবলম্বীরা প্রাচীনপন্থীদিগকে হীনযান নাম দিলেন। তাঁহারা নবীন পন্থাটিকে প্রাচীন পন্থা হইতে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়াছিলেন।—

মহাযান ও হীনযান

এই মহাযান মতাবলম্বীরাই সর্ব্ব প্রথম বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাকে দয়ার অবতার রূপে দেবতার আসনে বসাইয়া পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। মহাযান মতাবলম্বীরা ভক্তিকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দান করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে ভক্তির প্রাধান্য বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বকে **দেবতাবোধে পূজা করা, মূর্ত্তি পূজার প্রবর্ত্তন,** বুদ্ধত্ব লাভ করাই জীবের চরম লক্ষ্য মনে করেন।

গৌতমের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ ও মন্দিরে স্থাপন

ঐতিহাসিকেরা বৌদ্ধধর্ম্মের এইরূপ পরিবর্ত্তনের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রভাব লক্ষ্য করিয়া আসিতেছেন। হিন্দুর তেত্রিশ কোটি দেবতার ও গীতার ভাগবৎ ধর্ম্মের প্রভাব বৌদ্ধেরা শেষ পর্য্যন্ত কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। অশ্বঘোষ ও পরে মহাযানসম্প্রদায়-ভুক্ত হইয়াছিলেন। এবং গ্রন্থাদিও রচনা করেন।

মহাযান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা শাস্ত্রকর্ত্তা ছিলেন **নাগার্জ্জুন**। ইনি অশ্বঘোষের কিছু পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। 'মাধ্যমকারিকা' নামক মহাযান ধর্ম্মগ্রন্থ ইনিই প্রণয়ন করেন। কনিষ্কের সময় বৌদ্ধদের চতুর্থ বৌদ্ধসভার অধিবেশন হইয়াছিল। কাশ্মীরে রাজধানীর নিকট কুন্দলবন নামক সঙ্ঘারামে এই সভার অধিবেশন হয়। পাঁচশত বৌদ্ধ-শ্রমণ এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভায় বৌদ্ধধর্ম্মশাস্ত্র সম্বন্ধে আলোচনা হয়। আলোচনার ফলে **ত্রিপিটক** নামক বৌদ্ধ শাস্ত্রের প্রামাণিক ব্যাখ্যাস্বরূপ অনেক গ্রন্থাদি

বিরচিত হইয়াছিল। এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে এই সভার অধিবেশনের পর ঐ সকল গ্রন্থ বড় বড় তাম্রপাত্রে খোদিত হইয়া স্তূপ সমূহের অভ্যন্তরে সুরক্ষিত হইয়াছিল।

সম্রাট কনিষ্কের রাজত্বকালে গান্ধার-শিল্প বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। গান্ধার দেশে এই শিল্পের সৃষ্টি হইয়াছিল বলিয়া ইহা **গান্ধার-শিল্প** নামে পরিচিত।—ইতিহাস পাঠক মাত্রেই জ্ঞাত আছেন যে প্রায় তিনশত বৎসর কাল—গান্ধার দেশ গ্রীকদের অধীনে ছিল। তাহারই ফলে ঐ স্থানে একটি নূতন শিল্পের প্রভাব মূর্ত্ত হইয়া উঠে। কনিষ্কের রাজত্বকালের কতকগুলি উৎকৃষ্ট শিল্পনিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। গান্ধার-শিল্পিরা অর্থাৎ ভাস্করেরা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের অনেক মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

গান্ধার-শিল্প

কনিষ্ক প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার রাজসভা শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, কবি প্রভৃতির দ্বারা সমলঙ্কৃত ছিল। বসুমিত্র, পার্শ্ব, অশ্বঘোষ, চরক, সঙ্ঘরক্ষ, গ্রীক্-পূর্ত্তবিদ্যাবিশারদ এ্যাগিস্যাইলোস্ (Agesailos) প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ তাঁহার সভার গৌরব বর্দ্ধন করিতেন।

বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা এই যে এত বড় একজন সম্রাটের সম্বন্ধে হিন্দুসাহিত্য ও ইতিহাস কোনরূপ উদারতা দেখান নাই। কেবল কহ্লনের "রাজতরঙ্গিণী" নামক কাশ্মীরের ইতিহাসে কনিষ্কের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত ননিগোপাল মজুমদার মহাশয় বলেন—"খৃষ্টিয় দ্বিতীয় বা তৃতীয় শতাব্দীতে **বাঙ্গালাদেশ সম্ভবতঃ কুষাণ** রাজবংশের শাসনাধীনে ছিল। ঐ যুগের কয়েকটি মুদ্রা উত্তরবঙ্গে এবং হুগলি জেলায় মহানাদ গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছে।"

বিক্রমপুরে মহাযানপ্রভাব বিশেষ ভাবে বিদ্যমান ছিল। কি ভাবে কেমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মে মূর্ত্তি-নির্ম্মাণের ও মূর্ত্তিপূজার প্রথা প্রবর্ত্তন হইল, সেকথা বলিবার জন্যই আমরা এখানে কনিষ্কের বিষয় আলোচনা করিলাম।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর, গুপ্ত বংশের অভ্যুদয় হয়। কুষণ বা কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের পর এবং গুপ্তবংশের অভ্যুদয় কাল পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যবর্ত্তী কালের ইতিহাসের সহিত, আমাদের কোনও সংস্রব নাই, কাজেই উহার সম্বন্ধে আমাদের আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক বোধে পরিত্যক্ত হইল। গুপ্তসাম্রাজ্যের কালকে ভারতের সুবর্ণযুগ বলিয়া আখ্যাত হইয়া থাকে। গুপ্ত রাজত্ব হইতে অনুমান খৃষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে বাঙ্গালার ইতিহাসের কিছু কিছু মালমসলা পাওয়া যায়।

গুপ্তবংশ

গুপ্তরাজবংশ

খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দীর প্রথম ভাগে গুপ্ত রাজবংশ নামে এক নূতন রাজবংশ মগধের সিংহাসনে বসিয়াছিলেন। (আনুমানিক ৩৫০—৭৫০ খৃষ্টাব্দ) এ সময়ে অনেক শক্তিশালী নৃপতির আবির্ভাব হওয়ায় হিমালয় হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদার উপকূল পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র ইঁহাদের প্রভাব বিস্তৃত হয়। মৌর্য্যযুগে ভারতবর্ষ যেমন এক বিরাট ঐক্যবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া রাষ্ট্রীয়শক্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, এই যুগেও তেমনি ভারত আর একবার বিরাট রাষ্ট্রীয়শক্তি-গঠনে অর্থাৎ এক বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের উন্নতি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের পুনরায় অভ্যুত্থান, ললিতকলার শ্রীবৃদ্ধি ভারতের বাহিরে ভারতের জ্ঞান, বিদ্যা, সভ্যতার ও ধর্ম্ম প্রচারিত হইয়া **বৃহত্তর ভারতের** সৃষ্টি করিয়াছিল।

গুপ্ত রাজাদের রাজত্বকাল হইতে ইতিহাস লিখিবার কিছু কিছু উপকরণ পাওয়া যায়। তাঁহাদের উৎকীর্ণ শিলালেখ, তাম্রলিপি হইতে মুদ্রা এবং বৌদ্ধ শ্রমণ ফাহিয়ানের-ভারত ভ্রমণ হইতে গুপ্ত রাজাদের কীর্ত্তিকলাপ প্রভৃতি বিশেষরূপে জানা যায়। এই গুপ্ত রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম **গুপ্ত**। ইঁহাকে গুপ্তলেখমালায় 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত দেখা যায়। ইনি মগধের কাছাকাছি ২৭৫ খৃষ্টাব্দে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্তরাজ মহারাজ শ্রীগুপ্তের সময়ে মগধেশ্বর কে ছিলেন তাহা জানা যায় না; সম্ভবতঃ মৌর্য্যর, ভারশিব বা বাকাটক বংশের কেহ কেহ সেখানে রাজত্ব করিতেছিলেন, কিন্তু এ বিষয়ে তেমন কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

মহারাজ গুপ্তের পুত্র ঘটোৎকচগুপ্ত পিতার ন্যায় একজন সামন্ত নৃপতি মাত্র ছিলেন। মগধ অঞ্চলে তাঁহার তেমন কোন প্রভাব ছিল না। কিন্তু ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র প্রথম **চন্দ্রগুপ্ত** ৩২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন এবং আপনাকে স্বাধীন নৃপতি বলিয়া ঘোষণা করেন। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করেন। এই প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতেই গুপ্ত বংশের শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে। এই শ্রীবৃদ্ধির মূলে লিচ্ছবি জাতির নাম করাযাইতে পারে। লিচ্ছবি জাতি প্রাচীনকালে বৈশালী রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম্মের প্রভাব সময়ে লিচ্ছবি জাতি একটি প্রতিষ্ঠাপন্ন জাতি ছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এই লিচ্ছবি বংশের এক রাজকন্যা মহাদেবী কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। পাটলীপুত্র লিচ্ছবিজাতির অধিকারভুক্ত ছিল। কুমারদেবীর বিবাহোপলক্ষে তাঁহারা পাটলীপুত্র চন্দ্রগুপ্তকে যৌতুক স্বরূপ সমর্পণ করেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধ

গুপ্ত রাজবংশ

ইতিহাস লিখিবার উপকরণ

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত

স্মরণীয় করিবার জন্য কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রচারিত হয়, তাহাতে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার পত্নী কুমারদেবীর মূর্ত্তি ও অপর দিকে সিংহবাহিনী লক্ষ্মীদেবীর মূর্ত্তি ও 'লিচ্ছবয়ঃ' লিখিত আছে। চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবিবংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়া মগধ হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত সমগ্র গঙ্গাতীরবর্ত্তী বিস্তৃত প্রদেশই তাঁহার রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন—চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের সময় হইতে একটি নূতন সংবতের প্রবর্ত্তন হয়। ইতিহাসে উহা **গুপ্ত সংবৎ** নামে প্রসিদ্ধ। এই সংবৎ ৩১৯ খৃষ্টাব্দে প্রচলিত হইতে আরম্ভ হয়। 'চন্দ্রগুপ্ত' অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র **'সমুদ্রগুপ্ত'** গুপ্ত সিংহাসনের অধিকারী হইয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকাল ৩২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৩৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত গণনা করা হয়। সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন না, তথাপি চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকেই সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নির্ব্বাচিত করেন। সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবি রাজকন্যা কুমারদেবীর গর্ভজাত ছিলেন এই জন্যই আমরা তাঁহার খোদিত লিপিতে দেখিতে পাই,—তিনি আপনাকে 'লিচ্ছবি দৌহিত্র' বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ইতিহাসে **সমুদ্রগুপ্ত** একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিলেন। তাঁহার নাম ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। তিনি যে কেবল একজন দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন তাহাই নহে, তিনি রাজনীতিজ্ঞ, বিদ্বান ও সঙ্গীতানুরাগী নৃপতি ছিলেন। প্রাচীন ইতিহাসে যে সকল দিগ্বিজয়ী রাজার নাম দেখিতে পাই তিনি তাঁহাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। সমুদ্রগুপ্ত নানা দেশ জয় করিয়া দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি উত্তরভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিয়া গুপ্তসাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত করেন। তাঁহার রাজ্যকালের ইতিহাস এলাহাবাদ দুর্গের ভিতরে অবস্থিত অশোকস্তম্ভের গাত্রে যে খোদিত লিপি আছে তাহা হইতে জানিতে পারা যায়। এ লিপিটি অতি প্রাঞ্জল সংস্কৃতভাষায় রচিত। এই প্রকার লিপিকে **প্রশস্তি** বলে। মহাকবি হরিষেণ এই প্রশস্তিটি রচনা করেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজত্বকালের ঘটনাবলী ও তাঁহার জীবন চরিত সম্পর্কে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য ইহাতে আছে।

উত্তর ভারত বা আর্য্যাবর্ত্তে আপনার বিজয় গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণভারত জয় করিতে মনোযোগী হইয়াছিলেন। আমরা তাঁহার দক্ষিণ ভারত বিজয়ের সম্বন্ধে কোনও আলোচনা করিব না। আমরা উত্তর ভারতে তাঁহার বিজয়বার্ত্তার কাহিনীই আলোচনা করিব। আমরা হরিষেণের প্রশস্তি হইতে জানিতে পারি, সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার রাজধানী পাটলীপুত্র হইতে বিজয়-যাত্রা করিয়া একে একে 'সমতট,' (পূর্ব্ববঙ্গ) কামরূপ, ডবাক, নেপাল, কর্ত্তৃপুর, (বর্ত্তমান কুমায়ুন ও গাড়োয়াল) প্রভৃতি সীমান্তরাজ্যের নরপতিগণকে পরাজিত করিয়া তাহাদিগকে

সমুদ্রগুপ্তের বঙ্গ-বিজয়

অধীনতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে কর প্রদান করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, কালিদাস তাঁহার 'রঘুবংশ' নামক কাব্যের চতুর্থ সর্গে নৃপতি রঘুর যে দিগ্বিজয়-কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন তাহা সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক দিগ্বিজয়েরই রূপক বর্ণনা মাত্র। কালিদাস রঘুর বঙ্গবিজয় সম্বন্ধে যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা পাঠ করিলে এই কথা একেবারে অসঙ্গত বলিয়াও মনে হয় না। কবির বর্ণনা হইতে দেখা যাইতেছে যে 'সুহ্ম' এবং 'উৎকলের' লোকেরা সহজেই রঘুর বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল কিন্তু বঙ্গবীরেরা তাঁহার সহিত অসাধারণ বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করে। আমরা রঘুবংশের ৪র্থ সর্গ ৩৪ হইতে ৩৮ শ্লোক পর্যান্ত কলিদাস রঘুর যে দিগ্বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম :—

"পৌরস্ত্যানেবমাক্রামংস্তাংস্তান্ জনপদান্ জয়ী।
প্রাপ তালীবনশ্যামমুপকণ্ঠং মহোদধেঃ॥ ৩৪॥
অনম্রাণাং সমুদ্ধর্তুস্তস্মাৎ সিন্ধুরযাদিব।
আত্মা সংরক্ষিতঃ সুহ্মৈর্বৃত্তিমাশ্রিত্য বৈতসীম্॥ ৩৫॥
বঙ্গানুৎখায় তরসা নেতা নৌ-সাধনোদ্যতান।
নিচখান জয়স্তম্ভান্ গঙ্গাস্রোতোঽন্তরেষু সঃ॥ ৩৬॥
আপাদপদ্মপ্রণতাঃ কলমা ইব তে রঘুম্।
ফলৈঃ সংবর্দ্ধয়ামাসুরুৎখাত-প্রতিরোপিতাঃ॥ ৩৭॥
স তীর্ত্বা কপিশাং সৈন্যৈর্বদ্ধদ্বিরদ-সেতুভিঃ॥
উৎকলাদর্শিত-পথঃ কলিঙ্গাভিমুখো যযৌ॥ ৩৮॥

বিজয়ী রঘু এইরূপ অপ্রতিহত পরাক্রমে প্রাচ্যদেশ সমূহ জয় করিতে করিতে ক্রমে গিয়া, তালীবনসন্নিবেশে শ্যামবর্ণ পূর্ব্বমহোদধির বেলাভূমিতে উপনীত হইলেন। ৩৪।

বেগবতী প্রবাহিণীর খরস্রোত যেমন পুরঃস্থিত উচ্ছ্রিত বৃক্ষকেই উন্মূলিত করে, কিন্তু আনতকায় বেতসলতিকার কোন ক্ষতিই করেনা, বিজয়দৃপ্ত রঘুর প্রকৃতিও তদ্রূপ জানিয়া সুহ্মদেশীয় নৃপতিবৃন্দ তাঁহার সম্মুখে মস্তক অবনত করিলেন। ৩৫।

বঙ্গদেশের রাজন্যবর্গ রণতরীর সাহায্যে, প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুর সহিত যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে, তিনি সবলে তাঁহাদের পরাজয় সাধনপূর্ব্বক গঙ্গাপ্রবাহ মধ্যবর্ত্তী দ্বীপপুঞ্জে স্বীয় বিজয়স্তম্ভ প্রোথিত করিলেন। ৩৬॥

তাঁহাদিগকে পদচ্যুত করিয়া পুনরায় স্বপদে প্রতিষ্ঠাপিত করার পর, তাঁহারা শালি-ধান্যের ন্যায় (রোয়াধান) বিজেতা রঘুর পাদপদ্মে প্রণত হইয়া বিপুল ধনরাশির দ্বারা তাঁহাকে পূজা করিলেন। ৩৭॥

তদনন্তর রঘু গজনির্ম্মিত সেতুদ্বারা কপিশা নদী পার হইয়া সসৈন্যে উৎকল-দেশে উপনীত হইলেন। তদ্দেশীয় ভূপতিগণ সাগ্রহে তাঁহাকে পথ দেখাইয়া দিলে, তথা হইতে তিনি কলিঙ্গভূমি-অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ৩৮॥* [রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ—বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত কালিদাসের গ্রন্থাবলী প্রথম ভাগ ৪৭—৪৯ পৃষ্ঠা]

কালিদাসের এই বর্ণনা হইতে বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিলাম, রঘু যে দিগ্বিজয় করেন সেই বঙ্গদেশ, পূর্ব্ববঙ্গ এবং বিশেষরূপে **বিক্রমপুরকেই** বুঝাইতেছে। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে এবং প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক ভাণ্ডারকারের মতে ব্রহ্মপুত্র এবং পদ্মানদীর মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ডই **বঙ্গ নামে** পরিচিত। এই বঙ্গ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বেও বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াছি। তারপর আর একটা বিষয় লক্ষ্য করিবার আছে। রঘুর সহিত বাঙ্গালীরা যে যুদ্ধ করিয়াছিলেন তাহা বীরত্বের পরিচায়ক। বঙ্গদেশের রাজারা রণতরীর সাহায্যে প্রতিদ্বন্দ্বী রঘুর সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। বাঙ্গালাদেশ বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গে যেরূপ নদী আছে সেরূপ নদী আর কোথাও নাই। স্বর্গত ঐতিহাসিক মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন "বাংলার যেরূপ বড় বড় নদী আছে, তাহাতে বাঙ্গালীরা যে অতি প্রাচীনকালেও নৌকা গড়িত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। নৌকা ও অনেকরূপ ছিল—দোলা, ডুলি, ডিঙ্গি, ভেলা, নৌকা, বালাম, ছিপ, ময়ূরপঙ্খী ইত্যাদি। এই সকল ছোট ছোট নৌকা, সকল দেশেই আছে। বাংলায় কিন্তু বড় জাহাজও ছিল।"

কালিদাস বলিয়া গিয়াছেন "বাংলার রাজারা নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। পাল-রাজাদের যে যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা থাকিত, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। খালিমপুরে ধর্ম্মপালের যে তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ধর্ম্মপালের যুদ্ধের জন্য অনেক নৌকা প্রস্তুত থাকিত এ কথা স্পষ্ট লেখা আছে। রামপাল নৌকার সেতু করিয়া গঙ্গা পার হইয়াছিলেন, এই কথা 'রামচরিতে' স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে। ইংরাজী ১২১৬ সালে তাম্রলিপি

* Some scholars are of opinion that it is really the Guptas who under the poetic disguise of Raghus form the theme of Kalidasa's Raghuvansa, and that Canto IV of the poem is a disguised version of the conquering tour of *Samudra-Gupta* a record of whose conquest is inscribed on the pillar now in Allahabad fort but originally at Kausambi, 30 miles westward on the Jumna. With regard to the eastern powers of the age, this inscription describes Samudragupta as *Samatata Davaka-Kamarup-Nepala-Karttrpuradi, pratyanta, nrpatibhih..pranamaga-mana, paritosita-pracanda-sasanasya* (Fleet, P. 8). It may be noted incidentally that Karttipura is identified with present Kumaon (V. smith, J. R. A. S. 1897, P. 881). The Indian Historical Quarterly Vol. VII No 3 September 1931 page 440.

হইতে কতকগুলি বৌদ্ধভিক্ষু জাহাজে চড়িয়া পেগানে গিয়া তথাকার বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কার করেন, এই কথাও কল্যাণ নগরের শিলালেখে স্পষ্ট করিয়া বলা আছে।

"কিন্তু মনসা ও মঙ্গল-চণ্ডীর পুঁথিতেই আমরা বাঙ্গলা দেশের নৌকা-যাত্রার খুব জাঁকাল খবর পাই,—চৌদ্দ, পোনের, ষোলখানি জাহাজ একজন সওদাগর, একজন মাঝির অধীনে ভাসাইয়া লইয়া গঙ্গা বাহিয়া সমুদ্রে পড়িতেন। সমুদ্র বাহিয়া সিংহলে যাইতেন এবং তথা হইতে ও ১৫।১৬ দিন বাহিয়া মহাসমুদ্রের মধ্যে নানা দ্বীপ ও উপদ্বীপে বাণিজ্য করিতেন। * কেদাররায় ও প্রতাপাদিত্য সর্ব্বদাই নৌকা লইয়া যুদ্ধ করিতেন। অনেক সময় দূর দূরান্তরেও যাইতেন।

পালবংশীয় নরপালগণের কোন কোন তাম্রশাসনে "নৌবাটক" এবং কোন কোন তাম্রশাসনে "নৌবাট" শব্দ উৎকীর্ণ আছে। বাঙ্গালীর নৌবল চিরপরিচিত। মহাকবি কালিদাস এই জন্যই বাঙ্গালীকে "নৌসাধনোদ্যতান্" বলিয়া পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। কাজেই রঘুর সহিত বাঙ্গালার রাজারা রণতরী সমূহ লইয়া যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইবেন কিংবা পক্ষান্তরে দিগ্বিজয়ী সমুদ্রগুপ্তের সহিত নৌযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন ইহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। বিক্রমপুর অঞ্চলে নানা শ্রেণীর নৌকা এখনও প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্থানান্তরে আমরা সেই বিষয় লিপিবদ্ধ করিব। কেদাররায় ৫০০ কোষা লইয়া মোগলের বিরুদ্ধে এবং মগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহা সকলেরই জানা আছে। এরূপ স্থলে আমরা নানা অনুকূল প্রমাণের দ্বারা বলিতে পারিতেছি যে সমুদ্রগুপ্ত যে বাঙ্গালার রাজাদের নিকট বাধা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা পূর্ব্ববঙ্গের প্রতাপশালী নরপতিদিগের কাছেই হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা সম্পূর্ণ সঙ্গত। কোন কোন সুপণ্ডিত ঐতিহাসিকের মতে ইউ-য়ান চুয়াঙের সময়ে মেঘনাদ (মেঘনা) রামপালের নিকটই বোধ হয় সাগর দর্শন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে সাগর-শাখা বিস্তৃত ছিল। এইরূপ স্থলে আমরা সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়-যাত্রার ফলে যে যুদ্ধ হইয়াছিল তাহা সেকালের সমুদ্রশাখা মেঘনাদের বক্ষে হওয়া অসম্ভব নহে এইরূপ অনুমান করিতে পারি। অপরপক্ষে শালিধান্য রোপণ বঙ্গদেশে, বিক্রমপুরে আড়িয়ল বিল অঞ্চলে এখনও রোপিত হইয়া আসিতেছে। কাজেই আমরা অনুমান করিতে পারি **শ্রীবিক্রমপুরের** অধিবাসী এবং সেকালের পূর্ব্ববঙ্গের রাজাদের সহিতই নৌযুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল।

* য়ুয়ন্-চয়ঙের সময়ে মেঘনাদ (মেঘনা) নদ রামপালের নিকটেই বোধ হয় সাগর দর্শন করিয়াছিলেন। সে সময়ে বঙ্গ ও ত্রিপুরার মধ্যে সাগর-শাখা বিস্তৃত ছিল। য়ুয়ন্-চয়ঙের অন্যূন এক শতাব্দী পরে যখন শ্রীহর্ষ আদিশূরের রাজবাটীতে উপস্থিত হন তখনও তিনি রাজধানীর নিকটেই সমুদ্র দর্শন করিয়াছিলেন। নচেৎ তিনি কখনই অর্ণব বর্ণনা করিতেন না। বান্ধব, ষষ্ঠখণ্ড, পঞ্চম সংখ্যা ১২৮৮।

এখানে আমরা একটা বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। সমুদ্রগুপ্ত উত্তরাপথ ও দক্ষিণাপথ বিজয় করিয়া 'অশ্বমেধ-যজ্ঞের' অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাঁহার আদেশে নির্ম্মিত সেই যজ্ঞীয় অশ্বের একটি প্রস্তরময় মূর্ত্তি হিমালয় পর্ব্বতের পাদমূলে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। উহা এখন লক্ষ্ণৌএর যাদুঘরে রক্ষিত আছে। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞে দক্ষিণা দান করিবার জন্য এক নূতন সুবর্ণ মুদ্রা নির্ম্মাণ করেন, ঐ সমুদয় মুদ্রার একদিকে 'যজ্ঞযূপে আবদ্ধ অশ্ব ও অন্যদিকে প্রধানা মহিষীর মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। সমুদ্রগুপ্তের এই মুদ্রা অধুনা অতি দুষ্প্রাপ্য। অতএব আমরা দেখিতে পাইলাম গৌড় ও রাঢ়া প্রদেশ সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল এবং পূর্ব্ব ও দক্ষিণবঙ্গও গুপ্তসাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। সুতরাং 'বিক্রমপুর' যে সে সময়ে সমুদ্রগুপ্তের সীমান্তভুক্ত ছিল এইরূপ অনুমান করা একেবারে অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। তবে আমরা ইহাও দেখিতে পাইলাম যে সমতট বঙ্গের অধিবাসিগণ সহজে সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেন নাই। তাহারা নিজদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রকৃত বীরের ন্যায় দিগ্বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্তের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের তিন প্রকার সুবর্ণ মুদ্রা এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম প্রকারেব মুদ্রায় ধনুর্ব্বাণ হস্তে রাজার মূর্ত্তি, দ্বিতীয় প্রকারের মুদ্রায় পরশু হস্তে রাজার মূর্ত্তি এবং তৃতীয় প্রকাবের মুদ্রায় শূলহস্তে রাজার মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়। আর এক প্রকার স্বর্ণ-মুদ্রায় দেখিতে পাওয়া যায় রাজা একটি আসনে বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন। সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র 'দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত' সিংহাসনে আরোহণ করিয়া বিক্রমাদিত্য উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার মুদ্রায় বিক্রমাঙ্ক, শ্রীবিক্রম, বিক্রমাদিত্য, অজিতবিক্রম, সিংহবিক্রম এইরূপ নানা উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। এই সকল উপাধির মধ্যে বিক্রমাদিত্য উপাধিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপাধি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতে প্রচলিত ছিল। পুরাকালে উজ্জয়িনীর একজন নৃপতি শকদিগকে পরাজিত করিয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করেন এবং বিক্রমাব্দ নামে একটি অব্দের প্রচলন করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও এই 'শকারি বিক্রমাদিত্যের' অনুকরণে শকজাতীয় ক্ষত্রপবংশের রাজ্য নাশ করিয়া উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছিলেন এবং 'বিক্রমাদিত্য' নাম ধারণ করিয়াছিলেন ও রাজধানী উজ্জয়িনীতে স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন।

দিল্লীর কুতুবমিনারের নিকট মেহরৌলি নামক যে গ্রাম আছে সেখানে লৌহস্তম্ভের গায়ে একটি খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিতে 'চন্দ্র' নামক একজন রাজার বিজয়-কাহিনী সংক্ষেপে খোদিত আছে। এই চন্দ্র কে? ইনি প্রথম কি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কিংবা অন্য কোনও রাজা সেই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে নানারূপ মতভেদ প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন এই চন্দ্র, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারেন না।

মেহরৌলি লিপির চন্দ্ররাজা বঙ্গদেশের বিদ্রোহী শত্রুদলকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ইহা হইতে মনে হয় যে 'চন্দ্র' সমুদ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী কোন রাজা হইবেন, কারণ সমুদ্রগুপ্তই প্রথম বঙ্গ-বিজয় করিয়াছিলেন।* অতএব সমুদ্রগুপ্তের পরে বঙ্গবাসীগণ যে দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহী হইবেন তাহা সম্ভবপর। এখানে আর একটি কথাও উল্লেখযোগ্য। 'বিক্রমপুর' নামটি প্রাচীন তাম্রশাসনে 'শ্রীবিক্রমপুর' নামে লিখিত রহিয়াছে। অতএব বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত প্রবাদ 'বিক্রমাদিত্য' রাজার নাম হইতে 'বিক্রমপুর' নামের উৎপত্তি হইয়াছে, এই সম্বন্ধে আমরা এইরূপ অনুমান করিতে পারি যে সমুদ্রগুপ্তের বঙ্গদেশ বিজয়ের পর তাঁহার মৃত্যু হইলে বঙ্গবাসীগণ দেশের স্বাধীনতার জন্য বিদ্রোহী হইয়াছিলেন এবং তাহা-দিগকে দমন করিবার জন্য দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বঙ্গদেশে আসিয়া বিদ্রোহ দমন করেন ও নিজের উপাধি 'শ্রীবিক্রম' সংযুক্ত পুর বা নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইরূপ একটা অনুমান করা অসঙ্গত নহে। যদিও এ বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে অনুরূপ মত প্রকাশ করিয়াছি। এবং এখনও ইহাই সঠিক সিদ্ধান্তরূপে গ্রহণ করিতে পারি কিনা তাহাও বিচার্য্য। তবে ইহা লৌকিক প্রবাদ ও কিংবদন্তীর সহিত মিলিয়া যায়। সেজন্যই বিশেষভাবে ইহার উল্লেখ করিলাম।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে চীনদেশীয় পরিব্রাজক ফাহিয়ান ভারতবর্ষে আসিয়া-ছিলেন। তাহার বর্ণনা হইতেও চন্দ্রগুপ্তের সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানিতে পারিতেছি। কাজেই আমাদের মনে হয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সহিত বঙ্গদেশের বা বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক সম্বন্ধ অপ্রাকৃত নহে।

শাসনের সুবিধার জন্য গুপ্ত সাম্রাজ্যকে অনেকগুলি ছোট বড় ভাগে বিভক্ত করা হয়। সেই ভাগগুলিকে 'ভুক্তি' বলা হইত। এই ভুক্তি শব্দ পরবর্ত্তী কালেও প্রচলিত ছিল, যেমন পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি, বর্দ্ধমানভুক্তি ইত্যাদি।

* Eastern Bengal or at least the greater part of it probably remained as an independent Kingdom or more properly a confederacy of independent Kingdoms till the middle of the fourth century A. D. About this time we hear of a great fight put up by a confederacy of states in Vanga against a hero called *Chandra* who conquered the whole of Northern India from Bengal in the east to Bahlika beyond the Indus to the west. There is much dispute among historians about the identity of this king Chandra. Some have identified him with Chandra Gupta I or Chandra-Gupta II of the Imperial Gupta dynasty while others have identified him with Chandra varman of the susunia inscription. The Early History of Bengal by Dr. R. C. Majumder, M. A. Ph. D. page 13. (1) Meherauly Pillar inscription of Chandra; Fleet. Gupta Inscriptions, p. 139 (2) E. G Mr. R. G. Basak in (3) Ind. Ant. 1919 p. 98 ff. Ep. Ind. vol. XIII p. 133; vol. XII p. 318. (4) Dacca Review vol. X. 1920-21, Nos. 2, 3, 4, 5.

বর্ত্তমান সময়ে ঐতিহাসিক পণ্ডিতগণ এইরূপ সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন যে, সৌরাষ্ট্র এবং মালবের শক রাজাদের যিনি পরাজিত করিয়াছিলেন সেই শকবিজয়ী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভাতেই কবি কালিদাস, উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ বিরাজমান ছিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কালিদাস রঘুবংশ নামক কাব্যে রঘুর যে দিগ্বিজয় কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন এবং হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয় বর্ণনা এলাহাবাদের স্তম্ভলিপিতে যাহা করিয়াছেন এই দুইয়ের মধ্যে যথেষ্ট ঐক্য দেখিতে পাওয়া যায়। মনে হয় কালিদাস যেন রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা করিবার স্থলে সমুদ্রগুপ্তেরই দিগ্বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময় ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রই শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ভারতের সহিত রোমকসাম্রাজ্যের বাণিজ্য এত অধিক বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, রোমের স্বর্ণমুদ্রা 'দিনেরিয়স্' এদেশে ব্যবহার হইত। গুপ্ত রাজারা রোমের মুদ্রার অনুকরণে স্বর্ণমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। এ সকল মুদ্রাকে "দিনার" বলা হইত। মহারাজ চন্দ্রগুপ্ত রজতমুদ্রারও প্রচলন করিয়াছিলেন। গুপ্তরাজাদের এবং দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রা নানা স্থানেই বাঙ্গালাদেশে পাওয়া গিয়াছে। ওয়ারেন হেষ্টিংশের সময়ে প্রায় দুইশত গুপ্তমুদ্রা কালিঘাটে পাওয়া যায়। যশোহর জেলায় 'মহম্মদপুর' গ্রামে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অনেক রজতমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র 'কুমারগুপ্ত' আনুমানিক ৪১৩ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করেন। পিতার ন্যায় কুমারগুপ্তেরও অনেকগুলি উপাধি ছিল। তিনি তাঁহার মুদ্রাতে সেই সকল উপাধির ব্যবহার করিয়াছেন,—যেমন, মহেন্দ্র, মহেন্দ্রাদিত্য, সিংহমহেন্দ্র; অজিতমহেন্দ্র, গুপ্তকুলব্যোমশশি, 'অশ্বমেধ মহেন্দ্র' ইত্যাদি। আমরা এই সমুদয় উপাধি হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে কুমারগুপ্ত আপনাকে বীরত্ব ও প্রতাপের দিক দিয়া পিতার সমকক্ষ মনে করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। তাঁহার রাজ্যকালের শিলালিপি এবং মুদ্রার প্রাপ্তি স্থান হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে তাঁহার অধিকার বঙ্গদেশ হইতে সৌরাষ্ট্র পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ভাবে বিদ্যমান ছিল। তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার অমাত্য চিরাতদত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ শাসন করিতেন। কিন্তু বঙ্গ, পূর্ব্ববঙ্গ বা সমতটে কে শাসন করিতেন? তাহার কোন উল্লেখ নাই। অতএব 'শ্রীবিক্রমপুর' কোনও অজ্ঞাতনামা রাজার অধীনে স্বাধীন ছিল, এইরূপ অনুমান ব্যতীত আমরা আর কিছুই বলিতে পারি না। পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের ন্যায় কুমারগুপ্তও অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল ৪১৫ গৌপ্তাব্দে আরম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার সময়কার ছয়টি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রজতমুদ্রায় ১৩৬ গৌপ্তাব্দ পর্য্যন্ত বর্ষ অঙ্কিত পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজ্যকালের অবসান ঐ বর্ষ অর্থাৎ ৪৫৬ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি হইয়াছিল।

কুমারগুপ্তের রাজত্বের শেষভাগে, গুপ্তসাম্রাজ্য পরাক্রান্ত পুষ্যমিত্র ও হুনজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছিল। পুষ্যমিত্রের সহিত যুদ্ধে সম্রাটের সেনা পরাজিত হইলে যুবরাজ ভট্টারক স্কন্দগুপ্ত অসাধারণ পরাক্রমের সহিত তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ভিটারি লিপিতে [গাজিপুর জেলায় ভিটারি নামক স্থানের স্তম্ভগাত্রে খোদিত লিপি] হইতে জানা যায় যে, যুবরাজ স্কন্দগুপ্ত পিতৃকুলের বিরচিত রাজলক্ষ্মীকে স্থির করিবার জন্য এক রাত্রি ভূমিশয্যায় শয়ন করিয়াছিলেন। "অর্থাৎ যুবরাজকে রণক্ষেত্রেই রাত্রি অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল। আনুমানিক ৪৫৫ খৃষ্টাব্দে কুমারগুপ্ত পরলোক গমন করিলে—স্কন্দগুপ্ত সিংহাসনারোহণ করেন।

স্কন্দগুপ্ত

স্কন্দগুপ্ত বীর রাজা ছিলেন। তিনি হুনদিগকে পরাজিত করিয়া পিতৃরাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন। কিন্তু হুনেরা পরাজিত হইয়াও উত্তরাপথ আক্রমণ করিতে বিরত হয় নাই। এই জন্য তাঁহাকে বিশেষ সতর্কতার সহিত বাজ্যের প্রান্তদেশ সমূহ রক্ষা করিতে হইয়াছিল।

স্কন্দগুপ্তের প্রভাব—তাঁহার জীবিতকালে সৌরাষ্ট্র হইতে **বঙ্গদেশ** অবধি অক্ষুন্ন ছিল। তিনি কুমারগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় বিষ্ণুভক্ত ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় তিনি পরম ভাগবতরূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাঁহার উদারতা ছিল অসাধারণ। রাজা নিজে বৈষ্ণব হইলেও জৈন ও অন্যান্য ধর্ম্মের প্রতি সহানুভূতির অভাব ছিল না। তিনি কোন ধর্ম্মেরই বিদ্বেষী ছিলেন না। আনুমানিক ৪৬৭ খৃষ্টাব্দে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যু হয়।

অনেক ঐতিহাসিকের এইরূপ ধারণা যে স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পরই গুপ্তসাম্রাজ্যের প্রভাব বিলুপ্ত হইয়াছিল, কিন্তু একথা প্রমাণসহ নহে। শিলালেখন ও সাহিত্য দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইয়াছে যে গুপ্তসাম্রাজ্য পঞ্চম শতাব্দীর উত্তরার্দ্ধেও **মালব হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।** ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভে গুপ্তরাজাদের অধিকার **উত্তরবঙ্গ**, বিহার, প্রয়াগ, অযোধ্যা, যমুনা ও নর্ম্মদার মধ্যবর্ত্তী দেশ (বুন্দেলখণ্ড, বঘেলখণ্ড, জব্বলপুরের নিকটবর্ত্তী প্রদেশ ইত্যাদি) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ৫৩৩ খৃষ্টাব্দে একজন পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ ও গুপ্তসম্রাটের **পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি** অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে শাসন করিয়াছিলেন এইরূপ জানিতে পারা যায়।

গুপ্তসাম্রাজ্যের পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির শাসনকর্ত্তা

স্কন্দগুপ্তের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা পুরগুপ্ত; সিংহাসনে আরোহণ করেন। অতি অল্পকাল রাজত্ব করিবার পর তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মহিষী বৎসদেবীর পুত্র নরসিংহগুপ্ত পিতার পর সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। নরসিংহগুপ্ত, বালাদিত্য উপাধি ধারণ করেন। আনুমানিক ৪৭৩ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। তাঁহার মহিষীর নাম ছিল মহালক্ষ্মী দেবী। মহালক্ষ্মী দেবীর গর্ভজাত পুত্র কুমারগুপ্ত (দ্বিতীয়) বিক্রমাদিত্য

উপাধি ধারণপূর্ব্বক সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকাল ৪৭৬—৭৭ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সমাপ্ত হইয়াছিল। এইরূপে পুর, নরসিংহ ও দ্বিতীয় কুমারের রাজত্বকাল মাত্র দশ বৎসরকাল স্থায়ী ছিল।

দ্বিতীয় কুমারগুপ্তের পর বুধগুপ্ত, গুপ্তসাম্রাজ্যের সিংহাসন লাভ করেন। ইঁহার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে জানা যায় না। তবে অনুমিত হয় যে তিনি প্রথম কুমারগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। পিতার মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স বেশী ছিল না। তিনি একে একে জ্যেষ্ঠভ্রাতা স্কন্দগুপ্ত ও পুরগুপ্ত, ভ্রাতুস্পুত্র নরসিংহগুপ্ত ও পৌত্র কুমারগুপ্ত দ্বিতীয়কে রাজত্ব করিতে দেখিয়াছিলেন। অবশেষে পৌত্রের মৃত্যুর পর কেহই যখন সিংহাসনের দাবী করিবার রহিল না; তখন তিনি নিজেই রাজ্যভার গ্রহণ করিলেন। বুধগুপ্ত ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন, তাঁহার শাসনকালে বঙ্গদেশ হইতে মালব পর্য্যন্ত গুপ্তসাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পর হূনেরা ক্রমশঃ গুপ্তরাজ্যের সীমা লঙ্ঘন করিতে লাগিল। ধীরে ধীরে বিস্তৃত গুপ্তসাম্রাজ্য খণ্ড ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। হূনেরা একে একে মালব, রাজপুতনা এবং পঞ্জাব অধিকার করিল। এই ভাবে **সমুদ্রগুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য** প্রতিষ্ঠিত বিরাট গুপ্তসাম্রাজ্য ধ্বংসপ্রাপ্ত হইল।

ভানুগুপ্ত নামক একজন গুপ্ত রাজার নাম অরিকিনের (Eran) লিপিতে পাওয়া যায়। এই ভানুগুপ্ত ও বালাদিত্য অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া অনেকেই মনে করেন। লিপিতে ভানুগুপ্তকে 'পৃথিবীর বীর ও পার্থের ন্যায় শক্তিশালী নরেশ' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। ভানুগুপ্ত সম্ভবতঃ মিহিরকুলকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কিন্তু মিহিরকুল পরাজিত হইবার পরেও নানারূপ নৃশংস অত্যাচারের দ্বারা ভারতবর্ষে এক ভীষণ ত্রাসের সঞ্চার করেন, সেই সময়ে মাণ্ডাসোরের (Mandasor) রাজা যশোধর্ম্মদেব ৫৩৩ খৃষ্টাব্দের কিছু পূর্ব্বে এই রক্তপিপাসু নররাক্ষসের হস্ত হইতে ভারতের উদ্ধার সাধন করেন।

যশোধর্ম্মদেবের রাজকবি বাসুলি বিরচিত কীর্ত্তি-গাথা হইতে আমরা যশোধর্ম্মের ইতিহাস জানিতে পারি। মাণ্ডাসোরের (Mandasor) লিপি উৎকীর্ণ হইবার দশবৎসর পরে অর্থাৎ ৫৪৩—৪৪ খৃষ্টাব্দে গুপ্ত বংশের এক প্রতিনিধি যাঁহাকে একটি লিপিতে পরম-ভট্টারক, মহারাজাধিরাজ পৃথিবীপতি বলা হইয়াছে, **বঙ্গদেশের পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তিতে** (উত্তরবঙ্গ) শাসন করিতেছিলেন। কালবশে লিপি হইতে তাঁহার নামটি বিলুপ্ত হওয়ায় ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা অন্ধকার রহিয়াছে। কোন্ গুপ্তরাজার প্রতিনিধি বঙ্গদেশে শাসন করিতেছিলেন, তাঁহার পরিচয় আমরা জানিতে পারিলাম না।

যশোধর্ম্মদেবের মৃত্যুর পর আর্য্যাবর্ত্তের শাসনভার **মৌখরি** নামক রাজবংশের নৃপতিদের হস্তে পতিত হয়। মৌখরিগণ প্রথমে মগধে বাস করিতেন। মৌখরিরা পরে

কান্যকুব্জে রাজ্যস্থাপন করিয়াছিলেন। মৌখরি রাজারা গুপ্তসম্রাটদের পদ ও গৌরবের অধিকারী হইয়াছিলেন। মৌখরিদের প্রাচীন ইতিহাস বেশ ভাল করিয়া জানিবার উপায় নাই। মৌখরি নামে একটি প্রাচীন গোত্রের কথা জানা যায়। জয়াদিত্য ও বামনের কাশিকাবৃত্তি নামক পাণিনি রচিত আষ্টাধ্যায়ী নামক ব্যাকরণ-সূত্রের টীকা গ্রন্থে মৌখরি নাম পাওয়া গিয়াছে। কাশিকাবৃত্তি খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর বলিয়া পণ্ডিতেরা মনে করেন।

মৌখরি নামের উৎপত্তি যাহাই হউক, এই নামের দুইটী রাজবংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। একটি গয়ার নিকট অবস্থিত বরাবর ও নাগার্জ্জুনী নামক পর্ব্বতমালায় অবস্থিত "গুম্ফামন্দিরের" (Cave-Temple) ভিত্তিগাত্রে খোদিতলিপি হইতে মৌখরি রাজ অনন্তবর্ম্মা, তাঁহার পিতা শার্দুলবর্ম্মা ও পিতামহ যজ্ঞবর্ম্মার নাম পাওয়া গিয়াছে। এই তিন জনের শাসনকাল খৃষ্টিয় পঞ্চম শতাব্দী নির্দ্ধারিত হইয়াছে। খুব সম্ভবতঃ ইহারা গুপ্ত-সম্রাটদের সামন্ত ছিলেন।

এই বংশের প্রধান শাখার তিনজন রাজার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। হরিবর্ম্মা, আদিত্যবর্ম্মা, এবং **ঈশ্বরবর্ম্মা**। ঈশ্বরবর্ম্মের সময়েই মৌখরিবংশ বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। ঈশ্বরবর্ম্মার পিতা আদিত্যবর্ম্মা এবং স্বয়ং ঈশ্বরবর্ম্মা উভয়েই গুপ্ত-রাজবংশের রাজকুমারীদের বিবাহ করেন। এই বিবাহের দ্বারা যে তাঁহাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়।

ঈশ্বরবর্ম্মার উত্তরাধিকারীর নাম **ঈশানবর্ম্মা**। ঈশানবর্ম্মা 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। * আনুমানিক ৫৫৪ খৃষ্টাব্দে ঈশানবর্ম্মা সম্ভবতঃ গুপ্তরাজ তৃতীয় কুমারগুপ্তের সহিত অসিতে অসিতে সংঘর্ষ উপস্থিত করিয়াছিলেন। এবং হূনদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি অন্ধ্র, শুলিক ও **গৌড়দিগকে** রণে পরাজিত করিয়াছিলেন।

* (1) In or about the year A. D. 554, however, Isanvarman Maukhari ventured to measure swords with the Guptas, and probably also with the Huns, and assumed the Imperial title of Maharajadhirja. For a period about a quarter of a century (A. D 554—cir, A. D. 580) the Maukharis were beyond question the strongest political power in the upper Ganges valley. (Political History of Ancient India, Page 429 by Dr. H. C. Roy Chauadhury, M. A. Ph. d.)

(2) From an inscription of his son, Suryavarman, we learn that Isanvarman was ruling in 661 (I.e. A. D. 554) and that he had conquered the land of the Andhras, defeated the sulikas, otherwise unknown, and caused the *Gaudas* to cease their raids and remain within their own territory. (Page 102, The Cambridge shorter History of India.)

এইরূপ বিজয়ের দ্বারা প্রভাবশালী হইয়া এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হইয়াই তিনি 'মহারাজাধিরাজ' পদবি ধারণ করিয়াছিলেন। ঈশানবর্ম্মার বিজয়-কাহিনী তাঁহার 'হারাহা' নামক গ্রামে প্রাপ্ত শিলালিপিতে বর্ণিত আছে। গৌড়দের উল্লেখ সর্ব্ব প্রথম হারাহা লিপিতেই পাওয়া যায় এ বিষয়ে পূর্ব্বে (১০—১১ পৃষ্ঠা) বলা হইয়াছে।

ঈশানবর্ম্মার পরে সর্ব্ববর্ম্মা মৌখরি রাজ্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। সে সময়ে গুপ্ত বংশের দামোদর গুপ্ত রাজত্ব করিতেন। সর্ব্ববর্ম্মার সহিত দামোদর গুপ্তের যুদ্ধ হইয়াছিল, সেই যুদ্ধে সম্ভবতঃ দামোদর গুপ্তের মৃত্যু হইয়াছিল। এই সর্ব্ববর্ম্মার রাজত্ব-কালেই মগধ মৌখরি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। আদিত্য সেনের অফসড় লিপি হইতে জানা যায় যে, দামোদর গুপ্ত সম্মুখ সমরে প্রাণ-বিসর্জ্জন করেন। দামোদর গুপ্তের পর তাঁহার পুত্র মহাসেন গুপ্ত সিংহাসনারোহণ করেন। মৌখরি সাম্রাজ্যের বিস্তারের ফলে গুপ্তরাজ মহাসেনগুপ্তের রাজ্য মালবদেশে সীমাবদ্ধ ছিল। মহাসেনগুপ্তের রাজত্বকালের প্রধান ঘটনা, আসামরাজ সুস্থিরবর্ম্মার সহিত তাঁহার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে মহাসেনগুপ্ত বিজয়ী হইয়াছিলেন। অফসড়ের লিপিতে এই বিজয় কাহিনী লিখিত আছে। মহাসেনগুপ্ত স্থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের সহিত সৌহার্দ্দ স্থাপন করেন। এই বংশের রাজা প্রভাকর-বর্দ্ধন শ্রীকণ্ঠে (স্থানেশ্বরে) এক শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র হর্ষবর্দ্ধন পরে বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উত্তর ভারতে এক বিরাট সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিলেন। মহাসেনগুপ্তের পরে দেবগুপ্ত নামক একজন মালব নৃপতির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীহর্ষের রাজ্যকালে স্বাধীন গুপ্ত রাজাদের কোন প্রভাব ছিল না।

আমরা পূর্ব্বে সংক্ষেপে গৌড় দেশের কথা আলোচনা করিয়াছি (বিক্রমপুরের ইতিহাস ১০ পৃষ্ঠা)। কিন্তু আমরা গুপ্ত রাজাদের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে সমুদ্র গুপ্ত এমন পাঁচটী রাজ্য বিজয় করিয়াছিলেন, যাঁহাদের রাজ্য কলিঙ্গ রাজ্যের সীমান্তভুক্ত ছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে শৈলোদ্ভব নামক একটী রাজবংশ কলিঙ্গদেশে শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল তাঁহাদের বিষয় আমাদের আলোচনা অনাবশ্যক।

হর্ষের রাজত্বকালে বাঙ্গালাদেশে আমরা একজন অতি পরাক্রমশালী নৃপতির পরিচয় পাই। তিনি মহারাজা শশাঙ্ক। মহারাজা শশাঙ্ক গৌড়েশ্বর ছিলেন। তাঁহার সহিত মহারাজ হর্ষের যে কলহ হইয়াছিল তাহা আমরা বাণভট্ট প্রণীত হর্ষচরিত এবং চৈনিক পরিব্রাজক ইউ-য়ান্ চাঙের ভ্রমণ-বিবরণী হইতে জানিতে পারি। কয়েকখানি খোদিত-লিপি হইতেও শশাঙ্কের বিষয় অবগত হওয়া যায়। বঙ্গদেশ ও মগধের নানাস্থানে হইতে শশাঙ্ক ও নরেন্দ্রাদি‌ত্য নামাঙ্কিত স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে।

ইউ-য়ান্‌-চুয়াং লিখিয়াছেন—"বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল শত্রু কর্ণসুবর্ণের নৃপতি শশাঙ্ক হর্ষবর্দ্ধনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজ্যবর্দ্ধনকে নিহত করিয়াছিলেন। তিনি এতদূর বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন যে বুদ্ধগয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন।" এই ভাবে চীনদেশীয় ভ্রমণ শশাঙ্ককে একজন বৌদ্ধ-বিদ্বেষী এবং বৌদ্ধ-নির্য্যাতনকারী নৃপতিরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। হর্ষচরিতে এই রাজাকে "দুষ্ট-গৌড়-ভুজঙ্গ" নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শশাঙ্ক কে ছিলেন সে বিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে। হর্ষ-চরিতের-বর্ণনানুসারে ইঁহাকে গৌড়াধিপতি বলিয়া মনে হয়। সেকালে গৌড় বলিতে উত্তরবঙ্গ প্রধানতঃ বুঝাইত। অতএব আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে শশাঙ্ক মগধ, গৌড় ও রাঢ়া দেশের অধিকারী ছিলেন। ইঁহার অপর নাম নরেন্দ্র গুপ্ত। হর্ষচরিতের একখানা পুঁথিতে নরেন্দ্রগুপ্তের নাম উল্লিখিত আছে। সে যাহাই হউক আমরা দেখিতে পাইলাম যে গৌড়াধিপ শশাঙ্ক মগধ, গৌড় ও রাঢ়া দেশের অধিপতি ছিলেন—বঙ্গ রাজের সহিত কোন সম্পর্ক তাহার ছিল না। যদি ইনি বঙ্গ বা পূর্ব্ববঙ্গ পর্য্যন্ত প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন তাহা হইলে সমতট বা বঙ্গের উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকিত। স্বর্গত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার বিখ্যাত গ্রন্থ "বাঙ্গালার ইতিহাসে" শশাঙ্কের পরিচয় দিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"নরেন্দ্রগুপ্ত নাম দেখিলে বোধ হয় যে, তিনি গুপ্তবংশীয় নরপতি ছিলেন। গুপ্তনামধারী অভিজাত কুলজ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে কান্যকুব্জ অধিকারের উল্লেখ দেখিয়া পূর্ব্বোক্ত অনুমান যথার্থ বলিয়া বোধ হয়। তাঁহার যে সমস্ত মুদ্রা শশাঙ্ক নামে মুদ্রাঙ্কিত, তৎসমুদায়ের এক পার্শ্বে হস্তীর পৃষ্ঠে উপবিষ্ট মহাদেবের মূর্ত্তি ও অপর পৃষ্ঠে পদ্মাসনে সমাসীনা লক্ষ্মীর মূর্ত্তি আছে। প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের স্বুবর্ণমুদ্রাসমূহের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, দুই একটি বিষয়ে পার্থক্য থাকিলেও শশাঙ্কের মুদ্রার সহিত প্রাচীন গুপ্তরাজবংশের স্বুবর্ণমুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। প্রথমতঃ মুদ্রার দ্বিতীয় পৃষ্ঠে কমলাত্মিকা মূর্ত্তি, দ্বিতীয়তঃ মুদ্রার প্রথম পৃষ্ঠে রাজার নাম লিখনের পদ্ধতি, গুপ্ত মুদ্রার সহিত শশাঙ্কের মুদ্রার তুলনা করিলে এই দুইটী সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন গুপ্ত-সম্রাটগণ ভাগবৎ মতাবলম্বী অর্থাৎ বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু শশাঙ্ক শৈব ছিলেন সেই জন্যই বোধ হয়, তাঁহায় মুদ্রায় বৃষভ বাহন মহাদেবের মূর্ত্তি দেখা যায়। অধিকাংশ গুপ্তবংশীয় সম্রাটগণের মুদ্রায় রাজার নাম লিখন কালে একটি অক্ষরের নিম্নে আর একটি অক্ষর অঙ্কিত হইত, শশাঙ্কের মুদ্রাতেও এই লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়। যশোহর জেলায় মহম্মদপুর গ্রামেও অজ্ঞাত স্থানে প্রাপ্ত যে দুইটী মুদ্রা কলিকাতার চিত্রশালায় আছে তাহাদিগের দ্বিতীয় পৃষ্ঠে যে খোদিতলিপি আছে, কোন পণ্ডিতের মতে তাহার প্রকৃত পাঠ 'নরেন্দ্রাদিত্য'। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে নরেন্দ্রাদিত্য শশাঙ্কের "আদিত্য" নাম ছিল। সমুদ্রগুপ্ত ব্যতীত

অন্যান্য গুপ্ত রাজগণের এইরূপ আদিত্য নাম ছিল দেখিতে পাওয়া যায়। যথা চন্দ্রগুপ্ত, বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত, মহেন্দ্রাদিত্য, স্কন্দগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্য, চন্দ্রগুপ্ত দ্বাদশাদিত্য ইত্যাদি। শশাঙ্কের রাজ্য ও তাহার বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে যে সমস্ত প্রমাণ লিপিবদ্ধ হইল, তাহা হইতে অনুমান হয় যে; তিনি মগধের গুপ্তবংশজাত ছিলেন এবং মহাসেন গুপ্তের পুত্র অথবা ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন। মগধের গুপ্তরাজবংশ সম্ভবতঃ সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র গোবিন্দগুপ্ত হইতে উৎপন্ন।"* এ-সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন,—মৌখরী নৃপতিদের ন্যায় সম্ভবতঃ বাঙ্গলাদেশের শাসনকর্ত্তারাও খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্ত রাজাদের অধীনতা বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারিয়াছিল। চতুর্থ এবং পঞ্চম শতাব্দীতে গৌড়দেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের শাসনাধিকারে যে ছিল সে-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কিন্তু এই বাঙ্গালা দেশের সীমা কতদূর—অর্থাৎ গুপ্ত রাজারা যে বাঙ্গালা দেশের উপর আপনাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যন্ত প্রদেশের সীমা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। আমরা প্রয়াগের অশোকস্তম্ভ গাত্রোৎকীর্ণ প্রশস্তি হইতে সমুদ্রগুপ্তের যে দিগ্বিজয় কাহিনীর বর্ণনা পাই তাহা হইতে জানিতে পারিতেছি যে সমতট এবং ডবাক ব্যতীত বাঙ্গালার অন্যান্য অংশ পুণ্ড্র, বরেন্দ্র, উত্তর বঙ্গ এবং রাঢ় অর্থাৎ সমুদয় পশ্চিম বঙ্গ সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। তবে উত্তর বঙ্গ (পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি) প্রথম কুমারগুপ্তের সময়ে আনুমানিক ৫৪৩—৪ খৃঃ অব্দে গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল।

1. Like the Maukharis, the rulers of Bengal, too, seem to have thrown off the Gupta yoke in the second half of the sixth century A. D. In the fourth and the fifth centuries Bengal undoubtedly acknowledged the suzerainty of the Gupta Empire. The reference to Samatata in Eastern Bengal as a Pratyanta or border state in the Allahabad Pillar inscription of the emperor Samudra Gupta proves that the Imperial dominions must have embraced the whole of western Bengal, while the inclusion of Northern Bengal (Pundravardhana bhukti) within the empire from the days of Kumar Gupta I to A.D. 543—4 is sufficiently indicated by the Damodarpur plates. Samatata, through outside the limits of the Imperial provinces, had, nevertheless, been forced to feel the irresistible might of the Gupta arms.

2. From the fact that the plates found in west Varendra refer to Gupta emperors while those found elsewhere in Bengal refer to kings of other lines, it appears that the Gupta sway in Bengal was confined to west Varendra or what was afterwards known may as the kingdom of Gauda, while the rest of Bengal and Kamarupa merely adopted the Gupta script and the Gupta system of administration but were not under their sway. From the fact none of there inscriptions go beyond Kumargupta's line of we may conclude that Bengal was included in the Gupta empire when it reached its palmy days under tha emperor, as the poet Vatsa-Bhatti puts it in the verse...... Samudranta etc. (Fleet, P. 82).

এই বিবরণ আমরা দামোদরপুরের লেখন হইতে জানিতে পারি। সমতট বা বঙ্গরাজ্য গুপ্ত সাম্রাজ্যের সীমার বহির্ভূত ছিল, তথাপি তাহাদের উপরে গুপ্ত রাজগণের প্রভাব বিস্তৃত ছিল না এমন কথা বলা যায় না।"

আমরা উত্তর ভারতের সম্বন্ধে এবং বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন ইতিহাস সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করিলাম। আমরা একটি কথা বিশেষ করিয়া উপলব্ধি করিলাম যে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গৌড়দেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল; এ-বিষয়ে আমাদের সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই, কিন্তু ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌড় দেশের রাজ্যগুলি স্বাধীন হইয়াছিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভে মালব ও গৌড়দেশের গুপ্তরাজা তাঁহাদের সম্মিলিত শক্তির দ্বারা পুনরায় ভারতবর্ষের একচ্ছত্র সম্রাট হইবার উচ্চাশা অন্তরমধ্যে পোষণ করিতেন। তাঁহাদের এই আশা পূর্ণের প্রধান প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছিল থানেশ্বর ও কান্যকুব্জের মিত্রশক্তি। থানেশ্বরের বর্দ্ধন নৃপতি ও কান্যকুব্জের মৌখরি রাজা উভয়েই গুপ্তদেব বিশেষ শত্রু ছিলেন। প্রভাকর-বর্দ্ধনের মৃত্যুর পরে গুপ্তেরা মৌখরী ও পুষ্যভূতিদিগকে প্রবল বেগে আক্রমণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বে আমরা বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক বিষয়ই জানিতে পারি নাই। বর্ত্তমান সময়ে এ-বিষয়ে আমরা কিছু কিছু জানিতে পারিতেছি। একটী বিষয়ে বিশেষভাবে গৌরব বোধ করিতেছি এজন্য যে পূর্ব্বে অনেকেরই এইরূপ একটা মত ছিল যে বাঙ্গালাদেশ অতি আধুনিক; ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশের সঙ্গে ইহার দাবী চলিতে পারে না এবং পাল রাজাদের পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। সৌভাগ্যক্রমে বিবিধ ঐতিহাসিক আবিষ্কারের দ্বারা বাঙ্গালার প্রাচীন ইতিহাসের সমৃদ্ধি দিন দিনই আমাদের নিকট সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি রাঁচি-প্রবাসী রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের অসাধারণ চেষ্টা, যত্ন ও গবেষণায় বাঙ্গালাদেশের প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের অনেক কিছু প্রত্নচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। মিঃ ই, এ, মরে (E. A. Morray) টাটানগরের কাছাকাছি রুয়ানগরে (Ruanagar) নামক স্থানে অনেক কিছু প্রাগ্‌ঐতিহাসিক যুগের চিহ্ন আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে এক সময়ে বৃহত্তর বঙ্গের বিস্তৃত ভূ-ভাগ ছোটনাগপুর এবং বিহারের সভ্যতার ইতিহাস কোনরূপে আধুনিক বলা যাইতে পারে না।

বর্দ্ধমান জেলার দুর্গাপুর নামক স্থানেও অনেক কিছু প্রাচীন প্রত্নচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। রাজসাহী জেলায়, চব্বিশ পরগণায় এবং মেদিনীপুর, হুগলী প্রভৃতি স্থানে মৃত্তিকা খননের সহিত ৩য়, ৪র্থ খৃঃ পূর্ব্বাব্দের এবং ২য় ও ৩য় শতাব্দীর যে সমুদয়

রৌপ্য মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে মনে হয় এক সময়ে বাঙ্গালাদেশের উপর কুষাণ নৃপতিগণেরও প্রভাব বিদ্যমান ছিল।

আমরা এই অধ্যায়ে গুপ্ত রাজাদের সম্বন্ধে প্রয়োজনানুরূপ আলোচনা করিয়াছি। প্রকৃতপক্ষে বলিতে গেলে যদিও আমরা এখন পর্য্যন্ত গুপ্তরাজাদের সমকালীন বাঙ্গালা দেশের অবস্থা সম্পূর্ণরূপে জানিবার সুযোগ পাই নাই তথাপি এই কথা বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই বলিতে পারা যায় যে খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী হইতে বাঙ্গালাদেশের ইতিহাস বেশ ধারাবাহিকভাবে অনুসরণ করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। আমরা এই অধ্যায়ে মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত মৌর্য্যব্রাহ্মী-লিপির কথা উল্লেখ করিয়াছি। মহাস্থানগড়ই যে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন নগরী ছিল সে-বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। গুপ্তরাজাদের সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন বিশেষ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। যখন মহাস্থানগড়ের নানাস্থানের খনন কার্য্য সম্পূর্ণ হইবে তখন আমরা আশা করিতে পারি, গুপ্তরাজাদের সমসাময়িক ইতিহাস আরও সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারিব এবং রাঢ়া, বারেন্দ্র, বঙ্গ এই বিরাট বাঙ্গালাদেশের প্রাচীন ইতিহাস আমাদের বিশেষ গৌরবের কারণ হইবে।

এখন আমরা দেখিতে পাইলাম যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকার বাঙ্গালাদেশে বিস্তৃত ছিল, কিন্তু কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহার সঠিক বিবরণ জানিতে পারা যায় নাই। সম্প্রতি যে সকল ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যাইতেছে যে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন নগর গুপ্ত যুগ হইতেই বাঙ্গালাদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাহার অবশেষ করতোয়া তীরে বগুড়ার অন্তর্গত মহাস্থানগড়ের ধ্বংস স্তূপগুলির মধ্যে নিহিত রহিয়াছে। মহাস্থানের ধ্বংসস্তূপগুলি প্রায় চারি মাইল স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিত। ইহার কোন কোন স্থান খনিত হওয়ায় গুপ্তযুগ হইতে পালযুগ পর্য্যন্ত অর্থাৎ অনুমান পঞ্চম শতাব্দী হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত নানা প্রাচীন কীর্ত্তির চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা হইতে এইরূপ অনুমান হয় যে গুপ্তরাজাদের প্রভাব বারেন্দ্র-ভূমির পশ্চিম সীমান্ত পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। সেই বারেন্দ্র ভূমিই পরে গৌড়সাম্রাজ্য নামে পরিচিত হয়। বাঙ্গালাদেশের অন্যান্য ভূখণ্ড এবং কামরূপ ইত্যাদি গুপ্তলিপি এবং গুপ্ত শাসনরীতি অনুসরণ করিলেও গুপ্তরাজাদের শাসনাধীনে ছিল এমন কথা বলা চলে না। এইরূপ স্থলে অনুমান করা যায় যে কুমারগুপ্তের পূর্ব্বে সমগ্র বাঙ্গালা-দেশ কখনই গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূত হইতে পারে না।

গুপ্তরাজাদের বিষয়ে আমাদের আর বিস্তৃতরূপে আলোচনা করা অনাবশ্যক। আমরা দেখিতে পাইলাম গুপ্তরাজাদের প্রভাব উত্তরবঙ্গে অর্থাৎ বারেন্দ্রভূমে যেইরূপ বিস্তৃত ছিল বঙ্গদেশের অন্য কোথাও তদ্রূপ ছিল না। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে

ভারতবর্ষে যে সকল পরাক্রান্ত নৃপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে মহারাজ শশাঙ্কের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। বিহার প্রদেশে সাহাবাদ জিলার অন্তর্গত সাসারাম হইতে চব্বিশ মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে রোটাসগড় অবস্থিত। অনেকদিন পূর্ব্বে রোটাসগড় গিরিদুর্গস্থ প্রস্তর গাত্রে খোদিত একটী লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাতে লেখা আছে—"শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্ক দেবস্য"—শ্রীমহাসামন্ত শশাঙ্কদেবের। ঐতিহাসিকগণের মতে ইহাই মহারাজ শশাঙ্কের সম্বন্ধে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রমাণ-লিপি। অক্ষরতত্ত্বের আলোচনার দ্বারা এই শিলালিপির কাল সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভ কালের বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। এই মহারাজ শশাঙ্ক রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া সকলেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই শশাঙ্ক সর্ব্বপ্রথম করদ রাজা ছিলেন। কিন্তু ইনি কোন্ রাজার অধীনে করদ রাজা ছিলেন তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মৌখরী ঈশানবর্ম্মার রাজত্বকালের হারাহা লিপি ৫৫৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। ঈশানবর্ম্মার পরে একে একে সর্ব্ববর্ম্মা অবন্তীবর্ম্মা ও গ্রহবর্ম্মা ক্রমান্বয়ে মৌখরী সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ৬০৫ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে গ্রহবর্ম্মা অকালে নিহত হন। ঐতিহাসিকগণের মতে শশাঙ্ক মহারাজা গ্রহবর্ম্মা ও অবন্তীবর্ম্মার সময়ে রাজত্ব করিতেন। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে মহারাজ শশাঙ্ক সাহাবাদ জেলার করদ রাজা ছিলেন। এবং তিনি সর্ব্বপ্রথম অবন্তীবর্ম্মা ও তাঁহার পুত্র গ্রহবর্ম্মার অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন—"শশাঙ্ক সর্ব্বপ্রথম কর্ণসুবর্ণে স্বীয় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেন। তারপর তিনি ক্রমশঃ পুণ্ড্রবর্দ্ধন, গয়া, রোহিতগিরি এবং চোঙ্গোদমণ্ডল করায়ত্ব করেন। শশাঙ্ক মৌখরীদের অধীনে মহাসামন্তরূপে রাঢ়া, গৌড় ও মগধে শাসন করিতেন বলিয়া সমীচীন বোধ হয় না। মহাসামন্ত শশাঙ্ক উক্ত দেশত্রয়ে শাসক ছিলেন ধরিয়া লইলে তাঁহার রাজ্য অধিরাজের রাজ্য হইতে বৃহৎ ছিল বলিয়া প্রমাণিত হইবে। বস্তুতঃ মহাসামন্ত শশাঙ্কের আধিপত্য সাহাবাদ জিলা ভিন্ন অন্য কোন প্রদেশের উপর বিস্তৃত ছিল বলিয়া, কোন প্রমাণ নাই। রোহিতগিরি বর্ত্তমানে রোটাসগড় প্রাচীনকালে একটী বিখ্যাত স্থান ছিল। ইহা **পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্রবংশোদ্ভব নৃপতিগণের পূর্ব্বপুরুষদের রাজধানী ছিল।** শশাঙ্ক সর্ব্বপ্রথমে রোটাসগড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। সুতরাং মূলতঃ শশাঙ্ক রোটাসগড়েরই অধিবাসী ছিলেন। এমতাবস্থায় শশাঙ্ককে বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রথম জাতীয় বীর বলিয়া উল্লেখ করা চলে। "শশাঙ্ক বাঙ্গলার জাতীয় বীর বলিয়া গণ্য হইলে অন্যান্য যে সমস্ত বিদেশী বাঙ্গলা জয় করিয়াছিল তাঁহাদিগকেও বাঙ্গলার জাতীয় বীর বলা যাইতে পারে।"

শশাঙ্ক পশ্চিম দেশে যুদ্ধাভিযানের পূর্ব্বে মগধ, গৌড় ও রাঢ়া জয় করিয়াছিলেন। রোটাস গড় হইতে কর্ণসুবর্ণে তাঁহার রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। প্রাচীন কর্ণসুবর্ণের বর্ত্তমান নাম রাঙ্গামাটী। উহা মুর্শিদাবাদ জেলায় অবস্থিত। শশাঙ্কের জয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড় ও রাঢ়ার অধিপতি কে ছিলেন তাহা সঠিক নির্ণয় করার উপায় নাই। বপ্পকোষ তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে জয়নাগ কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। নিধানপুর তাম্র-লিপির সংবাদ অনুযায়ী কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্ম্মণ কিছুকালের জন্য কর্ণসুবর্ণের অধিপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ ভাস্করবর্ম্মা জয়নাগকে পরাজিত করিয়া কর্ণসুবর্ণ আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তীকালে শশাঙ্ক গৌড়দেশ তাঁহার নিকট হইতে জয় করিয়াছিলেন। ইহাব পরেই ভাস্করবর্ম্মা কামরূপের সিংহাসন রক্ষা কবিবার জন্য হর্ষের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।

মহারাজ শশাঙ্ক বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় রাজ্যবর্দ্ধনকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া যে ঐতিহাসিক বিতর্ক চলিতেছে তৎসম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে মতভেদ প্রচলিত দেখিতে পাওয়া যায়। সে যাহাই হোক ৬১৫—৬১৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতে শশাঙ্কের রাজশক্তি হ্রাস পাইতে থাকে। উক্ত বর্ষে দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার নিকট হইতে কলিঙ্গ অধিকার করেন। ৬৩৭ খৃষ্টাব্দে ইউ-আন্-চাঙ মগধ পরিদর্শন করেন। তাঁহার মগধ ভ্রমণের কিছুকাল পূর্ব্বেই শশাঙ্ক বুদ্ধগয়াতে বোধিবৃক্ষ ধ্বংস করিয়াছিলেন। শশাঙ্কের মৃত্যুর পর অশোকের শেষ বংশধর পূর্ণবর্ম্ম মগধের রাজা হইয়াছিলেন। চীন পরিব্রাজক পুণ্ড্রবর্দ্ধন, সমতট, কর্ণসুবর্ণ, তাম্রলিপ্ত প্রভৃতি রাজ্য কাহার দ্বারা শাসিত হইতেছিল তাহার কোন পরিচয় দিয়া যান নাই। কাজেই ঐ সমুদয় দেশ কাহার দ্বারা শাসিত হইত তাহা বলা কঠিন। সে সময়ে গৌড়দেশের এইরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল যে দেশের মধ্যে ভয়ানক অরাজকতা আরম্ভ হয়। কোন রাজা এক সপ্তাহ, কোন রাজা দুই সপ্তাহ কেহ বা এক মাস কাল রাজত্ব করেন।

ইউ-য়ান্-চাং বলেন শশাঙ্কের অত্যাচারেই বৌদ্ধ ধর্ম্মের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। ৬১৯ খৃষ্টাব্দের পর এবং ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে তাঁহার রাজত্বের অবসান হয়। বিক্রমপুর-রামপালে আবিষ্কৃত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন হইতে জানা যায় প্রাচীনকালে চন্দ্রবংশ রোহিত-গিরিতে রাজত্ব করিত। শ্রীচন্দ্রের প্রপিতামহ ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রবংশীয় ছিলেন। উক্ত চন্দ্রবংশের সহিত শশাঙ্কের কোন সংস্রব ছিল কি না তাহা বলা কঠিন।

এইরূপস্থলে পূর্ব্ববঙ্গের বঙ্গরাজ্যে শশাঙ্কের কোন প্রভাব বিদ্যমান ছিল কি না বলা সম্ভবপর নহে। কেন-না সেই সময়ে বঙ্গদেশ খণ্ডছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভাবেই শাসিত হইত।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে গুপ্ত রাজাদের সময় ভারতবর্ষে শিল্প ইত্যাদির দিক দিয়া যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল, এবং পাহাড়পুরে দুইটী বিখ্যাত ধর্ম্মকেন্দ্র ছিল। পাহাড়পুরে জৈন প্রভাব যে বিদ্যমান ছিল তাহা বুঝিতে পারা যায়। ৫৩৯ খৃষ্টাব্দে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে একদল চীন শ্রমণ আসিয়াছিলেন এবং সেখানে দীর্ঘকাল অবস্থানের পর বহু প্রাচীন বৌদ্ধ পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। আমরা দেখিতে পাই গুপ্ত রাজাদের সময়ে নালন্দা বিহারের বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল এবং উহার সমৃদ্ধি দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়।

গুপ্ত রাজারা কোন্ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন এবং কোন্ দেব দেবীর উপাসক ছিলেন তাহা বলা কঠিন এবং তাঁহাদের রাজধানীই বা কোথায় ছিল তাহাও সঠিকভাবে বলা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাদের মুদ্রায় লক্ষ্মীর মূর্ত্তি খোদিত দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে ইঁহারা বৈষ্ণবমতাবলম্বী ছিলেন। গয়ার খোদিতলিপিতে গরুড় চিহ্ন মুদ্রিত দেখিয়া এইরূপ সিদ্ধান্তে তাঁহারা উপনীত হইয়াছেন। অনেকে বলেন তাঁহাদের রাজধানী পাটলী-পুত্র বা বর্ত্তমান পাটনা নগরীতে ছিল। কালিদাসের মতে তাঁহাদের রাজধানীর নাম ছিল পুষ্পপুর—

অনেন চেদিচ্ছসি গৃহ্যমাণং পাণিং বরেণ্যেন কুরু প্রবেশে।
প্রাসাদ-বাতায়ন-সংশ্রিতানাং নেত্রোৎসবং পুষ্প-পুরাঙ্গনানাম্॥

রাজপুত্রি! এই বরণীয় মগধরাজ কর্ত্তৃক পাণি-পীড়ন যদি তোমার অভিলষিত হয়, তবে পরিণয়ের পর শোভাযাত্রা করিয়া যখন পাটলীপুত্র নগরে মহাসমারোহে প্রবেশ করিবে, তখন তত্রত্য প্রাসাদ সমূহের গবাক্ষদেশে দাঁড়াইয়া কত সুন্দরী ললনারা তোমার কমনীয় কান্তি দর্শনে নয়ন সার্থক করিবে।"

(রঘুবংশ—ষষ্ঠ সর্গঃ ২৪ শ্লোক) বসুমতী সংস্করণ

পালরাজগণের অভ্যুদয়

মহারাজা শশাঙ্কের পর অনেকদিন পর্য্যন্ত গৌড় বা বঙ্গদেশের কোন প্রকৃত ইতিহাস জানিতে পারা যায় না। সে-সময়ে বাঙ্গলাদেশ বলিতে সমগ্র গৌড়দেশকে বুঝাইলেও উহা উত্তর ভাগকেই বিশেষরূপে বুঝাইত। এই সময়ে নানা বিদেশী রাজারা বাঙ্গলাদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে কান্যকুব্জের রাজা যশোবর্ম্মার নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি তদানীন্তন গৌড়ের রাজাকে নিহত করেন এবং অসংখ্য হস্তীর অধিনায়ক বঙ্গরাজকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। এইভাবে নানারূপ বিদ্রোহ ও অশান্তির ভিতর দিয়া বাঙ্গলা-

দেশের শাসনকার্য্য চলিতেছিল। দেশের নানাস্থানে অশান্তি, বিদ্রোহ, কু-শাসন প্রভৃতির জন্য দেশে কোনরূপ শান্তি ছিল না। অনেকে কাশ্মীরের রাজা ললিতাদিত্যের পুত্র জয়াপীড় গৌড়-বিজয় করিয়াছিলেন বলিয়া থাকেন। কিন্তু ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথের মতে জয়াপীড়ের গৌড়দেশে আগমনের কথা সম্পূর্ণ কল্পনা প্রসূত।

অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত উত্তর ভারতে এমন কোন ক্ষমতাশালী নৃপতির আবির্ভাব হয় নাই যিনি সমগ্র উত্তর ভারতের উপর আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। সেই সময়ে বাঙ্গলাদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। বিদেশীয় রাজগণ কর্ত্তৃক বারবার আক্রমণে গৌড়ের প্রজারা অত্যন্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। তারপর গুপ্তবংশের দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পরে কোন রাজাই গৌড়, মগধ ও বঙ্গে আপনাদের আধিপত্য দৃঢ় ভাবে স্থাপন করিতে পারেন নাই। তাহারই ফলে নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নৃপতিরা পরস্পরে যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া নিজেদের শক্তির অপচয় করিতেন। মিলিতভাবে দেশের কল্যাণ করিবার মত আকাঙ্ক্ষা বা উচ্চ আদর্শ তাহাদের কাহারও ছিলনা। ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা তাহাদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। দেশপ্রীতি বলিয়া কোনরূপ অনুভূতি তাহাদের মধ্যে ছিল না। সেই সময়ে বাঙ্গলাদেশের অবস্থা বর্ণনা করিতে যাইয়া সন্ধ্যাকর নন্দী উহা মাৎস্যন্যায়ের সহিত তুলনা করিয়াছেন। মাৎস্যন্যায় বলিতে অরাজকতা বুঝায়। মাৎস্যন্যায় সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত একটি লৌকিক ন্যায়। তাহার অর্থ—দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার জনিত অরাজকতা। উদাসীন শ্রীরঘুনাথ বর্ম্ম বিরচিত "লৌকিক ন্যায়-সংগ্রহ" গ্রন্থে "মাৎস্যন্যায়" এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। যথা—

"প্রবল-নির্ব্বল-বিরোধে সবলেন নির্বল-বাধাবিবক্ষায়াং তু মাৎস্যন্যায়াবতারঃ। অয়ং প্রায়ঃ ইতিহাসপুরাণাদিষু দৃশ্যতে, যথাহি বাসিষ্ঠে প্রহ্লাদাখ্যানে তৎসমাধিং প্রস্তুত্যোক্তম্,—

এতাবতাথ কালেন তদ্রসাতল-মণ্ডলং।
বভুবারাজকং তীক্ষ্ণং মাৎস্যন্যায় কদর্থিতম্॥

যথা—প্রবলা মৎস্যা নির্ব্বলাং স্তান্নাশয়ন্তিস্মেতি ন্যায়ার্থঃ।"

অধ্যাপক বোধিলিঙ্গ একটী কারিকা উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যথা :—

"পরম্পরাভিষতয়া জগতো ভিন্নবর্ত্মনঃ।
দণ্ডাভাবে পরিধ্বংসী মাৎস্যোন্যায়ঃ প্রবর্ত্ততে॥"

—Von Bohtlingk's—Inde Spruche.

বঙ্গদেশে একসময়ে এইরূপ মাৎস্যন্যায় প্রবর্ত্তিত হইলে, প্রজাপুঞ্জ তাহা দূরীভূত করিয়া গোপালদেবকে রাজা নির্ব্বাচিত করিয়াছিল। গোপালদেবের পুত্র ধর্ম্মপালদেবের

তাম্রশাসনের এই বিবরণটী তারনাথের গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে। ইহা বাঙ্গলার ইতিহাসের একটি স্মরণীয় ঘটনা। 'মাৎস্যন্যায়ের' ব্যাখ্যা করিতে গিয়া "রামচরিতের" ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতবর স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, এম,-এ লিখিয়াছেন—"to escape from being absorbed into another kingdom or to avoid being swallowed like a fish. *

বৌদ্ধ ঐতিহাসিক লামা তারনাথ গোপালদেবের রাজ্যলাভের অব্যবহিত পূর্ব্বে গৌড়বঙ্গের অবস্থা কিরূপ ছিল সে সম্বন্ধে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রতিদিন এক একজন রাজা নির্ব্বাচিত হইতেন, কিন্তু ভূতপূর্ব্ব রাজার পত্নী রাত্রিতে তাঁহাদিগকে সংহার করিতেন। কিছুদিন পরে গোপালদেব রাজপদ লাভ করিয়া রাজ্ঞীর হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিয়া, আমরণ সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। তারনাথের ইতিহাস বিশ্বাসযোগ্য না হইলেও ইহা হইতে গৌড়বঙ্গের অরাজকতার বিষয় বিশেষ ভাবে জানিতে পারা যায়।

আমরা ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারিতেছি, বাঙ্গলার প্রাচীন ইতিহাসে পালরাজবংশের প্রথম রাজা গোপালদেব একজন মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি খৃষ্টিয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগে জনসাধারণ কর্ত্তৃক অরাজকতা নিবারণের জন্য রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিষয় আমরা ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন হইতে যে তিনটী শ্লোক উদ্ধৃত করিতেছি তাহা হইতেই পাঠকগণ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

শ্রিয় ইব স্বভগায়াঃ সম্ভবো বারিরাশি—
শশধর ইব ভাসো বিশ্ব মাহ্লাদয়ন্ত্যাঃ।
প্রকৃতি রবনিপানাং সন্ততে রুত্তমায়া—
অজনি দয়িতবিষ্ণুঃ সর্ব্ববিদ্যাবদাতঃ॥
আসীদাসাগরাদুর্ব্বীং গুর্ব্বীভিঃ কীর্ত্তিভিঃ কৃতী।
মণ্ডয়ন্ খণ্ডিতারাতিঃ শ্লাঘ্যঃ শ্রীবপ্যটস্তুতঃ॥
মাৎস্য-ন্যায়-মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশ-শিরসাং চূড়ামণি-স্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতন-যশোরাশি র্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না-যদি পৌর্ণমাস-রজনী জ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া॥

"মনোহারিণী লক্ষ্মীর উৎপত্তিস্থান যেমন সমুদ্র, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আহ্লাদ-জনয়িত্রী কান্তির উৎপত্তিস্থান [সম্ভব] যেমন শশধর, সেইরূপ অবনিপালকুলের সর্ব্বোৎকৃষ্ট বংশধরের বীজিপুরুষ [প্রকৃতি] সর্ব্ববিদ্যাবিশুদ্ধ দয়িতবিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

* গৌড়লেখমালা—ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসন ১৯ পৃষ্ঠা।

"যিনি বিপুলকীর্ত্তিকলাপে সসাগরা বসুন্ধরাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন, অরাতি-নিধনকারী [সর্ব্বকার্য্যে] কুশল, প্রশংসনীয়, সেই বপ্যট [দয়িতবিষ্ণু হইতে] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। [দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচারমূলক] "মাৎস্য ন্যায়" [অরাজকতা] দূর করিবার অভিপ্রায়ে, প্রকৃতিপুঞ্জ যাঁহাকে রাজলক্ষ্মীর কর গ্রহণ করাইয়া [রাজা নির্ব্বাচিত করিয়া] দিয়াছিল, পূর্ণিমা রজনীর [দিঙ্‌মণ্ডল-প্রধাবিত] জ্যোৎস্নারাশির অতিমাত্র ধবলতাই যাঁহার স্থায়ী যশোরাশির অনুকরণ করিতে পারিত, নরপাল-কুলচূড়ামণি গোপাল নামক সেই প্রসিদ্ধ রাজা বপ্যট হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"

এখানে আমরা দেখিতে পাইলাম এই তিনটী শ্লোকে দয়িতবিষ্ণু, বপ্যট এবং গোপাল এই তিনজনের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। দয়িতবিষ্ণু সম্বন্ধে বলা হইয়াছে নৃপতিগণের উত্তমবংশের প্রকৃতি বা বীজপুরুষ সর্ব্ববিদ্যাবিশুদ্ধ দয়িতবিষ্ণু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে দয়িতবিষ্ণু বিদ্বান এবং রাজবংশের জনক ভিন্ন আর কিছু বলা হয় নাই। তাঁহার প্রপৌত্র মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেবের প্রশস্তিকার যখন তাঁহাকে সর্ব্ববিদ্যাবিৎ ভিন্ন আর কোনরূপ বিশেষণে বিশেষিত করেন নাই তখন এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে তিনি বিশেষ প্রভাবশালী লোক ছিলেন না। পরের শ্লোকে দয়িতবিষ্ণুর পুত্র বপ্যট সম্বন্ধে বলা হইয়াছে তিনি প্রশংসার যোগ্য, অরাতিনিধনকারী কুশলী এবং বহুকীর্ত্তিকলাপ দ্বারা বসুন্ধরাকে বিভূষিত করিয়াছিলেন। আমরা অরাতি-নিধনকারী এই বিশেষণ হইতে বুঝিতে পারিতেছি যে বপ্যট একজন যোদ্ধা ছিলেন এবং যে সে যোদ্ধা ছিলেন না। তিনি প্রসিদ্ধ এবং প্রশংসনীয় যোদ্ধা ছিলেন। যিনি পৃথিবীকে কীর্ত্তির দ্বারা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, অর্থাৎ অনেক মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে—গোপালদেব এবং দেদ্দদেবী হইতে ধর্ম্মপালদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গোপালদেব পালরাজবংশের প্রথম রাজা। গোপালদেবের রাজত্বকাল সম্বন্ধে এবং সিংহাসনারোহণের সময় সম্বন্ধে ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। তারনাথের মতে গোপালদেব প্রায় পঁয়তাল্লিশ বৎসর রাজত্ব করেন। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ প্রভৃতি ঐ মতাবলম্বী। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—"গোপালদেব প্রৌঢ় বয়সে সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন এবং অতি অল্পকাল রাজ্য শাসন করিয়া পরলোক-গমন করিয়াছিলেন। গোপালদেব ৭৯০-৭৯৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।"*

* বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম খণ্ড ১৫৪ পৃষ্ঠা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

* Bengal suffered from prolonged anarchy which became so intolerable that the people (C. A. D. 750) elected as their king one Gopala, of the race of

গোপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র ধর্ম্মপাল গৌড় ও বঙ্গের সিংহাসনারোহণ করেন। গোপালদেব পালবংশের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও পালবংশের প্রকৃত কীর্ত্তিকলাপ এবং বিস্তৃত রাজ্য-সমৃদ্ধি ধর্ম্মপালের সময়েই যে প্রতিষ্ঠালাভ করে সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। ধর্ম্মপাল যেমন দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তেমনি পালরাজাদের গৌরব ও তাঁহার দ্বারাই প্রসারিত হয়। প্রায় সমুদয় উত্তর ভারত তিনি জয় করেন। কাজেই গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপাল কেবল বাঙ্গালা ও বিহারের রাজা ছিলেন তাহা নহে, তিনি বঙ্গ, বিহার ও উত্তর ভারতের নৃপতি ছিলেন।

ধর্ম্মপাল
৭৯৫-৮৩০ খৃষ্টাব্দ

মালদহ জেলার অন্তর্গত খালিমপুর গ্রামের উত্তরাংশে হলকর্ষণ করিতে গিয়া এক কৃষক ধর্ম্মপালের যে তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হয় তাহা ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে কৃষক-পত্নীর নিকট হইতে পরলোকগত উমেশচন্দ্র বটব্যাল মহাশয় ক্রয় করেন। সেদিন হইতেই ইতিহাসের এক নবযুগের অভ্যুদয় হইল। এই তাম্রশাসনখানিই হইতেছে পালবংশীয় দ্বিতীয় নৃপতি ধর্ম্মপালদেবের ভূমিদানের তাম্রশাসন। এই তাম্রশাসনখানি খালিমপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া ইহা খালিমপুরের লিপি নামে পরিচিত। এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেক অজ্ঞাত তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে।

নৃপতি ধর্ম্মপালদেব কিরূপ বীরপুরুষ ছিলেন, কিরূপ দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন তাহা এই তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায়।

তাম্রশাসনখানির সপ্তম শ্লোকে আছে—"সেই রাজা (ধর্ম্মপাল) প্রকট-লীলাচালিত-সেনাবল-সমভিব্যাহারে দিগ্বিজয়ার্থ বহির্গত হইলে, সেনাভারাক্রান্ত বিচলিত পর্ব্বতমালা বক্রভাব প্রাপ্ত হয়; এবং তাহাতে মস্তকস্থিত নম্রীকৃত মণি দ্বারা মস্তকে বেদনা অনুভব করিয়া, সেই বেদনাক্রান্ত শিরঃ সমূহের সাহায্যার্থ হস্তোদ্গম করিয়া, অনন্তদেব অধোদেশে [সেই রাজার] অনতিদূরবর্ত্তিরূপে ত্বরিত পদে অনুগমন করিয়া থাকেন।"

দ্বাদশ শ্লোকে রহিয়াছে—"তিনি মনোহর ভ্রূভঙ্গি-বিকাশে [ইঙ্গিতমাত্রে] ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদু, যবন, অবন্তি, গন্ধার এবং কীর প্রভৃতি বিভিন্ন জনপদের [সামন্ত ?] নরপালগণকে প্রণতি-পরায়ণ-চঞ্চলাবনত-মস্তকে সাধু সাধু বলিয়া কীর্ত্তন করাইতে, করাইতে, হৃষ্টচিত্ত পাঞ্চালবৃদ্ধকর্ত্তৃক মস্তকোপরি আত্মাভিষেকের স্বর্ণকলস উদ্ধৃত করাইয়া, কান্যকুব্জকে [অভিষিক্ত করাইয়া] রাজশ্রী প্রদান করিয়াছিলেন।"—ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় ধর্ম্মপাল কত বড় বীরপুরুষ ছিলেন।

the sea, in order to introduce settled government. The Oxford History of India —By Vincent A. Smith. C. I. E. page 185.

মহাবীর ধর্ম্মপাল রাজা হইয়া প্রথমে বঙ্গদেশ ও বিহার রাজ্যের শাসনব্যবস্থার সুশৃঙ্খলা করেন। পরে তিনি এইরূপ দিগ্বিজয়ে বাহির হইলেন।

এই সময়ে কান্যকুব্জে বা কনোজে ইন্দ্রায়ুধ নামে এক নৃপতি রাজত্ব করিতেন। সেই সময়ে রাজপুতনার ভিল্লমাল নামক নগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করিয়া নাগভট নামক একজন রাজা রাজপুতনা ও মালবদেশ শাসন করিতেছিলেন। এই সময় বিন্ধ্যপর্ব্বতও নর্ম্মদা নদীর দক্ষিণে রাষ্ট্রকূটবংশীয় নৃপতিরা বিশেষ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন। এই নৃপতিদের রাজধানী প্রথমে নাসিক নগরে ছিল পরে উহা মান্যখেত নগরে স্থানান্তরিত হয়। ধর্ম্মপাল রাষ্ট্রকূট-নৃপতি তৃতীয় গোবিন্দের (শ্রীপরবাল) কন্যা রন্নাদেবীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপালের শাসন সময়ে দুইটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। একটি ঘটনা কান্যকুব্জাধিপতি ইন্দ্র [মহেন্দ্র] নামক নরপতির ধর্ম্মপালের হস্তে পরাভব, অপর ঘটনা মহেন্দ্রের রাজ্যে ধর্ম্মপাল কর্ত্তৃক চক্রায়ুধ নামক সামন্ত নরপালের অভিষেক। মহেন্দ্র ধর্ম্মপালকে অসংখ্য সেনাবল লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া, যুদ্ধে পরাভব অনিবার্য্য মনে করিয়া, এতদূর বিহ্বল হইয়াছিলেন যে, ধর্ম্মপালের অসংখ্য সেনাবল যুদ্ধার্থ উৎসুক থাকিলেও, তাহাদিগকে রণশ্রম স্বীকার করিতে হয় নাই,—ধর্ম্মপাল রাজধানীতে উপনীত হইবামাত্রই তাহা অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।*

চক্রায়ুধ বশ্যতা স্বীকার করিলে মহানুভব নৃপতি ধর্ম্মপাল চক্রায়ুধের উপর প্রসন্ন হইয়া কান্যকুব্জে ফিরিয়া চক্রায়ুধের অভিষেক করাইলেন। ধর্ম্মপালের মহত্ত্ব ও বীরত্ব দর্শনে রাজপুতনা ও পঞ্জাবের নৃপতিগণ তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করিলেন।

ভিল্লমালের তেজস্বী রাজা নাগভটের কাছে ধর্ম্মপালের এই বীরত্ব-গৌরব সহ্য হইল না। বাঙ্গালাদেশে যখন অরাজকতা ছিল, বাঙ্গালার রাজারা যখন দুর্ব্বল ছিলেন, তখন নাগভটের পিতা বৎসরাজ বাঙ্গালাদেশ আক্রমণ করিয়া তথায় রক্তস্রোত বহাইয়াছিলেন, বাঙ্গালার দুইটি রাজছত্র কাড়িয়া আনিয়াছিলেন। সেই পদদলিত বাঙ্গলার রাজা আজ সমগ্র পূর্ব্ব ও উত্তর ভারতের সম্রাট হইতে চলিলেন, ইহা নাগভটের সহ্য হইল না। নাগভট প্রকাণ্ড বাহিনী লইয়া কান্যকুব্জ আক্রমণ করিলেন, চক্রায়ুধ পরাজিত হইয়া ধর্ম্মপালের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। এইবার নাগভটের সহিত ধর্ম্মপালের যুদ্ধ হইল। ধর্ম্মপালের শ্বশুর তৃতীয় গোবিন্দ যখন শুনিতে পাইলেন যে তাঁহার জামাতা পূর্ব্ব ভারতপতি ধর্ম্মপাল প্রতীহার-রাজ নাগভটের আক্রমণে বিপন্ন, তখন তিনি বহু সুশিক্ষিত

* গৌড়লেখমালা—২১ পৃষ্ঠা

সৈন্য লইয়া উত্তরা পথে অগ্রসর হইলেন। নাগভট তখন বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। সম্মুখে ধর্ম্মপালের সৈন্য আর পশ্চিমদিকে রাষ্ট্রকূটরাজ গোবিন্দের সৈন্য। নাগভট এইবার পরাজিত হইলেন এবং কোথায় যাইয়া যে লুকাইলেন তাহার আর সন্ধান মিলিল না। নাগভটের পরাজয়ের পর যুদ্ধের উপদ্রব নিবৃত্ত হইল।

ধর্ম্মপাল দীর্ঘকাল উত্তর ভারতের উপর প্রভুত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বাঙ্গালা ও বিহারের সর্ব্বত্র অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। * মহারাজা ধর্ম্মপাল ও পরবর্ত্তী পালরাজগণ প্রস্তরলিপি ও তাম্রশাসনে 'গৌড়াধিপ' ও 'গৌড়েশ্বর' বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। প্রতিহাররাজ ভোজের সাগরতালের শিলালিপিতে ধর্ম্মপালকে **"বঙ্গপতি"** বলিয়া এবং তাঁহার সৈন্যগণকে 'বঙ্গান্' অর্থাৎ বাঙ্গালী বলা হইয়াছে। বঙ্গ পালরাজগণের সাম্রাজ্যভুক্ত না হইলে এইরূপ উক্তির কোনও মূল্য থাকে না। * স্বর্গত ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্র গরুড়স্তম্ভ-লিপির আলোচনা করিতে যাইয়া পাদটীকায় লিখিয়াছেন—"পালবংশীয় নরপালগণ প্রথমে বঙ্গদেশে অধিকার লাভ করিয়া, পরে মগধ জয় করিবার যে কিংবদন্তী তারনাথের গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, (তদধিপ) শব্দে তাহা সমর্থিত হইতেছে। **পাল নরপালগণ যে বাঙ্গালী ছিলেন,** এই বিশেষণ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।"

তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথের মতে ধর্ম্মপাল প্রথমে বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তার করেন এবং পরে গৌড় প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য বিস্তারিত হইয়াছিল। 'ঢাকার

* ধর্ম্মপালের পিতা গোপালদেব প্রকৃতিপুঞ্জ কর্ত্তৃক "মাৎস্যন্যায়" দূরীভূত করিবার উদ্দেশ্যে, সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার কথা ধর্ম্মপালের [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসনে [৩য় শ্লোকে] উল্লিখিত আছে। তারনাথের গ্রন্থেও তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দিনাজপুরের বাদাল প্রস্তর লিপির (গরুড়স্তম্ভলিপির দ্বিতীয় শ্লোকে আছে—সেই গর্গ এই বলিয়া বৃহস্পতিকে উপহাস করিলেন যে,—[শত্রু] ইন্দ্রদেব কেবল পূর্ব্বদিকেরই অধিপতি, দিগন্তরের অধিপতি ছিলেন না, [কিন্তু বৃহস্পতির ন্যায় মন্ত্রী থাকিতেও] তিনি সেই একটী মাত্র দিকেও [সদ্যঃ] দৈত্যপতিগণ কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন, [আর] আমি সেই পূর্ব্বদিকের অধিপতি ধর্ম্ম* [নামক] নরপালকে অখিল দিকের স্বামী করিয়া দিয়াছি।—এই শ্লোকোক্ত ধর্ম্ম নামক রাজা ইতিহাস বিখ্যাত ধর্ম্মপাল। তাঁহার [খালিমপুরে আবিষ্কৃত] তাম্রশাসন তদীয় বিজয় রাজ্যের [দ্বাত্রিংশ-দ্বর্ষীয় দ্বাদশ মার্গ দিনে) পাটলিপুত্রের জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহার পূর্ব্বে আর কখনও পালবংশীয় নরপালগণের শাসন ক্ষমতা মগধে প্রতিষ্ঠিত থাকিবার প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। গৌড়লেখমালা ১১ পৃষ্ঠা

* ঢাকার ইতিহাস—দ্বিতীয় খণ্ড ১৬২ পৃষ্ঠা।
গৌড়লেখমালা ১১ পৃষ্ঠা। পাদটীকা।

ইতিহাস' লেখক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন—"এই সব কারণে মনে হয় ধর্ম্মপাল হয়ত গোপালের জীবিতাবস্থায় বঙ্গের শাসন-ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।" বঙ্গ বলিতে যে সমুদয় পূর্ব্ববঙ্গকে বুঝাইতে সে বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেও অতি বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। [৭৬-৭৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য] *

আমাদের মনে হয় যতীন্দ্র বাবুর এই অনুমান সত্য। এই প্রসঙ্গে আমরা বিক্রম-পুরের নামোৎপত্তির বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া বিস্তারিত ভাবে ইহা আলোচনা করিয়াছি। [৮-৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

ধর্ম্মপাল বৌদ্ধ ছিলেন। তিনি মগধ, বারেন্দ্র ও বঙ্গে তিনটি বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয় তাঁহার পিতা গোপালদেবের জীবিতকালে তিনি যখন বঙ্গে [বিক্রমপুরে] শাসনকার্য্যে ব্রতী, তখনই হয়ত **'বিক্রমপুরী বিহার'** নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন। রাজসাহী জেলার পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্য হইতে যে সকল প্রত্ন-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা হইতে মনে হয় যে পাহাড়পুরের মন্দির ও বিহার এক সময়ে ধর্ম্মপালদেবের সোমপুর মহাবিহার নামে পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী

* (1) Banga the country to the east of and beyond the delta J. A. S. B. 1873, No III and II. Blochman's History and Geography of Bengal.

(2) Banga or the territory east from the Karataya towards the Brahmaputra. The capital of Bengal both before and afterwards, having long been near Dacca in the province of Banga, the name is said to have been Communicated to the whole. [Hamiltons' Hindusthan vol. 1]

* There can be little doubt that a portion, at any rate, of the district of Dacca was included in the ancient kingdom of Pragjyotisha or Kamrup – a passage in the Yogini Tantra distinctly stating that the southern boundary of that kingdom was the junction of the Brahmaputra and Lakshya, which is situated near the modern town of Narayanganj. The early traditions that have come down to us indicate that Dacca and several of the neighbouring districts were originally under the sway of Buddhist kings. According to the Tibetan legends a Buddhist king named Vimala was master of Bangala and Kamrup, and therefore of Dacca. Hiuentsiang who visited Kamrup in the second half of the seventh century states that Samtata, which probably included the Pargana of Bikrampur, was a Buddhist kingdom although the king was a Brahman by caste. In the Raipura thana brass images of Buddhist origin have been discovered and two copper-plates with inscriptions of Buddhist kings. These have been assigned by experts to the end of the eighth and begining of the ninth century and a copper-plate found in the Faridpur district, which is ascribed to the same period, proves that the Bikramapur pargana was also under Buddhist rule. District Cazetteer of Dacca. Page 19.

নৃপতি ধর্ম্মপাল জীবনের প্রথম অবস্থায় যখন বঙ্গে [বিক্রমপুর] শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন তখন বিক্রমপুরী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া থাকিবেন।

তিব্বতদেশীয় ইতিহাসকার লামা তারনাথের মতে ধর্ম্মপাল প্রথমে বঙ্গদেশে আধিপত্য করেন এবং পরে গৌড় প্রভৃতি অঞ্চলে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তারনাথের মতে ধর্ম্মপাল চৌষট্টি বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্ত্তমান কালের ঐতিহাসিকগণ তারনাথের এই উক্তি সমর্থনযোগ্য মনে করেন না। তাঁহারা অনুমান করেন ধর্ম্মপাল দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বৎসরকাল রাজত্ব করেন (৭৭০—৮১৫ খৃষ্টাব্দ)।*

ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। গঙ্গাতীরে নির্ম্মিত তাঁহার বিক্রমশীলার বিহারের খ্যাতি পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন—ধর্ম্মপাল বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি মহাযানমতাবলম্বী বৌদ্ধ ছিলেন।

ধর্ম্মপাল ও তাঁহার পুত্র দেবপালের রাজত্বকালে প্রাচীন নালন্দা মহাবিহার ও ধীমান্ ও তাঁহার ছেলে বীতপাল নামে দুইজন শিল্পী বিশেষ খ্যাতিমান্ হইয়া উঠে এবং তাহাদের নির্ম্মিত দেব-দেবীর মূর্ত্তি সেকালের লোকের বিস্ময় উৎপাদন করিত।

ধর্ম্মপাল বাঙ্গালীজাতির গৌরব সেকালে যে-ভাবে বৃদ্ধি করিয়াছেন তাহাতে বাঙ্গালী জাতির অতীত ইতিহাস চিরসমুজ্জ্বল হইয়া রহিয়াছে। এই বীর সম্রাটের রাজশক্তি সুদূর উত্তর পশ্চিমের সীমা গান্ধার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল।

ধর্ম্মপালের কীর্ত্তি-কথা সেকালের লোকের মুখে মুখে পরিকীর্ত্তিত হইত। খালিমপুরের তাম্রশাসনের ১৩ শ্লোকে লিখিত হইয়াছে—"সীমান্তদেশে গোপগণ কর্ত্তৃক, বনে বনচরগণকর্ত্তৃক, গ্রাম সমীপে জনসাধারণ কর্ত্তৃক [গৃহ] চত্বরে ক্রীড়াশীল শিশুগণ কর্ত্তৃক, প্রত্যেক ক্রয়-বিক্রয় স্থানে বণিক্ সমূহ (?) কর্ত্তৃক, এবং বিলাসগৃহের পিঞ্জরস্থিত শুকগণ

* Dharmapala was a Buddhist, and built a celebrated monastery at Vikramsila, on the bank of the Ganges. He seems to have enjoyed a very long reign, probably of forty five years. (A D 770 815) [The Cambridge shorter History of India. Page 143.]

Dharmapala, like all the members of his house, was a zealous Buddhist. He founded the famous monastery and college of Vikramsila, which probably stood at Patharghata in the Bhagalpur District. The Buddhism of the Pals was very different from the religion or philosophy taught by Gautama, and was a corrupt form of Mahayana doctrine. The Oxford History of India By Vincent A. Smith, C. I. E. pp. 185.

কর্ত্তৃক গীয়মান আত্মস্তব শ্রবণ করিয়া [এই নরপতির] বদনমণ্ডল লজ্জাবশে নিয়ত ঈষৎ বক্র ভাবে বিনম্র হইয়া রহিয়াছে। *

সুপ্রসিদ্ধ 'গৌড়রাজমালা' প্রণেতা বলেন—"এই শ্লোকটি স্তাবকোক্তি বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে না। কারণ, আর কোনও প্রশস্তিতে রাজার সম্বন্ধে বিভিন্ন শ্রেণীর প্রকার অভিমত এরূপ ভাবে উল্লিখিত হইতে দেখা যায় না, এবং বিশেষ কারণ ব্যতীত, এরূপ বিশেষোক্তি ধর্ম্মপালের প্রশস্তিতে স্থান পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। প্রজাপুঞ্জ যাহার পিতাকে রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করাইয়াছিলেন, সেই ধর্ম্মপাল যে প্রজারঞ্জনে যত্নবান হইবেন, এবং তাঁহার যে প্রতিভা এক সময় তাঁহাকে উত্তরাপথের সার্ব্বভৌম পদলাভে সমর্থ করিয়াছিল, সেই প্রতিভাবলে তিনি যে প্রজারঞ্জনে সফলমনোরথ হইবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি?" *

পালবংশীয় নৃপতিদের সহিত 'বঙ্গ' পূর্ব্ববঙ্গের ও বিক্রমপুরের যে বিশেষ সম্বন্ধ ছিল তাহা জানিতে পারা যায়। 'বঙ্গপতি' ধর্ম্মপাল বঙ্গরাজ্যের উপরও প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়াই ঐরূপ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। এজন্যই পরবর্ত্তীকালে পূর্ব্ববঙ্গের নানা অঞ্চলে পালবংশীয় নৃপতিদের নানা শাখার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠার কথা প্রচলন আছে—এবং তাঁহারা ভূ-স্বামী বা ভূঁইয়া নামেও জনগণমধ্যে পরিচিত হইয়াছিলেন। †

* স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলেন—ধর্ম্মপাল কিরূপ লোকপ্রিয় ছিলেন, এই শ্লোকে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। পরবর্ত্তীকালে বরেন্দ্র মণ্ডলের ঘরে ঘরে মহীপালের গীত প্রচলিত হইয়াছিল। হয়ত একসময়ে ধর্ম্মপালের গীত ও সেইভাবে সকল স্থানেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু এই শ্লোক ভিন্ন, তাহার অন্য কোনরূপ উল্লেখ সাহিত্যে বা জনশ্রুতিতে বর্ত্তমান নাই। গৌড়লেখমালা ২২ পৃষ্ঠা।

* রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত 'গৌড়রাজমালা' দ্রষ্টব্য।

† .. .. The next ruler we hear of belonged to the Boonheas or Buddhist Rajahs. Three of the Booneah Rajahs took up their abode in this district, (Dacca) and in that portion of it lying to the north of the Boorganga and Dulleserry where the sites of the capitals are still to be seen. Justpal resided at Moodabpore in the Purgunnah of Toolipabad. Harischandra at Cotabary near Sabar and sesoopal at copassia in Bhowul......(Taylors Topography of Dacca).

"The Bhuya or Buddist Rajas (founders of the Pal dynasty of the kings of Bengal) are the next rulers spoken of. Three of them took their abode in this district, to the north of Booriganga and Dhaleswary, where the sites of their Capital are still to be seen." Hunters' statistical Account of Dacca, P. 118.
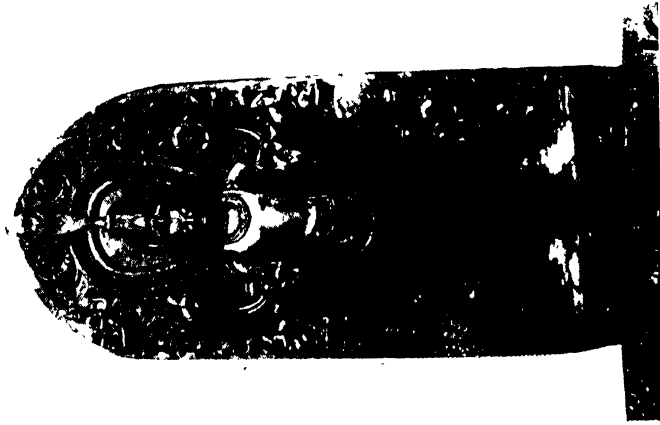
সূর্য্য-মূর্ত্তি
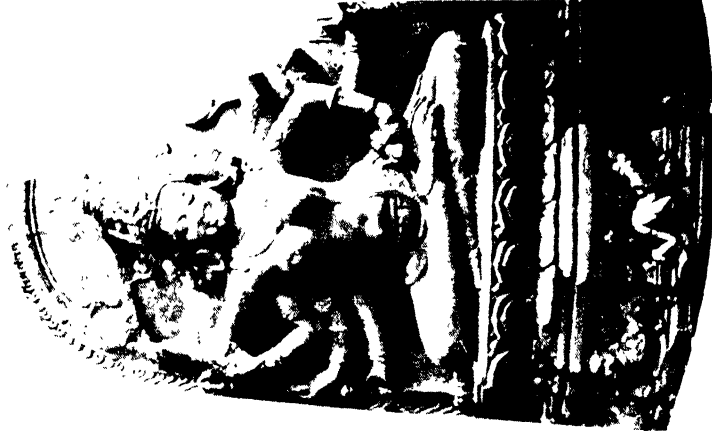
[রঘুরামপুরের খননে প্রাপ্ত]

ভ্রুকুটি তারা

জৈনসারের নিকটবর্ত্তী ভবানীপুর গ্রামে প্রাপ্ত। এই মূর্ত্তিটির নাম অনুসারেই সম্ভবতঃ গ্রামটির নাম ভবানীপুর হইয়াছিল। মূর্ত্তিটি নবম বা দশম শতাব্দীর বলিয়া অনুমিত হয়। উহা ঢাকা-সাহিত্য-পরিষদ গৃহে সংরক্ষিত আছে।

হেরুকা

[রামপালে প্রাপ্ত]

[শ্রীযুক্ত কালীপদ মৈত্র মহাশয়ের সৌজন্যে]

দেবপালদেবের "মুঙ্গেরলিপি" [১৭৮০ খৃষ্টাব্দে মুঙ্গের নগরে কর্ণেল ওয়াট্‌সন্ কর্ত্তৃক এই তাম্রপট্টলিপি আবিষ্কৃত হয়। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় এই তাম্রপট্টলিপির একটি লিথোগ্রাফ মুদ্রিত হইয়াছিল। ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে চার্লস উইল্‌কিন্স এই প্রাচীন লিপির পাঠোদ্ধার করিয়াছিলেন।]—এই লিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে দেবপালদেব—"নির্ম্মলচেতা সংযতবাক্ পবিত্রকায়-কর্ম্মনিরত, বোধিসত্ত্ব যেমন নিরুপদ্রব বুদ্ধপদ লাভ করেন, নির্ম্মলচেতা সংযতবাক্ পবিত্রকায়-কর্ম্ম-নিরত দেবপালদেবও সেইরূপ নিরুপদ্রব পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

একদিকে হিমালয়, অপরদিকে শ্রীরামচন্দ্রের কীর্ত্তিচিহ্ন সেতুবন্ধ,—একদিকে বরুণ-নিকেতন অপরদিকে লক্ষ্মীর জন্মনি-কেতন [ক্ষীরোদ সমুদ্র] এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন সমগ্র ভূমণ্ডল সেই রাজা নিঃসন্তপ্তভাবে উপভোগ করিয়াছেন।"

আজ পর্য্যন্ত দেবপালদেবের একখানি শিলালিপিও একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। কথিত আছে দেবপালের সেনাপতি **লাউসেন** বা **লবসেন** আসাম ও কলিঙ্গ রাজ্য পাল সাম্রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। দেবপাল **বিহার, বঙ্গ** এবং **আসামের** উপর যে আধিপত্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহা সুবিদিত।

"অরিনৃপতিমুকুটঘটিত চরণঃ সকল ভুবনবন্দিত শৌর্য্যঃ।
বঙ্গাঙ্গ মগধ মালব বেঙ্গীশৈরর্চ্চিতোঽত্তিশয় ধবলঃ॥

রাষ্ট্রকূট-নৃপতি প্রথম অমোঘবর্ষের সিরুর ও নীলখণ্ডে আবিষ্কৃত শিলালিপিদ্বয় হইতে জানা যায় যে, অঙ্গ-বঙ্গ, মগধ ও বেঙ্গীর অধিপতিগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিয়াছিলেন।*

কাজেই ইহা সহজেই বুঝিতে পারা যায় যে **বঙ্গ—পূর্ব্ববঙ্গ** বা **বিক্রমপুর** ও দেবপালের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।

* The Sirur inscription claims that worship was done to him by the kings of *Anga*, *Vanga*, Magadha, Malava and Vangis. As regards *Anga*, *Vanga*, and *Magadha* places which lay very far to the East, in the directions of Bengal,—the assertion is doubtless hyperbolical." Bombay Gazetteer. Vol I. part II page 402 (১) Epigraphica Indica for V. P. 211. (২) Epigraphica Indica vol IX P, 5

গরুড়স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে দর্ভপাণি দেবপালের প্রধান অমাত্য ছিলেন। দেবপাল, মন্ত্রী দর্ভপাণিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। উহার ষষ্ঠ শ্লোকে লিখিত আছে—"নানা-মদমত্ত-মতঙ্গজ-মদবারি-নিষিক্ত-ধরণীতল-বিসর্পি-ধূলিপটলে দিগন্তরাল সমাচ্ছন্ন করিয়া, দিক্‌চক্রাগত-ভূপালবৃন্দের চিরসঞ্চরমান-সেনা সমূহ যাঁহাকে নিরন্তর দুর্ব্বিলোক করিয়া রাখিত, সেই দেবপাল [নামক] নরপাল [উপদেশ গ্রহণের জন্য] দর্ভপাণির অবসরের অপেক্ষায় তাঁহার দ্বারদেশে দণ্ডায়মান থাকিতেন। গৌড়লেখমালা। গরুড়স্তম্ভলিপি ৭৮ পৃষ্ঠা।

দেবপালের মন্ত্রীর নাম ছিল দর্ভপাণি। দর্ভপাণির নীতি-কৌশলেই দেবপাল হিমালয় হইতে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত সমস্ত ভূমি দেবপালের অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহা হইতেই এইরূপ অনুমান করা যায় যে মান্যখেট বা খেতের রাষ্ট্রকূটবংশ এবং ভিন্নমালের গুর্জ্জর-প্রতীহারবংশ এই দুই বংশের সহিত যুদ্ধ করিয়া দেবপাল আপনার পৈত্রিক-রাজ্য সগৌরবে সুরক্ষিত রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। (১)

দেবপাল প্রায় উনচল্লিশ বৎসর রাজত্ব করিয়া পরলোক গমন করেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন এবং বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন।

দেবপালের মৃত্যুর পর ক্রমশঃ পালবংশের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়। গুর্জ্জর-প্রতীহার নৃপতিরা প্রবল হইয়া উঠেন এবং ক্রমশঃ মগধ, ত্রিহুত এমন কি বরেন্দ্র বা উত্তর-বঙ্গ পর্য্যন্ত অধিকার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

পাহাড়পুরের ভগ্নস্তূপের মধ্যে গুর্জ্জর-প্রতীহার রাজ মহেন্দ্রপালের শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতেও এ-কথা সপ্রমাণ হয়।

দেবপালের পর বিগ্রহপাল প্রথম গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইনি শূরপাল নামেও পরিচিত।

নৃপতি প্রথম বিগ্রহপাল বানপ্রস্থ অবলম্বন কবিয়াছিলেন। তাঁহার পরে—তদীয় পুত্র—নারায়ণ পালদেব গৌড়-বঙ্গের সিংহাসনে আরোহণ করেন।—সমুদ্র-পত্নী [জহ্নু কন্যা] জাহ্নবীর ন্যায় হৈহয় [রাজ] বংশ ভূষণস্বরূপা লজ্জানাম্নী [কন্যা] তাঁহার [বিগ্রহপাল] পত্নী হইয়াছিলেন। [সেই লজ্জাদেবীর] বিশুদ্ধ চরিত্র তদীয় পিতৃবংশের এবং পতিবংশে পরম "পাবন-বিধি" বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।" বিগ্রহপাল—"আমার পক্ষে তপস্যা এবং তোমার পক্ষে রাজ্য"—এইরূপ বলিয়াই তিনি বানপ্রস্থ অবলম্বনপূর্ব্বক পুত্র বিগ্রহপালকে রাজ্য দান করিয়াছিলেন।"

নারায়ণপালদেব দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত একখানা তাম্র-শাসন ভাগলপুরে আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া উহা "ভাগলপুরলিপি" নামে সুপরিচিত। এই তাম্রশাসন কলিকাতা এসিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে রক্ষিত আছে। নারায়ণ পালের রাজত্বের সপ্তদশবর্ষ রাজত্বকালে এই তাম্রশাসনখানি প্রদত্ত হইয়াছিল। এবং উহা—"**সৎসমতট-জন্মা-শুভদাস-পুত্র শ্রীমান্ মংখদাস** নামক শিল্পি কর্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় **সমতট নামে নগর যে বিদ্যমান** ছিল তাহা নিঃসন্দেহ এবং সমতটনগর নাম হইতে এক বিস্তৃত ভূ-ভাগের নাম **সমতট** হওয়া অসম্ভব নহে। এই প্রসঙ্গে অনুসন্ধিৎসু পাঠককে ডাক্তার শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক

লিখিত **"সমতটের রাজধানী"** শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। [সাহিত্য ২৫ শ বর্ষ, ৬ সংখ্যা। অশ্বিন ১৩২১।]

দেবপালের মৃত্যুর পর বিগ্রহপাল এবং নারায়ণপালের সময় হইতেই পালরাজবংশের অবনতি হইতে আরম্ভ হয়।

দ্বিতীয় বিগ্রহপালের মৃত্যুর পর মহীপালদেব যখন সিংহাসনে বসিলেন, তখন উত্তর-বঙ্গ পালরাজগণের হস্তে ছিল না। **দক্ষিণ ও পূর্ব্ববঙ্গ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি** জেলায় তখন পালরাজগণের রাজত্ব মাত্র বিদ্যমান ছিল। এক কথায় কেবলমাত্র সমতটের আধিপত্যই লাভ করেন।

মহীপালদেব বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি ধীরে ধীরে নিজশক্তি বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বাণগড়-লিপি হইতে জানিতে পারি "বিগ্রহপাল তদীয় অভ্রতুল্য সেনা-গজেন্দ্রগণ [প্রথমে] জল প্রচুর পূর্ব্বাঞ্চলে স্বচ্ছ সলিল পান করিয়া, তাহার পর [তদনু] মলয়োপত্যকার চন্দন-বনে যথেচ্ছ বিচরণ করিয়া, ঘনীভূত শীতল-শীকরোৎ-ক্ষেপে তরু-সমূহের জড়তা সম্পাদন করিয়া, হিমালয়ের কটকদেশ উপভোগ করিয়া-ছিলেন।" তাঁহার পুত্র শ্রীমহীপালদেব রণক্ষেত্রে বাহুদর্প-প্রকাশে সকল বিপক্ষ পক্ষ নিহত করিয়া 'অনধিকৃত বিলুপ্ত' পিতৃরাজ্যের উদ্ধার সাধন করিয়া, রাজগণের মস্তকে চরণপদ্ম সংস্থাপিত করিয়া, অবনিপাল হইয়াছিলেন।

মহীপালদেব আপনার পূর্ব্বপুরুষগণের হস্তচ্যুত রাজ্য পুনরায় অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গৌড়, মগধ প্রভৃতি অধিকার করিয়া এমন কি কাশী পর্য্যন্তও আপনার রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই পুনরধিকৃত এই রাজ্য বিদেশীয়েরাও সময় সময় আক্রমণ করিতে ইতস্তত: করেন নাই।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে—"মহীপালদেবের পিতার কোনরূপ বীরকীর্ত্তির উল্লেখ নাই। তাঁহাকে সূর্য্য হইতে 'চন্দ্র' রূপে উদ্ভূত বলিয়া এবং তজ্জন্য তাঁহাতে "কলাময়'ত্বের, আরোপ করিবার সুযোগ পাইয়া, কবি ইঙ্গিতে তাঁহার ভাগ্যবিপর্য্যয়ের আভাস প্রদান করিয়া থাকিবেন। তাঁহার সেনা-গজেন্দ্রগণের [আশ্রয়-স্থানাভাবে] নানাস্থানে পরিভ্রমণ করিয়া, শিশির-সংক্ষুব্ধ হিমাচলের অধিত্যকায় আশ্রয় লাভের কথায়, এবং তৎপরবর্ত্তী শ্লোকে মহীপালদেবের "অনধিকৃত বিলুপ্ত" পিতৃরাজ্য পুনঃপ্রাপ্তির কথায়, দ্বিতীয় বিগ্রহপালদেবের শাসন সময়েই পাল-সাম্রাজ্যের প্রথম ভাগ্য-

*গৌড়লেখমালা—১০০ পৃষ্ঠা

বিপর্য্যয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।* স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এ বিষয়ে লিখিয়াছেন—"মৈত্রেয় মহাশয়ের উক্তি সম্পূর্ণরূপে বিজ্ঞান সম্মত।* তাঁহার মতে "প্রথম মহীপালদেব পালরাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহপালের রাজ্যকালে বরেন্দ্র বা উত্তর-বঙ্গ কাম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ চন্দেল্লবংশীয় যশোবর্ম্মার সাহায্যে গুর্জ্জর-রাজ মহীপাল মগধ পুনরধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং মহীপালদেব, পিতার মৃত্যুর পরে, রাঢ় ও বঙ্গদেশের কিয়দংশের অধিকার মাত্র, উত্তরাধিকারীসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহীপাল স্বয়ং বরেন্দ্রী, মগধ ও তীরভুক্তি, এমন কি বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের রাজত্বের তৃতীয়বর্ষের পূর্ব্বে **বঙ্গ বা সমতট** অধিকৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া পালরাজগণ সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।†" আমরা এ বিষয়ে পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি।

ইহা হইতে সহজেই অনুমিত হয় যে **গৌড়বঙ্গাধিপ** পাল নৃপতিরা ধর্ম্মপাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই শাসনকর্ত্তারূপে বা বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া নিরাপদে বাস করিয়া শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য জল প্রচুর পূর্ব্বাঞ্চলে [বিক্রমপুরে] রাজধানীতে বাস করিয়া ও শাসনদণ্ড পারিচালনা করিতেন।

মহীপালদেব প্রথম আনুমানিক ৯৮০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসন আরোহণ করেন। পাল-

মহীপালদেব প্রথম ৯৮০ খৃঃ অঃ হইতে ১০৩০ খৃঃ অঃ

রাজাদের মধ্যে মহীপাল বেশ জনপ্রিয় নৃপতি ছিলেন। তাঁহার সম্বন্ধে বিবিধ গীতাবলী আজও শ্রুত হওয়া যায়।†

*গৌড়লেখমালা, পৃষ্ঠা, ১০০ পাদটীকা।

*বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২১১ পৃষ্ঠা। †The Dacca Review, May, 1914. Page 55.

† Of all the Pala kings he is the best remembered, and songs in his honour, which used to be sung in many parts of Bengal until recent times, are still to be heard remote corners of Orissa and Kuchbihar." Dt. Gazetteer Rajshahi page 26.

বঙ্গদেশের সুবিখ্যাত মহীপাল দীঘি এখনও সেই নিশ্চিহ্ন জনপ্রিয় রাজার প্রধান কীর্ত্তি স্বরূপ বিদ্যমান আছে। এই দীঘি রঙ্গপুরের অতি সন্নিহিত। তিনি প্রজাদিগকে স্বীয় চরিত্রের নানা গুণে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার কীর্ত্তিকলাপ সম্বন্ধে পল্লীগাথা এখনও উত্তর বঙ্গে গীত হইয়া থাকে। "ধান ভানতে মহীপালের গীত" এই

প্রথম রাজেন্দ্রচোলদেব ১০১১ খৃষ্টাব্দে চোল সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রচোল তাঁহার রাজত্বের নবম ও ত্রয়োদশ বৎসরে [১০২০ হইতে ১০২৪ খৃষ্টাব্দের] মধ্যে ওড্ড-বিষয়, কোশল-নাড়ু, **বঙ্গালদেশ** প্রভৃতি আক্রমণ করিয়াছিলেন। সারনাথের শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি যে গৌড়াধিপ মহীপাল ১০৮৩ সম্বতে [১০২৬] জীবিত ছিলেন। সুতরাং প্রথম রাজেন্দ্রচোল "ওড্ড-বিষয়" বা উড়িষ্যা তক্কণলাড়ম্ বা দক্ষিণরাঢ় এবং "**বঙ্গালদেশ**" বা বঙ্গ আক্রমণ করিতে গিয়া যে মহীপালের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, সেই মহীপাল অবশ্য পালবংশীয় মহীপাল। তিরুমলয়ের লিপিতে যে-ভাবে প্রথম রাজেন্দ্রচোলের দিগ্বিজয়-বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে' তাহা পাঠে মনে হয় তিনি গৌড়রাজ্যের দাক্ষিণাংশ আক্রমণ করিয়াছিলেন। তারনাথ লিখিয়া গিয়াছেন,—উড়িষ্যার রাজা মহীপালকে কর প্রদান করিতেন। চোলরাজ সম্ভবতঃ উড়িষ্যা, বঙ্গ এবং রাঢ়ের সামন্তগণকে পরাভূত করিয়াছিলেন ; এবং মহীপালের সহিত সম্মুখ যুদ্ধের পরেই হউক, বা পূর্ব্বেই হউক, আর অধিক দূর অগ্রসর হওয়া যুক্তিযুক্ত

রাজেন্দ্রচোলের বঙ্গালদেশ আক্রমণ [১০২০-১০২৪ খৃঃ অঃ]

প্রবাদ বাক্য বাঙ্গলার ঘরে ঘরে প্রচলিত। ষোড়শ শতাব্দীতে বৃন্দাবন দাস চৈতন্যের পূর্ব্বে বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন :

"যোগীপাল ভোগীপাল মহীপাল গীত
ইহা শুনিতে যে লোকে আনন্দিত।"

বৃহৎবঙ্গ—ডাঃ শ্রীদীনেশচন্দ্র সেন ২৬২ পৃষ্ঠা।—তিরুমালয়-পর্ব্বত মান্দ্রাজ-প্রেসিডেন্সির উত্তর-আর্কট জেলার অন্তর্ভুক্ত। এই লিপির মূল উদ্ধৃত করা অসম্ভব। তৎ পরিবর্ত্তে উদ্ধৃত অংশের ডাক্তার হল্‌ৎ (Hultz Scle) কৃত ইংরাজী অনুবাদ প্রদত্ত হইল।...... In the 13 th year (*of the reign*) of King. Parakesarivarman *alias* the lord Sri-Rajendra-Choladeva, who......seized by (his) great, warlike army (the following)......odda-vishaya which was difficult to approach, (*and which he subdued in*) close fights ; the good Kosalainadu, where Brahmans assembled ; Tandubutti, in whose gardens bees abounded (*and which he acquired*) after having destroyed Dharmapala (in) a hot battle ; Takkanaladam whose fame reached (all) directions, (*and which he occupied*) after having forcibly attacked Ranasura ; *Vangala-desha*, where the rain-wind never stopped, (*and from which*) Govindachandra fled, having descended from his male elephant ; elephants of rare strengths and treasures of women, (which he seized) after having been pleased to put to flight on a hot battle-field Mahipala, decked (as he was) with ear-rings, slippers, and bracelets ; Uttiraladam, as rich in pearls as the ocean ; and the Ganga, whose waters dashed against bathing places covered with sand." Epigraphica Indica, vol. VII, Appendix, List of Ins. of also see No 727—728 India No 729—গৌড়রাজমালা ৩৯—৪১ দ্রষ্টব্য

বিবেচনা না করিয়া, স্বরাজ্যে ফিরিয়া গিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ী চোলরাজ গৌড়রাজ্যের কোন অংশ স্থায়ীভাবে অধিকার করিয়াছিলেন, এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় না।

"পরকেশরী বর্ম্মা বা শ্রীরাজেন্দ্র-চোলদেবের (রাজত্বের) ত্রয়োদশ বৎসরে—যিনি······ তাঁহার মহান্ সমর-পটু সেনা দ্বারা (নিম্নোক্ত দেশ সকল) অধিকার করিয়াছেন—দুর্গম ওড্ড-বিষয়, (যাহা তিনি) প্রবল যুদ্ধে (পদানত করিয়াছিলেন); মনোরম কোশল-নাড়ু, যেখানে ব্রাহ্মণগণ মিলিত হইয়াছিল; মধুকর-নিকর-পরিপূর্ণ-উদ্যানবিশিষ্ট তন্দবুত্তি ভীষণ যুদ্ধে ধর্ম্মপালকে নিহত করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; সকল দিকে প্রসিদ্ধ তক্কণলাড়ম্, সবেগে রণশূরকে আক্রমণ করিয়া তিনি যে দেশ অধিকার করিয়াছিলেন; বঙ্গালদেশ, যেখানে ঝড়বৃষ্টির কখনও বিরাম নাই, এবং গজ-পৃষ্ঠ হইতে নামিয়া যেখান হইতে গোবিন্দচন্দ্র পলায়ন করিয়াছিলেন; কর্ণভূষণ চর্ম্মপাদুকা এবং বলয় বিভূষিত মহীপালকে ভীষণ সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়া তিনি তাঁহার অদ্ভুত বলশালী করিসমূহ এবং রত্নোপমা রমণীগণকে হস্তগত করিয়াছিলেন; সাগরের ন্যায় রত্নসম্পন্ন উত্তিরলাড়ম্; বালুকাময়-তীর্থ-ধৌতকারিণী গঙ্গা।

মহীপাল গৌড়ের সিংহাসন লাভ করিবার কিছুকাল পরেই মুসলমানগণের উত্তরাপথ বিজয়ের সূত্রপাত হইতে থাকে।

সুলতান মামুদের ভারত আক্রমণ-ফলে যখন উত্তর-ভারতের প্রসিদ্ধ নৃপতি জয়পাল, আনন্দপাল প্রভৃতি অনেকেই রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন যখন একে একে কান্যকুব্জ, গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, সোমনাথ প্রভৃতি স্থান বিজয়ী আক্রমণকারীর আক্রমণে বিধ্বস্ত হইতেছিল, সে সময়ে গৌড়ের নৃপতি মহীপাল যে কোনও যুদ্ধে যোগদান করিয়াছিলেন এইরূপ কিছুই জানা যায় না।

মহীপালকে সেই সময়ে পরের মঙ্গলমন্দিরে জীবনোৎসর্গ করিতে দেখা গিয়াছিল। সেই সমুদয় অতুলনীয় কীর্ত্তি আজিও পুণ্যশ্লোক নৃপতি মহীপালের নাম গৌরবের সহিত স্মরণ করাইয়া দিতেছে। মুর্শিদাবাদ জেলায় [রাঢ়দেশে] খনিত তাঁহার "সাগরদীঘি", এবং বরেন্দ্র (দিনাজপুর জেলায়) "মহীপালদীঘি" আজিও মহীপালের কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে। * এতদ্ব্যতীত তিনটি বৃহৎ নগরের ভগ্নাবশেষ—বগুড়া জেলার

* Mahipal-dighi. This is a large tank by the side of the Malda road about 18 miles south-west of Dinajpur in the Bansihari thana. It is thus described by Buchanan Hamilton :—

"In the north-east part of this division is a very large tank, supposed to have been dug by Mohipal Raja and called after his name. The sheet of water extends

অন্তর্গত **"মহীপুর"**, দিনাজপুর জেলায় **"মহীসন্তোষ"** এবং মুর্শিদাবাদ জেলায় **"মহীপাল"**, মহীপালের নামের সহিত জড়িত রহিয়াছে। গৌড়াধিপ মহীপালের বারাণসীধামেও অনেক কীর্ত্তি রহিয়াছে। সারনাথের প্রাপ্ত একখানা লিপি হইতে জানা যায় যে—"গৌড়াধিপ মহীপাল বারাণসীধামে, স্থিরপাল এবং বসন্তপালের দ্বারা ঈশান (শিব) ও চিত্রঘণ্টার (দুর্গার) মন্দিরাদি [কীর্ত্তিরত্নশতানি] প্রতিষ্ঠিত করাইয়াছিলেন, মৃগদাবের (সারনাথের) "ধর্ম্মরাজিকা" বা অশোকস্তূপ এবং অশোকের স্তম্ভোপরস্থিত "সাঙ্গ-ধর্ম্মচক্রের" জীর্ণ-সংস্কার করাইয়াছিলেন এবং অভিনব "শৈলগন্ধকুটী" নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সারনাথের লিপিতে মনে হয় যে—"বারাণসী তখন গৌড়-রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত ছিল।"

মহীপালের রাজত্বকালেই গৌড়রাষ্ট্রে বৌদ্ধশ্রমণদের একটি সম্মেলন হইয়াছিল এবং তদুপলক্ষে তিব্বত হইতেও অনেক বৌদ্ধশ্রমণ আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ১০৩০ খৃষ্টাব্দে এই মিলন সভার অধিবেশন হইয়াছিল।

প্রথম মহীপালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নয়পালদেব **গৌড়, মগধ, বঙ্গের** সিংহাসনে আরোহণ করেন। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তাম্রশাসন হইতে যে তিনি—"সমস্ত নরপালগণের মস্তকে পদ-বিন্যাস করিয়া, সকলদিকেই প্রতাপ বিস্তৃত করিয়া অজ্ঞানান্ধকারবিনাশী স্নিগ্ধ প্রকৃতি লোকানুরাগভাজন ছিলেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। নৃপতি নয়পাল পিতৃরাজ্য সুরক্ষিত রাখিতে পারিয়াছিলেন।

নয়পাল, বিক্রমপুরবাসী বিখ্যাত পণ্ডিত **দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে** (অতীশ) বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের জ্ঞানের জ্যোতিঃ বহন করিয়া গিয়াছিলন।

3,800 feet from north to south and 1,100 feet from east to west. Its depth must be very considerable, as the banks are very large. On the banks are several small places of worship, both Hindu and Moslem, but none of any consequence; nothing remains to show that Mohipal ever resided either at the tank or at Mohipur, near it, but there is a vast number of bricks, and some stones, that probably belonged to religious buildings that have been erected by the person who constructed the tank. One of the stones is evidently the lintel of a door and of the same style as those at Bannagar and may have been brought from the ruins of that city. The people in the neighbourhood have an idea that there has been a building in the centre of the tank; but there is probably devoid of truth, as there is no end to the idle stories which they relate concerning the tank and Mohipal. Both are considered as venerable or rather awful and the Raja is frequently invoked in times danger." District Gazetteer, Dinajpur, page 138.

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন বিক্রমশীলা-বিহারের অধ্যক্ষ, সে সময়ে গৌড়েশ্বর নয়পালের সহিত কর্ণদেবের যুদ্ধ হইয়াছিল।—"দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যখন বজ্রাসনে অর্থাৎ মহাবোধিতে বাস করিতেছিলেন, সেই সময়ে মগধরাজ নয়পালের সহিত তীর্থিকধর্ম্মাবলম্বী কর্ণ্যরাজ্যের বিবাদ হইয়াছিল। কর্ণ্যরাজ মগধ আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি নগর অধিকার করিতে না পারিয়া কতকগুলি বৌদ্ধ-বিহার মন্দিরাদি ধ্বংস করিয়াছিলেন। পরে নয়পালের সেনা জয়লাভ করিলে কর্ণরাজের সেনাগণ যখন নিহত হইতেছিল, তখন শ্রীজ্ঞান তাহাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টায় যুদ্ধ স্থগিত হইয়া সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল।"

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান
(অতীশ)

এ প্রসঙ্গে "গৌড়রাজ-মালা" লেখক বলেন যে—নয়পাল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানকে বিক্রমশীলার-বিহারের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করিয়াছিলেন। প্রথম যুদ্ধে গৌড়সেনা "কর্ণ্য" রাজের সেনা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল, এবং শত্রুগণ রাজধানী পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। কিন্তু নয়পালই জয়লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের যত্নে উভয় পক্ষে মৈত্রী স্থাপিত হইয়াছিল। দীপঙ্কর-শ্রীজ্ঞানের জীবন-চরিতকার বুস্তন তাঁহার নিজের শিষ্য ছিলেন। সুতরাং বুস্তনের প্রদত্ত মগধ-আক্রমণ-বিবরণ অবিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু কোন্ রাজ্যকে যে বুস্তন "কর্ণ্য" নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন, তাহা নিরূপণ করা কঠিন। "কর্ণ্য" শব্দ যদি রাজ্যের নাম রূপে গ্রহণ না করিয়া রাজার নাম মনে করা যায়, তবে এই সমস্যা পূরণ করা যাইতে পারে। চেদির কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেবের পুত্র কর্ণ্য নয়পালের জীবদ্দশায়, [১০৩৭ হইতে ১০৪২ খৃষ্টাব্দ] মধ্যে পিতৃ-সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। কর্ণের পৌত্রবধূ অহ্লনা দেবীর [ভেরঘাটে প্রাপ্ত] শিলালিপিতে উক্ত হইয়াছে, কর্ণের ভয়ে "কলিঙ্গের সহিত বঙ্গ কম্পমান ছিল।" অহ্লনাদেবীর পুত্র জয়সিংহদেবের [কর্ণ বলে প্রাপ্ত] শিলালিপিতে সূচিত হইয়াছে—গৌড়াধিপ গর্ব্ব ত্যাগ করিয়া কর্ণের আজ্ঞা বহন করিতেন। কর্ণ চিরজীবন প্রতিবেশী রাজন্তবর্গের সহিত বিরোধ রত ছিলেন। সুতরাং নয়পালের সময়ে মগধ-আক্রমণ তাঁহার পক্ষে অসম্ভব নহে। এবং সেই আক্রমণের পরিণাম সম্বন্ধে বুস্তন যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই হয়ত ঠিক্ * নয়পালদেব সম্ভবতঃ কুড়ি বৎসর কাল গৌড়ের সিংহাসনে আসীন ছিলেন এবং আনুমানিক ১০৪৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল।

* Journal of the Buddhist Text Society vol, I, 1903, pp 9-10, [Edited by Rai Saratchandra Das Bahadur,]

* (1) Epigraphica Indica vol, VIII, App, I.
(2) I bid' vol II, p, 11 (3) Indian Antiquary, vol, X VII p. 2 7.

দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান

স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন,—"নয়পালদেবের রাজ্যকালে বৈদ্যজাতির প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল; বৈদ্য গ্রন্থকার চক্রপাণিদত্ত নয়পালদেবের রন্ধনশালার অধ্যক্ষ ছিলেন। জনার্দ্দন-মন্দিরের প্রশস্তি বাজীবৈদ্যসহদেব কর্ত্তৃক এবং গদাধর-মন্দিরের প্রশস্তি বৈদ্যবজ্রপাণি কর্ত্তৃক রচিত হইয়াছিল। এই খোদিত লিপিদ্বয়ে শিল্পীর অনবধানতা-প্রযুক্ত বহু ভুল সত্বেও রচয়িতৃগণের বিদ্যার ও রচনা-কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। নয়পালদেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল গৌড়-মগধ-বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। **নয়পালদেবের-রাজ্যকালে বিক্রমপুরবাসী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নালন্দা মহাবিহারের সঙ্ঘস্থবির নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিব্বতরাজের অনুরোধে শ্রীজ্ঞান তথায় গমন করিয়াছিলেন।** *

বৌদ্ধদের নিকট দীপঙ্করের নাম সুপ্রসিদ্ধ। বঙ্গদেশের একান্ত সৌভাগ্যবশতঃ তিনি বঙ্গদেশে বাঙ্গালীর গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহার কথা বাঙ্গালীদের মধ্যেও অতি অল্প লোকেই জানেন। যে মহাপুরুষ তিব্বতের আদি ও শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মপাল মহাত্মা ব্রহ্মতনের দীক্ষা-গুরু, যাঁহার নাম শুনিবা মাত্র প্রধান লামা ও চীনের সম্রাট্ একসময়ে সসম্ভ্রমে আসন পরিত্যাগ করিয়া উদ্দেশে প্রণাম করিতেন, তিনি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন এ কথা ভাবিলেও আনন্দ হয়।

বৌদ্ধ-জগতে দীপঙ্কর

আমরা বৌদ্ধ গ্রন্থাদি হইতে জানিতে পারি যে দীপঙ্কর আনুমানিক ৯৮০ কিংবা ৯৮২-৯৮৩ খৃষ্টাব্দে গৌড়ান্তঃর্গত বাঙ্গালাদেশের বিক্রমপুর-বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আমি "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছিলাম—"বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে বৌদ্ধ মহাতান্ত্রিক দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ জন্মগ্রহণ করেন।" প্রাচীন বিক্রমপুর নগরীর বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। দীপঙ্করের জীবনী-লেখক বলেন—"He was born in the central palace called Suvarnadhvaja [Dhvaja-ensigns of royalty] of the city of *Vikrampuri* in Bāngala. পাগ্‌সাম্‌জন্‌ জং এর মতে তাঁহার জন্মভূমি বিক্রমপুর বজ্রাসনের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত। (১) অনেকে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের বজ্রযোগিনী গ্রামের পশ্চিমে বজ্রাসন বিহার ছিল বলিয়া অনুমান করেন। বজ্রাসন বলিতে সাধারণতঃ বুদ্ধগয়াকে বুঝায়। 'বজ্রাসন' শব্দের অপভ্রংশ হইতেছে বাজাসন। পশ্চিমে ঢাকা জেলার নায়া ও

অতীশ দীপঙ্কর

* (১) গৌড়লেখমালা ৪৫ পৃষ্ঠা (২) Indian Pandits in the land of snow, by Rai Bahadur Sarat Chandra Das C. I, E. pp. 51-71. বাঙ্গালার ইতিহাস (প্রথমখণ্ড) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩৪-৩৫ পৃষ্ঠা। Memoirs of Asiatic Society Bengal, Vol. V. P. 77.79. শিবদাস সেন, সম্পাদিত চক্রদত্ত, ১৩০২ সাল, ৪০৭ পৃষ্ঠা। Pag -Sam-Jon zang X. C. VII. Index. P.:97.

সুয়াপুর নামে দুইটি গ্রাম আছে, এই দুই পল্লীর সন্ধি স্থলে একটি বড় রকমের বিহার ছিল তাহা এখন উচ্চ ঢিপিতে পরিণত হইয়াছে। ঐ ঢিপিগুলির নাম 'বাজাসনের ভিটা'।

দীপঙ্করের পিতার নাম ছিল কল্যাণশ্রী (তিব্বতীয় নাম Dge-vahi) এবং তাঁহার মাতার নাম ছিল প্রভাবতী। বাল্যকালে পিতামাতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন চন্দ্রগর্ভ। দীপঙ্কর যখন বালক মাত্র তখন তাঁহাকে শিক্ষার জন্য জেতারি নামক একজন অবধূতের নিকট প্রেরণ করা হয়। জেতারির নিকট দীপঙ্কর বর্ণ-শিক্ষা ও প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়া পরে পঞ্চ বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করিবার জন্য মনোযোগী হইলেন।

এই জেতারি কে ছিলেন তাঁহার সম্বন্ধে সঠিক্ ভাবে বলা কঠিন। পাগ্ সাম্‌জন্‌ জংয়ের মতে জেতারি বরেন্দ্রের সনাতন নামক এক রাজার ঔরসে ও জনৈকা যোগিনী উপপত্নীর [*yogini concubine*] গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম ছিল গর্ভপাদ। পাল রাজাদের অধীনে সনাতন ছিলেন একজন সামন্ত নৃপতি। আর জেতারি ছিলেন তাঁহারই সভার একজন সভাসদ্। খৃষ্টিয় দশম শতাব্দীর শেষভাগে তিনি আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কথিত আছে বরেন্দ্র নৃপতি সনাতন একজন ব্রাহ্মণজাতীয় বৌদ্ধ [Brahman-Buddhist] আচার্য্যের নিকট তান্ত্রিক দীক্ষালাভ করেন এবং তৎ সম্বন্ধে সিদ্ধি লাভের জন্যই রাজা যোগিনীকে উপপত্নীরূপে রক্ষা করিয়াছিলেন। (১)

অনেকের মতে এই দুইটি উক্তির একটিও সত্য নহে। জেতারির নিজের লিখিত একখানি তন্ত্রগ্রন্থ হইতে জানিতে পারা যায় যে তিনি গগনঘোষ নামক একজন ব্রাহ্মণের পুত্র ছিলেন। তবে তিনি যে বাঙ্গালী ছিলেন এ বিষয়ে কোন সন্দেহই নাই।

এখানে একটি কথা এই যে দীপঙ্করের প্রাথমিক শিক্ষা কোথায় হইয়াছিল? জেতারি যদি বরেন্দ্রভূমের অধিবাসী হইয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে নিশ্চয়ই উত্তর বঙ্গে যাইতে হইয়াছিল। এ বিষয়ে এমন কোন প্রমাণ নাই যাহার সাহায্যে আমরা বলিতে পারি যে দীপঙ্কর প্রাথমিক শিক্ষা জেতারির নিকটই লাভ করিয়াছিলেন।

Dipankar was born A. D, 980 in the royal family of Gour at Vikrama (ni) pur in Bangala, a country lying to the east of Vajrasana. His father called Dge-Vahi dpal in Tibetan i.-e. "Kalyana Sri" and his mother Prabhabati gave him the name of Chandragurbha, and sent him while very young to the sage Jetari an Avadhuta adept for his education. Under Jetari he studied the five kinds of minor sciences, and thereby paved his way for the study of philosophy and religion.

(১) "বৃহৎ বঙ্গ" প্রণেতা ডাঃ শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বাজাসন সম্বন্ধে বলেন—যে সমস্ত প্রমাণ দেখিয়া স্বর্গীয় শরচ্চন্দ্র দাস মহাশয় বলিয়াছিলেন যে সম্ভবতঃ এই বাজাসন বিহারেই দীপঙ্করের প্রাথমিক শিক্ষা হয়। তিনি সম্ভবতঃ এক প্রবন্ধেও এ বিষয়ে উল্লেখ করিয়াছিলেন বলিয়া আমার স্মরণ হয়।

দীপঙ্কর তাঁহার আত্মকথা বলিতে যাইয়া বলিতেছেন—"আমাদের দেশে (ভারতে) রাজা এবং রাজবংশীয় লোকেরা বাস করেন। সে সময়ে বাঙ্গালাদেশে ভূ-ইন্দ্রচন্দ্র [Bhu-Indrachandra] নামে একজন রাজা রাজত্ব করিতেন। রাজবংশীয়দের দেহে রাজরক্ত থাকিলেও তাঁহারা রাজ্য বা সিংহাসনের অধিকারী নহেন। আমি রাজবংশে

১৯২০ খৃঃ অব্দে স্বর্গীয় নিবারণচন্দ্র দাস মহাশয় সেট্‌লমেণ্ট অফিসার স্বরূপ এই অঞ্চলটী জরীপ করেন। তিনি বাজাসন বিহারের বড় ঢিবি খানিকটা খনন করাইয়াছিলেন। যাঁহারা সেই খনন কার্য্য পরিদর্শন করিয়াছিলেন তাঁহারা আমাকে লিখিয়াছেন—"অনুমান ৪।৫ হাত গর্ত্ত করার পর দালানের ভিত্তি (foundation) পাওয়া যায়। তাহার পর আরও কয়েক হাত খোড়া হইয়াছিল। উক্ত foundation নাকি দুই হাত প্রস্থে ৩৫ হাত লম্বা ছিল। ইট গুলি বেশ বড় বড় ১২ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যে ৬ ইঞ্চি প্রস্থে এবং উচ্চতায় তিন ইঞ্চি হইবে। স্থানীয় ডাক্তার নরেন্দ্রমোহন আচার্য্য মহাশয় বলিয়াছেন—খোদাই করা কতকগুলি বাসন, পুষ্পপাত্র, কোসাকুসি' টাট, থালা, ঘণ্টা, শঙ্খ এবং একটি বাসুদেব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল এবং নানা রকমের কতকগুলি পাথর পাওয়া গিয়াছে। জিনিষগুলি একটা থলিয়া ভরিয়া কে লইয়া গিয়াছে বলিতে পারিলেন না। বাসুদেব মূর্ত্তি খানা শ্রীযুক্ত অচিন্ত্যপ্রকাশ দাশগুপ্ত স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। নান্নার বাসী প্রাচীন জমিদার শত বর্ষ বয়স্ক বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন "বাজাসনে ১৩।১৪টি ভিটা ছিল। দক্ষিণে রোউয়া, পূর্ব্বে নান্না', পশ্চিমে মলঙ্গী ও কৈকেয়ী নামক বিল পর্য্যন্ত ভিটা গুলি বিস্তৃত ছিল। এই স্থান প্রায় ৩।৪ মাইল লম্বা। তিনি বলেন আজ ৩০০।৪০০ বৎসরের মধ্যে এখানে কোন বসবাস নাই এখনও নান্নার ও ভাদাইলিয়ার লোকদের বাজাসনের লোক বলিয়া থাকে। তিনি আরও বলেন যে বাজাসন হইতে ৬ মাইল দূরবর্ত্তী সাভার পর্য্যন্ত একটী দীর্ঘ সুরঙ্গ ছিল তাহাতে সাভারের লোক অনায়াসে এই বাজাসনের বিহারে যাতায়াত করিতে পারিত। যখন ধীমন্তসেনের পুত্র রণবীরসেন সাভারে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করেন তখন বহু যোদ্ধা ও সেনাপতি তাঁহার সাহচর্য্য করিয়া সমস্ত কিরাতদেশ অধিকার করিয়াছিলেন বলিয়া শিলালিপিতে উক্ত আছে। আমরা এই অঞ্চলের দাশবংশের কুলজীতে দেখিতে পাই যে এই সময় নীলাম্বর, দিগম্বর ও বিষ্ণুদাস ফৌজদার বাজাসনে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। "আইন ই আকবরীতে" দেখিতে পাই যে ৫০০০ অশ্বারোহী সৈন্যের কর্ত্তাকে ফৌজদার উপাধি দেওয়া যাইত। বিষ্ণুদাস ফৌজদার বল্লালের প্রধান সেনাপতি পদ্মদাস হইতে ষষ্ঠস্থানীয় ছিলেন। সুতরাং চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেই তিনি বিদ্যমান ছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এদিকে ১৩৭৭ খৃঃ অঃ সাভারের মঠ নির্ম্মিত হয়। রণবীর সেনের পৌত্র এবং বাগা হরিশ্চন্দ্রের পুত্র এই মঠের স্থাপয়িতা। সুতরাং দেখা যায় যে বিষ্ণুদাস ফৌজদার এবং রণবীর ইহারা সমসাময়িক। শিলালিপিতে যে সব যোদ্ধৃবর্গের কথা উল্লিখিত আছে তাহাদের মধ্যে বিষ্ণুদাস ফৌজদার যে একজন ছিলেন তৎসম্বন্ধে প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। এখনও তাঁহাদের বংশধরদিগকে প্রাচীন লোকে বাজাসনের দাশ বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকে। এই বৌদ্ধ বিহারের সঙ্গে সংস্রবের হেতু দাশবংশের প্রাচীনরা এই নামে অভিহিত হওয়া পছন্দ করিতেন না। এখনও ঐ অঞ্চলের নাম—"সুয়াপুর নান্না মদে ভাতে পান্না", এই দুর্নাম আছে। সম্ভবতঃ পরে বৌদ্ধ তান্ত্রিক কদাচারের ফলে এ দুনাম রটিয়াছিল।

কৃষ্ণচন্দ্র রায় মহাশয় আরও বলেন—অনেক দিন পূর্ব্বে একজন সন্ন্যাসী নান্নাগ্রামে আমার নিকট আসিয়াছিলেন সে সন্ন্যাসী ঐ বাজাসনেই থাকিতেন। তাহার তিন চারি বৎসর পর আবার এক কপালিক সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি কিছু খাইতেন না বা কাপড় পরিতেন না। জোর করিয়া খাওয়াইলে খাইতেন ও কাপড় পরিতেন। এবং তিনি রাত্রিতে বাজাসনে বসিয়া ধ্যান করিতেন। বয়স জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন ৩৫০ বৎসর! আমরা তাঁহাকে পাগল বলিতাম কিন্তু একদিন রঘুনাথপুরের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত সার্ব্বভৌম মহাশয় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে কথা বলিলে তিনি অনর্গল সংস্কৃত ধর্ম্মকথা বলিয়া আমাদের চমৎকৃত করেন। তিনি বলিতেন তোমরা এই ভিটা খনন কর এখানে পঞ্চমুণ্ড শিব আছেন আরও অনেক কিছু আছেন। অনেক বৎসর পর গভর্ণমেণ্ট হইতে এই স্থান খনন করা হয় তখন ঐ স্থান হইতে নানা রকমের পাথর পাওয়া গিয়াছিল।

জন্মলাভ করিয়াছিলাম। আমার পিতার নাম তিব্-নাম খা হি-দান-পগ্ [Tib-Nam mkhahi-dvan-phyug], অর্থাৎ স্বর্গের অধিপতি [Lord of heaven]। আমার পিতা গৃহস্থ উপাসক এবং বিখ্যাত বোধিসত্ব ছিলেন। তিনি মাতৃজাতীয় তন্ত্রমতের উপাসক ছিলেন। আমি তাঁহার নিকট একটী তন্ত্রোপাসনায় দীক্ষা লাভ করিয়াছিলাম। আমার পিতার দুই পত্নী ছিলেন। একজন ব্রাহ্মণী এবং অপর ছিলেন ক্ষত্রিয়াণী। আমি ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্মলাভ করিয়াছিলাম। ক্ষত্রিয়াণীর গর্ভে একটী মূর্খ পুত্র জন্মলাভ করে। আমার প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর আমার সেই মূর্খ বৈমাত্রেয় ভ্রাতার সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল। আমি তাহাকে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম, কিন্তু সে তাহাতে স্বীকৃত হয় নাই। ইহার পর আমার সহিত আর তাহার দেখা হয় নাই।" *.

দীপঙ্করের আত্মকথা হইতে আরও জানিতে পারা যায় যে তাঁহার মাতা বিদুষী মহিলা ছিলেন। অতীশের জীবন-চরিত-রচয়িতা কল্যাণমিত্র [Phyg-Sarpa] দীপঙ্করের সহিত উনিশ বৎসর কাল এক সঙ্গে শিষ্যরূপে বাস করিয়াছিলেন—তিনি দীপঙ্করের যে জীবনচরিত রচনা করিয়া গিয়াছেন তাহা একখানি প্রামাণিক গ্রন্থ। কল্যাণ মিত্র একদিন তিব্বতে দীপঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন :—"আপনি বেদ সম্বন্ধে এইরূপ সুপণ্ডিত হইলেন কিরূপে?—"তাঁহার উত্তরে তিনি বলিলেন,—"আমার মা ব্রাহ্মণী ছিলেন, তিনি শৈশবকালে আমাকে বেদ সম্বন্ধে শিক্ষা দান করিয়াছিলেন।" কাজেই দীপঙ্করের বাল্যজীবনের প্রাথমিক শিক্ষা যে উত্তমরূপে তাঁহার মাতার নিকট হইতে হইয়াছিল তাহা আমরা দীপঙ্করের নিজের এই উক্তি হইতেই বুঝিতে পারিতেছি। এবং এই কারণেই জেতারি নামক অবধূতের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন কিনা তাহা সন্দেহজনক বলিয়া মনে হয়।

* (1) During my time the king called Bhu Indra Chandra reigned in Bangala, The extent of his Raj was what could be traversed by a Bal-lan-mo, she-elephant, in seven days. A Bal-lan-mo' she-elephant is very swift. She walks a great distance, only taking a short respite at mid-day

Rnal-hbyor-pa-chen-po relates the following as having been related by Atisa himself :—"In our (country) India there are Royalty and Royal race. The former owns kingdom. The latter, though royalty in bloood, has no Raj. I belong to the Royal race. My father called (in Tib-Nam mkhahi dvan-phyug, the lord of heaven) was a householder upasaka (lay devotee). He was a great Bodhisattva. He practised the Tantra of the Matri class. I obtained an Abhisheka, consecration of one (of the Tantras) from him. There were two wives to my father, one a Brahmani and the other a khatriyani. I am the son of the former. Buddhist Text Society volume 1. Edited by Sarat Chandra Das.

দীপঙ্করের বাল্যজীবনেই তাঁহার প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। যেমন বয়স বাড়িতে লাগিল, তেমনি তাঁহার প্রতিভারও বিকাশ পাইতে লাগিল। জেতারি তাঁহার অদ্ভুত মেধা ও গভীর অভিনিবেশ দর্শনে চমৎকৃত হইয়াছিলেন। কৃষ্ণগিরি বিহারের রাহুল গুপ্তের (Rahul Gupta) নিকট বৌদ্ধদিগের ত্রিশিক্ষা নামক তত্ত্বগ্রন্থে জ্ঞান লাভের জন্য গমন করেন। সেখানে তিনি বজ্র নামক সাধন মার্গেও দীক্ষা লাভ করেন। উনিশ বৎসর বয়সে দীপঙ্কর ওদন্তপুরী বিহারের আচার্য্য পরম পণ্ডিত শীলরক্ষিতের নিকট হইতে ভিক্ষুব্রতে দীক্ষা লাভ করেন।

হিন্দু ও বৌদ্ধ দর্শনে পারদর্শিতা

অল্প সময়ের মধ্যেই দীপঙ্কর অনেকগুলি হিন্দু ও বৌদ্ধদর্শন সম্বন্ধে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করেন। তাঁহার যশঃ দেশ-বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করিল। দীপঙ্করের সহিত তর্ক করিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করিবার জন্য পণ্ডিতেরা সব আসিতে লাগিলেন। কিন্তু কেহই তাঁহাকে তর্কে পরাস্ত করিতে না পারিয়া 'অবনত মস্তকে' দেশে প্রত্যাগমন করেন। দীপঙ্করের বয়স যখন পঁচিশ বৎসর তখন তিনি একজন প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ব্রাহ্মণকে তর্কযুদ্ধে পরাজিত করিয়া অসীম গৌরব লাভ করেন। ইহার পরেই দীপঙ্কর ওদন্তপুরী বা পুরের বৌদ্ধাচার্য্য শীলরক্ষিতের নিকট হইতে "শ্রীজ্ঞান" উপাধি লাভ করেন।

উপাধি লাভ

একত্রিশ বৎসর বয়সে তিনি ভিক্ষু আশ্রমের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন এবং বোধিসত্ত্বের কঠোর ব্রতে দীক্ষিত হইলেন। সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মরক্ষিত এ বিষয়ে তাঁহার দীক্ষাগুরু। অতঃপর দীপঙ্কর মগধের প্রসিদ্ধ ও পারদর্শী বৌদ্ধ—আচার্য্যগণের নিকট সমগ্র বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। প্রাচীন মগধ বর্ত্তমান রাজগীরের নিকট প্রসিদ্ধ নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্নিকটস্থ একটী পল্লী আজিও **'দীপনগর'** নামে পরিচিত হইয়া দীপঙ্করের পুণ্যস্মৃতি বহন করিতেছে। তিব্বতীয় ভাষায় দীপঙ্কর না লিখিয়া দীপঙ্কর লেখা হয়। অতএব দীপঙ্কর বর্ত্তমানে 'দীপনগরে' পরিণত হওয়া অসম্ভব নহে।

ভিক্ষু হইবার পরে দীপঙ্কর বিক্রমশীলা বিহারে যাইয়া আশ্রয় লাভ করেন। সেখানে অল্প দিনের মধ্যেই সকলের নিকট প্রধান পণ্ডিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার জ্ঞানতৃষ্ণা দিন দিনই বাড়িতে লাগিল। নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াও তাঁহার জ্ঞানস্পৃহা নিবৃত্ত হইল না, বরং দিন দিন আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। আরও অধিক শিক্ষা লাভের জন্য এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য তাঁহার চিত্ত ব্যাকুল হইল। কিছুতেই যেন তিনি অন্তর মধ্যে তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না।

সুবর্ণদ্বীপ যাত্রা

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন, 'সে সময় মঠের' "বিক্রমশীলার অধ্যক্ষ তাঁহাকে সুবর্ণদ্বীপে প্রেরণ করেন। তিনি সুবর্ণদ্বীপে বৌদ্ধধর্ম্ম সংস্কার করিয়া প্রসিদ্ধ হন।"

তিব্বত পর্য্যাটক শরচ্চন্দ্র দাশ লিখিয়াছেন :—"তৎকালে সুবর্ণদ্বীপ (ব্রহ্মদেশ) প্রাচ্যজগতে বৌদ্ধ ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল। আচার্য্য চন্দ্রকীর্ত্তি তথাকার প্রধানতম যাজক। দীপঙ্কর অবশেষে তাঁহারই নিকটে যাইতে মনস্থ করিলেন। এবং কতিপয় বণিকের সমভিব্যাহারে বৃহৎ নৌকারোহণে সুবর্ণদ্বীপের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভীষণ সমুদ্রবক্ষে প্রকাণ্ড তরণী, প্রচণ্ড ঝটিকা ও তুফানের ক্রীড়া-পুত্তলিকাস্বরূপ ভাসিয়া চলিল; পথিমধ্যে কত কষ্ট, কত বিঘ্ন, পদে পদে তাঁহার মঙ্গল-যাত্রায় নানা অমঙ্গলের সূচনা করিল। অবশেষে তের মাস পরে নৌকা সুবর্ণদ্বীপের উপকূলে উপনীত হইল। তথায় দ্বাদশবর্ষ অবস্থিতিপূর্ব্বক তিনি অভীষ্ট বিদ্যালাভ করিয়া কতকগুলি বণিকের সহিত একখানি পোতারোহণে স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন। আসিতে আসিতে পথিমধ্যে তিনি তাম্রদ্বীপ ও অবণ্যদ্বীপ দেখিয়া আসিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি মগধে প্রতিগমন করিয়া শান্তি, নরোপান্ত, কুশল, অবধূত, তম্বী প্রভৃতি যোগীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন।"

মগধে প্রত্যাবর্ত্তন

দীপঙ্কর যখন সুবর্ণদ্বীপে যাত্রা করেন, তখন তাঁহার বয়স মাত্র একত্রিশ বৎসর ছিল। কাজেই তিনি যখন মগধে প্রত্যাবর্ত্তন করেন, তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র ৪৩ বৎসর।

মগধে ফিরিয়া আসিলে পর মগধের বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ দীপঙ্করের অসাধারণ পাণ্ডিত্য দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তাঁহারা দীপঙ্করের প্রতিভার ও বৌদ্ধশাস্ত্রে অসাধারণ জ্ঞান দেখিয়া তাঁহাকে তথাকার "ধর্ম্মপাল" রূপে মনোনীত করিলেন। বৌদ্ধদের মধ্যে এ অতি শ্রেষ্ঠ সম্মান। দীপঙ্কর যে শুভ মুহূর্ত্তে সেইখানে ধর্ম্মপাল রূপে মনোনীত হইলেন, সেইদিন হইতেই মগধে বৌদ্ধধর্ম্ম দৃঢ়রূপে সংস্থাপিত হইল। ভারতীয় বৌদ্ধপণ্ডিতগণের মধ্যে তিনিই শীর্ষস্থান অধিকার করিলেন। এ সময়ে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাবোধি বিহারে বজ্রাসনে (Vajrasana) বাস করিতেছিলেন। এখানে তাঁহার সহিত তীর্থিক-ধর্ম্মাবলম্বী (ভিক্ষাজীবী) হিন্দু পণ্ডিতগণের ধর্ম্ম বিষয়ক তর্ক-বিতর্ক উপস্থিত হয়, প্রত্যেকবারই পণ্ডিতগণ তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। এ সময়ে দীপঙ্করের কীর্ত্তি-সূর্য্য মধ্য গগনে আরোহণ করিয়াছে, ভারতে ও বহির্ভারতে তাঁহার জ্ঞান-জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে।

দীপঙ্কর "ধর্ম্মপাল"

দীপঙ্কর যখন বজ্রাসনে বাস করিতেছিলেন, সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের পালবংশীয় নরপতি মহীপালদেব দীপঙ্করকে তাঁহার বিক্রমশীলা বিহারে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। মহীপালদেব বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন এবং বৌদ্ধ কীর্ত্তি রক্ষা ও সংস্কারের জন্য তাঁহার অসাধারণ অনুরাগের পরিচয় পাওয়া যায়। মহীপালদেবের সারনাথ প্রস্তরলিপির "প্রথম পংক্তিতে "গৌড়াধিপ" মহীপালের আদেশে, কাশীধামে 'ঈশান চিত্র ঘণ্টাদির' শত কীর্ত্তিরত্ন নির্ম্মিত হইবার এবং দ্বিতীয় পংক্তিতে "ধর্ম্মরাজিকা ও সাঙ্গ ধর্ম্মচক্র" সংস্কৃত হইবার এবং "অষ্ট মহাস্থান শৈলগন্ধ কুটি" পুনরায় নূতন করিয়া নির্ম্মিত হইবার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদ এই সকল কার্য্য সম্পাদনের কাল বলিয়া, ইহাতে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে, [মহীপাল দেবের শাসন-কালের একাদশ সংবৎসরে] নালন্দার বিশ্ব বিখ্যাত বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্নিদাহ-বিনষ্ট মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার সাধিত হইবার পরিচয় [নালন্দা-লিপিতে] প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কাজেই মহীপালদেব দীপঙ্করের পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যাইয়া অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করিবেন তাহা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং তাঁহার ন্যায় একজন বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী নৃপতির পক্ষে সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গতই বলিতে হইবে। *

বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ

দীপঙ্কর মহীপালের আমন্ত্রণে বিক্রমশীলা বিহারে গমন করেন। প্রথম মহীপাল-দেবের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র নয়পালদেব "গৌড়-মগধ বঙ্গের" সিংহাসনে আরোহণ করেন। নয়পালদেব দীপঙ্করের গুণ-গরিমায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বিক্রমশীলের প্রধান যাজকের পদে বরণ করিতে ইচ্ছা করিলে, দীপঙ্কর তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। এই সময়ে কার্ণদেশের [কনোজের] রাজা মগধ আক্রমণ করেন। নয়পালের সেনাদল বারবার যুদ্ধে পরাজিত

বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ

(১) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩২১, ২৬৩ পৃষ্ঠা (২) গৌড়লেখমালা—১০৯ পৃষ্ঠা।

Acharya Dipankara Cri—Jnana, alias Atica was a contemporary of Naypal Deva, and Buston's Chosbybny gives the following relevant facts Atica residing at Vajrasana (Bodh Gaya) when the king of the karnya in the west invaded Magadha, and a war ensued between him and Nayapala. The invaders sacked several towns at first, but were ultimately defeated. Atica meditated and succeeded in bringing about a treaty between the two kings. Apparently some time before this he had been appointed by Nayapala, as high priest of Buddhist vihara at vikramsila

Inscription of Nayapala Deva by M. M. Chakravartty J. A. S. B. 1900. Pl. 1 P. 192.

হইল এবং শত্রুসেনা রাজধানীর নিকটে অগ্রসর হইতে লাগিল। উপায়ান্তর না দেখিয়া নয়পাল কর্ণ রাজার নিকট সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। দীপঙ্করের চেষ্টা ও যত্নে সন্ধি স্থাপিত হইল। তখন উভয় রাজা বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।—এ বিষয় পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাস সর্ব্ব প্রথমে ইহার উল্লেখ করেন। পরে স্বর্গীয় মনোমোহন চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ, স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু এবং ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শরৎচন্দ্র দাস ও মনোমোহন বাবুর মতই সমর্থন করিয়াছেন।

সে সময়ে বিক্রমশীলা বিহারের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি নালন্দা বিহারের চেয়েও অধিক ছিল। "অনেক বড় বড় পণ্ডিত, বিক্রমশীল হইতে লেখাপড়া শিখিয়া, শুধু ভারতবর্ষে নয়, তাহার বাহিরেও গিয়া বিদ্যা ও ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। বিক্রমশীলা বিহারের রত্নাকর শান্তি একজন খুব তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈয়ায়িক ছিলেন। প্রজ্ঞাকরমতি, জ্ঞানশ্রীভিক্ষু প্রভৃতি বহু সংখ্যক গ্রন্থকার ও পণ্ডিতের নাম বিক্রমশীলের মুখ উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছিল। এরূপ বিহারের অধ্যক্ষ হওয়া অনেক সৌভাগ্যের কথা।"

দীপঙ্কর যখন বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষ হইলেন সে সময়ে সেখানে ৫৭ জন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বাস করিতেন। বিক্রমশীলা বিহার যেরূপ বৃহৎ ছিল, তেমনি তাহার ব্যবস্থা ও ছিল অত্যন্ত চমৎকার। এই বিহারের সম্মুখস্থিত প্রাচীর গাত্রের দক্ষিণদিকে নাগার্জ্জুনের মূর্ত্তি চিত্রিত ছিল এবং বাম পার্শ্বে স্বয়ং দীপঙ্করের মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি যে দীপঙ্করকে তৎকালের প্রসিদ্ধ পণ্ডিতগণ, নাগার্জ্জুনের সহিত সমান মর্য্যাদা দিতে পরাঙ্মুখ হইতেন না। এবং তিনি সাধারণের নিকট কিরূপ সম্মানিত ছিলেন তাহাও ইহা হইতে জানিতে পারা যায়। সেই বিহারের আর এক দিকের প্রাচীর গাত্রে প্রাচীন কালের পণ্ডিতগণের আলেখ্য অঙ্কিত ছিল, এবং সিদ্ধাচার্য্যগণের মূর্ত্তির চিত্রও তাহাতে ছিল।

বিহারের অধ্যক্ষ

দীপঙ্কর অতীশ যখন বিক্রমশীলা বিহারে বাস করিতেন সে সময়ে তিনি বিহারও মন্দিরের চাবি নিজের কাছে রাখিতেন। অতীশের আঠারোটী চাবি রক্ষা করিতে হইত। ইহা হইতে মনে হয় যে সে সময়ে অষ্টাদশটি বিহার ও মন্দির বিক্রমশীলা বিহারের অন্তর্ভূত ছিল। দীপঙ্কর—আঠারোজন বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীকে অধ্যাপনার জন্য একটি স্বতন্ত্র শ্রেণী-বিভাগ করিয়াছিলেন।

দীপঙ্করের তিব্বত গমন

বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিবার পরও তাঁহাকে কার্য্যোপলক্ষে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন বিহারে যাতায়াত করিতে হইত বলিয়া মনে হয়। অন্ততঃ সোমপুরী বিহারে কিছুদিনের জন্য বাস করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়। তেঙ্গুরের ক্যাটালগ হইতে তাহার আভাস পাওয়া যায়।

তারা

[বজ্রযোগিনী গ্রামে প্রাপ্ত। এই মূর্তির নীচে কায়স্থ শ্রীমজ্ঞেশ গুপ্ত, খোদিত লিপি রহিয়াছে।]

এই সময়ে হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে সুদূর তিব্বতে দীপঙ্করের অমরত্ব লাভের পথ ধীরে ধীরে পরিস্কৃত হইতেছিল। সমগ্র বৌদ্ধ শাস্ত্রে গভীর পারদর্শিতা এবং বৌদ্ধজগতে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াও তিনি কখন স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, একদা তিব্বতের অধিপতি লামাও তাঁহাকে "অতীশ" (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) বলিয়া পূজা করিবেন। তৎকালে থোলিং নগরে লামার প্রধান রাজপীঠ ছিল। তদীয় রাজত্বকালে তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। তিনি বৌদ্ধনীতির সংস্কার করিবার অভিপ্রায়ে ভারতের প্রধান প্রধান বৌদ্ধ বিহারে কতিপয় নবীন সন্ন্যাসীকে পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা কাশ্মীর প্রভৃতি নানাস্থানে বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া অবশেষে বিক্রমশীলায় উপনীত হইলেন। তথায় দীপঙ্করের যশোগৌরব তাঁহাদের শ্রুতিগোচর হওয়াতে তাঁহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া রাজ-সকাশে তাঁহার সমস্ত বিবরণ নিবেদন করিলেন। রাজার কৌতূহল দ্বিগুণ বাড়িয়া উঠিল। এইরূপ অদ্বিতীয় বৌদ্ধ আচার্য্যকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য তিনি নিতান্ত ব্যগ্র হইলেন এবং প্রভূত সুবর্ণ ও একশত পরিচারকের সহিত একজন বিশ্বস্ত রাজপুরুষকে মগধে প্রেরণ করিলেন। পথিমধ্যে অসীম কষ্ট ও যাতনা সহ্য করিয়া, রাজদূত বিক্রমশীলায় উপনীত হইল এবং দীপঙ্করের সম্মুখে সেই প্রকাণ্ড স্বর্ণপিণ্ড স্থাপন করিয়া রাজার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিল। দীপঙ্কর তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। শত শত অনুনয় বিনয়, সহস্র প্রলোভন সেই তেজস্বী মহাপুরুষকে ভুলাইতে পারিল না। দীপঙ্কর কিছুতেই তিব্বতে যাইতে চাহিলেন না। তিনি বিনীত ভাবে বলিলেন—"আমার সোনার দ্বারা কোনও প্রয়োজন নাই। আমি সোনা দিয়া কি করিব?" তিনি আরও বলিলেন আমাকে দুইটী কারণে তোমরা তিব্বতে লইয়া যাইতে চাহিতেছ—প্রথমতঃ সুবর্ণ প্রাপ্তির লোভ, দ্বিতীয়তঃ সিদ্ধ দেবতারূপে পরিগণিত হইবার জন্য—ইহার একটির প্রতিও আমার আকর্ষণ নাই। কাজেই আমি আমার তিব্বত—যাত্রার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে বলিয়া মনে করি না। রাজদূত দীপঙ্করের এইরূপ উক্তি শুনিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে স্বদেশে ফিরিয়া গেল।

রাজা লামা ল্হে-সে-হোড (Lha-bla-ma-ye-she-'od) রাজদূতের মুখে দীপঙ্করের সমস্ত বিবরণ শুনিয়া দীপঙ্করকে আনিয়া তিব্বতের ধর্ম্ম—সংস্কার করিবার জন্য অতি মাত্রায় আগ্রহান্বিত হইয়াছিলেন। রাজা লা-লামা বৃদ্ধ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র চ্যাং-চুব রাজা হইলেন। চ্যাং-চুব রাজপদ গ্রহণ করিলেও তিনি সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুর ন্যায়ই জীবন যাপন করিতেন।—চ্যাং-চুব রাজা হইয়াই এক ধর্ম্মসভার আহ্বান করিলেন। সেই সভায় তিব্বতের ঐ অঞ্চলের যত সব ধার্ম্মিক শ্রমণগণ

আসিয়া মিলিত হইলেন। রাজা তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"আপনারা প্রত্যক্ষভাবে দেখিতে পাইতেছেন যে আমাদের দেশে ধর্ম্মের বিশেষ অবনতি হইয়াছে। ভিক্ষুদের মধ্যে মতভেদ চলিতেছে। একদল ভিক্ষু নীলবর্ণানুরঞ্জিত আল্ল-খোল্লা পরিয়া তান্ত্রিক ব্যাভিচার শিক্ষা দিতেছে। স্বর্গত মহারাজ ধর্ম্মের সংস্কারের জন্য পূর্ব্বে যে তেরোজন পণ্ডিত আনাইয়াছিলেন তাঁহারাও এখানে ধর্ম্ম-সংস্কার সম্বন্ধে কোনও কার্য্য করিতে পারেন নাই। এইরূপ স্থলে যেরূপেই হয়, স্বর্গীয় মহারাজার আদেশ প্রতিপালন করিতে হইবে। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত ব্যক্ত করুন। উপস্থিত শ্রমণগণ সকলেই নৃপতি চ্যাং-চুবের এই ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

এই সভায় বিনয়ধর নামক একজন বৌদ্ধ শ্রমণ উপস্থিত ছিলেন।. ইনি পূর্ব্বেও কয়েক বৎসর ভারতবর্ষে বাস করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ভাষার সহিত ইঁহার পরিচয় ছিল। বিনয়ধরের বয়স তখনও সাতাইশ বৎসব মাত্র ছিল। রাজা চ্যাং-চুব বা বান্চুর বিনয়ধরকে বলিলেন—"তুমি পূর্ব্বে ভারতবর্ষে বাস করিয়াছ। সে দেশের উষ্ণ জলবায়ুর সহিত তুমি পরিচিত অতএব তুমিই দীপঙ্করকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য গমন কর। যদি তিনি একান্তই না আসেন তবে তাঁহার পরবর্ত্তী যিনি শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া আসিও।"

বিনয়ধর পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তিনি নির্জ্জনে মঠে বসিয়া ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করা এবং ধ্যান-ধারণার ভিতর দিয়া জীবন অতিবাহিত করাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করিয়াছিলেন, কাজেই তাঁহার ইচ্ছা ছিল না যে ভারতবর্ষে আসেন। কিন্তু নৃপতি চ্যাং-চুব বিশেষ ভাবে অনুজ্ঞা দেওয়ায় তিনি রাজাদেশ পালন করিতে বাধ্য হইলেন।

তিব্বত রাজা চ্যাং-চুবের দীপঙ্করকে তিব্বতে আনিবার জন্য বিনয়ধরকে প্রেরণ

রাজা তাঁহার সহিত ১০০টি অনুচর দিতে চাহিলেন, কিন্তু বিনয়ধর মাত্র পাঁচটি সঙ্গী লইলেন। রাজা তাঁহাকে অনেক স্বর্ণ দিলেন। সেই স্বর্ণের মধ্য হইতে কতক দীপঙ্করকে উপঢৌকন স্বরূপ কতক বিনয়ধরের পারিশ্রমিক, কতক বিনয়ধরের যাতায়াতের ব্যয় বাবদ এবং কতক একজন দোভাষীর জন্য।

বিনয়ধর নানারূপ ক্লেশ সহ্য করিয়া দুর্গম-পার্ব্বত্য-পথে ভারতের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহাদের দস্যু-তস্করের হাতে বিড়ম্বিত হইয়া এবং নানা বাধা-বিঘ্ন অতিক্রমপূর্ব্বক বিক্রমশীলা বিহারে আসিতে হইয়াছিল। (১)

(১) Rgya-tson-gru gru senge, a native of Tag-t shal in Tsan to proceed to vikram-sila, taking with him one hundred attendants and a large quantity of gold. After

সে সময়ে বিনয়ধরের অধ্যাপক তিব্বত দেশীয় গ্যায়ৎসনে তথায় অবস্থান করিতে-ছিলেন। বিনয়ধর দীপঙ্করকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্য বিক্রমশীলা আসিয়াছেন সে কথা তাঁহার নিকট বলিলেন। তখন গ্যায়ৎসনে তাঁহাকে বলিলেন যে—একথা এই বিহারের কাহারও নিকট কোন ক্রমেই এখন প্রকাশ করিবেন না। কেন না দীপঙ্কর এই বিহারের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত। তিনি এই বিহার পরিত্যাগ করিয়া যান তাহা এখানকার কাহারও অভিপ্রেত নহে। আপনারা এ বিষয়টি গোপন রাখিয়া এই বিহারে অবস্থান করুন এবং মহাস্থবির রত্নাকরকে যথোপযুক্ত স্বর্ণ দক্ষিণা প্রদান পূর্ব্বক এই বিহারের শিষ্যরূপে অবস্থান করিতে থাকুন। তারপর যদি আপনাদের ব্যবহার দ্বারা মহাস্থবিরকে সন্তুষ্ট করিতে পারেন তাহা হইলে আপনাদের পক্ষে অতীশের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া মনোগত অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবার সুযোগ ও সুবিধা হইবে। বিনয়ধর গ্যায়ৎসনের পরামর্শ গ্রহণ করিলেন এবং অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রমশীলা বিহারের অধ্যাপকগণের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারিলেন।

বিক্রমশীলা বিহারে এক মহাসভার অধিবেশন হইল। সেখানে প্রায় আট হাজার ভিক্ষু সমবেত হইয়াছিল। সেইখানে বিনয়ধর তেজঃপুঞ্জ কলেবর দীপঙ্করকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। তারপর কয়েকদিন পরে সুযোগক্রমে দীপঙ্করের নিকট ভক্তি-প্রণত-মস্তকে বিনয় সহকারে তাঁহাদের রাজার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন।

দীপঙ্কর ধৈর্য্যসহকারে সব কথা শুনিলেন। তিব্বত অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম্মের নানা অবনতির বিষয় অবগত হইয়া তাঁহার হৃদয় দ্রবীভূত হইল কিন্তু কি যে করিবেন তাহা ভাবিয়া স্থির করিতে পারিলেন না—তিব্বত যাইবেন কিনা, সে বিষয়ে মন স্থির করিবার পূর্ব্বে এবং সম্মতি দিবার পূর্ব্বের রজনীতে তিনি বিক্রমশীলা বিহারের মধ্যস্থিত তারা দেবীর মন্দিরে গমন করিলেন। মণ্ডল (Cycle of offerings) স্থাপন করিয়া তিনি দেবীর নিকট প্রার্থনা করিলেন—"দেবি! আমি যদি তিব্বত গমন করি তবে আমার দ্বারা কি

encountering immense hardship and privation in the journey, the traveller reached Magadha. Arrived at Vikramsila, he presented to Dipankara the king's letter with a large piece of bar gold as a present from the soverign and begged him to honour his country with a visit. Hearing this, Dipankar replied :—"Then it seems to me that my going to Tibet would be due to two causes :—first, the desire of amassing gold, and second the wish of gaining sainthood by the loving others, but I must say that I have no necessity for Gold, nor any anxiety for the second at present So saying he declined to accept the present. * * * Thinking that it was hopeless to bring Dipankar.a......The king of Tibet dies in captivity. Journal of the Buddhist Text society, vol 1. Page 13.

তিব্বতের দূষিত বৌদ্ধধর্ম্মের কোনরূপ সংস্কার হইতে পারিবে? ধর্ম্মপরায়ণ মৃত তিব্বতের মহারাজার একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল আমি তিব্বতে যাইয়া ধর্ম্মের সংস্কার সাধন করি। এই প্রবীণ বয়সে আমার পক্ষে কতদূর তাহা সম্ভবপর হইবে তাহা দেখি! আপনি আপনার উপাসিকা যোগিনীর মুখে ব্যক্ত করুন।" (২)

দীপঙ্করের এইরূপ সুযুক্তিপূর্ণ প্রার্থনার পর যোগিনী উত্তর করিলেন—"তুমি যদি তিব্বতে গমন কর, তবে সেখানে মহদ্ধর্ম্মের বিবিধ কল্যাণ সাধিত হইবে। বিশেষতঃ উপাসক (দলাই লামা) পরম উপকৃত হইবেন। দলাইলামা তোমার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্ম্মের সংস্কার সাধন ও উন্নতি করিতে সমর্থ হইবেন। তিব্বত গমন করিলে তোমার জীবনের আয়ু কুড়ি বৎসর হ্রাস পাইবে। আর যদি তিব্বতে গমন না কর তাহা হইলে তুমি বিরানব্বই বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিবে।"

এইবার দীপঙ্কর মনঃস্থির করিয়া তিব্বত-যাত্রা করিতে উদ্যোগী হইলেন। প্রথমে তিনি বিক্রমশীলার বিহারের মহাস্থবির রত্নাকরের নিকট বলিলেন—"আমি তিব্বতীয় শিষ্যগণের সহিত তীর্থদর্শনে যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছি। আপনি আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত সুস্থ ও সবল থাকেন ইহাই ভগবান্ তথাগতের নিকট প্রার্থনা করিতেছি।'

দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রা

রত্নাকরও তাঁহার সহিত তীর্থ-যাত্রার অভিলাষী হইলেন। রত্নাকরের এই কথায় দীপঙ্কর নীরব রহিলেন। রত্নাকর বলিলেন—"দীপঙ্কর" আমি তোমার মনোভাব বুঝিতে পারিয়াছি। তুমি অষ্ট পুণ্যস্থান দেখিবার ছল করিয়া বিনয়ধর (নাগ-চো), গ্যায়ৎসন এবং তাঁহাদের সঙ্গী অন্য পাঁচজন শ্রমণের সহিত তিব্বত-যাত্রার অভিলাষী হইয়াছ। একবার আমি তোমার যাইবার পক্ষে বাধা স্বরূপ হইয়াছিলাম। এইবারও যদি তোমার যাইবার কথা কোনওরূপে নৃপতির কর্ণে যাইয়া পৌঁছায় তাহা হইলে তোমার যাওয়া সম্ভবপর হইবে না বিশেষ এই দুইজন তিব্বতীয় ভিক্ষুর ও জীবন সংশয়াপন্ন হইবে। কিন্তু আমি ইঁহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছি,

(২) That night Atisa made preparations for conducting a religious service before the image of the goddess Tara. Placing the Mandala (Cycle of offerings). "He made the prayers: If I could go to Tibet, would I be of great service to the religion of Buddha, whether there by the wishes of the saintly king of Tibet would be fulfilled, and least of all if there would any risks to my person and life. ****

Yogini replied, yes, if you go to Tibet you will be of great service to there and particularly to an upasaka (Dalai Lama) by devotion and through him to the whole country. but your life would be shortend by twenty years. If you do not go to Tibet, you will live 92 years. In Tibet you would live nay up to 72 year. Indian Pandits in the Land of Snow.

অতএব ইহাদের প্রতি কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করা কর্ত্তব্য নহে। তারপর ইহারা তিব্বতীয় মহারাজার নিকট হইতে যে মহদুদ্দেশ্যের বার্ত্তা লইয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছেন এইরূপ স্থলে আমি সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িয়াছি, কি করিব তবে আমি তিন বৎসরের জন্য তোমাকে যাইতে দিতে পারি।”

মহাস্থবির রত্নাকরের এই অভিপ্রায় অল্প সময়ের মধ্যেই বিক্রমশীলা বিহারের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইল। বিহারের ভিক্ষুগণ অধ্যাপকগণ সকলেই দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রা সম্পর্কে বিরোধী হইয়া দাঁড়াইলেন। কিন্তু দীপঙ্করের প্রাণে নবীন উৎসাহ উদ্দীপিত হইয়া উঠিয়াছিল। তিব্বতের মৃত মহারাজার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় উদ্বেলিত হইয়াছিল। তিনি তিব্বত-যাত্রার জন্য আয়োজন ও উদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিব্বতের রাজার প্রেরিত স্বর্ণ, দীপঙ্কর চারিভাগে বিভক্ত করিয়া তাহার এক ভাগ দিলেন বিক্রমশীলার অধ্যাপকদিগকে, অপর একভাগ দিলেন স্থবির রত্নাকরের হাতে, তৃতীয় ভাগ তিনি বজ্রাসন বিহারের সাহায্যার্থ প্রেরণ করিলেন আর চতুর্থ ভাগ রাজভাণ্ডারে দেওয়ার জন্য যথোপযুক্ত উপদেশ দিলেন এবং বলিয়া দিলেন যেন এই স্বর্ণ বৌদ্ধ ভিক্ষু সম্প্রদায়ের কল্যাণার্থ ব্যয়িত হয়।

তারপর আসিল একদিন বিদায় মুহূর্ত্ত। সে সময়ে বিক্রমশীলা বিহারের শ্রমণগণ ও অধ্যাপকগণ, শিষ্যগণ সকলে অশ্রুপূর্ণ-লোচনে দীপঙ্করের দিকে চাহিয়া রহিলেন। দীপঙ্কর সেই স্তব্ধ ও শোকাকুল জনতার দিকে চাহিয়া ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িলেন।

দীপঙ্করের মনে পড়িল—বিক্রমশীলা বিহারের শত স্মৃতি। প্রতিদিন প্রত্যূষে তিনি যখন বিহারের বাহিরে আসিতেন, তখন ভিখারী বালকগণ করুণ-নয়নে তাঁহার দিকে চাহিয়া ছোট ছোট হাতগুলি বাড়াইয়া বলিত “বাবা, ভিক্ষা দে! বাবা ভিক্ষা দে!” মনে পড়িল কিরূপ ন্যায়নিষ্ঠার সহিত তিনি এই বিহারের প্রধান আচার্য্যরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন। এমন কি দিবাকর চন্দ্র (Devakar Chanda), রামপাল প্রভৃতির ন্যায় শিষ্যদিগকেও বিক্রমশীলা বিহার হইতে তাহাদের অপরাধের জন্য বিতাড়িত করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই। *

দীপঙ্করের প্রভাব ও ন্যায়নিষ্ঠা

আজ সেই কীর্ত্তিক্ষেত্র বিক্রমশীলা বিহার পরিত্যাগ করিয়া যাইতে তাঁহার প্রাণে যে কত বড় ক্লেশ বোধ হইতেছিল, তাহা সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

* (১) দিবাকর চন্দ্র একজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের শিষ্য। পরে ইনি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। নৃপতি নয়পালের রাজত্ব কালের লোক। দীপঙ্কর ইহাকে বিক্রমশীলা বিহার হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। (২) রামপাল হস্তীপালের পুত্র। বিক্রমশীলা বিহারের একজন ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধের শিষ্য ছিলেন। দীপঙ্কর ইহাকেও বিহার হইতে বিতাড়িত করেন। Pag-sam Jon zang-Index XIVI and Index CIX.

দীপঙ্কর বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে বিহারের শ্রমণগণ, শিষ্যগণ, কেহই তাঁহাকে তিব্বতের ন্যায় দুর্গম প্রদেশে যাইতে দিতে সম্মত হইবেন না। এই জন্যই "অষ্ট মহাস্থান" * দেখিবার ছল করিয়া তাঁহাকে বিহার হইতে বাহির হইতে হইয়াছিল। তাঁহার এই তীর্থযাত্রা যে তিব্বত—যাত্রা তাহা বিক্রমশীলা বিহারের সকলেই কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছিল। কাজেই তাঁহার যাত্রাকালে সকলের প্রাণেই একরূপ গভীর বেদনা ও দুঃখ সঞ্চারিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাপ্রাণ দীপঙ্কর তাঁহার বয়স ও পথের দারুণ ক্লেশের কথা ও বিস্মৃত হইলেন, যখন তাঁহার মনে পড়িল পবিত্র বৌদ্ধ-ধর্ম্মের তিব্বতে কি দারুণ অবনতিই না হইয়াছে! তখন তাঁহার মনে হইল—ধর্ম্মপ্রাণ রাজ-সন্ন্যাসী জে-সে-হোড্ তাঁহাকে তিব্বতে লইয়া যাইবার জন্যই প্রাণ-বিসর্জ্জন দিয়াছেন। ধর্ম্ম-সংস্কারের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইবে। সেই অর্থ কিরূপে সংগ্রহ হইতে পারে, সে চিন্তায় জে-সে হোড্ যখন ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন, সে সময়েই তাঁহার মন্ত্রী কর্ত্তৃক একটি স্বর্ণখনি আবিষ্কারের কথা জানিতে পারিলেন। সেই খনির নিকটে গেলে পর গ্যারলোগ্ (Garlog) নামক স্থানের মুসলমান নৃপতি তাঁহাকে বন্দী করেন। গ্যারলোগ তুর্কীস্থানে অবস্থিত। গ্যারলোগের মোস্লেম নৃপতি তিব্বতীয়দিগকে বলিলেন—"আমি তোমাদের রাজাকে মুক্তি দিতে পারি, যদি তোমরা রাজার আকৃতির পরিমাণ ও দেহের ওজনানুরূপ স্বর্ণ দান করিতে পার। তখন সারা তিব্বতে স্বর্ণ-সংগ্রহের জন্য লোক ছুটিল। সুবর্ণ সংগৃহীত হইল, মূর্ত্তিও নির্ম্মিত হইল, কিন্তু রাজার মাথা তৈরী করিবার পরিমাণ সোনা কম পড়িল। গ্যারলোগের রাজার ইহাতে তৃপ্তি হইল না। তিনি রাজা জে-সে-হোড্‌কে এক গভীর অন্ধকারময়

তিব্বত যাত্রাকালে দীপঙ্করের বয়স

* বৌদ্ধদের অষ্ট 'মহাস্থান' বা তীর্থস্থান হইতেছে (১) লুম্বিনী উদ্যান (Modern Rumnidei in Nepal Terci) বুদ্ধদেব যেখানে জন্মগ্রহণ করেন। (২) বুদ্ধগয়া (Budh Gaya) এইস্থানে বুদ্ধ বুদ্ধত্ব (সম্যক্ সম্বুদ্ধ) লাভ করিয়াছিলেন। গয়া সহর হইতে ছয় মাইল দূরে বুদ্ধগয়া অবস্থিত। (৩) মৃগদাব (Deer-park-modern Sarnath) সারনাথ। বুদ্ধদেব 'সম্যক্ সম্বুদ্ধ' এই পদ প্রাপ্তির পর ধ্যানযোগে জানিতে পারিলেন যে এক্ষণে তাঁহার বুদ্ধত্ব প্রাপ্তির পূর্ব্বেকার পাঁচজন শিষ্য মৃগদাবে (সারনাথে) আছেন। ইহা জানিয়া তিনি সারনাথে আসিয়া আপনার ধর্ম্মোপদেশ প্রথমে ঐ পাঁচজনকে প্রদান করেন। বুদ্ধদেবের জীবনের এই ঘটনা "ধর্ম্মচক্রপ্রবর্ত্তন" নামে প্রসিদ্ধ। কেননা এইখানেই তিনি তাঁহার সেই পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদিগকে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষা দিয়াছিলেন। সারনাথের প্রাচীন নাম 'ইসিপতন মিগদাব।' সারনাথের মাটি খুঁড়িয়া অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখানে একটি যাদুঘরও প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছে। (৪) কুশীনারা (বর্ত্তমান কাশিয়া বা কুশীনগর। ইহা মল্লদিগের নগর ছিল। মল্লদের শালবনে বুদ্ধদেব মহাপরি-নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন। (৫) জেতবান-শ্রাবস্তীর নিকট (Modern-Sahreth Maheth) এখানে বুদ্ধদেবের অলৌকিক লীলা-মাহাত্ম্য প্রকাশিত হইয়াছিল। (৬) বৈশালী (Modern-Baisali) এখানে একটি হনুমান বুদ্ধদেবকে ভোজন করাইয়াছিল। (৭) সমকাস্য (Modern Sankisa) এখানে তিনি বিমান হইতে অবতরণ করেন। (৮) রাজগৃহ, বর্ত্তমান-রাজগীর এখানে তিনি একটি বন্য হস্তীকে দমন করিয়াছিলেন।

কারাগৃহে বন্দী করিলেন। ঐ সময়ে নূতন রাজা বান্-চুব বা চ্যাং-চুব্ (Bang-Chub) হোড্ রাজা জে-সে হোডের মুক্তি-কামনায় তখনও তিব্বতের সর্ব্বত্র স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য লোক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাতের মুক্তির জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। জে-সে হোডের সহিত তিনি যখন সাক্ষাৎ করিতে গেলেন, সে সময়ে জে-সে হোড্ তাঁহাকে বলিলেন,—'বৎস! আমি বৃদ্ধ হইয়াছি। মৃত্যু আমার সন্নিকটবর্ত্তী। আমার মনে হয় আমার পূর্ব্বজন্মে আমি কখনও বৌদ্ধধর্ম্মের কল্যাণে জীবন বিসর্জ্জন দেই নাই। এইবার এই জন্মে আমার নিকট সেই সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছে, আমাকে মহদ্ধর্ম্মের জন্য প্রাণত্যাগ করিবার সুযোগ দাও। আমাকে মুক্ত করিবার জন্য এই সযত্ন সংগৃহীত স্বর্ণের অপব্যয় না করিয়া তুমি ভারতবর্ষ হইতে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতকে আনয়ন করিয়া অধঃপতিত তিব্বতীয়দিগের মধ্যে পুনরায় বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কার করিয়া দেশে পবিত্রতা আনয়ন কর। বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্র মহদ্বাণী প্রচারে ব্রতী হও।" চ্যাং-চুব্ নত মস্তকে খুল্লতাতের এই বাণী শিরোধার্য্য করিয়া লইলেন।—নৃপতি জে-সে হোড্ কারাগারেই প্রাণত্যাগ করিলেন। *

—দীপঙ্করের চক্ষের সমক্ষে সেই মৃত্যু-দৃশ্য প্রতিভাত হইয়া উঠিয়াছিল। বৌদ্ধধর্ম্মের জন্য যিনি এমন করিয়া আত্মবিসর্জ্জন করিতে পারেন, তাঁহার আকাঙ্ক্ষা কি অপূর্ণ থাকিবে? তাই দীপঙ্কর দুর্লঙ্ঘ্য হিমালয়ের পথকে গ্রাহ্য করিলেন না—নিজের বয়স মানিলেন না—ধর্ম্মের জন্য বাঙ্গালীর গৌরব গরিমা, ভারতীয় পণ্ডিতের মহত্ত্ব বিকাশের জন্য বাঙ্গালী দীপঙ্কর-বিক্রমপুরের এই বিক্রমশালী সন্তান তিব্বত-যাত্রা করিলেন।

দীপঙ্করের তিব্বত যাত্রাকালে তাঁহার বয়স কত ছিল, সে বিষয়ে বিভিন্নরূপ মত দেখিতে পাওয়া যায়। কাহারও কাহারও মতে তিনি ১০৪২ খৃঃ অঃ ৫৯ বৎসর বয়সে তিব্বত-যাত্রা করেন। * এল, এ, ওয়াডেল [L. A. Waddell] সাহেবের মতে দীপঙ্কর ১০৩৮ খৃঃ অঃ তিব্বতে গমন করেন। সে সময়ে তাঁহার বয়স ৫৮-৫৯ বৎসর ছিল। রকহিল সাহেবও দীপঙ্কর ৫৯ বৎসরে তিব্বতে গমন করেন সেই কথা বলিয়াছেন। ...তবে তাঁহার হিসাব মানিয়া লইলে হইলে দীপঙ্করের জন্ম ৯৮৩ খৃঃ অঃ হইয়াছিল বলিয়া মানিয়া লইতে হয়। কিন্তু আমরা তিব্বতের ইতিহাস এবং অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের লেখা হইতে সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারিতেছি যে দীপঙ্কর ৫৯ বৎসর বয়সে অর্থাৎ আসন্ন ষাট বৎসর বয়সে তিব্বত-যাত্রা করেন ও তাই

তিব্বতে যাত্রাকালে দীপঙ্করের বয়স

* Antiquities of Indian Tibet Pt I, By A. H. Francke, Ph. D. Page 50--52.

In A. D. 1013, The Indian Pandit Dharmapala came to Tibet with several of his disciples, and in 1042 the famous ATISHA, a native of Bengal, who is known in Tibet as Jo-Vo-rje or Jo-Vo-rtishe, also came here. The Life of Buddha Translated by W. W. Rock Hill. Page 227. 1884.

প্রামাণিক রূপে পাইতেছি। তাঁহার জন্মের বৎসর স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাসের মতে ৯৮০ খৃঃ অঃ হইয়াছিল, ইহাই এতদিন কিন্তু প্রামাণিকরূপে গৃহীত হইয়াছিল। * অতীশের জন্ম ৯৮২ বা ৯৮৩ খৃঃ অঃ হউক না কেন, তিনি যে ৫৯ বৎসর বয়সে তিব্বত-যাত্রা করেন, সে বিষয়ে আমাদের কোনও সন্দেহের কারণ নাই। তবে কোন্ সময়ে গিয়াছিলেন, তাহা লইয়াই তর্ক উপস্থিত হয়। আমাদের মনে হয় অধিকাংশ লেখকই যখন অতীশ ১০৪২ খৃঃ অঃ তিব্বত গমন করিয়াছিলেন বলিয়া বলিতেছেন, তখন আমরাও ১০৩৮ খৃঃ অঃ এর পরিবর্ত্তে ১০৪২-৪৩ খৃঃ অঃ তিনি তিব্বত গিয়াছিলেন সে কথাই প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রার পূর্ব্বে বৌদ্ধধর্ম্মের সংস্কারের জন্য তিব্বতের বৌদ্ধ নৃপতিগণ চেষ্টা করিয়াছেন এবং ১০১৩ খৃঃ অঃ হইতেই এই প্রচেষ্টা চলিতেছিল। লামা-জে-সে-হোড [Lha Lama Yeces Hod-the Royal Lama] তিব্বতের প্রচলিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ আচার অনুষ্ঠানে বিরক্ত হইয়াই উহার সংস্কারে উদ্যোগী হইয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্যোগে—প্রাচ্য বা পূর্ব্বদেশ হইতে কাশ্মীরের রত্নবজ্র, মগধের ধর্ম্মপাল, প্রভৃতি তিব্বতে গিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের সহিত তাঁহার যে কয়জন শিষ্য গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সকলের পশ্চাতেই 'পাল' শব্দ যুক্ত ছিল। ইঁহাদের সহায়তায় রাজসন্ন্যাসী জে-সে হোড্ তাঁহার রাজ্য মধ্যে ধর্ম্ম, শিল্প প্রভৃতি কয়েকটি বিষয়ের দিক্ দিয়া কতকটা সংস্কার করিতে পারিয়াছিলেন। ধর্ম্মপালের পর দীপঙ্কর তিব্বতে গমন করেন। *

অতীশের তিব্বত-যাত্রার সঙ্গী হইলেন পণ্ডিত ভূমিসঙ্ঘ (Bhumisangha), বীর্য্যচন্দ্র, নাগ-ছো, গ্যায়ৎসো এবং অনেক অনুচর ও ভৃত্যমণ্ডলী। তাঁহারা যাত্রাপথে প্রথমে মিত্রবিহারে আসিলেন। সেই বিহারের শ্রমণগণ এই যাত্রীদলকে পরম সমাদর সহকারে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা অতীশকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। এই বিহার হইতেই তাঁহারা তিব্বতের

তিব্বতের যাত্রা-পথে

1. Indian Monk Atisa (His proper name was Dipankar Srijnana) who Came to Tibet in 1038 A. D. Lhassa and its Mysteries by L. A. Waddell L. L. D. P. p. 320.

2. ... ... He quitted his monastery Vikramsila, for Tibet in the year 1042 A. D. at the age of 59. J. A. S. B. 1881. P. 23.

* In 1042 A. D. Atica proceeded to Tibet. J. A. S. B. 1900. Part I. P. 192. Manomohan Chakravatty, M. A. B. L. M. R. A. S. আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বাঙ্গালার নৃপতি নয়পালের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁহার একখানি শিলালেখ হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে নয়পাল ১০৩৭—১০৪১ খৃঃ অঃ মধ্যে সিংহাসন লাভ করেন। এবং তাঁহার মৃত্যু ১০৫৩ খৃঃ অঃ হয়। অতএব অতীশ ১০৪২ খৃঃ অঃ তিব্বত-যাত্রা করেন। ইহাই বিবিধ প্রমাণের সাহায্যে বুঝা যাইতেছে। স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তীর মতেও অতীশের তিব্বত-যাত্রা ১০৪২ খৃঃ অঃ।

উদ্দেশে চলিতে লাগিলেন। গ্যায়াৎসোর সঙ্গে ছিল দুইজন ভৃত্য, নাগ-ছোর সহিত ছিল ছয়জন এবং অতীশের সঙ্গে ছিল কুড়িজন অনুচর। তাঁহারা চলিতে চলিতে ক্রমে ভারতের সীমান্ত প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে একটি ছোট বিহার ছিল—সেই বিহারের শ্রমণগণ সঙ্ঘবদ্ধভাবে অতীশ এবং তাঁহার সঙ্গিগণকে পরম শ্রদ্ধার সহিত আশ্রমের অতিথিরূপে গ্রহণ করিলেন। ভারতের সীমান্ত প্রদেশস্থিত এই শ্রমণগণ আপনাদের মধ্যে এইরূপ আলোচনা করিতেছিলেন: "যদি অতীশের এই তিব্বত-যাত্রা আমরা প্রতিরোধ করিতে পারিতাম, তাহা হইলে খুবই ভাল হইত, কেননা আমরা ইহা বিশেষ ভাবে উপলব্ধি করিতেছি যে অতীশের ন্যায় একজন মহাপণ্ডিতের ভারতবর্ষ হইতে প্রস্থানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে বৌদ্ধধর্ম্মের গৌরবসূর্য্য অস্তমিত হইবে। অতএব আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে মহাপণ্ডিত আচার্য্য অতীশকে তাঁহার তিব্বত-যাত্রার অভিপ্রায় হইতে নিবৃত্ত করা। আবার সঙ্ঘের অন্যান্য শ্রমণেরা বলিলেন: "বিক্রমশীলা বিহারের আচার্য্যগণ যখন তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই তখন আমাদের এইরূপ চেষ্টা করা সম্পূর্ণ যুক্তি-বিরুদ্ধ।"

বিহারের শ্রমণগণ অশ্রুপূর্ণ-লোচনে অতীশ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে পর্ব্বতে আরোহণ করিতে দেখিলেন।

অতীশ এবং তাঁহার সঙ্গিগণ ভারতের সীমান্ত প্রদেশ অতিক্রম করিয়া তীর্থিকদের গন্তব্যস্থল অতি পবিত্র একটি বিহারে আসিয়া পৌঁছিলেন। সেস্থানে অতীশের মতাবলম্বী পঞ্চদশজন বৌদ্ধাচার্য্য বাস করিতেছিলেন। এই আশ্রমের আচার্য্যগণ তাঁহার সহিত পরিচিত হইয়া ধন্য মনে করিলেন। সারা দিন অতীশের সহিত তাঁহারা ধর্ম্মালোচনা করিলেন। অতীশ তাহাদিগকে এইরূপ সরলভাবে বৌদ্ধধর্ম্মের নিগূঢ় তত্ত্ব সমুদয় বুঝাইয়া দিলেন যে সেই আশ্রমবাসী শ্রমণগণ অতীশের পাণ্ডিত্য ও অমায়িক ব্যবহারে একান্ত প্রীত হইয়া প্রত্যেকে তাঁহাকে একটি ছত্র উপহার দিলেন। তাঁহারা অতীশের সহিত একান্ত অনুগতের মত ব্যবহার করিয়াছিলেন।

এই স্থান পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা ক্রমশঃ পার্ব্বত্য-পথে চলিতে লাগিলেন। এই পথে অনেক তীর্থিকেরা ও তাঁহাদের সঙ্গী ছিল। তীর্থিকদলের মধ্যে শৈব, বৈষ্ণব, কপিলাশ প্রভৃতি নানা সম্প্রদায়ের লোক ছিল, তাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্ম-বিদ্বেষী ছিল। ইহারা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রচার ও সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন না। এই তীর্থিকদলের মধ্যে কেহ কেহ অতীশকে হত্যা করিতে উদ্যোগী হইয়াছিল। একবার তাহারা আঠারো জন দুর্দ্দান্ত দস্যুকে এই কার্য্যে প্ররোচিত করে, কিন্তু সেই দস্যুগণ অতীশের সৌম্য, শান্ত ও জ্যোতিষ্মান্ মুখশ্রী

দেখিয়া এমন ভাবে অভিভূত হইয়া পড়িল যে, তাহাদের হাতের অস্ত্র হাতেই রহিয়া গেল— প্রস্তর মূর্ত্তির মত সকলে নির্ব্বাক্ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। অতীশ কিছু দূর অগ্রসর হইয়া বলিলেন—'আমার এই হতভাগ্য দস্যুদের জন্য দুঃখ হইতেছে!' এইরূপ বলিয়া তিনি মাটির উপর কয়েকটি মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া যেমন মন্ত্রোচ্চারণ করিলেন অমনি নির্ব্বাক্ ও অচল দস্যুদল আবার বাকৃশক্তি লাভ করিল এবং চলিতে সক্ষম হইল।

একদিন পথিমধ্যে এক স্থানে অতীশ দেখিতে পাইলেন, তিনটি কুকুরের বাচ্চা শীতে জড়সড় হইয়া কষ্ট পাইতেছে। কেহ তাহাদের দিকে ফিরিয়াও তাকাইতেছে না। অতীশ কুকুরের বাচ্চা তিনটিকে তুলিয়া তাঁহার গাত্রাবরণের মধ্যে লইলেন এবং বলিলেন—আহা! বাছারা, তোমরা বড় কষ্ট পাইতেছ! এই কথা বলিয়া তিনি পুনরায় পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন। এম্নি ছিল তাঁহার দয়া ও মহত্ত্ব।

অতীশের দয়া ও মহত্ত্ব

এ স্থানের রাজা (জমিদার) এই যাত্রীদলের প্রতি অত্যন্ত দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছিলেন। অতীশের সহিত চন্দন কাষ্ঠের নির্ম্মিত একটি ছোট টেবল্ (Table) ছিল। রাজা দীপঙ্করের নিকট সেই টেবলটি অভদ্রভাবে দাবী করিলেন। অতীশ বলিলেন: "আমি তিব্বতের রাজাকে উপহার দিবার জন্য এই টেবলটি লইয়া যাইতেছি। আমি ইহা কোন প্রকারেই হস্তান্তরিত করিতে পারিব না। রাজা ইহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাঁহাকে বিপন্ন করিবার জন্য পথে এক দস্যুদলকে পাঠাইয়া দিলেন, যেন তাহারা পরদিন প্রত্যুষে অতীশ ও তাঁহার সঙ্গিগণ যেমন এ পথ দিয়া যাইবেন, সে সময়ে তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সমুদয় দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করে এবং তাঁহাদের প্রাণনাশ করে।

পরদিন প্রত্যুষে রাজা যেমন-যাত্রীদলের নিকট হইতে বিদায় লইয়া গেলেন, তখন দীপঙ্কর তাঁহার সঙ্গিগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"তোমরা সতর্ক থাকিবে। আজ পথে পাহাড়িয়া দস্যুরা আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিবে।" তাহাই হইল,—কিন্তু অতীশের মন্ত্র-প্রভাবে তাহারা নির্ব্বাক্ভাবে যন্ত্রচালিত পুতুলের ন্যায় চলিয়া গেল। এইরূপে অতীশের আরাধ্যাদেবী তারার শুভ সিদ্ধি প্রভাবে তাঁহাদের দস্যুভীতি আর রহিল না।

এইবার তাঁহারা নেপালের নিকটে আসিয়া পৌঁছিলেন। দূর হইতে পুণ্য পীঠস্থানের আর্য্য স্বয়ম্ভুর মন্দির দেখিয়া তাঁহাদের মন ও প্রাণ আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা সকলে একটি শাখা-প্রশাখা-বিশিষ্ট শ্যামল-পত্ররাজি-শোভিত বিরাট বৃক্ষের নীচে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। এইখানে ভারবাহী জন্তুর পৃষ্ঠ হইতে মালপত্র নামানো হইল।

আর্য্য-স্বয়ম্ভুর মন্দির দর্শনে দীপঙ্করের প্রাণ এতদূর আনন্দে বিভোর হইয়াছিল যে তিনি অপলকনেত্রে সেই দিকে তাকাইয়াছিলেন। অতীশ বৃক্ষের শীতল ছায়ায় উপবেশন করিলেন। তাঁহার দক্ষিণ দিকে গ্যায়ৎসো এবং বাম দিকে বসিয়াছিলেন তাঁহার ভ্রাতা বিজয়চন্দ্র। আর মধ্যস্থলে একটি উচ্চ আসনে বসিয়াছিলেন রাজসন্ন্যাসী মহারাজা ভূমিসঙ্ঘ। এই ভূমিসঙ্ঘ অতীশের প্রিয়তম শিষ্য।

স্বয়ম্ভুর নৃপতি অতীশকে সদলবলে রাজসম্মানে অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহার ও তাঁহার সঙ্গিগণের সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থার জন্য রাজকর্ম্মচারীদিগের উপর ভার দিলেন। মগধের শ্রেষ্ঠ আচার্য্যকে নৃপতি অনন্তকীর্ত্তি অনেকদূর হইতেই পরম সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া রাজপ্রাসাদে আনিয়া তাঁহার থাকিবার সর্ব্ববিধ সুব্যবস্থা করিলেন। তিনি নিজে সম্মুখে উপবেশন করিয়া আচার্য্য অতীশের উপদেশাবলী শ্রবণ করিয়া আপনাকে ধন্য মনে করিতে লাগিলেন।

এই স্থানে গ্যায়ৎসোর মৃত্যু হইল। গ্যায়ৎসো রাহু নামক একজন তীর্থিকের নিকট হইতে 'নবসন্ধি' নামক বিষয়ে সিদ্ধি লাভ করিতে যাইয়া মৃত্যু-মুখে পতিত হইলেন।

গ্যায়ৎসোর মৃত্যু

মুমূর্ষু অবস্থায় গ্যায়ৎসো অতীশের নিকট এই তান্ত্রিক অভিচারের বিষয় বর্ণনা করিলে, অতীশ তাঁহার কথা শুনিয়া অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হইয়া বলিলেন,—"তুমি অত্যন্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছ গ্যায়ৎসু! এই তীর্থিক সম্প্রদায়ের তান্ত্রিক ক্রিয়ানুষ্ঠানকারীরা নানারূপ মন্দ অভিপ্রায় লইয়া কার্য্য করে। এখন তোমার জন্য আমার অত্যন্ত চিন্তার কারণ ঘটিয়াছে।"

গ্যায়ৎসোকে আরোগ্য করিবার সমুদয় চেষ্টাই ব্যর্থ হইল। গভীর রাত্রিতে গ্যায়ৎসোর মৃত্যু হইল। অতীশের অনুচরগণ অতি গোপনে রাত্রিকালেই নদীর তীরে লইয়া যাইয়া তাহার দেহের সৎকার করিল। পরদিন প্রত্যূষে যাত্রাকালে গ্যায়ৎসোর পরিত্যক্ত শয্যা দ্রব্যাদি একটা ডুলির মধ্যে এমন ভাবে সাজানো হইল যেন লোকে মনে করে যে পীড়িত গ্যায়ৎসো ডুলিতে চড়িয়া যাইতেছেন। পাছে নেপাল সরকার কোনরূপ অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাদিগকে বিপন্ন করে এজন্যই তাঁহারা এরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। নতুবা অনাবশ্যক ভাবে যাত্রা-পথে বিলম্ব ও বিঘ্ন ঘটিত।

নেপালে অবস্থান কালে অতীশ, নৃপতি নয়পালকে একখানি উপদেশপূর্ণ লিপি প্রেরণ করেন। ঐ লিপিখানি 'বিমলরত্নলেখ' নামে পরিচিত। অতীশ তাঁহার সঙ্গীয় দ্বিভাষীর (Lochava) সাহায্যে ঐ সুন্দর উপদেশপূর্ণ পত্রখানি তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত করিয়াছিলেন।

এইবার পুনরায় অতীশ ও তাঁহার সহযাত্রিগণ নেপাল পরিত্যাগ করিয়া যাত্রা আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা হোল্কা [Holka] নামক স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হোল্কার মঠে অতীশের এক বন্ধু প্রধান আচার্য্যরূপে অবস্থান করিতেছিলেন। ইনি বৌদ্ধ-ধর্ম্মশাস্ত্রে একজন সুপণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত ছিলেন। বার্দ্ধক্যের দরুন তিনি বধির হইয়া পড়িয়াছিলেন বলিয়া সকলের নিকট তিনি বধির স্থবির [Deaf Sthavir] নামে পরিচিত ছিলেন। অতীশ তাঁহার পুরাতন বন্ধু এই বধির স্থবিরের নিকট একমাস কাল ছিলেন। এখানকার শ্রমণগণ তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গিগণকে পরম সমাদরে সেবা ও যত্ন করিয়া পরিতৃপ্ত করিয়াছিলেন। অতীশের সহিত এখানে প্রায় এক সপ্তাহকাল বৃদ্ধ স্থবিরের সঙ্গে নানাবিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। বধির স্থবির মন্ত্র সম্বন্ধে অবিশ্বাসী ছিলেন,—অতীশ তাঁহাকে সে বিষয়ে বলিতে যাইয়া বলিলেন যে—'বুদ্ধত্ব' প্রাপ্তির জন্য মন্ত্র এবং পারমিতার (Paramita) দুইয়েরই আবশ্যকতা আছে। তিনি এ সম্বন্ধে সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যের নিমিত্ত 'চার্য্য-সঙ্ঘ প্রদীপ' নামে একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। লোচ্ছবা বা দোভাষী অতীশের উপদেশে উহা তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিলেন।

হোল্কা-বিহার

হোল্কা হইতে অভিযাত্রীদল পালপোইথান (Palpoi Than) নামক স্থানে আসিলেন। এসময়ে নেপালের রাজা অনন্তকীর্ত্তি সেই স্থানে দরবার করিতেছিলেন। তিনি অতীশকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত অভিনন্দিত করিলেন। অতীশ নৃপতি অনন্তকীর্ত্তিকে "দৃষ্টৌষধি" (Drishta Ushadhi) নামক একটী হস্তী উপহার দিলেন এবং এই হস্তীটিকে কি ভাবে পরিচালনা করিতে হইবে সে বিষয়েও বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন। অতীশ বলিলেন,—"মহারাজ, আপনি যুদ্ধাস্ত্র বহন করিবার জন্য কখনও এই হস্তী প্রয়োগ করিবেন না। কিংবা ইহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া কাহাকেও যুদ্ধ করিতে দিবেন না। এই হস্তীটিকে আপনি পূজোপকরণ, ধর্ম্মগ্রন্থ এবং দেবমূর্ত্তি প্রভৃতি বহন করিবার জন্য নিযুক্ত করিবেন। আপনাকে আমি যেমন এই হস্তীটি উপহার দিলাম, তেমনি আমি এই হস্তীর বিনিময়ে আপনার নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে আপনি এই স্থানে একটী বিহার নির্ম্মাণ করিয়া দিবেন। সেই বিহারের নাম হইবে **থান বিহার** (Than vihara)।

প্যালপোইথান

নেপালের রাজা-থান

রাজা অনন্তকীর্ত্তি অতীশের এই নিবেদন পরম শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিলেন এবং বিহার নির্ম্মাণের সম্পূর্ণ ভার তাঁহার পুত্র পদ্মপ্রভের [Padma-prabha] উপর অর্পণ করিলেন। পদ্মপ্রভ অতীশের শ্রমণ-শিষ্যরূপে পরিগৃহীত হইলেন।

পদ্মপ্রভ

ভারত পরিত্যাগের পর একমাত্র পদ্মপ্রভই অতীশের নিকট সর্ব্বপ্রথম শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। থান বিহার নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ হইলে পরে অতীশ পুনরায় তিব্বতের দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার সঙ্গীয় 'লোচ্ছবা' দো-ভাষী রাজপুত্রকে তিব্বতীয় ভাষা শিক্ষা দিবার জন্য সেখানে রহিয়া গেলেন।

থান বিহার

অতীশ ও তাঁহার অভিযাত্রীদল যখন তিব্বতে প্রবেশ করিলেন, তখন তাঁহারা দেখিতে পাইলেন রাজা চ্যাং-চুবের [Chan-Chub] প্রেরিত একশত অশ্বারোহী পুরুষ কারুকার্য্য-পরিশোভিত শ্বেতপরিচ্ছদে সজ্জিত হইয়া অতীশ ও তাঁহার সঙ্গিগণকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন। ইহারা চারিজন সৈন্যাধ্যক্ষের নেতৃত্বাধীনে আসিয়াছিল। তাঁহাদের নাম লা-ওয়াংপো [Lhai Wanpo] লা-লো দোই [Lhai-Lo-doi] লা সিরাব [Lha Serab] এবং লা শে জোন্ [Lhai-Sei-zon।] ইহাদের প্রত্যেকের হাতে ছিল ষোলটি করিয়া বর্শা। বর্শার উপরে ছিল শ্বেত পতাকা। অশ্বারোহীদের প্রত্যেকের হস্তে ছিল, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতপতাকা এবং কুড়িটি শ্বেত সাটিনের ছত্র। ইঁহারা বিবিধ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে চারিদিক নিনাদিত করিয়া —"ওঁ মণিপদ্মে হুম" এই পবিত্র মন্ত্র গান করিতে করিতে মগধের বিখ্যাত আচার্য্য দীপঙ্করকে রাজা চ্যাং চুবের নামে আসিয়া প্রণতি পূর্ব্বক সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিলেন। সেদিনকার সেই অভিনন্দন, তিব্বতীয়দের ভক্তি-প্রণত ভাব অতীশের চিত্তকে বিশেষরূপে মুগ্ধ করিয়াছিল। তাঁহার হৃদয় তখন আনন্দে অভিষিক্ত হইয়াছিল। দেবতারা যে তাঁহার এই তিব্বত আগমনকে সার্থক করিয়া তুলিবেন তাহা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তিনি পুলকিত হইয়াছিলেন। তিব্বতের গুজে [Gu-ze] নামক স্থানেই তাঁহাকে এইরূপ অভ্যর্থনা করা হইয়াছিল।

তিব্বতে প্রবেশ

এই গু-জেতেই অতীশ সর্ব্বপ্রথম চা পান করেন। তিনি গুজেতে আসিয়া পৌছিলে পর এবং বিশ্রামাদি করিবার সময়ে গুজের অভিনন্দনকারীগণ তাঁহার নিকট তিব্বতীয় রীতিতে চা প্রস্তুত করিয়া উপস্থিত করিলেন এবং বলিলেন—"মহাত্মন্! আপনি যদি অনুমতি করেন তবে আপনাকে আমাদের দেশের এই স্বর্গীয় পানীয় পান করিবার জন্য অনুরোধ করিতেছি।" অতীশ বলিলেন,—"এই পানীয়ের কি নাম? তোমরা যার এত সুখ্যাতি করিতেছ? তিব্বতীয়েরা বলিলেন,— মহাত্মন্! ইহার নাম চা। এই গাছের ছাল খাইতে নাই, কিন্তু ইহার পাতা চূর্ণ করিয়া উষ্ণ জলে ভিজাইয়া পান করিতে হয়। এই পানীয়ের অনেক কিছু গুণ রহিয়াছে।" অতীশ তাহাদের কথা শুনিয়া

বলিলেন—"এমন উত্তম পানীয় নিশ্চয়ই তিব্বতীয় ভক্ত শ্রমণগণের প্রার্থনার ফলে বিধাতা দান করিয়াছেন। আমি ইহা পান করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলাম।"

গু-জে হইতে এই যাত্রীদল একে একে নানাস্থান অতিক্রম করিয়া ডোক্ [Dok] নামক স্থানে আসিলেন। এই স্থানটী মানস-সরোবর নামক হ্রদের অল্প দূরে অবস্থিত।

মানসসরোবর

এই স্থানে দলে দলে গ্রামবাসিগণ আসিয়া অতীশকে বিবিধ উপহার দিয়া পরিতুষ্ট করিতে লাগিল। ডোক্ নামক স্থানে প্রাতঃর্ভোজন ইত্যাদি সমাপন করিয়া তাঁহারা মানসসরোবরের তীরে আসিয়া পৌছিলেন। মানসসরোবরেব নির্ম্মল নীলাভ সলিলরাশি এবং চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখিয়া দীপঙ্কর এতদূব মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে তিনি এই স্থানে এক সপ্তাহকাল অবস্থান করেন। এই স্থানের সৌন্দর্য্য তাঁহার চিত্তশতদল নবারুণ-দীপ্তিতে বিকশিত করিয়া তুলিয়াছিল। অতীশ যখন মানসসরোবরের তীরে বাস করিতেছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে নাগ-ছো ও এখানে আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অতীশ একদিন যখন মানসসরোবরের পবিত্র

পিতৃ তর্পণ

জলের মধ্যে দণ্ডায়মান হইয়া পিতৃ-পুরুষগণের উদ্দেশে তর্পণ কবিতেছিলেন, সে সময়ে নাগ-ছো জিজ্ঞাসা করিলেন—"আপনি জলে দাঁড়াইয়া কি কবিতেছেন?" অতীশ বলিলেন,—"আমি পিতৃপুরুষের উদ্দেশে তর্পণ করিতেছি, ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব প্রভৃতি দেবতাব উদ্দেশে স্তুতি জানাইয়া পিতৃ পুরুষের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। কেন, তোমাদেব তিব্বতীয়দের মধ্যে কি তর্পণের রীতি প্রচলিত নাই?" নাগ-ছো কহিল—"হাঁ, আমাদের দেশে মঞ্জুশ্রী দেবী এবং অন্যান্য দেব-দেবীর উদ্দেশে অর্চ্চনা করিবার মন্ত্র রহিয়াছে।" অতীশ নাগ-ছোকে তর্পণেব প্রযোজনীয়তা সম্বন্ধে বিবিধ উপদেশ প্রদান করিলেন।

অতীশ মানসসরোবরের তীর পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছেন, ইতিমধ্যে এই সংবাদ দিকে দিকে প্রচারিত হইয়াছিল। মানসসরোবরের তীরবর্ত্তী তিনটি দেশ হইতে দলে দলে লোক তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য আসিতে লাগিল। তিব্বতের ধর্ম্মবিপ্লবের ও অবনতির যুগে ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতেব আগমন তাহাদেব নিকট এক নূতন উৎসাহ ও আনন্দের প্রেরণা আনিয়া দিয়াছিল।

এ সময়ে অতীশকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য ৩০০ শত অশ্বারোহী আসিয়া উপস্থিত হইল। ইহাদের সকলেরই ছিল শ্বেত-পরিচ্ছদ পরিহিত। তিন শতাব্দী পূর্ব্বে আচার্য্য শান্তিরক্ষিতকে যেমন তিব্বতীয়েরা অভ্যর্থিত করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন— অতীশকেও তেমনি শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত পরম ভক্তি-সহকারে আজ আবাব রাজার

অনুচরবর্গ অভ্যর্থনা করিতে লাগিলেন। তাঁহারা অতীশকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—"হে পরম প্রবীণ, ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত, দেবতা যেমন ভক্তের প্রার্থনায় ভক্তের বাঞ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য আসিয়া দর্শন দেন, তেমনি হে মহাপ্রাণ! মহাপুরুষ, আপনি তিব্বতীয়গণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে দয়া করিয়া তিব্বতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আপনি 'চিন্তামণি',—আপনি পরশমণি, যাহার স্পর্শে লৌহও স্বর্ণ হয়, যাহার নিকট প্রার্থনা কবিলে কোন কিছুই অপূর্ণ থাকে না! তেমনি জানি আপনি আমাদেব প্রার্থনা পূর্ণ কবিবার জন্যই এখানে আসিয়াছেন। আমরা জানি, আমাদের এই দেশ ধর্ম্ম সম্বন্ধে হীন—যে ধর্ম্ম গৌরবে ভাবত গরীয়ান্, তবু আমাদের দেশের প্রতি বিশ্ব প্রকৃতির অশেষ রূপ করুণা ধারা বর্ষিত হইয়াছে। আমাদেব দেশে সূর্য্যের প্রখর প্রতাপ নাই, আমাদেব দেশ শীতল ও শান্তিপ্রদ। আমাদের দেশে নীল-সলিলপূর্ণ হ্রদ এবং নির্ঝরিণী রহিয়াছে অসংখ্য। তিব্বতের জলবায়ু মানুষকে সজীব কবিয়া তোলে। তিব্বতের পার্ব্বত্য প্রদেশ পর্ব্বতান্তরালে অবস্থিত বলিয়া শীতের প্রখরতা সেখানে উপলব্ধি হয় না। সেখানকার উষ্ণতা শবীব ও মনকে কর্ম্মঠ এবং উৎসাহী কবিয়া তোলে।

যখন বসন্ত ঋতুর সমাগম হয়, তখন আমাদেব দেশে খাদ্যের কোনওরূপ অপ্রাচুর্য্য থাকে না। তখন আমাদের দেশে জননী লক্ষ্মীব শুভদৃষ্টিতে সমুদয় শস্যক্ষেত্র স্বর্ণশস্য-সম্ভারে পবিপূর্ণ হয়। শরৎ ঋতুতে তিব্বতেব প্রকৃতি সবুজ সৌন্দর্য্যে হাস্যময়ী হয়। মাঠে মাঠে, বনে-বনে, পর্ব্বতে-পর্ব্বতে শ্যামলশ্রী উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। হে পবম শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত! আমাদের দেশ প্রত্যেক বিষয়েই শ্রেষ্ঠ। আমাদেব জন্মভূমি আমাদের নিকট সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম। আজ আপনার শুভাগমনে আমাদেব দেশ পবিত্র হইয়াছে। আপনি আমাদেব রাজাব পক্ষ হইতে আমাদের মুখে সর্ব্ব প্রথম সাদর স্বাগত-বাণী শ্রবণ করুন। যদিও আমাদের বৃদ্ধ নৃপতি লা-জে-শে হোড্ পবলোক গমন কবিযাছেন, তথাপি আমাদেব বর্ত্তমান নৃপতি চ্যাং-চুব অতিশয় বিচক্ষণ ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি। তিনি প্রজাদের কল্যাণের জন্য, ধর্ম্মের সংস্কারেব জন্য, হে মহানুভব ভারতীয় শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত! আপনাকে আমাদের তিব্বতে আনয়ন করিয়াছেন। আপনি যখন আমাদের দেশে শুভাগমন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই আপনার মহৎ উপদেশে আমরা ধন্য হইব। আমাদেব নৃপতি যেমন আপনার শুভাগমনে প্রীতিলাভ করিয়াছেন, তেমনি আমরা সকলে আপনার আদেশ ও উপদেশ মান্য করিয়া কৃতার্থ হইব। তিব্বতেব গৌরব ও প্রতিষ্ঠা পুনরায় সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইবে আমরাও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া আপনার মহিমাগীতিতে ধন্য হইব।"

এইবার অতীশ রক্ষীদল-পরিবেষ্টিত হইয়া চ্যাং-চুবের রাজধানী থেডিং নগরের দিকে

অগ্রসর হইলেন। তাহারা 'লো আ. লোমা, লোলা' গীতে চারিদিক মুখরিত করিতে করিতে চলিল।

অতীশের বয়স প্রায় ষাট বৎসর হইলেও তাঁহার শারীরিক সৌন্দর্য্য, মধুর হাস্যময় মুখমণ্ডল, স্নেহপূর্ণ ব্যবহার সঙ্গিগণকে প্রীতিমুগ্ধ করিয়াছিল। এই দেব-প্রকৃতির ভারতীয় পণ্ডিতকে দেখিয়া তিব্বতীয় অনুচববৃন্দ পবম প্রীতি ও আনন্দ লাভ কবিয়াছিলেন। তাঁহার সহাস্য মুখমণ্ডল হইতে সংস্কৃত শ্লোকেব আবৃত্তি বড় মধুব শুনাইত। তিনি চলিবার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বদা বিবিধ মন্ত্র উচ্চাবণ কবিতে কবিতে চলিতেন। এই যে অজ্ঞাত দুর্গম গিরিপথে চলিতেছেন, বৃদ্ধ বয়সে বিবিধ ক্লেশ সহ্য কবিতেছেন তবু সকলের সঙ্গে সুমিষ্ট ভাবে কথাবার্ত্তা বলিতেছেন,—"অতি ভালো! অতি ভালো! অতি ভালো! অতি মঙ্গল! অতি ভালো হে! মহাকরুণিকা তাবা! শাক্যমুণি দেখ! এই কয়েকটি কথা প্রতি নিয়ত তাঁহাব মুখ হইতে উচ্চাবিত হইতেছিল।

চ্যাং-চুবেব প্রেরিত লোকজনেব প্রতি প্রশংসমান দৃষ্টিতে চাহিয়া অতীশ বলিতেছিলেন—"এই রাজকর্ম্মচাবীগণ আনন্দে ও হাস্য-কৌতুকে গন্ধর্ব্ব-নৃপতি প্রমোদকেও হাব মানাইয়াছে। ইহাবা দেখিতে বক্ষ জাতীয় যক্ষ সদৃশ। সত্য সত্যই হিমাবৎ প্রদেশ অবলোকিতেশ্বব দেবেব লীলা নিকেতন। তাঁহাবই কৃপাবলে তিব্বতীয়দেব ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ-প্রকৃতিব "পার্ব্বত্যজাতীয় লোকেরা' মহদ্ধর্ম্মেব আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছে। এই দুর্দ্দান্ত জাতিয় লোকেরা দেখিতে কদাকাব ও ভীষণাকৃতি হইলেও ইহাদেব প্রকৃতি দিব্য বিনয়পূর্ণ এবং ভক্তি অনুগত। ইহারা সত্য সত্যই দেব অবলোকিতেশ্বরেব অনুগত সেবক। মনে হইতেছে ইহাদের যিনি নৃপতি, তাঁহার প্রভাব ও প্রতিপত্তি নিশ্চযই দেববাজ ইন্দ্রতুল্য হইবে।"

এই ভাবে আনন্দ-অভিযান কবিতে কবিতে দীপঙ্কব যখন বাজধানী থোলিংব (Tholin) নিকটবর্ত্তী হইলেন, তখন নৃপতি চ্যাংচুবেব প্রধান অমাত্য ওয়ান্ চুগ্ (Hhai-wan-chug) অতীশকে অভ্যর্থনা কবিতে আসিলেন। মন্ত্রী ওয়াংচুগ্ অতীশের দুই খানি হস্ত নিজ হস্তমধ্যে ধারণ কবিয়া বলিলেন,—"হে প্রভু! আমরা আপনাকে রাজ-

থোলিংয়ের পথে

নির্দ্দেশ মত অভ্যর্থনা কবিতে অগ্রসর হইয়াছি। আপনি বৌদ্ধধর্ম্মের তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষ। আপনি দয়া করিয়া আমাদের দেশে আগমন করিয়া আমাদিগকে ধন্য করিয়াছেন। আপনি দারুণ পথ-ক্লেশ সহ্য করিয়াও যে আমাদিগকে মুক্তি-পথের সন্ধান দেখাইতে আসিয়াছেন, সেজন্য আমাদের কৃতজ্ঞতাপূর্ণ সাদর অভিনন্দন গ্রহণ করুন।" মন্ত্রী এই কথা বলিয়া একটি চিত্র-পট (Tapestary) উপহার দিলেন।

ঐ পটে অবলোকিতেশ্বর দেবের মূর্তি অঙ্কিত ছিল। এই পটটি প্রায় চল্লিশ হস্ত পরিমিত দীর্ঘ ছিল। এবং উহা অতি সুন্দর ভাবে স্বর্ণ সূত্রদ্বারা কারু-কার্য্য খচিত ছিল। অতীশ ঐ প্রতিমূর্ত্তির চিত্রপট পাইবা মাত্র তাহা অভিষিক্ত করিয়া লইলেন।

রাজা চ্যাং-চুবের নিকট, দীপঙ্কর তিব্বতে আসিয়া পৌছিয়াছেন এই সংবাদ যাওয়া মাত্র ন্যাহারি (Nahari) নামক স্থানের লোকেরা দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিতে লাগিল। এই ভারতীয় পণ্ডিত তিব্বতীয়গণের একমাত্র আলোচনার বিষয় হইয়া দাঁড়াইলেন। প্রত্যেক গ্রামবাসী, প্রত্যেক নাগরিকের মুখেই এই মহাপণ্ডিতের কথা শুনা যাইতে লাগিল। উচ্চ, নীচ এবং সাধারণ জনগণেরও তাঁহার মুখে ম্যা-ফ্যাম্ বা (Ma-Pham) বা মানস-সরোবরের বিষয় অবগত হইবার জন্য আগ্রহ দেখা গেল। রাজা যে মহামানবকে তিব্বতে আনয়ন করিবার জন্য এত অর্থব্যয় করিলেন, যাঁহাকে আনিবার চেষ্টায় বহু লোকের অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইতে হইয়াছে, না জানি সেই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় পণ্ডিত কিরূপ দেখিতে, কিরূপ তাঁহার পাণ্ডিত্য, কিরূপ তাঁহার বাক্য ও উপদেশ। এইরূপ ব্যগ্রতা যে জনসাধারণের পক্ষে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সেকথা সহজেই বুঝিতে পারা যায়। রাজা চ্যাং-চুব ও তাঁহার কর্ম্মচারিদের প্রমুখাৎ দীপঙ্করের সম্বন্ধে নানা বিষয়ে জানিবার জন্য কৌতূহলি হইয়াছিলেন।

রাজা চ্যাং-চুব যখন ব্যগ্রভাবে দীপঙ্করের বিষয় জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছিলেন, ঠিক্ সেই সময়ে তাঁহার মন্ত্রী লা-লোদোই (Lha lodi) দশজন অশ্বারোহী শরীররক্ষী সহ নৃপতিসকাশে আসিয়া উপনীত হইলেন এবং বলিলেন, "মহারাজ! যে মুহূর্ত্তে বহু শাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত দীপঙ্কর' পাল্‌পা (Palpa) নেপালে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন, সে সময়ে নেপালের মহারাজা অতি বিপুল ভাবে তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা করেন, এমন কি তাঁহার পুত্র পর্য্যন্ত অতীশের নিকট দীক্ষিত হইয়া "দেবেন্দ্র" নামে অভিহিত হইয়াছেন। অতীশের সহিত সমগ্র পশ্চিম ভারতের একজন রাজ-শ্রমণ ও আসিয়াছেন, তাঁহার নাম ভূমিসজ্ঘ। ভূমিসজ্ঘ নানা গুণে গুণান্বিত, সসাগরা ধরণীর মহারাজচক্রবর্ত্তী সম্রাট হইবার যোগ্য। ধর্ম্মের জন্য পৃথিবীর সমুদয় বিলাস-সুখ ও ধনৈশ্বর্য্যের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, তিনি জ্ঞানী মহাপুরুষ দীপঙ্করের নিকট দীক্ষা লাভ করিয়া শ্রমণ-ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অতীশের একান্ত অনুগত বলিয়াই আমাদের তিব্বতে আগমন করিয়াছেন। মানসসরোবরের তীর পর্য্যন্ত প্রায় ৪২৫ জন নেপাল-রাজ-অনুচর দীপঙ্করের অনুগামী হইয়াছিলেন। সেখানে হাজার হাজার কৃষক ও রাখালেরা আসিয়া মহামতি দীপঙ্করকে বন্দনা করিয়া গিয়াছে এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া ধন্য হইয়াছে।"

মন্ত্রীর মুখে দীপঙ্কর তাঁহার যাত্রা-পথে যে সর্ব্বত্র বিশেষ ভাবে সম্মানিত হইয়াছেন

এমন কি নেপাল-রাজও যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন ইহাতে নৃপতি অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। দীপঙ্কর যখন থোড়িং রাজদরবারে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন স্বয়ং নৃপতি এবং রাজ দরবারের সকলে দণ্ডায়মান হইয়া অতীশকে অভ্যর্থনা করিলেন।

রাজপ্রাসাদে অভ্যর্থনা

কিন্তু একজন বৃদ্ধ লামা দীপঙ্করকে দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন না, সম্ভবতঃ বার্দ্ধক্যের দরুনই তিনি দণ্ডায়মান হইতে পারেন নাই। এই বৃদ্ধ লামার নাম ছিল, রিন্-চেন্-জং-পো। রিন্-চেন্-জংপোর প্রতি (Rinchen-zanpo) এক সময়ে রাজা (Lha-sde-btsan) কর্তৃক তিব্বতের পুরাণ (Phuran) এবং রং (Rong) প্রদেশের উপর ধর্ম্মনেতৃত্ব ভার প্রদত্ত হইয়াছিল। রিন্-চেন্-জংপো তিব্বতের ঐ সকল প্রদেশে অনেক মঠ, মূর্ত্তি ও বিদ্যা-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁহার শিষ্যগণ মধ্যে দশজন সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছিল। এবং তাহারা "লোচবা" (Lochava) বা দ্বিভাষী নামে পরিচিত ছিল। রিন্-চেন্-জংপো সংস্কৃত ও তিব্বতীয় ভাষায় একখানি অভিধান প্রণয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠাপিত তান্ত্রিক ধর্ম্মাচার তিব্বতে বিশেষ ভাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। গল্প আছে যে-একবার রিন্-চেন্-জংপো একটা দুরন্ত দৈত্যকে দমন করিয়াছিলেন!

দীপঙ্করের সহিত রিন্-চেন্-জংপোর যখন প্রথম সাক্ষাৎ হইল তখন তাঁহার বয়স ছিল ৮৫ বৎসর। দীপঙ্কর তাঁহার বয়ঃকনিষ্ঠ, এজন্য রিন্-চেন্-জংপো ভারতীয় পণ্ডিতকে দণ্ডায়মান হইয়া অভ্যর্থনা করিলেন না, কিন্তু পরে দীপঙ্করের মুখে পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিবিধ দেবতাগণের স্তোত্র প্রভৃতি শুনিয়া তিনি একান্ত মুগ্ধ হইলেন। সর্ব্বোপরি দীপঙ্করের তাঁহার প্রতি বিনয়-পূর্ণ ব্যবহার তাঁহাকে একান্ত মুগ্ধ করিল। অবশেষে বৃদ্ধ রিন্-চেন্-জংপো ও বিনীত ভাবে দীপঙ্করের নিকট দণ্ডায়মান হইয়া সম্মান প্রদর্শন করিলেন। বৃদ্ধ রিন্-চেন্-জংপো ৯৫ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।

এই ভাবে তিব্বত-রাজ দীপঙ্করকে পরম সমাদরের সহিত আপনার দেশে অভ্যর্থনা করিয়া লইলেন। রাজা, প্রজাদের প্রতি এইরূপ অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন যে: "তাহাদের-দীপঙ্করের আদেশ ও উপদেশ অনুযায়ী ধর্ম্মপথে পরিচালিত হইতে হইবে।" ভারতীয় পণ্ডিতগণের মধ্যে দীপঙ্কর যে অতি শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তাহা তিনি সহজেই বুঝিতে পারিলেন। রাজা দীপঙ্করের বিদ্যাবত্তা ও বিবিধ গুণ দেখিয়া তাঁহাকে জো-বো-জে (Jovo-Je) অর্থাৎ প্রভুস্বামী বা স্বামী ভট্টারক (Supreme Lord) উপাধি প্রদান করিলেন।

দীপঙ্কর থোলিং (Tholin) উপনীত হইয়া তিব্বতে মহাযান মত প্রচার করিলেন।

Pag-Sam-Jon-zang—contents xv11.

এবং তাঁহার প্রস্তাবিত মত সম্বন্ধে বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া প্রকাশ করিলেন। তিনি ক্রমশঃ তিব্বতের ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই তাহার সংস্কার করিতে সমর্থ হইলেন। অতীশের চেষ্টা ও যত্নে তিব্বতের লুপ্ত প্রায় বৌদ্ধধর্ম্মের গরিমা পুনরায় ফিরিয়া আসিল।

দীপঙ্করের উপদেশানুসারে চলিয়া তিব্বতীয় লামারা বৌদ্ধ-ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম কি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। অতীশ প্রায় বারো বৎসর কাল তিব্বতে বাস করেন, এই সময়ের মধ্যে তিনি তিব্বতের বিভিন্ন প্রদেশে পর্য্যটন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের পবিত্রতা এবং প্রকৃত ধর্ম্মতত্ত্ব জনগণ মধ্যে প্রচারিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশ, ধর্ম্ম-জীবন, গ্রন্থ প্রণয়ন ইত্যাদি এবং অমানুষিক কঠোর পরিশ্রমের কাজ দেখিয়া তিব্বতবাসী তাঁহাকে দেবতার ন্যায় শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দীপঙ্কর কি ভাবে তিব্বতবাসীদিগের মধ্যে ধর্ম্ম প্রচার করিয়া নৈতিক উন্নতি ও মঙ্গল বিধান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সে কথা পরে উল্লেখ করিলাম।

লাশার নিকটবর্ত্তী ন্যাথ্যাং (Nethan) নামক স্থানে ১০৫৩ খৃঃ অঃ ৭২ বা ৭৩ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। এই গ্রামটি নেতাং (Netang) নামে পরিচিত। কেহ কেহ এই স্থানের নাম নের্তাম্ (Nyertam) বলেন। চীনারা বলে ই-তাং (Yettang)। এসিয়ার সর্ব্বত্র, তিব্বতের প্রসিদ্ধ স্থান সমূহে যেখানে যেখানে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচলিত আছে সেই সেই স্থানে তিনি দেবতার ন্যায় পূজা পাইয়া আসিতেছেন। সকলের হৃদয়-মন্দিরে তাঁহার স্মৃতি পরম শ্রদ্ধার সহিত ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়া আসিতেছে। তিব্বতের বৌদ্ধধর্ম্মের অন্যতম ধর্ম্ম নেতা ব্রোমতোনের (Bromton) ছিলেন তিনি ধর্ম্মাচার্য্য।

দীপঙ্করের মৃত্যু

দীপঙ্কর বহু গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এবং তিনি একশতটি মহাযান ধর্ম্ম-সম্পর্কিত উপদেশ দিয়াছেন। এখানে আমরা তাঁহার লিখিত কতিপয় পুস্তকের নাম দিলাম (১) বোধিপথপ্রদীপ, (২) চর্য্যা সংগ্রহ-প্রদীপ, (৩) মধ্যমোপদেশ, (৪) সংগ্রহগর্ভ, (৫) মহাযান পথসাধন বর্ণ সংগ্রহ, (৬) মহাযান পথ সাধন-সংগ্রহ, (৭) দশ কুশল কর্ম্মোপদেশ, (৮) বর্ণ বিভঙ্গ, (৯) সূত্রার্থ সমুচ্চয়োপদেশ, (১০) সপ্তকবিধি, (১১) গুরুক্রিয়াক্রম, (১২) সরঙ্গতায়দশ। দীপঙ্কর নয়পালকে উপদেশপূর্ণ যে পত্র লেখেন, তাহা 'বিমল-রত্ন-লেখ', নামে পরিচিত। তিব্বতে দীপঙ্কর ক-দং (Kah-dam) নামক বৌদ্ধসম্প্রদায়ের সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

অতীশের সমাধি-মন্দির গ্রো-ম (Sgro-ma) নামে পরিচিত। নাম (Nam) নামক গ্রামের যে স্থানে অতীশের সমাধি-মন্দিরটি অবস্থিত, সে স্থানটি অতি নির্জ্জন।

যে দীপঙ্কর তিব্বতীয়দের ধর্ম্ম-সংস্কারের জন্ম জীবন আহুতি দিয়াছিলেন, তাহারা কিন্তু অতীশের সমাধি-মন্দিরটির রক্ষার দিকে একান্ত উদাসীন। ওয়াডেল্ সাহেব অতীশের সমাধি-মন্দিরটি দেখিয়া লিখিয়াছেন :—"আমি নাম গ্রামে দীপঙ্করের সমাধি-মন্দিরটির ধ্বংসপ্রায় অবস্থা দেখিয়া অবাক্ হইলাম। যে ধর্ম্মপ্রাণ সাধু মহাত্মা তিব্বতের ধর্ম্ম-সংস্কারের জন্ম সুদূর তিব্বতের নির্জ্জন প্রান্তরে জীবন বিসর্জ্জন দিলেন, অকৃতজ্ঞ তিব্বতীয়েরা কিনা তাঁহার সমাধি ভবনটিকে রক্ষা করিবার প্রতি একান্ত উদাসীন। যে গৃহের মধ্যে অতীশের দেহাবশেষ রক্ষিত, তাহা একটা গোলাঘরের ন্যায় কক্ষ মাত্র। বাহিরের দিক্‌টা পীতবর্ণানুরঞ্জিত, উহার চারিদিকে কতকগুলি প্রাচীন উইলো (Willow-trees) তরু মাথা তুলিয়া একটি বীথি রচনা করিয়াছে। মন্দিরটির আকার অনেকটা চুরতেনের [chorten] মত। উহার উচ্চতা ১৪ ফিট' পরিধি ও তদনুরূপ। ইহার উপরটা বালিচুনের কাজ করা এবং মন্দিরের প্রাচীরের গাত্র অপটু চিত্রকরের অঙ্কিত কয়েকটি বুদ্ধ এবং অতীশের নিজেরও কয়েকটি চিত্র দ্বারা শোভিত রহিয়াছে। দীপঙ্করের চিত্রে দেখিতে পাওয়া যায় তিনি পদ্মাসনে বসিয়া আছেন। নিম্ন ভাগে শ্বেত হস্তী, শ্বেত ছত্র, প্রভৃতি পবিত্র সপ্ত চিহ্ন রহিয়াছে। ছয় জন অশিক্ষিত লামার উপর এই সমাধি-মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের ভার রহিয়াছে। ইহারা সমাধি-মন্দিরের ২০০ শত গজ দূরে একটি তরুলতা-গুল্মহীন প্রস্তরাকীর্ণ পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে বাস করে। এই ছয়জন লামার মধ্যে মাত্র একজন সামান্য ভাবে কিছু লিখিতে পড়িতে জানে। এখানকার পর্ব্বতগাত্রে খোদিত মূর্ত্তি ও নিকটবর্ত্তী স্থানের স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্য রীতি দেখিয়া মনে হয় যে অতীশ ও তাঁহার সঙ্গিগণ এই স্থানের কাছাকাছি কোথাও হয়ত বা বাস করিতেন।"

অতীশের সমাধি-মন্দির

দীপঙ্কর ন্যা-থ্যাং (Nye-thang) নামক স্থানে একটি বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ন্যা-থাং লাশা হইতে অল্প দূরে অবস্থিত। ন্যা-থাংয়ের বিহারটি বর্ত্তমান সময়েও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া আসিতেছে। এখানে এখনও প্রায় পঞ্চাশ জন লামা বাস করেন। আজ পর্য্যন্ত বংশপরম্পরাগত ভাবে তিব্বতীয় গল্পপ্রিয় বৃদ্ধগণ ও লামাগণ ভারতীয় মহাপুরুষ দীপঙ্কর ও তাঁহার সঙ্গিগণের মহানুভবতার কথা বলিয়া থাকেন। (১)

ন্যাথাং-বিহার

"খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে শ্রীজ্ঞান অতীশ বাঙ্গলা দেশ (বিক্রমপুর) হইতে তিব্বতে গমন করেন। তিনি তথায় একটি স্থান লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছিলেন, "এই

* Lhasa and its Mysteries by L. A; Waddell. Page 321-322.

(১) Atisha founded a monastery at Nye-thang, a few miles, from Lhasa an

স্থানে পরবর্ত্তী কালে ক্রেডিং বিহার প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং উহাতে ষোড়শ স্থবিরের পূজা হইবে। আমি দিব্য চক্ষুতে এই স্থানে ষোড়শ স্থবিরের মূর্ত্তি দেখিতেছি।"

এইরূপে নানা দিক্ দিয়াই আমরা দীপঙ্করের প্রতিভা ও তিব্বতে তাঁহার শ্রদ্ধা ও সমাদর এবং ভবিষ্যদ্বাণীর পরিচয় পাইয়া থাকি। অতীশ দীপঙ্করই প্রকৃত পক্ষে তিব্বতে তান্ত্রিক বিষয়ে উৎকৃষ্ট গ্রন্থ রচনার পথ নির্দ্দেশ করেন। দীপঙ্করের বিরচিত গ্রন্থ নিচয় নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে [He wrote a great number of works which may be found in the Bstan-hgyur, and translated many others, relating principally to Tantrik theories and practices]

দীপঙ্করের ভাবে ও আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া এবং তাঁহার উপদেশে তদীয় প্রিয় শিষ্য বুস্তন্ (Bustan) একখানি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন [The jewel of the manifestation of the Dharma, or Tchos-hbyung rin-Tchen' is one of the principal authorities in Tibetan History]

অতীশ দীপঙ্কর যখন তিব্বতে আগমন করেন, সে সময়ে ইউ-ৎসি (Wu-tse) [অমিতাভ] নামক স্থানে তিনি একটি বৃহৎ গ্রন্থাগার দেখিয়াছিলেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁহার সেই প্রাচীন গ্রন্থাগারটি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। এই বৃহৎ পাঠাগার হইতে দীপঙ্কর নানা বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এবং তিনিও নানা গ্রন্থাদি সংগ্রহ করিয়া ঐ গ্রন্থাগারের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছিলেন।*

দীপঙ্করের গ্রন্থাগার

স্পিতি (spiti) নামক স্থানে একটী বিহার আছে। সেই বিহারটির নাম তাবো (Tabo)। ঐ বিহারের মধ্যে একটী খোদিত-লিপি আছে। উহা গুজের (Guze) রাজা চ্যাং-চুব-হোডের সমকালীন। এই নৃপতিই অতীশকে তিব্বতে আনিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। তাবো বিহারের প্রধান হলটির নাম "নাম-পার-স্রাঙ্গ-জ্যাড্" (Nam-par-srang-mdzad) নামে আখ্যাত। এই হলটি অতীশের সময় যেমন ছিল এখনও তেমনি রহিয়াছে, উহার কোনরূপ পরিবর্ত্তন হয় নাই। এই কক্ষের মধ্যে যে সব সুন্দর সুন্দর প্রাচীর-চিত্র এবং দেবতাদের মূর্ত্তি আছে তাহা দেখিবার মত। এই সমুদয় চিত্র ও মূর্ত্তি দীর্ঘকাল অবস্থান করিয়া দর্শন করিলে এবং গবেষণা করিলে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা আছে। এই বিহারে প্রজ্ঞাপারমিতার একখানি তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত পাণ্ডুলিপি আছে, ঐ পাণ্ডুলিপি খানা একাদশ শতাব্দীর।

তাবোর বিহার

institution which still flourished, with fifty resident Lamas. The Land of Lama by David Macdonald Page 40. (১) সাহিত্য ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ষোড়শ মহাস্থবির ৩০ পৃষ্ঠা-সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। The life of Budha translated by W.W. Rockhill 1884.

* Journey to Lhasa and Central Tibet by Sarat Chandra Das, P. *222*

এই বিহারের দুইটি খোদিত-লিপি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। এই লিপি দুইটি মেজের (Floor) অতি অল্প উপরে খোদিত। ইহাতে এইরূপ অনুমিত হয় যে যাঁহারা এখানে পদ্মাসনে বসেন তাঁহাদের পড়িবার পক্ষে সুবিধাজনক হইবে বলিয়াই এত নিম্নে দেয়ালের গায়ে কালির দ্বারা উহা লিখিত হইয়াছে। একটি লিপিতে এই বিহার প্রতিষ্ঠাতার নাম রহিয়াছে, সে প্রায় ৯০০ বৎসর পূর্ব্বের কথা, সে সময়ে এই বিহার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে যাঁহারা যাঁহারা সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহাদের নামও রহিয়াছে। অপর লিপিটি হইতে জানা যায় যে গুজের রাজ-সন্ন্যাসী চ্যাং-চুব-হোড এই বিহারটির সংস্কার করেন। এবং উহাতে সেকালের দুইজন প্রধান লামার নাম উল্লেখ রহিয়াছে, একজনের নাম রিন্-চেন্-জঙ্গ-পো (Rinchen-zanpo) অপর জন হইতেছেন অতীশ। অতীশের বা অতীশার তিব্বতীয় নাম হইতেছে ফুল-ইয়াং (Phul-byung) .

আমরা ঐ লিপি হইতে জানিতে পারি যে অতীশের সাহায্যে রিন্-চেন্-জঙ্গ-পো জ্ঞানের আলো [Light of wisdom] লাভ করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বে বৃদ্ধ পণ্ডিত রিন্-চেন্-জঙ্গপোর কথা বলিয়াছি। এই লিপি হইতে আমরা জানিতে পারিতেছি যে এই বৃদ্ধ পণ্ডিত প্রকৃত ভাবেই দীপঙ্কর কে আপনার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত বলিয়া পরে মানিয়া লইয়াছিলেন। (১)

এই খোদিত লিপি দুইটি যখন রাজা চ্যাং-চুব-হোডের সময়ে সংস্কৃত হয় তখন আনুমানিক ১০৫০ খৃষ্টাব্দে ইহার প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা অসঙ্গত নহে। গুজে প্রদেশের প্রাচীন রাজধানী থো-লিং (Thol-ding) এর নিকটবর্ত্তী 'পু' (Poo) নামক স্থানে রাজা জে-শে হোডের যে খোদিত লিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতেও অতীশের বিষয় অবগত হওয়া যায়। [২]

১৮৬৩ খৃঃ অঃ মিঃ পি ইগারটন [Mr P, Egerton, of the civil service] (A. H. Heyde) এর সহিত স্পিতি বিহার দেখিতে গিয়াছিলেন। তাঁহাদের এই পর্য্যটনের ফলে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সেই গ্রন্থে স্পিতি বিহারের বহু ফোটোগ্রাফ প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাদের মতে স্পিতি বিহার সম্ভবতঃ অতীশের শিষ্য ব্রোমতোন্ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। সে যাহা হউক ইহা সুস্পষ্ট ভাবে জানা যাইতেছে যে অতীশ গুজে প্রদেশের একটি বিহারে প্রায় দুই বৎসর কাল অবস্থান করেন।

(১) Archaeological Survey of Indla, Annual Report 1909-10.

(২) Antiquities of Indian Tibet, by A. H. Francke, Pages 1, 19, 23, 41, 42, 45. 50, 51, 52.

সেই বিহারটির নাম 'নিরাভোগ মহাবিহার'। এই বিহারে থাকিবার সময় তিনি "লোকাতিত-সপ্তাঙ্গ-বিধি" নামক এক খানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এখান হইতে পরে তিব্বতে গমন করেন।

আমরা হ্যাকিন সাহেবের লিখিত Asiatic Mythology নামকগ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে মুজে গীমে [Muse Guiemet] র বাকোট সংগ্রহাগারে অতীশের একখানি চিত্র আছে। সেই চিত্রে অতীশ এবং তাঁহার একজন শিষ্য—Rta-nag-gos-lo-tsa-ya-khugda-L. lhasirtis, এবং বজ্রসত্ব শক্তিকে আলিঙ্গন করিতেছেন এইরূপ ভাবে অঙ্কিত চিত্র ও যমের চিত্র রহিয়াছে। এই চিত্রখানি অতি সুন্দর। [১]

অতীশ দীপঙ্করের চিত্র

কথিত আছে দীপঙ্করের ধ্যান-প্রভাবে হয়গ্রীব মূর্ত্তির রূপ প্রকাশ পাইয়াছিল। [The horse-necked one] হয়গ্রীবের ঘোড়ার মত গলা, তিনটি মাথা, চারিটি হাত এবং চারিটী পা। মাথার চুল উস্কখুস্ক, মড়ার মাথার খুলির দ্বারা গঠিত মুকুট, মৃতমুণ্ড দ্বারা গ্রথিত কোমরবন্ধ, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম্ম। উর্দ্ধ দিকের হস্তে তীর ধনু। পদতলে দৈত্য বা রাক্ষস। [২]

হয়গ্রীব মূর্ত্তির প্রকাশ

এইভাবে নানা দিক দিয়াই আমরা জানিতে পারিতেছি যে দীপঙ্করের সেকালে ভারতবর্ষের পণ্ডিতসমাজে ও যেমন, তেমনি তিব্বতেও তাঁহার অসাধারণ প্রভাব বিস্তার লাভ করিয়াছিল। তিনি যখন তিব্বত গমন করেন, তখন বিক্রমশীলা বিহারের প্রধান আচার্য্য রত্নাকরের সহিত এইরূপ কথা ছিল যে তিনি তিনবৎসর পরে ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন, কিন্তু তিব্বতীয়েরা তাঁহার প্রতি এতদূর অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে তাঁহার পক্ষে ঘটনাচক্রে পড়িয়া আর ফিরিয়া আসা সম্ভবপর হইল না। ইহা হইতেও বুঝিতে পারা যায় যে তিনি তিব্বতে কিরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এবং জনপ্রিয় ছিলেন।

* Monastery of spiti was probably founded by Brom-Ston, the famous pupil of the famous teacher Atisa, in the 11th century Antiquities of Indian Tibet. by A. H Francke. Part 1 1914 cal. Page 45.

† Cordier, II. P. 251.

(১) দীপঙ্কর সম্বন্ধে Asiatic Mythology তে এই চিত্রের বিষয় লিখিত আছে এবং দীপঙ্কর ও তাঁহার শিষ্য সম্বন্ধে নিম্নলিখিত রূপ মন্তব্য রহিয়াছে, Rta-nag-gos-lo-tsa-ya-khug—A scholar and translator of high repute, people of the great master Atisa (Eleventh century) head of a school of copyists. In a painting in the Bacot collection he is depicted with the reformer Atisa (Dipangkara Srijnana) on his right, on the left Vajrasattva embracing his sakti, then to the right again Yama, the king of the hells. Page 173, Asiatic Mythology by J. Hackin, Clement Huart &c and translated by F. M. Atkinson.

(২) The Gods of Northern Buddhism by Alice Getty, oxford. 1928. Page 163.

দীপঙ্কর বরদা তারা এবং ষোড়শ মহাস্থবিরের ভক্ত ছিলেন এবং তিব্বতে উঁহার পূজা প্রবর্ত্তন করেন। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ বলেন :—স্থবির শব্দের অর্থ বৃদ্ধ। মনু বলেন :—

বরদাতারা ও ষোড়শ মহাস্থবির

ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ানমস্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥ মনু, ২।১৫৬।

"যাহার কেশ পক্ক হইয়াছে, তাহাকেই স্থবির বলে না। যিনি যুবক হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, দেবগণ তাঁহাকেই স্থবির বলিয়া জানেন। অতএব মহাস্থবির শব্দের অর্থ,—পরমশাস্ত্রজ্ঞ। পালি ভাষায় স্থবিরকে থের্ বলে। থের্ বৌদ্ধ ভিক্ষুর এক সম্মান-সূচক উপাধি। যে বৌদ্ধ ভিক্ষু-ব্রত গ্রহণ করিবার পর অন্ততঃ দশ বৎসর কাল নিষ্কলঙ্ক জীবন যাপন করিয়াছেন, তিনি থের্ পদবাচ্য। এইরূপ যে ভিক্ষু অন্তত বিশ বৎসর কাল পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে মহা থের্ বলে। তিব্বতীয় ভাষায় মহাস্থবির বা মহাথেরকে, নে-তেন্-ছেম্-পো বলে। এ শব্দের আবয়বিক অর্থ মহা-আসন-স্থির।"

খৃষ্টিয় প্রথম শতাব্দী পর্য্যন্ত সাত শত বৎসর মধ্যে ষোল জন মহাস্থবির আবির্ভূত হইয়াছিলেন, যদিও তাঁহারা বিভিন্ন সময়ে ও বিভিন্ন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের চরিত্রের উৎকর্ষ ও পরোপকারিতায় বিস্মিত হইয়া পরবর্ত্তী বৌদ্ধগণ এই ষোলটি নাম একসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। তিব্বতীয় ভাষায় ষোড়শ স্থবিরকে নেতেন্‌চুরুক্ বলে। তিব্বতের সর্ব্বোত্তম বিহার সমূহে অদ্যাপি মহা আড়ম্বরে নেতেন্-চুরুকের পূজা হয়। 'পাগ্‌সাম্ জোন্ জাঙ্গ' নামক সুপ্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ইতিহাসে ৩২৭—৩৩০ পৃষ্ঠায় স্থবির পূজার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইয়াছে। *

আমরা দীপঙ্করের তিব্বত-যাত্রার ইতিহাস বলিলাম। কিন্তু বাঙ্গালাদেশের এই মহাসাধক তিব্বতে যাইয়া, সেখানকার ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিরূপ সংস্কার করিয়াছিলেন এইবার সে বিষয়ে কিছু বলিতেছি। আমাদের দেশে মহাপুরুষগণের সম্পর্কে নানারূপ অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত হইয়া থাকে। দীপঙ্করের সম্পর্কেও তাঁহার সমসাময়িক জীবন-চরিত লেখকগণ, বলিয়া

তিব্বতে দীপঙ্করের শিক্ষা ও প্রভাব

* তিব্বতের ষোড়শ-মহাস্থবির—(১) দ্বিভুজ, (২) অঙ্গদিক, (৩) অজিত, (৪) বনবাসী, (৫) কালিক, (৬) বজ্রায়ণী পুত্র, (৭) ভদ্রিক, (৮) কনকবৎস, (৯) ভরদ্বাজ, (১০) বাকুল, [১১] ধৃতবর্ষ্ম, [১২] পিণ্ডোল ভরদ্বাজ, [১৩] নাগসেন, [১৪] ভবিক বা সিবক, [১৫] ধর্ম্মত্রাত বা ধর্ম্মাত, [১৬] রাহুল।

সাহিত্য, ১৬শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, বৈশাখ, ১৩১২। মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এম-এ লিখিত তিব্বতের ষোড়শ-মহাস্থবির নামক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

থাকেন যে, তাঁহার এক অসাধারণ শক্তি ছিল তাহা হইতেছে "পূর্ব্বজন্মানুস্মৃতি" অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মের সমুদয় কথা তাঁহার এজন্মেও স্মরণ ছিল। এক কথায় তিনি জাতিস্মর ছিলেন।

দীপঙ্কর তিব্বতে আসিয়া বারো বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। এই বারো বৎসর কাল তিনি তিব্বতের প্রায় সমুদয় প্রধান প্রধান নগরী এবং পুণ্যপীঠ সমূহ পর্য্যটন করিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে উপদেশ দিয়াছিলেন। একজন বাঙ্গালী ধর্ম্মাচার্য্যের পক্ষে বিদেশী তিব্বতীয়দিগকে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝাইয়া দেওয়া যে কত বড় গুরুতর কাজ তাহা সহজই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। দীপঙ্কর কিন্তু এই কার্য্যটী অতি সুন্দর ভাবে সম্পন্ন করিয়াছিলেন।

বুদ্ধদেব যেমন জাতকের গল্প বলিয়া শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেন, দীপঙ্করও তাঁহারই আদর্শে প্রত্যেকটী বক্তৃতা বা উপদেশের পর তাঁহার পূর্ব্বজন্মের এক একটী গল্প বলিয়া শ্রোতৃমণ্ডলীকে আকৃষ্ট করিতেন। তিব্বতীয়েরা শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং বিস্ময়ের সহিত তাঁহার বর্ণিত গল্প এবং উপদেশগুলি অন্তরের সহিত গ্রহণ করিতেন। দীপঙ্করের পবিত্র জীবন, তাঁহার সুমধুর ব্যবহার ও তিব্বতীয়দের প্রতি তাঁহার স্নেহ ও ভালবাসা অতি সহজেই তিব্বতবাসীদিগকে ধীরে ধীরে ধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিবার জন্য আগ্রহান্বিত করিয়া তুলিয়াছিল। অনেকে বলেন দীপঙ্করের শিক্ষা ও জাতকের গল্প বলার জন্যই তিব্বতের ধনী ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি বিশেষভাবে অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার গল্প বলিবার ক্ষমতা এইরূপ অসাধারণ ছিল যে, বালক, বৃদ্ধ, তরুণ, তরুণী সকলেই তাঁহার গল্প শুনিবার জন্য সমবেত হইতেন। অতীশও তাঁহার শিষ্যগণের সাহায্যে তিব্বতের কুসংস্কারাচ্ছন্ন অধিবাসীদের মন হইতে অনেক অন্ধ সংস্কার দূর করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। নরহত্যা, পশুবলি, ভূত-প্রেতে বিশ্বাস, ব্যাভিচার এইসকল দূষিত কার্য্য তাঁহার প্রভাবে বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল।

তিনি ধর্ম্ম কি ? কর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, এবং বৌদ্ধধর্ম্মের মূল আনন্দ, পরম প্রার্থিত 'নির্ব্বাণ' কাহাকে বলে এ সমুদয় ধীরে ধীরে তিব্বতীয়দের নিকট ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই আদর্শ অনুসরণ করিয়াই বৌদ্ধধর্ম্মের মূল সত্যকে প্রকৃতভাবে তাহারা গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল। ঐতিহাসিকের মতে ; "He gave a thoroughly spiritual turn to the minds of the Tibetan People,"

তিব্বতের শত শত শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অতীশের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে যেমন দীক্ষালাভ করেন তেমনি জ্ঞানানুশীলন দ্বারা ও বিবিধ ধর্ম্মশাস্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন। এই সকল শিষ্যদের মধ্যে জীনকর প্রধান ছিলেন। তাঁহার পারিবারিক নাম হইতেছে ব্রোমতোন্। ব্রোমতোন্ অতীশের নিত্যসঙ্গী ছিলেন। অতীশ যখন যে স্থানে গমন করিতেন জীনকর

অতীশের শিষ্য-সম্প্রদায়

ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাইতেন। এইজন্য ব্রোমতোন্ কে বুদ্ধদেবের নিত্যসঙ্গী আনন্দের সহিত তুলনা করা হইত। অতীশ ও ব্রোম্‌তোন জার্পা [yerpa] নামক বিহারে তিন বর্ষা [তিন বৎসর] অর্থাৎ বর্ষাকাল বাস করিয়াছিলেন। এই বিহারটী তুষার-ধবল-শৃঙ্গরাজী-পরিবেষ্টিত একটী অতি সুন্দর উপত্যকায় অবস্থিত। তিব্বতের এই স্থানটী প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য বিশেষ বিখ্যাত। এই স্থানে দীপঙ্কর তাঁহার প্রিয় শিষ্য ব্রোমতোন্ সম্বন্ধে অপর একজন শিষ্যের নিকট বলিয়াছিলেন: "ব্রোমতোন অবলোকিতেশ্বর দেবের অবতার স্বরূপ। তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার ভক্তি এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞান ও সিদ্ধি দেখিয়া আমি চমৎকৃত হইয়াছি। সে শুধু তিব্বতের নয়, বৌদ্ধজগতের উজ্জ্বল মণি। আমি তোমাদের নিকট এক সময়ে ব্রোমতোনের পূর্ব্ব জন্মের কাহিনী বলিব। ধর্ম্ম সম্বন্ধে ব্রোমতোন্ এতদূর উন্নত যে তাহা একটী রত্নখনির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।" দীপঙ্করের এইরূপ উক্তি শুনিয়া যে শিষ্য ব্রোমতোন্ সম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি বিস্মিত হইলেন। কিন্তু বিনয়ী ব্রোমতোন বলিলেন: "হে পূজনীয় গুরুদেব, আমি আপনার চরণতলে বসিয়া যে বিদ্যা ও জ্ঞানলাভ করিয়াছি তাহার জন্য আপনার এইরূপ প্রশংসা পাইবার যোগ্যতা আমার নাই।"

আমরা এই ভাবে দেখিতে পাইলাম দীপঙ্কর কিরূপ ভাবে তিব্বতীয়দিগের মনোরঞ্জন করিয়া ধীরে ধীরে তাঁহাদের জীবনে পবিত্রতার পুণ্যধারা প্রবাহিত করিয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মহাত্মা অতীশের [শ্রীজ্ঞান দীপঙ্করের] জনৈক প্রসিদ্ধ শিষ্য তাঁহার জীবন-চরিত রচনা করিয়াছিলেন। সেই জীবন বৃত্তান্ত হইতে আমরা জানিতে পারি যে সেকালের বৌদ্ধলামারা ও শ্রমণেরা কিরূপ উষ্ণীশ [শিরোস্ত্রাণ] ব্যবহার করিতেন। ১০৩০ খৃষ্টাব্দে বিক্রমশীলার মঠে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের এক অধিবেশনে তিব্বত রাজদূত নাগটাহো নাচোডা উপস্থিত ছিলেন। তিনি তদানীন্তন শ্রেষ্ঠ পুরোহিত স্থবির রত্নাকরের নিকট সংস্কৃত শিখিবার জন্য মগধে আসিয়াছিলেন। নাগটাহো এই সভায় উপস্থিত থাকিয়া যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে যে, উপাসনার সময়ে বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ টুপি বা উষ্ণীশ ব্যবহার করিতেন। তাঁহাদের ব্যবহৃত টুপী ত্রিকোণাকার ছিল। কথিত আছে তিব্বতের লামারা যে ত্রিকোণাকার টুপি ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা দীপঙ্কর কর্তৃকই তিব্বতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তিব্বতে অতীশের যে মূর্ত্তি অঙ্কিত আছে, তাঁহার মস্তক যে রক্তবর্ণ উষ্ণীশে পরিশোভিত তাহা ত্রিকোণাকার। এই ত্রিকোণাকার টুপিই লামারা শিরোস্ত্রাণরূপে ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন।

লামাদের ত্রিকোণাকার উষ্ণীশ

অতীশ দীপঙ্করের তিব্বতীয় ভাষায় অনেক জীবন-চরিত আছে। সে সমুদয় গ্রন্থ আলোচনা করিয়া বিস্তারিত ভাবে দীপঙ্করের জীবনী লিখিতে গেলে তাহা একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন :—'তিব্বতে দীপঙ্করের জীবনচরিত—অনেক আছে। আমরা কেহই তাহার সন্ধান করি নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক লামা দাউস্‌নদুপ কাজি মহাশয়ের নিকট প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা ব্যাপী দীপঙ্করের জীবনীর একখানি তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত পুঁথি আমি দেখিয়াছিলাম, তাঁহার সাহায্যে সেই পুস্তকের খানিকটা বুঝিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। আশা ছিল অবসর হইলে তাঁহারই সাহায্যে পুস্তক খানির অনুবাদ করিব। কিন্তু তাঁহার অকাল মৃত্যুতে সে আশা পূর্ণ করিতে পারিলাম না। বইখানি যে কোথায় গেল, তাহাও জানিনা। তিব্বতে সন্ধান করিলে আরও এরূপ পুঁথি পাওয়া যাইতে পারে বলিয়া মনে হয়। ব্রমটন লিখিত (১০৫৫ খৃঃ) দীপঙ্করের জীবন চরিতে-অনেক কথা পাওয়া যায়। এই একজন পূর্ব্ববঙ্গের বাঙ্গালী ছিলেন যিনি তৎকালীন জগতে অদ্বিতীয় যশ অর্জ্জন করিয়াছিলেন। *

অতীশের জীবন-চরিত

আমরা দীপঙ্করের সম্পর্কে তিব্বতীয় ভাষায় লিখিত সমুদয় জীবনচরিত হইতেই জানিতে পারি যে, তিনি বাঙ্গালাদেশের অন্তর্গত বিক্রমপুরের অধিবাসী ছিলেন। বিক্রমপুর, অর্থাৎ শ্রীবিক্রমপুর নামক সুবৃহৎ রাজধানীর অন্তর্ভুক্তি বজ্রযোগিনী নামক অংশে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। আমি এবিষয়ে মৎ প্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাসে' সর্ব্ব প্রথম উল্লেখ করিয়াছিলাম। তখন অনেকেই আমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন, এমন কি আমার গ্রন্থের ভূমিকা লেখক পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ও লিখিয়াছিলেন "বিক্রমপুর অদ্বিতীয় বৌদ্ধ পণ্ডিত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জন্মভূমি। তাঁহার ন্যায় ধীশক্তিসম্পন্ন মনীষী তখন ভারতবর্ষে ও তিব্বতে ছিল না। তিব্বত হইতে সময় সময় বৌদ্ধগণ দীপঙ্করের জন্মভূমি দর্শনেচ্ছায় বিক্রমপুরে আসিয়া থাকেন। কিন্তু বিক্রমপুরের কোন্ স্থানটী তাঁহার জন্মস্থান তাঁহার মীমাংসা বিষয়ে বড়ই গোলযোগে পড়েন।' * * * যোগেন্দ্রবাবু বজ্রযোগিনীকেই দীপঙ্করের জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। প্রত্নতত্ত্ববিদগণের এবিষয়ের যাথার্থ্য নির্ণয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত।" [১]

দীপঙ্করের জন্মভূমি

এই বিষয়টী লইয়া এবং আমার লিখিত "বাঙ্গালায় নটরাজ" শীর্ষক প্রবন্ধ লইয়া একটু আন্দোলনের পর দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞানকে আমি কোন্ কোন্ প্রমাণ

* বৃহৎবঙ্গ, প্রথম খণ্ড ৩১৬ পৃষ্ঠা। (১) বিক্রমপুরের ইতিহাস, প্রথম সংস্করণ ১৬ পৃষ্ঠা।

বলে বজ্রযোগিনীর অধিবাসী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলাম তৎসম্বন্ধে সংস্কৃত কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ মহানুভব মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট এক পত্রে লিখিয়াছিলাম। তদুত্তরে তিনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন এখানে তাহার প্রতিলিপি প্রদত্ত হইল।

My dear Jogendra Babu,

I am glad to hear that you have discovered two images of Nataraja from Eastern Bengal, your discovery confirms my theory that the worship of Nataraja was very common in early times but has almost disappeared from Bengal at the present day. *As regards Dipankar I long ago gave out my view that he was a native of Vajrajogini in Vikrampur.*

He flourished during the reign of the Pal kings and belonged to the Vajra sect of Mahajan Buddhist. That sect still exist in Tibet, Their Tantrik Practice called Mahasiddhi requires the Company of women called Yoginis * * *

Three Lamas from Tibet came to invite Dipankara at Vikrampur where they resided for two years. There was a Buddhist University at Vikrampur.

এখানে মহামহোপাধ্যায় স্বর্গত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিক্রমশীলা বিহারের সহিত বিক্রমপুরের নাম সংযোজিত করিয়াছেন। এই ভুল অনেকেই করিয়া থাকেন। * * * বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাব যে বিশেষ ভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করিব। সে সময়ে বিক্রমপুরে কোনও বিশ্ববিদ্যালয় ছিল কিনা তাহার কোনও প্রমাণ আমাদের হাতে নাই। তবে দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞানের বাসভূমি বজ্রযোগিনীর একটি স্থান এখনও 'টোলবাড়ীর ভিটা' নামে পরিচিত।

এক সময়ে বিক্রমশীলা বিহার সম্বন্ধে যে আলোচনা চলিয়াছিল তাহাতে কেহ কেহ বিক্রমপুরের সহিত বিক্রমশীলা বিহারকে জড়িত করিয়াছিলেন। স্বর্গত অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—''আজকাল একটা প্রশ্ন শোনা যাচ্ছে বিক্রমশীলা বিহার কোথায় ছিল? কেহ কেহ বিক্রমশীলাকে বিক্রমপুরের সঙ্গে জড়িত

* (১) বিক্রমপুরে প্রাপ্ত নটরাজ শিবমূর্ত্তি-শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত-ভারতবর্ষ ১ম বর্ষ ২য় খণ্ড পৌষ ১৩২০

বিক্রমশীলা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, প্রবাসী কার্ত্তিক ১৩৩০, ২৩ ভাগ, ২য় খণ্ড ৫ম সংখ্যা। ৮৭ পৃষ্ঠা ফণীন্দ্রনাথ বসু। (২) Index Pag-sam-Jon-Zang,

নটরাজ

করেছেন, তাঁরা ব'লতে চান যে বিক্রমপুরে বিক্রমশীলার মঠ ছিল। এখানে নামের সামঞ্জস্য খুব আছে বটে। কিন্তু সেইটেই মুখ্য প্রমাণ হতে পারে না। এ বিষয় লামা তারানাথের কথা আমি অধিক বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে করি। লামা তারানাথ তাঁর 'ভারতীয় বৌদ্ধধর্ম্মের ইতিহাসে' এই বিক্রমশীলার মঠকে মগধে গঙ্গার তীরে এক পাহাড়ের উপর প্রতিষ্ঠিত বলে নির্দ্দেশ করেন। [জার্ম্মাণ পণ্ডিত Schiefner এর অনুবাদ Taranath পৃঃ ২১৭ দ্রষ্টব্য] এই প্রমাণ অগ্রাহ্য করে আমরা বিক্রমশীলাকে বিক্রমপুরে নিয়ে যেতে পারিনে * * * যতদিন না এই স্থানটী বিজ্ঞান সম্মত উপায়ে খনন করা হচ্ছে, ততদিন এ প্রশ্নের চরম মীমাংসা হবে না। পণ্ডিত অভয়কর গুপ্ত ও দীপঙ্কর নালন্দা এবং বিক্রমশীলা দুই যায়গায়ই বই রচনা করেছিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী যোগিনীগণের ও তান্ত্রিকগণের বাস হেতু তাঁহাদের উপাস্যা দেবী বজ্রযোগিনীর নামের অনুযায়ী যে এই গ্রামের নাম বজ্রযোগিনী হইয়াছে ইহাই প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া মনে হয়। *

নেপালের সাঙ্কু [Sanku] নামক স্থানে বজ্রযোগিনীর একটি মন্দির আছে। সেই মন্দির মধ্যে উগ্রতারা দেবীর [Ugra-Tara] মূর্ত্তি—প্রতিষ্ঠিতা আছেন। আমাদের মনে হয় বজ্রযোগিনী গ্রামেও বজ্রযোগিনী দেবীর কোনও মন্দির থাকা সম্ভবপর এবং তদনুসারে বজ্রযোগিনী নামটী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। গ্রাম্য লোকেরা সাধারণতঃ এ গ্রামের নাম "বদর যোগিনী" এইরূপ বলিয়া থাকেন।

অনেক দিন পূর্ব্বে বজ্রযোগিনী গ্রাম নিবাসী 'হেলেনা কাব্য' প্রণেতা স্বর্গত কবি আনন্দচন্দ্র মিত্র মহাশয় লৌকিক কিংবদন্তী-মূলক "রাজকুমারী" নামক উপন্যাসে এই গ্রামের নাম "বরদা যোগিনী" উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার কাল্পনিক যুক্তি এই যে "পাল বংশীয়া বরদা নাম্নী কোন রাজকন্যা যোগিনীবেশে এই গ্রামে বাস করিতেন বলিয়াই ইহা 'বরদা যোগিনী' বা বজ্রযোগিনী' নামে অভিহিত হইয়াছে। এই যোগিনী মুন্সীগঞ্জের পূর্ব্বধারে ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদের সঙ্গমস্থলে স্নান করিয়াছেন বলিয়াই ঐ ঘাট 'যোগিনী ঘাট' বলিয়া প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর অষ্টমী স্নানোপলক্ষে এই

* [Vajrajogini, the chief Tantric ascetical Goddess, at whose request Buddha, in his terrific form of Vajra Bhairava, had delivered the Mula Tantra scriptures.]

VajraJogini, Consort of Heruka. Buddhist Iconography—Binoytosh Bhattacharjya Pages 155. 156,

ঘাটে পূর্ব্বে বহু যাত্রীর সমাগম হইত।" ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তানুযায়ী আনন্দ বাবুর লিখিত এই কিংবদন্তী সত্য নহে। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধপণ্ডিত দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞান এ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি বজ্রযোগিনী দেবীর উপাসক ছিলেন। বজ্রযোগিনী দেবীর অধিষ্ঠান-ভূমি বলিয়াই ইহা বজ্রযোগিনী নামে খ্যাত। *

বজ্রযোগিনী বিক্রমপুরের একটী সুপ্রসিদ্ধ গ্রাম। ইহার আয়তন প্রায় চারি বর্গ-মাইল। এই গ্রাম মুন্সীগঞ্জ মহকুমার সমীপবর্ত্তী। ইহা যে প্রাচীন শ্রীবিক্রমপুর নগরীর (বর্ত্তমানে রামপাল নামে পরিচিত) অন্তর্ভূত একটী অংশ ছিল তাহা পূর্ব্বেও উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রাম পূর্ব্বে নিম্নলিখিত কতকগুলি পাড়ায় বিভক্ত ছিল। (১) আট-পাড়া (২) পানহাট্টা (৩) আচার্য্যপাড়া (৪) বরলিয়া (৫) ধামদ (৬) মামাসার (৭) আজিমপুরা (৮) ধামারণ (৯) কল্যাণসিংহ (১০) ডেকুরাপাড়া (১১) চুড়াইন (১২) নাহাপাড়া (১৩) ভট্টাচার্য্য পাড়া (১৪) সোমপাড়া (১৫) পুকুর পাড়া (১৬) গুহপাড়া (১৭) পুরোহিত পাড়া (১৮) বসুপাড়া (১৯) শঙ্করবাঁদ (২০) সুখবাসপুর (২১) সরস্বতী (২২) রামসিংহ (২৩) মহাকালী (২৪) দেওসার (২৫) রঘুরামপুর (২৬) ধলগাঁ।

ইহা হইতেই এই গ্রামটী যে কত বড় বিস্তৃত ছিল তাহা অনুমিত হইবে। এই গ্রামের মৃত্তিকা খননে বহু প্রাচীন অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ ও বিবিধ দেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে একটী সরস্বতী মূর্ত্তির কথা বিশেষ রূপে উল্লেখযোগ্য। এই মূর্ত্তিটী বজ্রযোগিনী গ্রামের যে স্থানে পাওয়া গিয়াছে সেই স্থানের নিকটবর্ত্তী উচ্চ মৃত্তিকা স্তূপ "নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা" নামে অদ্যাপি পরিচিত হইয়া আসিতেছে। ঐ ভিটার বা বাড়ীর সংলগ্ন তিনটী প্রাচীন দীঘি পরস্পর কোণাকোণি ভাবে সংলগ্ন রহিয়াছে। ঐদীঘি তিনটী লালমতি, বোলমতি এবং ইছামতি নামে পরিচিত। সেই প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি যখন প্রথম এ ভিটা সংলগ্ন নানা স্থান পর্য্যবেক্ষণ করি, তখন যেখানে পঞ্চমুণ্ডীর আসন ছিল সেই স্থানটীও দেখিয়াছিলাম। ঐ স্থানের সহিত একটী অংশ টোলবাড়ীর ভিটা'টিও প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। পরবর্ত্তী কালে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনী-কান্ত ভট্টাশালী মহাশয় ও এ বিষয়ে আমাদের মতেরই সমর্থন করিয়াছেন। (১) এ পর্য্যন্ত

* সত্তর বৎসর পূর্ব্বে মুন্সীগঞ্জের পূর্ব্বদিকস্থ যোগিনী ঘাটে অষ্টমী স্নান করণার্থ অসংখ্য যাত্রি সমাগত হয়। স্নান ও তৎসঙ্গে আপন আপন ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমাপনান্তে অনেক যাত্রিকে বল্লাল রাজার কীর্ত্তিকদম্ব সন্দর্শন জন্য রামপালে উপস্থিত হয়। সেই উপলক্ষে নানাবিধ দ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়া থাকে। পল্লীবিজ্ঞান [১২৭৩-৭৫]।

* বিক্রমপুরের বিবরণ প্রথমখণ্ড—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। ১৩২৬ বঙ্গাব্দ। ২৬৯—২৮০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptures in the Dacca Museum. Page 190.

বাঙ্গালাদেশের, কি বাঙ্গালার বাহিরের, কি ইউরোপীয় পণ্ডিত যে কেহ দীপঙ্করের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তিব্বতীয় ইতিহাস প্রভৃতি পাঠ করিয়া এবং তিব্বতে গমন করিয়া তাঁহার কীর্ত্তি-পরিচয়, তদ্‌রচিত গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়া একবাক্যে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে দীপঙ্কর বাঙ্গালার অধিবাসী [বিক্রমপুর] ছিলেন। দীপঙ্কর আপনাকে রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, একথাও অপ্রকৃত নহে। তিব্বত দেশীয় লামা তারনাথ তাঁহার বৌদ্ধ ধর্ম্মের ইতিহাসে এইরূপ লিখিয়াছেন যে সে সময়ে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রত্যেক ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্য নিজ নিজ অধিকারে রাজা উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজ নিজ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অধিকারে রাজত্ব করিতেন, কিন্তু সমগ্র দেশে কেহ একচ্ছত্র নৃপতিরূপে আধিপত্য করিতে সক্ষম হয় নাই। কাজেই দীপঙ্কর আপনাকে যে রাজবংশীয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন তাহা অসঙ্গত নহে। তাঁহার পিতা ঐরূপ কোনও রাজবংশের লোক ছিলেন ইহাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

দীপঙ্কর তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যে সংস্কার করিয়াছিলেন সে বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের প্রসিদ্ধ প্রাচ্যবিদ্যানুরাগী পণ্ডিতেরাই নিজ নিজ গ্রন্থে শ্রদ্ধার সহিত তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। তিব্বতের ইতিহাসে সগৌরবে উহা উল্লিখিত আছে।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন :—"দীপঙ্কর বৃদ্ধ বয়সেও তিব্বতে গিয়া অনাবারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন এবং তথাকার অনেক লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছিলেন।

দীপঙ্কর বাঙ্গালীর গৌরব

তাঁহার পরে তিব্বতে নানা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উদয় হইয়াছে। তিব্বতে যে কখন বৌদ্ধধর্ম্মে লোপ হইবে এরূপ আশঙ্কা আর হয় নাই। তিনি তিব্বতে মহাযান মতেরই প্রচার করেন। তিনি বেশ বুঝিয়াছিলেন যে, তিব্বতীরা বিশুদ্ধ মহাযান ধর্ম্মের অধিকারী নয়, কেননা, তখনও তাহারা দৈত্য দানবের পূজা করিত, তাই তিনি অনেক বজ্রযান ও কালচক্রযানের গ্রন্থ তর্জ্জমা করিয়াছিলেন ও অনেক পূজাপদ্ধতি ও স্তোত্রাদি লিখিয়াছিলেন। তেঙ্গুর ক্যাটালগের প্রতি পাতেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বা অতিশার নাম দেখিতে পাওয়া যায়। আজিও সহস্র সহস্র লোকে তাঁহাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে। অনেকে মনে করেন, তিব্বতীয়দিগের যা কিছু বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা এ সমুদায়ের মূল কারণ তিনিই। এরূপ লোককে যদি বাঙ্গালীর গৌরব মনে না করি, তবে মনে করিব কাহাকে ?" *

* সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা। ৪র্থ সংখ্যা ১৩২১ সন ২৬৩ পৃষ্ঠা। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত—Modern Buddhism and its Followers in Orissa নামক গ্রন্থে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখিত ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

(১) Encyclopaedia of Religion and Ethics. Volume II. page 191. Edited by James Hastings. (২) During the reign of Mahipal's successor Nayapala, and headed by Atisa, from the Vikramsila monastery in Magadha, continued the work and firmly re-established Tibetan Buddhism. The Early History of India-Vincent A. Smith Pages 400-402.

দীপঙ্করের জন্মস্থান যে বাঙ্গালা দেশের বিক্রমপুর অঞ্চলে ছিল তৎ সম্বন্ধে আমরা বিবিধ প্রমাণ সহকারে আলোচনা করিয়াছি। যাঁহারা ঐতিহাসিক আলোচনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের নিকট ইহা বিশেষ ভাবেই জানা আছে যে, খৃষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দী ও তাহার পূর্ব্ব হইতেই সমতট বিক্রমপুরে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত ছিল। দীপঙ্করের সমকালে এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কালে বিক্রমপুরে বৌদ্ধ প্রভাবের বিবিধ পরিচয় নানারূপে পাওয়া যাইতেছে। সেই সব প্রমাণ একেবারে যাহাকে বলে 'পাথুরে প্রমাণ'। বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রামে প্রাপ্ত শ্রীমূর্ত্তি সমূহই তাহার প্রধানতম সাক্ষী। আমরা পরে যখন মূর্ত্তিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিব তখনই উহা পাঠকবর্গ উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

দীপঙ্করের জন্মস্থান

কিছুদিন পূর্ব্বে রাহুল সাংকৃত্যায়ন নামক একজন লেখক দীপঙ্করকে বিহারের অধিবাসী বলিয়া উল্লেখ করেন। তাঁহার মতে দীপঙ্কর বিহারের সাহোর নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি এ সম্বন্ধে কোনও যুক্তি বা তর্কের অবতারণা করেন নাই। আমাদের দেশে অনেকেই নিজ নিজ কল্পিত সিদ্ধান্তের অনুরূপ বিষয়ের অবতারণা করিয়া সম্পূর্ণ অনাবশ্যক ভাবে একটা তর্কের সৃষ্টি করেন। রাহুল সাংকৃত্যায়নও তাহাই করিয়াছেন। *

* পণ্ডিতবর রাহুল সাংকৃত্যায়ন দীপঙ্কর সম্বন্ধে "প্রবাসী" মাসিক পত্রে লিখিয়াছিলেন :—"ভোট দেশে ভারতীয় আচার্য্যদের মধ্যে শান্তরক্ষিত ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সমধিক সম্মানিত। দীপঙ্করের তিব্বতীয় নাম "অতীশা," "জোবো (স্বামী), বা "জোবো-জে" (স্বামী ভট্টারক)। ইঁহারা দুই জনেই সহোর প্রদেশের রাজবংশে উদ্ভূত। বাঙালী পণ্ডিতগণ "অতীশকে" বাঙালী বলিয়া প্রমাণ করেন। "বৌদ্ধগান ও দোঁহা" নামক পুস্তকের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এইরূপে জালন্ধরী কাহ্ন সরহ আদি কবিদের দাঁড় করাইয়াছিলেন। যাহা হোক, সহোর বঙ্গদেশে নয় বিহারে, বিক্রমশিলার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে, মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে এ অঞ্চল "ভাগল" নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সহোর মাণ্ডলিক রাজ্য ছিল, উহার রাজধানী ছিল বর্ত্তমান কহল গ্রামের নিকটস্থ কোনও স্থানে, দশম শতাব্দীতে রাজা কল্যাণশ্রী ইহার শাসক ছিলেন। ঐ সময়ে বঙ্গের পালবংশের বিজয়ধ্বজা বঙ্গ ও বিহার উভয় প্রদেশেই উড়িতেছিল, রাজা কল্যাণশ্রী তাঁহাদের অধীন ছিলেন। তাঁহার রাণী শ্রীপ্রভাবতী "কাঞ্চনধ্বজ" রাজপ্রাসাদে ভোটীয়-জল-পুরুষ-অশ্ব বর্ষে (৯৮২ খ্রী:) এক পুত্ররত্নের জন্মদান করেন। উত্তরকালে ইতিহাসে ইনিই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ হন। রাজা কল্যাণশ্রীর পদ্মগর্ভ, চন্দ্রগর্ভ, ও শ্রীগর্ভ নামক তিন পুত্রের মধ্যে ইনি মধ্যম।—নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর। রাহুল সংকৃত্যায়ন প্রবাসী বৈশাখ ১৩৪৫সন ১০৪ পৃষ্ঠা।

দীপঙ্করের জন্মস্থান সম্বন্ধে রাহুল সাংকৃত্যায়ন যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তৎ সম্বন্ধে তিনি কোনওরূপ প্রমাণ উপস্থিত করিতে পারেন নাই। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রতি তিনি যে কটাক্ষপাত করিয়াছেন তাহাও সমীচীন হয় নাই। শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে এবং বৌদ্ধ পণ্ডিতগণ সম্বন্ধে নানা রূপ

সরস্বতী

[বিক্রমপুরস্থ বজ্রযোগিনী গ্রামে দীপঙ্কর অতীশ শ্রীজ্ঞানের বাসভূমি—অথবা নাস্তিক পণ্ডিতের বাড়ী রূপে পরিচিত—টোল বাড়ীর মৃত্তিকা খননে প্রাপ্ত। ১৩২২ সনের "বিক্রমপুর" পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় এই মূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল।]

রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় সহোর মাণ্ডলিক রাজ্যের কথা বলিয়াছেন ও সহোর প্রদেশে দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াছেন, আমরা সেই সহোর সম্বন্ধে শরৎচন্দ্র দাশ মহাশয়ের লেখা হইতে যাহা জানিতে পারি, তাহাও সাংকৃত্যায়ন মহাশয়ের মতের পরিপোষক নহে। এমন কি সহোর ও বাঙ্গলা দেশের অন্তর্ভূর্ত বলিয়াই উল্লিখিত আছে :—To the East of vajrasana [Buddha Gaya] lies the great country of Bangala in which there was the place called Das-hor containing twenty hundred thousands habitations. At its centre was situated the capital which was prosperous, opulent, spacious, filled with a large population, well swept and kept clean. The Kings palace stood at the middle of city, furnished with many golden Dhwaja (ensigns of royalty). It will be seen that the name Das-hor has been elsewhere confounded with the name of a Khetria tribe. According to Cosma De koros the name Das-hor, is same as *sahor* the common name for a city, but it remains to be shewn if the name *sahor* is derived from Maghhadi or Bengali. It is considered, I believe,*

নূতন তথ্য দিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার মত একজন ঐতিহাসিকের পক্ষে বিনা প্রমাণ প্রয়োগে কোন কথা বলা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ আমরা নানা দিক দিয়া নানা ভাবে আলোচনা করিয়া দেখিতে পাইতেছি যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সমুদয় লেখকগণই একবাক্যে দীপঙ্কর যে বঙ্গদেশের অর্থাৎ পূর্ব্ববাঙ্গলার অধিবাসী ছিলেন তাহা সপ্রমাণ করিয়াছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর পূর্ব্বেই এবিষয়ে পাশ্চাত্য লেখকগণ ও শরৎচন্দ্র দাস মহাশয় প্রমাণ প্রয়োগ সহকারে দীপঙ্কর যে বাঙ্গলার অধিবাসী ছিলেন সে কথা বলিয়াছেন কাজেই এজন্য সাংকৃত্যায়ন মহাশয়ের মন্তব্য একেবারেই সমীচীন হয় নাই। এ বিষয়ে অনাবশ্যক এবং অহেতুক বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। আমরা এখানে রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতবাদের উপর শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাশগুপ্ত 'প্রবাসী' পত্রে যাহা বলিয়াছেন তাহা ও প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিলাম :—"অতীশ দীপঙ্কর সহোরে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, একথা নিতান্তই নূতন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় এই তথ্য কোন্ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কি সেকথাও বলেন নাই। বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ কোনও বাঙ্গালীর রচিত পুস্তক দেখিয়া অতীশকে বাঙ্গালী প্রতিপন্ন করেন নাই, এ বিষয়ে তাঁহাদের উপজীব্য একাধিক তিব্বতীয় ইতিবৃত্ত মূলক গ্রন্থ।

সকল গ্রন্থের উক্তি হয়তো বিশ্বাসযোগ্য নাও হইতে পারে, কিন্তু তেঙ্গুরের ক্যাটালগে 'বোধিমার্গ-প্রদীপ-পঞ্জিকা নাম' বলিয়া অতীশের স্বরচিত একখানি গ্রন্থে যে বিবরণ আছে, তাহাতে অতীশের বর্ণনায় স্পষ্ট লেখা আছে যে, তিনি "বাংলার রাজপরিবারে" জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন [Dipankara Srijnana de souche royale Bengalie—Catalogue du Fonds Tibetain de la Bibliotheque Nationale, Troisieme Partie, par P, Cordier, P 327] তেঙ্গুরের ক্যাটালগে 'একবীর সাধন নাম' বলিয়া অতীশের যে অপর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহাতেও আচার্য্য পৈণ্ডপাতিক শ্রীদীপঙ্করকে 'বাংলার' (du Bengale) বলিয়া উক্ত হইয়াছে (Ibid, Deuxieme Partie P, 46) "প্রবাসী" আশ্বিন ১৩৪৪ অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান ৮৯০ পৃষ্ঠা।

by same as derived from Urdu. [Buddhist Text society, Volume I. Page 8] অর্থাৎ বজ্রাসনের (বুদ্ধগয়া) পূর্ব্বে বিখ্যাত বাঙ্গালাদেশ অবস্থিত। বঙ্গদেশে সহোর নামক একটি স্থানআছে। ঐ স্থানে দুই লক্ষ লোকের বাস। ঐ সহরের মধ্যবর্ত্তী স্থানে রাজধানী বিরাজিত। রাজধানীতে বহু লোকের বাস এবং নগরীটি বহু স্বর্ণ-ধ্বজ [রাজ-চিহ্ন] সমন্বিত বাড়ীঘরে সুশোভিত। সহরটি সমৃদ্ধ, জনতাবহুল, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। রাজপ্রাসাদ নগরীর মধ্যস্থলে বিদ্যমান। রাজপ্রাসাদের উপর বহু কাঞ্চন-ধ্বজ শোভমান। অনেকে এক ক্ষত্রিয় জাতির নামের সহিত এই স্থানের নামের গোল করেন। Cosma-de Koorosi এর মতে—সহোর নামটি হইতেছে সহর বা সহোর অর্থাৎ নগর অর্থবোধক। অনেকের মতে সহোর শব্দ মাগধি বা বাঙ্গলা শব্দ হইতে উদ্ভূত। আবার অনেকে মনে করেন উহা উর্দ্দু হইতে উদ্ভূত। কাজেই রাহুল সংকৃত্যায়ন যে সহোর মাণ্ডলিক রাজ্যের কথা উল্লেখ করিয়াছেন তাহা যে বাঙ্গলা দেশেরই অন্তর্গত ছিল, বিহারে নহে। *

তিব্বতীয় ভাষায় দীপঙ্কর অতীশের অনেকগুলি জীবন-চরিত রহিয়াছে। তাঁহাদের মধ্যে কল্যাণমিত্র—[Phyag-sorpa], নাগ-সো-[H Borm-Ston-Pa], বুস্তন-[Bu-Ston], এবং "অতিশাই নামথর" নামক দীপঙ্করের জীবনীখানি বিশেষরূপে প্রামাণিক বলিয়া গণ্য। আমরা এই সমুদয় গ্রন্থ হইতে জানিতে পারি যে দীপঙ্কর বাঙ্গলা-দেশের বিক্রমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। "অতীশাই নামথরের" ইংরাজীতে কিংবা পাশ্চাত্য অন্য কোনও ভাষায় কোনরূপ অনুবাদ হইয়াছে কিনা তাহা আমরা জানিনা। বিখ্যাত পর্য্যটক স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাশ মহাশয় বলেন:–"আমি তিব্বতীয় ভাষার অভিধান সঙ্কলনকারী বহুতর প্রাচীন হস্তলিখিত বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলাম। উক্ত পাণ্ডুলিপি সমূহের মধ্যে "অতীশাই নামথর" নামক অতীশের জীবনী গ্রন্থে আমি "পান্স" বা পণ্ডিতের টুপি ধারণ বিষয়ের উল্লেখ দেখিতে পাই। মহাত্মা অতীশ তিব্বত-যাত্রাকালে মস্তকে টুপি পরিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্বপ্রথম তিব্বতীয় লামাদিগের মধ্যে মস্তকাবরণ ধারণ করিবার পদ্ধতি প্রচলিত করেন। পাগ্-সাং জোং জাঙ্গ নামক তিব্বতীয় গ্রন্থে পণ্ডিতদিগের শিরোস্ত্রাণ ধারণের বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে। এই গ্রন্থ ভারতবর্ষ ও তিব্বতের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যে পূর্ণ"।

অতীশের জীবন-চরিত লেখকগণ

* Alex Cosma de Koorosi—a native of Hungary, who, to follow out philological researches, resorted to the east, and for years passed under privation, such as seldom has been endured, and patient labour in the cause of science, compiled a Dictionary and Grammer of the Tibetan language, his lasting and real monument. On his road to H'lasa to resume his labours he died at Darjeeling on the 11th April, 1842, Aged 44 years. Darjeeling Past and present by E. C. Dozey P. 147.

দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের জীবনচরিতকার বুস্তন তাঁহার প্রিয় শিষ্য ছিলেন। বুস্তন দীপঙ্করের জীবন-চরিত লিখিতে যাইয়া তাঁহার বিষয়ে যাহা লিখিয়াছেন —এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম। "প্রাচীন কালে বুদ্ধ যখন জন্মগ্রহণ করেন সে সময়ে রাজগৃহ নামক স্থানে জিন পুত্র ভদ্রাচার্য্য নামে একজন গৃহস্থ বাস করিতেন। পরবর্ত্তী কালে তিনি বুদ্ধদেবের মৃত্যুর ১,৮১৫ বৎসর পরে পূর্ব্বভারতের বঙ্গদেশে **বিক্রমপুর নগরে** অতীশরূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই রাজবংশেই শান্তি বা শান্তরক্ষিত ও জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর রাজধানীর মধ্যবর্ত্তী প্রাসাদে জন্মলাভ করেন। ঐ প্রাসাদ "সুবর্ণধ্বজ" নামে পরিচিত ছিল। ইঁহার পিতার নাম কল্যাণশ্রী এবং মাতার নাম পদ্মপ্রভা। ইঁহাদের তিনপুত্র ছিল। দীপঙ্কর মধ্যম এবং তাঁহার নাম চন্দ্রগর্ভ রাখা হয়। দীপঙ্করের অতি অল্প বয়সে বিবাহ হয়। তাঁহার পাঁচটী স্ত্রী ছিল। ইঁহাদের গর্ভে নয়টী পুত্র জন্মগ্রহণ করে। এক পুত্রের নাম পুণ্যশ্রী।" [In ancient time when the Buddha had come to this world, there was a householder in Rajagriha named Jinaputra. ***In later time he was born as Atica according to Bu-Ston, 1815 years after the death of the Buddha, at the city of Vikrampur in Bengal, in Eastern India,*** in the Royal house from which the great Sage Canti Raksita had sprung. His birth took place in the central palace called Suvarnadhvaja. His father was king Kalyan Cri and mother Queen Padma Prabha, He was the second of the three sons they had and was named Chandra-garbha. He was married while young to five wives by whom he had nine sons, one of whom was PunyaCri] *

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরী বলেন :—"পাল-রাজগণের আনুকূল্যেই দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান প্রমুখ বাঙ্গালী প্রচারকেরা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন।"

পাগ্-সাম্-জোন্-জাঙ্গে বঙ্গের নানাস্থানে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণের পরিচয় লিখিত আছে। আমাদের মনে হয় সে-সময়ে যাঁহারা বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হইতেন তাঁহারা নিজেদের বংশ বা জাতির পরিচয় ও সঙ্গে সঙ্গে দিতেন। এইজন্য আমরা তিব্বতের ইতিহাসে যে সকল বাঙ্গালী বৌদ্ধের পরিচয় পাই তাহাতে "ব্রাহ্মণ বৌদ্ধ" এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাইয়া থাকি।

* (১) Pag-Sam-Jon Zang, Part II XVIII. (২) ভারতবর্ষের ইতিহাস, হেম রায়-চৌধুরী ৯৪ পৃষ্ঠা।

Pag—Sam Jon-Zang. Part I Cx liv Index.

সাহিত্য ১৫শ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা, আষাঢ় ১৩১২ সাল, "বৌদ্ধ লামার শিরোত্রাণ' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য ১৮৯ পৃষ্ঠা।

আমরা এইখানে বিক্রমপুরের আর একজন ব্রাহ্মণ-শ্রমণের পরিচয় দিতেছি, ইহার নাম ধীমপা। ইনি কৃষ্ণাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। [Dhimapa a Brahman Buddhist of Vikrampure, a novice monk who served Krishnacarya.]

ধীমপা ব্রাহ্মণ-শ্রমণ বিক্রমপুর

আমরা দীপঙ্করের কথা এইখানেই শেষ করিলাম। তাঁহার জন্মস্থান, বংশ-পরিচয় পাণ্ডিত্য এবং তিব্বত-যাত্রা এবং তথায় তিনি যে ভাবে ধর্ম্ম সংস্কার করিয়া তিব্বতবাসীর নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও ভক্তিলাভ করিয়াছিলেন--তাহা বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের কারণ। বাঙ্গালী দীপঙ্করকে স্মরণ করিয়া আজ আমরা বাঙ্গালী মাত্রেই গর্ব্ব অনুভব করিতেছি।

আমরা প্রসঙ্গক্রমে পালরাজাদের বিষয় আলোচনা করিয়াছি। এইখানে একটা কথা বলা আবশ্যক যে, পূর্ব্ববর্ত্তী পালরাজাগণের অর্থাৎ ধর্ম্মপাল, দেবপাল প্রভৃতি নৃপতিগণের গৌড়-বঙ্গ-মগধ পর্য্যন্ত যে প্রভাবের বিষয় জানিতে পারি পরবর্ত্তী পালরাজাগণের সেই প্রভাব ছিলনা।

পালরাজাদের শেষকথা

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক বলেন :—"অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বাঙ্গলা দেশকে আমরা কেবল দুইটী বিভাগে বিভক্ত মনে করিয়া ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বুঝিবার চেষ্টা করিতে বাধ্য হইব, উত্তরে "গৌড়" বা "পুণ্ড্রবর্দ্ধন" এবং পশ্চিমে, দক্ষিণে ও পূর্ব্বে 'বঙ্গ'। এই সময়ে 'বঙ্গ' বলিলে পূর্ব্ব কালের 'সুহ্ম' 'বঙ্গ' ও 'সমতট' এই তিন দেশের অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত বিভাগ মনে করিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ তখন 'বর্দ্ধমানপুর' হরিকেলের একটী স্কন্ধাবার (রাজধানী বা সেনানিবেশ স্থান) ছিল। এই যুগের উত্তর বাঙ্গলার নরপতি 'গৌড়াধিপ'—'গৌড়েশ্বর' প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত হইতেন। দশম একাদশ শতাব্দীতে হরিকেল বা **বঙ্গদেশের রাজধানী পূর্ব্ববাঙ্গালার বিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল একাদশ দ্বাদশ শতাব্দীর 'বঙ্গপতি'গণও বিক্রমপুর রাজধানী হইতেই** শাসন কার্য্য পরিচালনা করিতেন।" কাজেই দীপঙ্করের রাজধানী বিক্রমপুরের অন্তর্ভূত বজ্রযোগিনী গ্রামে জন্মগ্রহণ করা যে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক তাহা সহজেই অনুমেয়।

"খৃষ্টিয় নবম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে গৌড়াধিপগণ ও বঙ্গপতিগণ সর্ব্বদাই পরস্পর স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নরপতিরূপে নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতেন। পরস্পরের মধ্যে সময়ে সময়ে যে যুদ্ধবিগ্রহ বা অন্য কোনরূপ রাজনীতিক সম্বন্ধ বা সম্পর্ক ঘটে নাই তাহা বলিলে ইতিহাসের মর্য্যাদা অতিক্রম করা হয়। ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই গৌড়েশ্বর পাল-নরপতিগণের রাজত্বের সময়ে, বিশেষতঃ তাঁহাদের সাম্রাজ্য

প্রতিষ্ঠার ও তদ্বিস্তারের প্রথম যুগে, বঙ্গরাজ্যকে পাল সাম্রাজ্যের অধিকারভুক্ত ও পাল রাজগণের শাসনাধীন মনে করিয়া থাকেন। ....কেবল বাঙ্গালা দেশের বিভাগ সমূহের কথা বলিতে গেলে এই বলিতে হয় যে, উত্তরবঙ্গই গৌড়েশ্বরগণের অপরোক্ষ অধিকারে ছিল এবং অনুত্তর-বঙ্গ অর্থাৎ পশ্চিম দক্ষিণ-পূর্ব্ববঙ্গ বঙ্গপতিগণের শাসনাধীনে ছিল। *

স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য

আমরাও ডাক্তার বসাক মহাশয়ের সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া মনে করি। নয়পালের পরবর্ত্তী রাজগণের বিষয় বিস্তারিতরূপে আলোচনা করা আমরা অনাবশ্যক মনে করিতেছি। কেন-না তাহাদের প্রভাব বঙ্গরাজ্যে ছিলনা। নয়পালের মৃত্যুর পর তদীয় পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পালদেব সিংহাসনে আরোহণ করেন। ঐতিহাসিক রাখাল-দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন:— "তৃতীয় বিগ্রহপাল গৌড় মগধ এবং বঙ্গের অধিকার লাভ করিয়াছিলেন।" * একথা যে প্রমাণসহ নহে তাহা আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে যখন স্বাধীন বঙ্গরাজ্য ও রাজধানী বিক্রমপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিব তখন তাহার উল্লেখ করিব। এই তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের সময় হইতেই পালসাম্রাজ্যের অধঃপতন আরম্ভ হয়। তৃতীয় বিগ্রহপালদেবের তিন পুত্র মহীপাল, শূরপাল ও রামপাল। ইহারা সকলেই একে একে গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপাল জীবিত কালে অথবা তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরে বরেন্দ্রভূমে [উত্তরবঙ্গ] কৈবর্ত্তগণ বিদ্রোহী হইয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দী বিরচিত 'রামচরিতে' এই বিদ্রোহের বর্ণনা রহিয়াছে, কাজেই মহীপাল রাজা হইয়া যে রাজ্যলাভ করিয়াছিলেন তাহা সেইরূপ বিস্তৃত ছিলনা।

তৃতীয় বিগ্রহপাল

মহীপাল রাজা হইয়া মন্ত্রীগণের পরামর্শে অনেক গর্হিত কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া "রামচরিতে" লেখা আছে। তিনি তাঁহার ভ্রাতা শূরপাল এবং রামপালকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিলেন, এই ভয়ে যে—তাঁহারা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবে। কিন্তু মহীপাল বিদ্রোহী কৈবর্ত্তগণকে দমন করিতে যাইয়া নিহত হইলে পর রামপালদেব কারামুক্ত হইয়াছিলেন। অনেকের মতে মহীপালদেবের মৃত্যুর পর শূরপাল দেবও সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। সন্ধ্যাকরনন্দী কিন্তু এ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই।

দ্বিতীয় মহীপাল

কৈবর্ত্ত বিদ্রোহ ও মহীপালের মৃত্যু

* ডাক্তার শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম. এ. পি. এইচ-ডি বঙ্গসমতটের কয়েকটি প্রাচীন-বৌদ্ধ রাজবংশ। প্রাচী ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা ৪১—৪২ পৃষ্ঠা।

* বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১ম খণ্ড ২৩৫ পৃষ্ঠা।

মহীপালদেবের মৃত্যুর পর রামপাল কারামুক্ত হইলেন কিন্তু সে সময়ে তাঁহাদের রাজ্য শত্রুকরতলগত। রামপাল কি ভাবে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিবেন সেজন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন, অবশেষে তিনি বরেন্দ্রী ত্যাগ করিয়া গৌড়রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশের সামন্তগণকে একত্রিত করিবার জন্য রাঢ়, অঙ্গ মগধ প্রভৃতি পর্য্যটন করেন এবং সামন্তগণের সহায়তা প্রার্থনা করেন। তাঁহারা রামপালকে সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুতি দিলেন। তৎপর রামপাল এক মহাবাহিনী লইয়া নৌকায় গঙ্গা পার হইলেন। পালরাজের সেনার সহিত কৈবর্ত্ত রাজের সেনার ভীষণ যুদ্ধ হইল, করিপৃষ্ঠে অবস্থিত কৈবর্ত্তরাজ ভীম বন্দী হইলেন। এই উপলক্ষ্যে সন্ধ্যাকর নন্দী একপক্ষে রামের এবং অপরপক্ষে ভীমের চরিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন। * রামচন্দ্র যেমন রাক্ষস রাবণকে বধ করিয়া সীতাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন তেমনই মহারাজ রামপাল 'যুদ্ধ-সাগর' লঙ্ঘন করিয়া ভীমরূপ রাবণ বধ করিয়া জনকভূ উদ্ধার করিয়া রামপাল ত্রি-জগতে দাশরথি রামের ন্যায় যশোবিস্তার করিয়াছিলেন। রামপালকে রামচরিতকার রামচন্দ্রের সহিত তুলনা করিয়াছেন। 'জনকভূ' বরেন্দ্র অর্থে গ্রহণ করিলে এই শ্লোকেও কৈবর্ত্ত-বিদ্রোহের প্রমাণ পাওয়া যায়। জনকভূর এক অর্থ সীতা-জনক হইতে যিনি উদ্ভূত হইয়াছেন, আর এক অর্থ জনকের অর্থাৎ পিতার ও জন্মভূমি অর্থাৎ পিতার রাজ্য বরেন্দ্রী দেশ। *

রামপাল

রামপালের জনক-ভূ উদ্ধার

রামচন্দ্র যেমন অর্ণব লঙ্ঘন করিয়া, রাবণ বধান্তে জনকনন্দিনী লাভ করিয়াছিলেন; রামপালদেবও [যথাবৎ] সেইরূপ যুদ্ধার্ণব সমুত্তীর্ণ হইয়া, ভীমনামক ক্ষৌণী-নায়কের বধ সাধন করিয়া, জনক ভূমি (বরেন্দ্রী) লাভে ত্রিজগতে [শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়] আত্মযশঃ বিস্তার করিয়াছিলেন।

অধ্যাপক ভিনিস্ এই শ্লোকোক্ত 'জনক ভূ"—শব্দের মিথিলা অর্থ গ্রহণ করিয়া, রামপাল কর্ত্তৃক ভীম নামক মিথিলাধিপতির পরাজয়-সাধনের ইঙ্গিত করিয়া লিখিয়াছেন—I cannot identify the name। এই শ্লোকের সহিত মিথিলার সম্পর্ক নাই। জনক-ভূ" শব্দে পাল রাজগণের জন্মভূমি "বরেন্দ্রী" সূচিত হইয়াছে। তৃতীয় বিগ্রহপাল দেবের পরলোকগমনের পর তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বিতীয় মহীপাল দেবের যথেচ্ছ শাসনে সংক্ষুব্ধ হইয়া প্রজাপুঞ্জের নায়ক কৈবর্ত্ত জাতীয় দিব্য তাঁহাকে সিংহাসন-চ্যুত ও নিহত করিলে কিছুকালের জন্য পালরাজগণের "জনকভূ" [বরেন্দ্রী] তস্য ভ্রাতা রুদোক এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ভীম নামক ক্ষৌণী-নায়কের করতলগত হইয়াছিল। রামপাল বহু চেষ্টায়, বহু ক্লেশে সেই 'জনকভূ'র উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন বলিয়া, [স্বনাম-সাদৃশ্যে এবং স্বকার্য্য-সাদৃশ্যে] দ্বিতীয় রামচন্দ্র রূপে প্রতিভাত হইয়াছিলেন। রাজকবি এই ঐতিহাসিক ঘটনা বিবৃত করিবার অভিপ্রায়ে, রামপক্ষে এবং রামপাল-পক্ষে তুল্যরূপে প্রযোজ্য 'জনকভূ লাভাৎ' 'ভীম—রাবণ-বধাৎ' এবং যুদ্ধার্ণবোল্লঙ্ঘনাৎ' এই তিনটি শ্লিষ্ট পদের ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সন্ধ্যাকর-নন্দি বিরচিত 'রাম চরিত' কাব্যে এই ঐতিহাসিক ঘটনার আনুপূর্ব্বিক বিবরণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহার কোন কোন স্মৃতি চিহ্ন বরেন্দ্রভূমিতে অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই প্রশস্তিতে কৈবর্ত্তরাজ ভীম 'ক্ষৌণী নায়ক' বলিয়া উল্লিখিত—রাজকবি তাঁহাকে নায়ক মাত্রই বলিয়াছেন রাজা বলেন নাই। গৌড়লেখমালা—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় ১৩৮ পৃষ্ঠা।

ভীম রামপালের সহিত যুদ্ধে বিশেষ পরাক্রম দেখাইয়াছিলেন। ভীম যখন হস্তীপৃষ্ঠে ধৃত হন তখন তাঁহার বন্ধু হরি, কৈবর্ত্ত-সৈন্যদিগকে লইয়া যুদ্ধ করেন। সম্ভবতঃ ভীমও হরি উভয়েই এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। রামপাল এইভাবে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া বরেন্দ্রীতে 'রামাবতী' নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। 'রামাবতী' পাল রাজবংশের শেষ রাজধানী। রামপাল দেব এই নগরে 'জগদ্দল মহাবিহার' নামে একটি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। 'রামাবতী' রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের সময়েও গৌড়রাজ্যের রাজধানী ছিল। আবুলফজল তৎপ্রণীত 'আইন-ই-আকবরী'তে 'রমৌতি নগরের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন:—" লক্ষ্মণাবতী হইতে যেমন লক্ষ্মৌতি হইয়াছে, সেইরূপ রামাবতি পারস্য ভাষায় রমৌতি রূপ ধারণ করিয়াছে।" *

রামাবতী

রামাবতী নগরী প্রতিষ্ঠার পর রামপাল দেব উৎকল ও কলিঙ্গ বিজয় করিয়াছিলেন। রামপালের পর অল্পদিনের মধ্যেই পাল রাজবংশের অবনতি ঘটে এবং তৃতীয় বিগ্রহ পালের সময় হইতেইযে তাহার সূত্রপাত হইয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ইহা হইতে পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন যে, 'শ্রীবিক্রমপুর' বা 'বঙ্গরাজ্য' দশম-একাদশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর পাল রাজগণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—এবং স্বাধীন ছিল এবং গৌড়াধিপগণ ও বঙ্গপতিগণ স্বতন্ত্র ও স্বাধীন ভাবে ভিন্ন ভিন্ন রাজ্য ও রাজধানীতে অবস্থান করিয়া নিজ নিজ রাজ্য শাসন করিতেন। **স্বাধীন বঙ্গদেশের রাজধানী ছিল বিক্রমপুর** এবং সেই স্বাধীন বঙ্গরাজ্যের গৌরব-কাহিনী আমরা পরবর্ত্তী অধ্যায়ে আলোচনা করিব।

* রামপাল রামাবতী নামে যে নগর বসান, 'জগদ্দল মহাবিহার' তাহার কাছেই ছিল। উহা গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গমের উপরেই ছিল। এখন করতোয়া গঙ্গায় পড়ে না পড়ে যমুনায়, গঙ্গাও এক সময়ে বুড়ীগঙ্গা দিয়া যাইত। তাই, ভাবিয়াছিলাম, রামপাল নামে মুন্সীগঞ্জে যে এক পুরাণ গ্রাম আছে, হয়ত সেই রামাবতী ও জগদ্দল উহারই নিকটে হইবে। আমি একথা প্রকাশ করার পর, অনেকেই জগদ্দল খুঁজিতেছেন, কেহ মালদহে, কেহ বগুড়ায়, কিন্তু খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নাই, পাওয়া কিন্তু নিতান্ত দরকার। কারণ, মগধে যেমন নালন্দা, পেশোয়ারে যেমন কনিষ্ক বিহার, কাশ্মীরে যেমন দীপদত্তম বিহার, সেইরূপ বাঙ্গালায় মহাবিহার জগদ্দল। তেঙ্গুরে কোথাও লেখে উহা বরেন্দ্রে ছিল, কোন কোন জায়গায় লেখে বাঙ্গালায়, কোন কোন জায়গায় লেখে পূর্ব্ব ভারতে। যাহা হউক উহা একটি প্রকাণ্ড বিহার ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। * * রামপালই যে ঐ বিহার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, এমন বোধ হয় না। [মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা ৪র্থ সংখ্যা সন ১৩২১] স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় শব্দগত সাদৃশ্যের উপর নির্ভর করিয়া ঢাকা জেলার অন্তর্গত রামপালকে রামাবতী বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ের নিকট রামপুরা নামক স্থানে রামাবতীর অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাচীন রামাবতী সরকার জন্নতাবাদ বা গৌড়ের সীমা মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং তাহার ধ্বংসাবশেষ কখনই ঢাকা অথবা বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত হইতে পারে না। বগুড়া সরকার ঘোড়াঘাটে এবং সরকার বাজুহায় অবস্থিত এবং রামপাল সরকার সোনারগাঁয়ে অবস্থিত। বাঙ্গালার ইতিহাস—২৭২ পৃষ্ঠা।

পঞ্চম অধ্যায়

প্রাচীন বঙ্গ রাজ্য—রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর

'বঙ্গ' নামটি অতি প্রাচীন। এ বিষয়ে পূর্ব্বে অনেক কথাই বলা হইয়াছে। এই নাম বৈদিক সাহিত্যে, বৌদ্ধগ্রন্থে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে, পুরাণে, মহাকবি ভাসের নাটক প্রভৃতিতে উল্লিখিত আছে। কিন্তু সেকালের বঙ্গদেশের সীমা কিরূপ ছিল, সে-সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের নাই এজন্য এখানে ভৌগোলিক বৃত্তান্ত ও কিছু আলোচনা করিব।

বঙ্গ নামের প্রাচীনত্ব

প্রত্যেক দেশেরই প্রাকৃতিক সীমা নানারূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ নদী-মাতৃক-দেশে, নদীর গতি-পরিবর্ত্তন হেতু, দেশের সীমার পরিবর্ত্তন ঘটে। রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনেও দেশের সীমার পরিবর্ত্তন হয়। অতীতের কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি বর্ত্তমান সময়ের কথাই বলি, তাহা হইলেও বর্ত্তমান ইংরাজ রাজত্বে বঙ্গ-দেশের সীমা কতবার কতরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা সকলেরই সুবিদিত।

আমরা খৃষ্টিয় চতুর্থ শতাব্দী হইতে বঙ্গদেশের যে পরিচয় পাই, তাহা যে সমতট প্রদেশ হইতে স্বতন্ত্র এবং পূর্ব্বাঞ্চলের প্রত্যন্ত দেশ সমূহের মধ্যে পরিগণিত হইত তাহা সমুদ্রগুপ্তের প্রয়াগস্তম্ভলিপি হইতেই জানিতে পারি। তখন বঙ্গদেশে গুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত হইলেও সমতট প্রত্যন্ত দেশ রূপে পরিগণিত ছিল।

'বঙ্গ, সমতট

ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বলেন—"ষষ্ঠ শতাব্দীর জ্যোতির্ব্বিদ গণিতাচার্য্য বরাহমিহির পূর্ব্বদিকের মগধ, মিথিলা, প্রাগজ্যোতিষাদি দেশ সমূহের মধ্যে সুহ্ম, সমতট, গৌড়ক, পৌণ্ড্র, তাম্রলিপ্তিক ও বর্দ্ধমান এই কয়টী দেশের নামোল্লেখ করিয়াছেন এবং অগ্নিকোণে অঙ্গ-কলিঙ্গাদি দেশ-সমূহের মধ্যে বঙ্গ ও উপবঙ্গের নামও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বরাহমিহিরের পূর্ব্বে ও তাঁহার সমসময়ে দেশবিভাগ সমূহের নাম ছিল গৌড়ক ও পৌণ্ড্র—তাহাই কোটিবর্ষ প্রভৃতি 'বিষয়' লইয়া গঠিত 'পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি' নামে, আবার কখনও 'বরেন্দ্রী' নামেও আখ্যাত হইত, এবং তাহাই মোটামুটিভাবে বর্ত্তমান সময়ের 'উত্তর বঙ্গ,' অর্থাৎ রাজসাহী, পাবনা, বগুড়া, রঙ্গপুর, দিনাজপুর ও মালদহ জিলা সমূহের সম্পূর্ণ ভাগ বা অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত বিভাগ। আর যে দেশ বিশেষের নাম ছিল 'সমতট,' তাহাই মোটামুটি ভাবে বর্ত্তমার সময়ের "পূর্ব্ববঙ্গ"

বঙ্গ ও উপবঙ্গ

অর্থাৎ বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা ঢাকা ও ফরিদপুর জিলা সমূহের সম্পূর্ণ ভাগ বা অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত বিভাগ, কিন্তু খুলনা ও চট্টগ্রামের সমুদ্রতট সংলগ্ন অংশ বিশেষ ইহাতে অন্তর্ভুক্ত ছিল না এইরূপ কথা কেহ শপথ করিয়া বলিতে পারিবেন না। * "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন,—"সমুদ্র পর্য্যন্ত সম্প্রসারিত পূর্ব্ববঙ্গই প্রাচীনকালে সমতট, বঙ্গ বা হরিকেল প্রদেশ বলিয়া পরিচিত ছিল।"

ইউয়ান্ চোয়াং
(৬৩০—৬৪৪ খৃঃ)

চীন দেশীয় পর্য্যাটক ইউয়ান্ চোয়াং [হিউয়েন সাঙ] বাঙ্গলা দেশ পর্য্যটন করেন। তিনি তাঁহার ভ্রমণে পৌণ্ড্রবর্দ্ধন, কর্ণসুবর্ণ, **সমতট** ও তাম্রলিপ্তের নামোল্লেখ করিয়াছেন। তবে তিনি বঙ্গ ও সমতট এই উভয় স্থানকেই 'সমতট' শব্দ দ্বারা বুঝাইয়াছেন কিনা তাঁহার লিখিত বিবরণী হইতে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

ইউয়ান চোয়াংয়ের পর খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে চৈনিক-পর্য্যটক ইৎসিং ভারতে আসেন। হরিকেল অর্থাৎ বঙ্গে ["বঙ্গাস্তু হরিকেলিয়া" ইতি হেমচন্দ্র] এ নামের উল্লেখ করিয়াছেন। হরিকেল হইতেছে পূর্ব্ববঙ্গের [বঙ্গের] প্রাচীন নাম। তিনি হরিকেল পূর্ব্ব ভারতের পূর্ব্ব সীমায় অবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি হরিকেলকে একটি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং এখানকার শিললোকনাথ বিশেষ বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন।

চৈনিক পর্য্যটক
ইৎসিং (৬৭১—৬৯৫
খৃঃ অঃ)

বৌদ্ধ গ্রন্থে তাঁহার চিত্র আছে। ফরাসী পণ্ডিত ফুশেও তাঁহার লিখিত Etude sur L' Iconographic Bouddhique de-L' Inde, P. 200. নামক গ্রন্থে একখানি চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। এবং তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী "সেঙ্গচি নামক অন্য একজন চীন দেশীয় পর্য্যটক যে সমতট দেশে রাজভট্ট নামক একজন নরপতিকে সিংহাসনারূঢ় দেখিতে পাইয়াছিলেন, তিনি একথারও উল্লেখ করিয়াছেন। ইৎসিঙ্গের সময়ে এই দুইটী নাম যে এক দেশকে বুঝাইত তাহাও বলা কঠিন।

অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে বাঙ্গলাদেশ দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। তখন—**বঙ্গ** বলিলে পূর্ব্বকালের **সুহ্ম, বঙ্গ** ও **সমতট** এই তিন

* বঙ্গ সমতটের কয়েকটি প্রাচীন বৌদ্ধ রাজবংশ-ডাক্তার শ্রীরাধাগোবিন্দ বসাক এম-এ.—'প্রাচী' প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা—১৩৩০, আষাঢ় ৪০—৪২পৃষ্ঠা।

দেশের অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত বিভাগ মনে করিতে হইবে এবং সম্ভবতঃ তখন "বর্দ্ধমানপুর" হরিকেলের একটি স্কন্ধাবার (রাজধানী বা সেনানিবেশ স্থান) ছিল। এই যুগের উত্তর বাঙ্গলার নরপতি "গৌড়াধিশ"—"গৌড়েশ্বর" প্রভৃতি উপাধিতে পরিচিত হইতেন।

গৌড় বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন ও বঙ্গ

দশম ও একাদশ শতাব্দীতে হরিকেল বা বঙ্গদেশের রাজধানী পূর্ব্ববাঙ্গলার বিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল। একাদশ—দ্বাদশ শতাব্দীর বঙ্গপতিগণও **বিক্রমপুর** রাজধানী হইতে বঙ্গদেশ শাসন করিতেন। প্রাচীন-[বিক্রমপুর নগরীতে] রামপালে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে, "আধারো **হরিকেল** রাজ-ককুদচ্ছত্র স্মিতানাং শ্রিয়াম্" উক্তিতে **হরিকেল** শব্দ রহিয়াছে। বল্লাল-চরিতে আছে, মহারাজ বল্লালসেন সুবর্ণবণিক জাতীয় শ্রেষ্ঠি বল্লভানন্দের নিকট দেড় কোটি মুদ্রা ঋণ প্রার্থনা করিলে, বল্লভানন্দ বলিয়াছিলেন যে—যদি মহারাজা বল্লালসেন হরিকেলীয় প্রদেশ তাঁহার অধিকারে রাখেন, তাহা হইলে তিনি ঋণ দিতে সম্মত আছেন। কাজেই 'হরিকেল' শব্দ দ্বারা যে বঙ্গ রাজ্য কে বুঝাইত তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহেরই কারণ নাই।

রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর

চৈনিক পরিব্রাজক ইউয়ান চাং-সমতট-রাজ্যের যে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা এইরূপ:—

"সমতট রাজ্য চক্রাকারে ৩০০০ লি বা ৬০০ মাইল এবং সমুদ্রের তীরবর্ত্তী, ভূমি নিম্ন ও উর্ব্বরা। রাজধানী চক্রাকারে ২০ লি বা ৪ মাইল। প্রচুর পরিমাণে শস্য জন্মে। সর্ব্বত্র ফল ও ফুল পাওয়া যায়। জল বায়ু স্বাস্থ্যকর, এবং লোকের আচার ব্যবহার প্রীতিপ্রদ। সমতটবাসীরা স্বভাবতঃ কষ্টসহিষ্ণু, ক্ষুদ্রকায় ও কৃষ্ণবর্ণ। তাহারা বিদ্যানুরাগী, সকলে যত্ন সহকারে বিদ্যা উপার্জ্জন করে। সমতট রাজ্যে সত্যধর্ম্ম (বৌদ্ধধর্ম্ম) ও অপধর্ম্ম (হিন্দুধর্ম্ম) উভয় ধর্ম্মের বিশ্বাসীগণই বাস করে। এখানে ন্যূনাধিক ত্রিশটী সংঘারাম বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সকল মঠে প্রায় দুই হাজার পুরোহিত অবস্থিতি করেন। ইহারা সকলেই স্থবির নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ভুক্ত। সমতট রাজ্যে ন্যূনাধিক একশত দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। ইহার প্রত্যেক দেব-মন্দিরেই নাগা সম্প্রদায়ভুক্ত লোক সমূহ উপাসনা করে। নিগ্রন্থ নামক অসংখ্য উলঙ্গ সন্ন্যাসী এই রাজ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। নগর হইতে অনতিদূরে অশোক নির্ম্মিত স্তূপ। এইস্থানে পুরাকালে তথাগত এক সপ্তাহ দেবগণের

* (১) সাহিত্য, ১৩২৫, পৌষ সংখ্যা, (২) Indian Antiquary, 1919, P. P. 98-101 (৩) বৃহৎসংহিতা—১৪শ অধ্যায়, (৪) Takakusu's Itsing, Oxford, 1896, XI V. I. (৫) Beal's "Life of Hiuen-Tssiang," London 1911, Introduction, P. XI. (৬) ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, ১৮ পৃষ্ঠা শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়। (৭) Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol I. P. 86. (৮) প্রতিভা ১৩২০ চৈত্র সংখ্যা (৯) J. A. S. B. 1914. P. P. 86—87 (১) শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসন-৫ম শ্লোক, সাহিত্য ১৩২০ ভাদ্র।

হিতকল্পে সুগভীর ও রহস্যপূর্ণ শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। ইহার পার্শ্বে যেথানে চারিজন বুদ্ধ উপবেশন ও ভ্রমণ করিতেন, তাহার চিহ্ন বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই স্তূপের অনতিদূরে একটি সংঘারামে হরিত প্রস্তর নির্ম্মিত বুদ্ধমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মূর্ত্তি আট ফিট উচ্চ। সমতট হইতে ৯০০ লি বা ১৮০ মাইল পশ্চিমে তাম্রলিপ্তি দেশ"—ইউয়ান-চোয়াং এর বর্ণনা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে সমস্ত বঙ্গ, উপবঙ্গ বা গাঙ্গের বদ্বীপ সমতট রাজ্যভুক্ত ছিল। আমরা পূর্ব্বে এ বিষয়ে বলিয়াছি।

সমতটের সীমা সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক ও আলোচনা আজ পর্য্যন্ত ও সমান ভাবে চলিয়া আসিতেছে। তবে এবিষয়ে বিশেষরূপ তর্কের প্রয়োজন নাই। কেন-না বঙ্গ-সমতটে প্রাপ্ত মূর্ত্তি ইত্যাদি হইতেই তাহার বিস্তৃতি সম্বন্ধে আমরা উপযুক্ত প্রমাণ যুক্তিযুক্ত ভাবে জানিতে পারিতেছি। বঙ্গ-সমতট রাজ্যের বিবিধ স্তূপ ইত্যাদি খনিত হইলে একদিন অশোকস্তম্ভ কিংবা বৃহত্তম বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হওয়া বিচিত্র নহে।

সমতট বর্ত্তমান সময়ের বাখরগঞ্জ, নোয়াখালী, ত্রিপুরা, ঢাকা ও ফরিদপুর জিলা সমূহের সম্পূর্ণ ভাগ লইয়াছিল, কিন্তু খুলনা ও চট্টগ্রামের সমুদ্র-তট-লগ্ন অংশ বিশেষ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল না এমন কথা বলা যায় না। তবে কতকটা যে ছিল তাহা সুনিশ্চিত।

'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন:— "সমতট বিস্তীর্ণ রাজ্য। আমাদের আলোচ্য যশোহর খুলনার বাহিরে সমতটের অনেক অংশ ছিল। ইউয়ান-চোয়াং এর বর্ণিত ৩০টি সংঘারাম ও ১০০ দেবমন্দিরের মধ্যে কয়টি এ প্রদেশে ছিল এবং কয়টী বাহিরে ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। একস্থানে সমতটের রাজধানী ছিল বলিয়া আমরা কতকগুলি প্রমাণ উপস্থিত করিয়াছি; সে প্রমাণ যে পর্য্যাপ্ত নহে, তাহা আমরাই সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বুঝি। হয়ত সেখানে একটি সংঘারাম মাত্র ছিল এবং **সমতটের রাজধানী প্রকৃত পক্ষে পূর্ব্ববঙ্গে** ছিল। যতদিন অকাট্য প্রমাণ বলে এই বিপ্লব বহুল দেশের পুরাতত্ত্ব মীমাংসিত না হয়, ততদিন শুধু মানসিক সম্ভাবণে পরকে নিজের মতাবলম্বী হইতে বলা যায় না।" সতীশ বাবুর এ উক্তি প্রকৃত ঐতিহাসিকের মতই হইয়াছে। শিববাড়ীর বুদ্ধমূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া তিনি আরও বলিয়াছেন যে "যে প্রদেশে বৌদ্ধ প্রভাবের চাক্ষুষ নিদর্শন অতীব বিরল, সেখানে এমন মূর্ত্তির আবির্ভাব বিস্ময়কর," কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গ-বিক্রমপুরে চাক্ষুষ নিদর্শন ও যেমন বহু রহিয়াছে, তেমনি মৃত্তিকার অভ্যন্তরেও অনেক কিছু নিদর্শন রহিয়াছে।

এখানে একটি বিষয়ের আলোচনা আবশ্যক। বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্ত্তির পাদ পীঠে খোদিত লিপি হইতে জানা যায় যে নৃপতি মহীপাল সমতট প্রদেশের রাজা ছিলেন। পাল বংশে দুইজন

* 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' প্রথম খণ্ড—২০২-২১৩ পৃষ্ঠা—সতীশচন্দ্র মিত্র

মহীপাল ছিলেন। প্রথম মহীপাল দেব ছিলেন পাল রাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম মহীপাল ছিলেন প্রথম বিগ্রহ পালের পুত্র। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা—যতীন্দ্র বাবু বলেন—"বাঘাউরা লিপির দ্বিতীয় মহীপাল কে? দ্বিতীয় মহীপাল কখনও সমতটে রাজ্য বিস্তৃত করিতে পারেন নাই। তৎকালে সমতট বঙ্গে বর্ম্মবংশীয় রাজগণের আধিপত্য ছিল। সুতরাং বাঘাউরা লিপির লিখিত মহীপাল দ্বিতীয় মহীপাল হইতে পারেন না। বিশেষতঃ প্রথম মহীপালের বাণগড় লিপির সহিত বাঘাউরা লিপির অক্ষরের তুলনা করিলে উভয় লিপিমালা এক সময়ের বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।" [ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ২২৩ পৃষ্ঠা] স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—প্রথম মহীপাল রাজবংশের দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। মহীপালের পিতা দ্বিতীয় বিগ্রহ পালের রাজ্যকালে বরেন্দ্রী বা উত্তর বঙ্গ কম্বোজ জাতি কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল এবং সম্ভবতঃ চন্দেলবংশীয় যশোবর্ম্মার সাহায্যে গুর্জ্জররাজ মহীপাল মগধ পুনরাধিকার করিয়াছিলেন। সুতরাং মহীপাল দেব, পিতার মৃত্যুর পরে রাঢ় ও বঙ্গদেশের কিয়দংশের অধিকার মাত্র, উত্তরাধিকার—সূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মহীপাল স্বয়ং বরেন্দ্রী, মগধ ও তীরভুক্তি, এমন কি, বারাণসী পর্য্যন্ত অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে পূর্ব্ব বঙ্গ বা সমতট অধিকৃত হইয়াছিল। কেহ কেহ অনুমান করেন যে, গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া পালরাজগণ সমতটে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। * * রাখালবাবুর মতে নারায়ণ পালের রাজ্যকালে উৎকীর্ণ গরুড়স্তম্ভ-লিপি ও কুমিল্লা জেলার বাঘাউরা গ্রামে আবিষ্কৃত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদ পীঠস্থ খোদিত লিপির অক্ষর গুলির সহিত বাণগড়ের স্তম্ভলিপির অক্ষর গুলির তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে, বাণগড় লিপি গরুড় স্তম্ভ লিপির পরে এবং বাঘাউরা লিপির পূর্ব্বে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। অক্ষর তত্ত্ব হইতে কল্পনার ইতিহাসে কাম্বোজ জাতির আক্রমণের কাল স্থির নির্দ্দেশ করা যায়। যাঁহাকে অক্ষর তত্ত্বের প্রামাণিকতার সম্বন্ধে সন্দিহান, তাঁহাদিগের সহিত বিশুদ্ধ প্রত্ন-বিদ্যামূলক ইতিহাসের মতদ্বৈধ বিচিত্র নহে। বাণগড় স্তম্ভ লিপিতে কম্বোজ জাতীয় গৌড়েশ্বরের নামোল্লেখ নাই। ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বিদেশীয়ও বিজাতীয় গৌড়েশ্বর শিবোপাসক হইলেও গৌড়রাজ্যে তাঁহার নাম সুপরিচিত হয় নাই। * * * এইমাত্র নিশ্চয় করিয়া বলা যাইতে পারে যে, বাণগড়ের শিবমন্দিরনির্ম্মাতা কম্বোজজাতীয় গৌড়েশ্বর প্রথম মহীপালদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী; সুতরাং তিনিই মহীপালের পিতৃরাজ্যে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কাম্বোজবংশীয় গৌড়রাজগণের নিকট হইতেই মহীপাল পিতৃভূমি বরেন্দ্রী অধিকার করিয়াছিলেন। মহীপালদেবের সুদীর্ঘ রাজ্যকালের প্রথম ভাগে সমতট তাঁহার অধিকারভুক্ত ছিল; কারণ, তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে লোকদত্ত নামক বৈষ্ণব মতাবলম্বী জনৈক বণিক্ সমতটে একটি নারায়ণ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল।" [বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথমখণ্ড ২১৬ পৃষ্ঠা] বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত লিপির কথা আমরা যথাস্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

কাজেই আমরা নিরপেক্ষ ভাবে সমতটের যে ভৌগোলিক পরিচয় দিয়াছি তাহাই প্রকৃত ভাবে যথার্থ বলিয়া মনে হয়। চৈনিক পরিব্রাজক বলিয়াছেন যে সমতটে ৩০টির অধিক বৌদ্ধ সংঘারাম এবং বৌদ্ধ স্থবির সম্প্রদায়ের ২০০০ এর অধিক শ্রমণ ছিল। একথা অপ্রকৃত নহে। তাহা না হইলে পূর্ব্ববঙ্গের সর্ব্বত্র এত মূর্ত্তি আসিল কোথা হইতে? মূর্ত্তি যখন ছিল,তাহাদের উপাসকও ছিল। কেননা যাঁহারা সামান্য ভাবেও পূর্ব্ববঙ্গ পরিভ্রমণ করিয়াছেন,

বাঘাউরা গ্রামের খোদিত লিপিসংযুক্ত বিষ্ণুমূর্তি
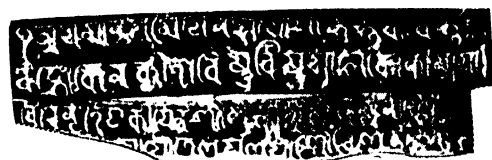
তাঁহারা এই সত্যটা চাক্ষুষ ভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন যে বিক্রমপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, বাখরগঞ্জ, ত্রিপুরা, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতির বহু গ্রামেই নানা শ্রেণীর মূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে। কত যে স্তূপ, কত যে বৌদ্ধদেব-দেবী ও হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি অযত্নবিন্যস্ত ভাবে পড়িয়া আছে তাহার সংখ্যা নির্দ্দেশ করাও বড় সহজ ব্যাপার নহে। এবং "সমতটে 'বুদ্ধারধি ভগবতী তারা' এইরূপ A. S. B. Manuscript No A. 15. উল্লিখিত আছে।*

সমতট রাজ্য

কোন কোন প্রস্তর মূর্ত্তির পাদপীঠে ও সমতট নামের উল্লেখ রহিয়াছে। পরবর্ত্তী কালের প্রাচীন লিপিতেও সংস্কৃত সাহিত্যে 'বঙ্গ' শব্দটির অধিক প্রচলন হইলেও সমতট শব্দটি ও সম্পূর্ণ ভাবে পরিত্যক্ত হয় নাই, তাহার প্রমাণ রূপে আমরা ভাগলপুরে আবিষ্কৃত নারায়ণপাল দেবের তাম্রসাশনের "সৎ সমতট জন্মা" শিল্পীর এবং ত্রিপুরা জেলার বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণু মূর্ত্তির পাদপীঠে খোদিত প্রথম মহীপাল দেবের রাজ্যসম্বত সমন্বিত ৩য় রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ লিপির উল্লেখ করিতে পারি যথা—"**সমতটে** বিলকীয়কীয় পরম বৈষ্ণবস্য" ইত্যাদি কাজেই নানা দিক্ দিয়াই দেখিতে পাইতেছি যে সমতট রাজ্য সম্পর্কে—এই সিদ্ধান্তই ঠিক্ যে পূর্ব্ববঙ্গ— ই সমতট রাজ্য ছিল। এবং যে যে জেলা উহার অন্তর্ভূক্ত ছিল তাহাও বলা হইয়াছে। এবং প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত বিবিধ প্রমাণ প্রয়োগ সহকারেও তাহাই সপ্রমাণ হইয়াছে।

বরাহ মিহির—যে দেশ গুলিকে 'উপবঙ্গ' নামে অভিহিত করিয়াছেন, তাহা

বঙ্গ ও উপবঙ্গ

বাস্তবিক পক্ষে দক্ষিণ ও মধ্য বাঙ্গলার দেশ সমূহ অর্থাৎ যশোহর, খুলনা, (সুন্দরবন সহ) চব্বিশ পরগণা, নদীয়া ও মুর্শিদাবাদ দেশসমূহের ভাগ বা অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত ছিল বলিয়া নির্দ্দশ করা যাইতে পারে।

একটা কথা প্রণিধানযোগ্য এই যে ইউ-য়ান-চোয়াং তাঁহার বর্ণনায় বঙ্গদেশের নাম উল্লেখ করেন নাই। কাজেই এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন :—It is very curious that the pilgrim does not mention the country of Vanga. It can be specified as the country lying between the Meghna river on the east, the sea on the south and the old Budi-ganga course of the Ganges on the north. The western boundary of Vanga appears always to have been indefinite. Yuan Chuang must have passed over Vanga in going from Samatata to Tamralepti'. The reason of his silence appears to have been the fact that owing to general subsidence of the country towards the end of the 6th century. A. D. It had rapidly sank

*Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum—Plate II. Page 14.

very low in geographical and political importance and did not recover from this set back for some centuries. When the pilgrim passed over this tract by the middle of the 7th century A. D., there was nothing to attract and detain him there."

সমতট সম্পর্কে এবং উহার সীমা নির্দ্দেশ সম্বন্ধে সকলেই আমাদের সহিত একমত। উহা একটি বৃহৎ রাজ্য ছিল এবং ত্রিপুরা, নোয়াখালী, বরিশাল, ফরিদপুর, এবং ঢাকা জেলার অধিকাংশ ও উহার অঙ্গীভূত ছিল। সমতট ক্ষুদ্র ভূখণ্ড ছিলনা।

ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় বঙ্গ ও সমতট দুইটি স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া মনে করেন এবং 'বঙ্গাধিপ' বা বঙ্গপতি বলিলে তাঁহার অধিকার 'সমতট' প্রদেশেও বিস্তৃত ছিল বলিয়া বুঝিতে হইবে। কাজেই দেখা যাইতেছে যে 'বঙ্গ' শব্দটি 'সমতট' দেশকে লইয়াও প্রযুক্ত হইত। এই বুঝাইত যে—সমতট প্রদেশ তাঁহার রাজ্য পর্যন্ত।

পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে-বঙ্গ সমতট-পূর্ব্ববঙ্গ

খৃষ্টিয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-ভারতের উত্তর ভাগ এবং মধ্যভাগ গুপ্ত বংশীয় রাজাদের বিভিন্ন শাখা কর্ত্তৃক শাসিত হইত। এবং এক সময়ে গুপ্তদের সামন্ত নৃপতি রূপে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারাই গুপ্তদের প্রভাব হ্রাস পাইলে স্বাধীন হইলেন। আদি গুপ্তবংশীয়দের শাখার একমাত্র পুরগুপ্ত মগধের কিয়দংশ এবং অঙ্গরাজ্য লইয়া রাজত্ব করিতেছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গ—বঙ্গ-সমতট রাজ্য ও গুপ্তদের প্রাধান্য সময়ে সামন্ত রাজ্য ছিল।

সমতট, [প্রত্যন্ত দেশ] ডবাক (১) কামরূপ, নেপাল প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী সম্রাট্ সমুদ্রগুপ্তের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। পূর্ব্ববঙ্গের নৃপতিরাও গুপ্ত নৃপতিগণের আনুগত্য স্বীকার করিতেন। খৃষ্টিয় ষষ্ঠ শতাব্দী পর্য্যন্ত তাঁহারা গুপ্তদের আনুগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। হুনদের আক্রমণে এবং মালব নৃপতি যশোবর্দ্ধনের প্রভাব বশতঃ গুপ্তরাজাদের প্রতিপত্তি হ্রাস পাইয়াছিল।

বঙ্গ-সমতট প্রদেশে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে যে আদি গুপ্ত রাজাদের প্রভাব বিদ্যমান ছিল, সে-কথা আমরা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। [৮৫—১০১ পৃষ্ঠা] দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের এবং স্কন্দগুপ্তের স্বর্ণ মুদ্রা এবং ময়ূরাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রা ফরিদপুর জেলার কোটালিপাড়ার

+ বিষ্ণু মূর্ত্তির পাদপীঠে উৎকীর্ণ শিলালিপি।
(১ম) ওঁ সম্বত্ ৩ মাঘ দিনে ২৭ ? (১৪ ?) শ্রীমহীপাল দেবরাজ্যে
(২য়) কীর্ত্তিরিয়ং নারায়ণ ভট্টারকাখ্য সমতটে বিলকীন্দ।
(৩য়) কীয় পরম বৈষ্ণবস্য বণিক লোকদত্তস্য ব সুদত্ত সুত।
(৪র্থ) স্বমাতা পিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশো অভিবৃদ্ধয়ে।

গ্রামের নিকটে পাওয়া গিয়াছে। আমি মূলচর গ্রামেও মৃত্তিকার নীচে হইতে একটি সুবর্ণ মুদ্রা পাইয়াছিলাম। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একদিন বৃষ্টির পর আমাদের বাড়ীর পথের মাটি সরিয়া যাওয়ায় একটি প্রাচীনা রমণী ঐ মুদ্রাটি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। ঐ মুদ্রাটি আমি বারেন্দ্র অনুসন্ধান-সমিতিতে প্রদান করিয়াছি। ঐ সুবর্ণ মুদ্রাটির চিত্র মৎপ্রণীত 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণে মুদ্রিত করিয়াছিলাম।* এইবারও মুদ্রিত হইল। কাজেই পূর্ব্ববঙ্গ অর্থাৎ বঙ্গ ও সমতট রাজ্যে গুপ্তরাজাদের যে প্রভাব বিদ্যমান ছিল তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কোটালিপাড়ার ন্যায় মূলচর গ্রামে প্রাপ্ত এবং সাভারে প্রাপ্ত গুপ্তরাজাদের স্বর্ণমুদ্রা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে পূর্ব্ববঙ্গ বিশেষ বিক্রমপুর অঞ্চল দিগ্বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্ত এবং তাঁহার পরবর্ত্তী বংশধরগণের অধীনে কিছুকাল ছিল।

কোটালিপাড়া মূলচর ও সাভারে প্রাপ্ত গুপ্তরাজাদের মুদ্রা

বাঙ্গলার ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে, মগধের শেষ গুপ্ত-রাজবংশের শেষ নরপতি দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তই কাণ্যকুব্জাধিপতি যশোধর্ম্মা কর্ত্তৃক নিহত গৌড়-মগধ-নাথ। আবার অনেকে এইরূপ মত ও পোষণ করেন যে, এই নৃপতি আর কেহই নহেন খড়্গবংশীয় নৃপতি বঙ্গ এবং সমতটের অধিপতি রাজরাজভট্ট। এই রাজরাজভট্টের কথাই আমরা চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিঙ্গের বিবরণ হইতে জানিতে পারিয়াছি।

আমাদের এই স্থানে বাধ্য হইয়াই নানা কারণে একটু পূর্ব্বানুবৃত্তি করিতে হইতেছে। আমরা—পূর্ব্বে গুপ্তরাজবংশের আলোচনা করিতে যাইয়া তাঁহাদের প্রভাব এবং কতদূর পর্য্যন্ত তাঁহাদের রাজত্ব বিস্তৃত ছিল, সে-কথাও বলিয়াছি। গুপ্তরাজবংশ বিধ্বস্ত হইলে পর বঙ্গদেশের অবস্থা কিরূপ ছিল তাহা সম্পূর্ণ ভাবে আমরা জানিতে না পারিলেও ইহা জানা যায় যে, তাঁহাদের অধঃপতনের পর বঙ্গরাজ্য অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে স্থানীয় নৃপতিগণ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়া নিজ নিজ প্রাধান্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

"The discovery of gold coins of Chandra Gupta II and Skanda Gupta, and also silver coins with the peacock symbol in or near Kotalipara in the Faridpur district is an evidence in point, for supporting the theory that the Eastern Bengal kingdom remained under the paramount power of the early Guptas" The History of North-Eastern India—by Radha Govinda Basak M. A. Ph. D. Chapter IX Page 181.

* বিক্রমপুরের ইতিহাস—প্রথম সংস্করণ, ৬৮ পৃষ্ঠা।

এখানে আমরা গুপ্ত রাজাদের একটি বংশলতা প্রদান করিলাম। আদিগুপ্তরাজবংশের যে শাখা **বঙ্গ-সমতট** রাজ্যে রাজত্ব করেন, এই বংশলতা হইতে তাহা সুস্পষ্ট ভাবে বুঝা যাইবে।

আদি গুপ্ত সম্রাটদের ও বঙ্গের গুপ্ত নৃপতিগণের বংশলতা :
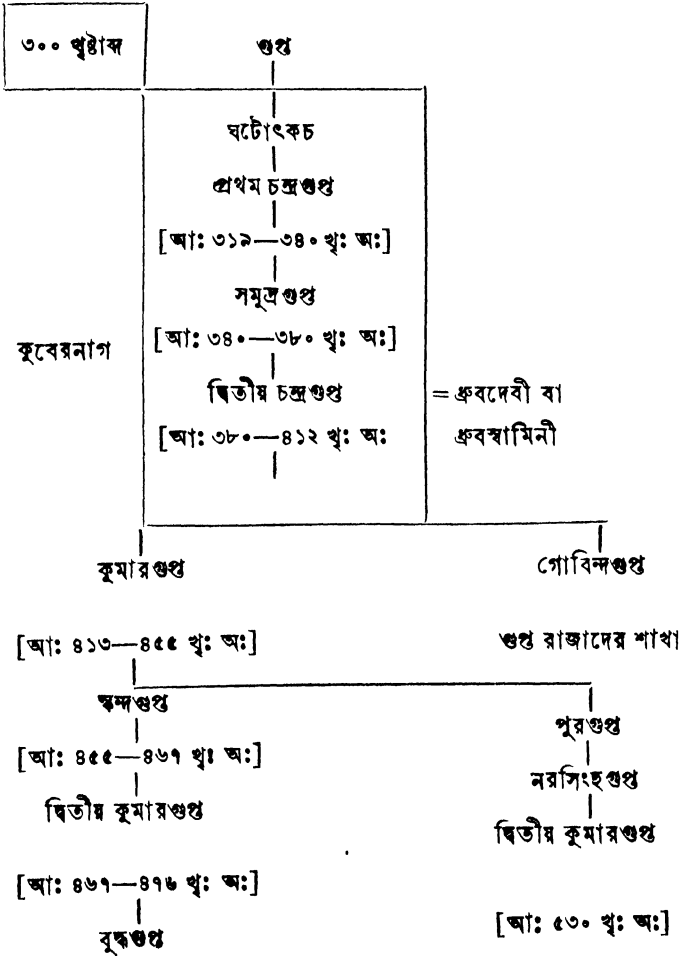
মূলচর গ্রামে প্রাপ্ত গুপ্ত রাজাদের আমলের একটি স্বর্ণমুদ্রা

[আঃ ৪৭৬—৫০০ খৃঃ অঃ]

ভানুগুপ্ত

[আঃ ৫০০—৫৪৩ খৃঃ অঃ]

বঙ্গ ও সমতট রাজ্যের গুপ্ত রাজগণ
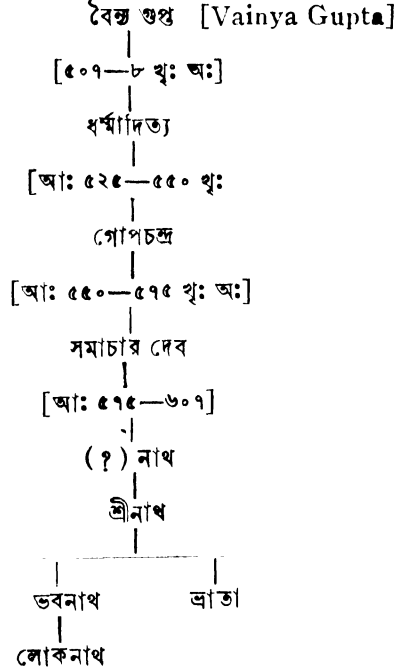
[আঃ ৬৬৩—৬৪ খৃঃ অঃ]

এই বংশলতা হইতে পাঠকগণ পূর্ব্বঙ্গের [বঙ্গ-সমতট রাজ্যের] গুপ্ত নৃপতিগণের পরিচয় পাইবেন এবং সপ্তম শতাব্দী পর্য্যন্ত যে তাঁহাদের প্রভাব বঙ্গ সমতট রাজ্যে বিদ্যমান ছিল তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন। বিক্রমপুরে বা বঙ্গ-সমতট রাজ্যে যে তাঁহাদের প্রভাব বিশেষ ভাবে বিস্তৃত ছিল এ সম্বন্ধে আমাদের অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ নাই। এজন্যই কিংবদন্তী-মূলক বিক্রমাদিত্যের কথা একেবারে অলীক বলিয়া প্রতীয়মান হয় না।

গুপ্ত রাজাদের প্রভাব সম্বন্ধে ইহার অধিক আমাদের কিছু বলার নাই। তাঁহাদের সমসাময়িক কোনও প্রাচীন মূর্ত্তি পূর্ব্ববঙ্গের কোন স্থানে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি। উত্তরবঙ্গের কোনও স্থানে গুপ্তযুগের কিছু নিদর্শন অদ্যাপি

আবিষ্কৃত হয় নাই। যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা প্রায় সকলই পালরাজাদের সময়ের।*

আমরা রামপালের বিষয় প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিয়াছি। তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ বলেন যে, রামপাল বহুদূর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ভীমকে পরাজিত করিয়া তিনি মিথিলা বা উত্তর বিহার, চম্পারণ এবং দ্বারভাঙ্গা জেলা, এমন কি, কামরূপ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র কুমারপাল প্রধান মন্ত্রী বৈদ্যদেবের উপরে কামরূপের শাসনভার সমর্পণ করিয়াছিলেন।

রামপালের রাজত্ব

ভারতবর্ষের বা হিন্দুস্থানের সর্ব্বত্র বৌদ্ধধর্ম্মের ক্রমিক অবনতি ঘটিলেও রামপালের সময়ে মগধ এবং বঙ্গদেশের প্রায় সর্ব্বত্র বৌদ্ধ অধিবাসীদের দ্বারা অধ্যুসিত ছিল।

দিনাজপুরের মহারাজের উদ্যানে একটী কারুকার্য্য খচিত শিলাস্তম্ভ আছে। সেই স্তম্ভটী বাণগড় হইতে আনীত হইয়াছিল। উহার গায়ে যে খোদিত লিপি আছে তাহা হইতে জানা যায় যে, কম্বোজবংশীয় অজ্ঞাতনামা জনৈক গৌড়পতি কর্ত্তৃক একটী শিবালয় নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং ঐ স্তম্ভটী সেই শিবালয়ের সংলগ্ন ছিল। এই শিবমন্দির বাণগড়ের কোন্ স্থানে অবস্থিত ছিল তাহা এখন পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায় নাই। শিলালিপির অক্ষর দেখিয়া—অনেকে মনে করেন খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে কম্বোজবংশীয় কোনও নৃপতি এই অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। অতএব, আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে উত্তরবঙ্গ পালরাজ বংশের হস্তচ্যুত হইয়া কম্বোজ বংশের হস্তগত হইয়াছিল। এই কম্বোজবংশীয়েরা কোথা হইতে আসিলেন সে-বিষয়ে নানারূপ মতভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

উত্তরবঙ্গে কম্বোজীয়-দের অধিকার

কিছুদিন হইল উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত ইর্দা (Irda) গ্রামে কম্বোজবংশের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে [১৯৩৪—৩৫ খ্রী অঃ]।† এই তাম্রফলকে

* The rise of the Gupta dynasty in Northern India in the 4th century A. D. ushered in the golden age of Indian art in every branch of fine arts. * * * The best sculptures of this period have been found at Sarnath, Mathura and Deogarh in the United Provinces, while examples of terra-cotta and minor arts have been found practically in all the excavations in North India. An out-line of Archæology in India by Rai Bahadur K. N. Dikshit, M,A.F R.A.S.B. Director General of Archæology in India [An outline of the Field Sciences in India Page 166]

† Progress of science in India, Page 273.

কম্বোজবংশীয় নৃপতিদের উল্লেখ আছে। এই বংশীয় নৃপতি নয়পাল দেবের একাধিক্রম দানের বিষয় উল্লিখিত আছে। এই তাম্রলিপিতে রাজ্যপাল, নারায়ণপাল, নয়পাল প্রভৃতি রাজার নাম রহিয়াছে। অনেকে এই নৃপতিদের সহিত, বাঙ্গলার পালরাজাদের সংস্রব রহিয়াছে মনে করেন। কিন্তু বিশেষ ভাবে পরীক্ষার দ্বারা জানা গিয়াছে যে কম্বোজবংশীয়দের সহিত বাঙ্গলার পালরাজাদের কোনও সংস্রব নাই। পালরাজাদের পরে কম্বোজীয় নৃপতিরা উত্তর বাঙ্গলায় আধিপত্য করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাণগড়ে খনন কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন। এই খননের ফলে আশা করা যায় যে, হয়তো এই কম্বোজবংশ সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক নূতন কথা জানিতে পারিব। তবে এই কথা বিশেষ দৃঢ়তার সহিতই বলিতে পারা যায় যে, কম্বোজবংশীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে পাল রাজাদের প্রভাব হ্রাস পাইয়াছিল এবং উহা কম্বোজবংশের অধিকারভুক্ত হয়। একাদশ শতাব্দীতে কৈবর্ত্ত—বিদ্রোহের দরুন পালরাজাদের যাহা কিছু প্রতিপত্তি ছিল তাহাও হ্রাস পায়, তাহারই ফলে সেনরাজগণ আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া বঙ্গদেশের উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

এই প্রসঙ্গে ভট্টশালী মহাশয় আসরফপুর তাম্রশাসনের ব্যবহৃত অক্ষরের সহিত শ্রীহর্ষের তাম্রশাসনদ্বয়ের ও সম্রাটের কিঞ্চিৎ পরবর্ত্তী কালের রাজা আদিত্য-সেনের সাহাপুর ও অপসড় শিলালিপির অক্ষর সাদৃশ্য আছে বলিয়া, যেরূপ দৃঢ়তার সহিত বিজ্ঞাপিত করিয়াছেন, এবং তৎপ্রসঙ্গে ৺রাজেন্দ্র লাল মিত্র ও ৺গঙ্গামোহনের উপর যেরূপ কটাক্ষপাত করিয়াছেন তাহা সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।" ডাঃ রাধা-গোবিন্দ বাবুর এই উক্তি আমরা সমর্থন করি।

আমাদের মনে হয় মহারাজাধিরাজা শ্রীহর্ষের মৃত্যুর পর যখন বঙ্গদেশে নানারূপ বিপ্লব ও অশান্তির আবির্ভাব হইল এবং প্রত্যেকেই আপনার প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য ব্যস্ত হইলেন—সেই "মাৎস্যন্যায়ের" যুগেই সম্ভবতঃ আসরফপুর তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা দেবখড়্গ ও তদ্বংশীয় বৌদ্ধ রাজগণ, পূর্ব্ববঙ্গের পূর্ব্বাঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন। খড়্গবংশীয় নৃপতিদের নামের বিশেষণরূপে পরম ভট্টারক পরমেশ্বর" প্রভৃতি সার্ব্বভৌমত্ব সূচক কোনও উপাধি দেখা যায় না এজন্যই রাধাগোবিন্দ বাবুর ভাষায় বলিতে হয় যে—"ইহা হইতে মনে করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা স্বল্প বিস্তর স্থান লইয়া রাজত্ব করিয়াছিলেন। স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয়ও লিখিয়াছেন যে, These kings were local kings of no very extensive dominion. কাজেই ভট্টশালী মহাশয়ের কল্পিত সিদ্ধান্ত রাজভট্ট ও

তাঁহার পিতা ও পিতামহ দেবখড়্গ ও জাতখড়্গ প্রভৃতি বৌদ্ধ নৃপতিগণ সকলেই সমতটের রাজা ছিলেন, ইহা প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে না। কেন না তাহার মূলে তেমন কোনও বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বিদ্যমান নাই।

স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যার্ণব মহাশয় ও ভট্টশালী মহাশয়ের মতাবলম্বী। তিনিও বলিয়াছিলেন যে খড়্গাবংশীয় দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজভট্ট এবং চীন পরিব্রাজক বর্ণিত "সমতটরাজ রাজভট একই ব্যক্তি।"

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক, "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় প্রভৃতি অনেকেই অক্ষর-তত্ত্বের প্রমাণানুসারে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে 'দেবখড়্গের পুত্র রাজরাজভট কখনই খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর ব্যক্তি হইতে পারেন না। তাঁহারা বলেন শ্রীহর্ষ, ভাস্করবর্ম্মা, আদিত্য সেন, লোকনাথ প্রভৃতির লিপি সমূহ হইতে দেবখড়্গের লিপিতে মাত্রার ক্রমিক বিকাশ অধিকতর। এই সমস্ত কারণেই আসরফপুরের লিপিকাল সপ্তম শতাব্দীর না হইয়া কিছু পরবর্ত্তী কালেরই হইবে। এইরূপ সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়।"—অনেকের মত এই যে—"কান্যকুব্জাধিপতি যশোবর্ম্মার সাম্রাজ্য ধ্বংসের বহুকাল পরে নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে খড়্গোদ্যম এবং ঐ শতাব্দীর শেষপাদে দেবখড়্গ ও রাজ রাজভট্টের আবির্ভাব কাল অনুমান করা যাইতে পারে। সুতরাং ইৎসিং কথিত সমতট রাজের সহিত দেবখড়্গের তনয় রাজরাজভট্টের একত্ব প্রতিপাদন নিস্ফল।"

আসরফপুরের লিপিকলা ও খড়্গাবংশের কাল নির্দ্দেশ

খড়্গ রাজবংশীয়েরা যে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন তাহা তাঁহাদের "সর্ব্বলোক-বন্দ্য ত্রৈলোক্য খ্যাতকীর্ত্তি **ভগবান সুগত** এবং তৎ প্রতিষ্ঠিত শাস্ত, ভব—বিভব-ভেদকারী, যোগিগণের যোগগম্য ধর্ম্ম" এবং তদীয় "অপ্রমেয় বিবিধগুণ সম্পন্ন সংঘের পরম ভক্তিমান উপাসক" প্রভৃতি বিশেষণ হইতে বুঝিতে পারা যায়। নৃপতি খড়্গোদ্যমের পর 'পরম সৌগতোপাসক' জাতখড়্গ পরে "অশেষ-ক্ষিতি-পাল-মৌলি-মালা-মণি-দ্যোতিত-পাদ-পীঠ" অরিজিৎ দেবখড়্গ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং এই নৃপতিই আসরফপুর তাম্রশাসন দ্বয়ের প্রতিপাদয়িতা।

বৌদ্ধ ধর্ম্ম ও খড়্গারাজ বংশ

প্রথম তাম্রশাসন খানি দ্বারা দেবখড়্গ দশদ্রোণাধিক নব পাটক ভূমি কুমার রাজরাজভট্টের আয়ুষ্কামনার্থে আচার্য্যবন্দ্য সংঘমিত্রের বিহার বিহারিকা চতুষ্টয়ে দান করিয়াছেন।

চৈত্য

এই চৈত্যটি আসরফপুরের তাম্রশাসনের সহিত পাওয়া গিয়াছে। চৈত্যটির তিনটি স্তর। সর্ব্বনিম্নস্তরে তিনটি তিনটি করিয়া দ্বাদশটি মুদ্রাসনসংবদ্ধ বুদ্ধমূর্ত্তি বিরাজিত। ইহার শীর্ষদেশে সম্ভবতঃ বুদ্ধ-বিহারে রক্ষিত হইত। পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব কিরূপ ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল, এই চৈত্য হইতেও তাহা প্রমাণিত হয়। চৈত্যটি কলিকাতা যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে।

দেবখড়্গোর ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে, ১৩ই বৈশাখ তারিখে, পরম-সৌগত পুরদাস কর্ত্তৃক প্রশস্তি লিখিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় তাম্রশাসন দ্বারা দশদ্রোণাধিক ষট্পাটক ভূমি বুদ্ধ, ধর্ম্ম ও সংঘ এই ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে শালিবর্দ্ধকস্থিত আচার্য্য সংঘমিত্রের বিহারে প্রদত্ত হইয়াছে। এই দ্বিতীয় তাম্রশাসনখানিও দেবখড়্গোর এয়োদশ রাজ্যাঙ্কে ২৫শে পৌষ তারিখে পরম সৌগত পুরদাস কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গে [বঙ্গদেশে] বৌদ্ধ প্রভাব যে কিরূপভাবে বিস্তৃত ছিল তাহা এই তাম্রশাসনদ্বয় হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। দেবখড়্গোর শাসনকালে সুবর্ণগ্রামের কোনও স্থলে একটি বুদ্ধ-মণ্ডপ প্রতিষ্ঠিত ছিল। আর ইহাও জানিতে পারা যায় যে সংঘমিত্র শালিবর্দ্ধক নামক বিহারের আচার্য্য ছিলেন। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন যে "তাম্রশাসন এবং চৈত্যের প্রাপ্তিস্থান রায়পুর থানার অন্তর্গত আসরফপুর গ্রাম; সুতরাং বুদ্ধ-মণ্ডপটি যে আসুরফপুরের অনতি দূরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল তাহা অনুমান করা যাইতে পারে।"—আমরা ইহা প্রমাণ সহ মনে করি না। আমরা মনে করি 'বুদ্ধ-মণ্ডপ' ও বিহার সুবর্ণগ্রামেরই কোন না কোন স্থানে প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সম্বন্ধে আমরা তিব্বতের ইতিহাস পাগ্-সম-জন্স-জংয়ের হইতে জানিতে পারি যে বিক্রমপুরের ন্যায় সুবর্ণগ্রাম সে সময়ে পূর্ব্ব ভারতে বঙ্গদেশের একটি শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ-কেন্দ্র ছিল। ঐ গ্রন্থের বহুস্থানে সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁয়ের উল্লেখ আছে যথা :— Svanargaon (Sonargaon) a city in Bengala where a Brahman named Kacijita established a religious institution in which every ten house holders supplied food to a *Bhikhu*.*

সুবর্ণগ্রামের বুদ্ধ-মণ্ডপ ও শালিববর্দ্ধকবিহার

সুবর্ণগ্রাম বর্ত্তমান সোনারগাঁ

বাঙ্গালা দেশে সোনারগাঁ সহর। সেখানকার কাশীজিৎ নামক একজন ব্রাহ্মণ-বৌদ্ধ একটি ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। এবং এইরূপ রীতি প্রবর্ত্তিত ছিল যে দশজন গৃহস্থ একজন ভিক্ষুকে প্রতিপালন করিবেন।' ইহা হইতে সুস্পষ্ট ভাবে ইহা প্রমাণিত হইতেছে যে সুবর্ণগ্রাম বৌদ্ধগণের কেন্দ্রস্থান ছিল। যতীন্দ্রবাবু শালিবর্দ্ধক বিহারকে শাবদ্দিয়া মৌজা বা গ্রাম বলিতে চাহেন। এ-বিষয়ে কোনও সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভবপর নহে। তবে ঐ বিহারটি যে একটি শ্রেষ্ঠ বিহার ছিল এবং তাহার

* Pag sam-Jan-2ang-Index cxx vii.

ভার আচার্য্য বন্দ্য সংঘমিত্রের হস্তে ন্যস্ত ছিল কাজেই বিহারটির সম্বন্ধে বিশেষভাবে তত্ত্বানুসন্ধান আবশ্যক। আমাদের মনে হয় খনন কার্য্য ব্যতীত এ বিষয়ে কোনরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সঙ্গত হইবে না।

পালরাজাদের পতনের সমকালে **পূর্ব্ববঙ্গে এই স্বাধীন** রাজ্য প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ নারায়ণপালের রাজ্যের শেষভাগে এই রাজ্য খড়্গোদ্যম কর্ত্তৃক স্থাপিত হয়। খড়্গোদ্যমের পর তাঁহার পুত্র জাতখড়্গ পৌত্র দেবখড়্গ পূর্ব্ববঙ্গে অধিকার লাভ করেন। আমরা দেবখড়্গের ত্রয়োদশ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ দুইখানি তাম্রশাসন হইতে এই রাজবংশের বিষয় জানিতে পারি। ইহারা দশম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

বঙ্গের খড়্গরাজ বংশ :—

খড়্গোদ্যম
|
জাতখড়্গ
|
দেবখড়্গ [আঃ ৭৪০—৭৬০ খ্রীষ্টাব্দ]
|
রাজরাজভট্ট (যুবরাজ)

খড়্গরাজাদের লাঞ্ছন
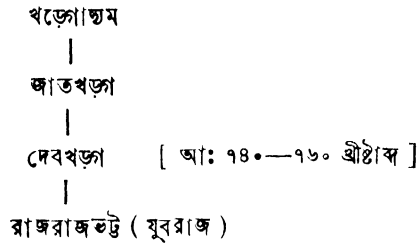
খড়্গরাজাদের দ্বিতীয় তাম্রশাসন খানির মধ্যস্থলে একটী রাজ-মুদ্রা সংযুক্ত রহিয়াছে। উহার মধ্যে "শ্রীমদ্দেবখড়্গ" এই নামটি উৎকীর্ণ আছে। অর্হৎগণের ধ্বজা ও বাহন মধ্যে বৃষ অন্যতম, ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে যে বৃষ খড়্গ নৃপতিদের লাঞ্ছন ছিল। তাঁহারা [খড়্গরাজগণ] সম্ভবতঃ বৃষভলাঞ্ছিত ধ্বজা ব্যবহার করিতেন।

খড়্গরাজগণের রাজ্য বিস্তার

খড়্গ রাজগণের রাজধানী কোথায় ছিল এবং তাঁহাদের রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী ঢাকা হইতে প্রকাশিত 'প্রতিভা' পত্রিকায় এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় 'পূর্ব্ব বঙ্গের বিস্মৃত জনপদ' A Forgotten Kingdom of East Bengal' নামক প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত করেন যে—"খড়্গরাজগণ সমতটের রাজা ছিলেন, এবং কুমিল্লার অনতিদূরবর্ত্তী বড় কামতা বা কর্ম্মান্তনগর খড়্গরাজাদের রাজধানী ছিল বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার যুক্তির মূলে কুমিল্লার নর্ত্তেশ্বর মূর্ত্তির পাদ-পীঠ লিপিতে উৎকীর্ণ শিলালিপির পাঠ—যথা :—

[পাঠ] ১। ওঁ। (?) হচন্দ্র দেব পাদীয়-বিজয় রাজ্যে অষ্টা···ষ্ণ চতুর্দশ্যা (ং) তিথৌ বৃহস্পতিবারেষু (পু) ষ্যা-নক্ষত্রে কর্ম্মান্ত পালশ্রী

২। কুসুম-দেব-সুত-শ্রীভাবুদে [ব] কারিত-শ্রীনর্ত্তেশ্বর ভট্টা···[চন্দ্র শর্ম্মা ?] আষাঢ় দিনে ১৪ ॥ খনিতঞ্চ রাতাকেন সর্ব্বাক্ষরঃ [বং] খনিতঞ্চ শ্রীমধুসূদনেতি ॥

আসরফপুর শাসন দ্বয়ে এবং কুমিল্লার শিলালিপিতে 'কর্ম্মান্ত' শব্দটির উল্লেখ দেখিয়া ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় খড়্গাবংশীয় রাজাদের কাল নির্ণয় এবং তাঁহাদের রাজধানী কর্ম্মান্তনগর বা বর্ত্তমান বড়কামতা নামক স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন।

আসরফপুর তাম্রশাসনের প্রথম শাসনের শেষ পংক্তিতে লিখিত আছে,—"লিখিতং জয়কর্ম্মান্ত বাসকে পরম-সৌগতোপাসক-সুরদাসেন 'এবং দ্বিতীয় শাসনের ধর্ম্মানুশংসিনী শ্লোকাবলীর পর লিখিত আছে,—"জয়-কর্ম্মান্ত বাসকাৎ লিখিতং পরমসৌগত সুব দাসেনিতি।" "জয় কর্ম্মান্তবাসকে" [এবং তথা হইতে] লিপিদ্বয় লিখিত হইয়াছিল মাত্র। লেখক সৌগত সুরদাস। কোন্ রাজধানী বা নগর হইতে রাজা "সমাজ্ঞাপয়তি"—আদেশ করিতেছেন,—লিপিদ্বয়ে আদৌ তাহার উল্লেখ নাই। স্বর্গত গঙ্গামোহন বাবু ভ্রান্ত ভাবে মনে করিয়াছিলেন যে, "Both the charters were issued (?) in the same year [Sambat 13] from the place Jaya-Karmanata- Vsaka"—অর্থাৎ "রাজ্যের ত্রয়োদশ বর্ষে, রাজা "জয় কর্ম্মান্ত-বসাক" (স্থান) হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন।" ইহা হইতেই ভট্টশালী মহাশয় ও মনে করিয়া লইয়াছেন যে, খড়্গাবংশীয়গণ "কর্ম্মান্ত নামক নগর" হইতে সমতটের রাজ্য পরিচালনা করিতেন।

সমতটের রাজধানী

সমতট রাজা

কুমিল্লার অনুসন্ধান কার্য্য ব্যাপৃত থাকার সময়ে, হঠাৎ নটেশ শিবমূর্ত্তির পাদ-পীঠ-লিপিতে সেই "কর্ম্মান্ত" নগরটি ও তাহার "রাজার" নাম পাইবা মাত্রই তিনি "কর্ম্মান্তের খড়্গাবংশীয়" রাজগণের সহিত কুমিল্লার খোদিত লিপিতে উল্লিখিত 'কর্ম্মান্ত রাজগণের সম্বন্ধ স্থাপন কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকিবেন। এ-বিষয়ে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক বিশেষ যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে "কর্ম্মান্ত" শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়া এবং অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে—"যে যেহেতু বড় কামতার নিকট প্রাপ্ত এই প্রাচীন নর্ত্তেশ্বর মূর্ত্তির পাদ-পীঠ-লিপিতে একটি "কর্ম্মান্ত" শব্দের উল্লেখ পাওয়া গিয়াছে, অতএব বড় কামতাই কর্ম্মান্ত-নগর। এদিকে আবার কুমিল্লার অপর পারে আসরফপুরে প্রাপ্ত খড়্গা-বংশীয় বৌদ্ধ রাজা দেবখড়্গের সময়ে তাম্রশাসন লিপিতে ও যখন "কর্ম্মান্ত বাসকের" উল্লেখ পাওয়া যায়,

তখন সেই কর্ম্মান্ত ও বড় কাম্‌তাই হইবে। সুতরাং তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে, কাম্‌তা বা কুমিল্লার অংশ বিশেষই সে কালের সমতটের রাজধানী ছিল। এবং লোকে এই স্থান বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিল বলিয়া, তিনি তাঁহার প্রবন্ধের নাম রাখিয়াছিলেন,—"পূর্ব্ব বঙ্গের একটি বিস্মৃত জনপদ।" সুধিগণই এইরূপ বিচার-পদ্ধতির বিচার করিবেন। যদি বা কালে হুউয়ান্‌-চোয়াঙ-বর্ণিত সমতটের রাজধানী বলিয়া প্রতিপন্ন করে, তথাপি ইহা "কর্ম্মান্ত" নামক নগর বলিয়া গণ্য হইবে না।"*

এখন কথা হইতেছে যে সমতটের রাজধানী কোথায় ছিল? এবং খড়্গদের রাজধানীই বা কোথায় ছিল? খড়্গদের সম্বন্ধে স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় বলিয়াছেন: "These kings were local kings of no very extensive dominion." অর্থাৎ খড়্গ নৃপতিগণ স্থানীয় নৃপতি ছিলেন, তাহাদের রাজ্য তেমন বিস্তৃত ছিল না তাঁহারা সমগ্র সমতটের অধিপতি ছিলেন। তাঁহার এই উক্তি প্রমাণ সহ নহে। খড়্গ নৃপতিগণের ভূমিদান বিষয়ে এই তাম্রশাসন হইতে জানা যাইতেছে যে তাঁহারা 'বিভিন্ন রাজ কর্ম্মচারীবৃন্দ জানাইয়া কিংবা রাজাদেশও প্রাচারিত হয় নাই কেবলমাত্র 'বিষয়পতি' এবং 'কুটুম্ব' গণকেই দানের বিষয় বলা হইয়াছে। এইজন্যই গঙ্গামোহন বাবু প্রভৃতি

সমতটের রাজধানী কোথায়?

ঐতিহাসিকগণ মনে করেন যে খড়্গ রাজগণের রাজ্য স্থানীয় কতকগুলি গ্রাম লইয়া সীমাবদ্ধ ছিল। তাম্রশাসনদ্বয়ের প্রাপ্তিস্থান এবং তাম্রশাসনোক্ত উল্লিখিত স্থান সমূহের পরিচয় হইতে এইরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে যে সুবর্ণগ্রাম (সোনার গাঁ) এবং ভাওয়ালের কতকাংশ লইয়াই খড়্গ রাজগণের রাজ্য বিস্তৃত থাকা সম্ভবপর। ইৎসিংয়ের সমতটের বর্ণনা হইতে ইহা অনুমিত হয় যে সমতটের যিনি নৃপতি ছিলেন, তিনি বিশেষ ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন এবং সেই নৃপতি খড়্গবংশোদ্ভব রাজরাজভট্ট যে নহেন তাহা সুনিশ্চিতরূপে বলা যাইতে পারে। খড়্গবংশীয় নৃপতিদের রাজধানী কোথায় ছিল তাহা আজ পর্য্যন্তও স্থিরীকৃত হয় নাই। তবে ইহা বিশেষভাবে জানা গিয়াছে যে তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। শ্রীবিক্রমপুরের সহিত তাঁহাদের কোনরূপ সংস্রব ছিল কিনা তাহাও জানা যায় না।

ডাঃ ভট্টাশালী "কর্ম্মান্তকে" একটি নগরের নাম স্থির করিয়া 'কুসুমদেবকে' তথাকার রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠাপিত করিয়াছেন এবং তিনি আসরফপুরের উৎকীর্ণ লিপিদ্বয়ের জয় কর্ম্মান্তবাসক" ও কামতা শিলালিপির 'কর্ম্মান্তকে' অভিন্ন স্থান বিবেচনা করিয়া,

*: Memoirs of the Asiatic Society of Bengal, Vol I. PD—85P.9,

ইৎসিঙ্গ কথিত সমতট রাজ্যের নৃপতি রাজরাজভট্ট এবং তাঁহার রাজধানী কর্ম্মান্ত-নগরকে যে সমতটের রাজধানী বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন এবং কুমিল্লা যে কমলাঙ্ক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিছুতেই ইহা হইতে পারে না, কেননা 'শ্রীক্ষেত্র' বা শ্রীক্ষত্র দেশ ত্রিপুরা জেলার অধিকাংশ স্থান লইয়া বিস্তৃত ইহাই পণ্ডিতগণ চীন পরিব্রাজকগণের লিখিত বিবরণী হইতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব সমতটের রাজধানীর সন্ধান করিতে হইলে অন্য দিকে অনুসন্ধান করিতে হইবে।*

আমি 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' প্রথম সংস্করণেও বলিয়াছি এবং এইবারও বলিতেছি যে সমতট নামে একটি স্বতন্ত্র নগরী ছিল, তাহাই ছিল সমতট প্রদেশের রাজধানী। [বিক্রমপুরের ইতিহাস ১১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।] সেই সমতট নগরী কোথায় ছিল?—রেণেলের দশম সংখ্যক মানচিত্রে সমকুট [somkoot] নামক একটি স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বহু প্রাচীন কীর্ত্তিকলাপের ধ্বংস-চিহ্ন সহ উহা কীর্ত্তিনাশার বুকে বিলীন হইয়া গিয়াছে। আমাদের অনুমান হয় যে এই 'সমকুটই' ছিল সমতটের রাজধানী সমতট নগরী। উহাই কালক্রমে 'সমকুট' নামে পরিণত হইয়াছিল। এই সমতটের রাজধানী সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিকগণ বিভিন্নরূপ মত পোষণ করিয়াছেন। ফার্গুসনের মতে সোনারগাঁ বা সুবর্ণগ্রাম, ওয়াটার্সের মতে ফরিদপুর জেলার দক্ষিণাংশে [সমকুট বলা যাইতে পারে] কানিংহামের মতে যশোহরে সমতটের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তবে আমরা বিবিধ প্রমাণ-প্রয়োগ-বলে এবং তাম্রশাসনাদি হইতে এবং খোদিত লিপি হইতেও সমতটের অস্তিত্বের কথা জানিতে পারি। নারায়ণপাল দেবের 'ভাগলপুর লিপির' [৫০-৫৪ পংক্তি] সৎ সমতট জন্মা শুভদাস পুত্র শ্রীমান্ মংখদাস নামক শিল্পি-কর্ত্তৃক ইহা উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ত্রিপুরা জেলার বাঘৌরা বা বাঘাউরা গ্রামে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্ত্তির পাদ-পীঠে সমুৎকীর্ণ মহীপাল দেবের রাজ্যসংবৎ সমন্বিত লিপিতেও সমতটের উল্লেখ আছে, "সমতটে বিলকীন্নকীয় পরম বৈষ্ণবস্থ" ইত্যাদি। কিছুদিন হইল দ্বিতীয় গোপালদেবের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহাতেও শ্রীমদ্বিমল দাসেন মন্থদাসস্য সূনুনা। ইদং শাসনসমুৎকীর্ণং সৎসমতটজন্মনা॥

বিক্রমপুরের সমতট নগরী

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ১৩২১ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রে সমতটের রাজধানী শীর্ষক প্রবন্ধে ভট্টশালী মহাশয়ের সিদ্ধান্তের বিবিধ যুক্তি ও প্রমাণ সহকারে প্রতিবাদ করিয়াছেন। "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয় ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ অধ্যায়ে খড়্গারাজগণ সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া ভট্টশালী মহাশয়ের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং দেখাইয়াছেন যে বড় কামতা কর্ম্মান্ত নগর নহে। আমাদের এ-বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন তবে প্রয়োজন বোধে সামান্য ভাবে উল্লেখ করিলাম মাত্র। অনুসন্ধিৎসু পাঠক রাধাগোবিন্দ বাবুর প্রবন্ধ ও রায় মহাশয়ের ইতিহাস পাঠ করিতে পারেন।

লিখিত আছে। অর্থাৎ সৎসমতট জন্মা মন্মদাসের পুত্র শ্রীমান্ বিমল দাস কর্তৃক এই শাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে। 'মদ্যদাস'কে কেহ কেহ 'মন্মদাস'ও পড়িয়া থাকেন। *

বিক্রমপুরের চন্দ্ররাজগণ

আমরা যখন "বিক্রমপুরের ইতিহাস" [প্রথম সংস্করণ] প্রকাশ করি, তখন দুইটি নূতন রাজবংশের পরিচয় জানিতে পারি নাই। এই দুইটি নূতন রাজবংশ হইতেছে চন্দ্রবংশ ও বর্ম্মবংশ । 'বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হয়, রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের 'গৌড় রাজমালা' ১৩১৯ সালে প্রকাশিত হয়। স্বর্গত বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রথমখণ্ড ১৩২১ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত হয় এবং 'ঢাকার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড ১৩২২ বঙ্গাব্দে বাহির হইয়াছিল। কাজেই রমাপ্রসাদ বাবু রাখাল বাবু এবং যতীন্দ্রবাবুর ও স্বর্গত 'বিশ্বকোষ' সঙ্কলয়িতা প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ডে' চন্দ্র-রাজ বংশ ও বর্ম্ম রাজবংশের উল্লেখ করিতে পারিয়াছেন, আমার পক্ষে তাহা সম্ভবপর হয় নাই। এ প্রসঙ্গে রাখালবাবু বলেন,—খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে যখন গৌড়-বঙ্গ মগধ বারংবার বহিঃশত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইতেছিল, তখন বঙ্গে দুইটি নূতন রাজ্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। বিগত দশবৎসরের মধ্যে তিন খানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়া এই নব প্রতিষ্ঠিত রাজবংশদ্বয়ের কথা জনসমাজে সুপরিচিত করিয়াছে। নূতন রাজবংশদ্বয় বর্ম্মবংশ ও চন্দ্রবংশ নামে পরিচিত হইয়াছে।"

বিক্রপুরের চন্দ্র ও বর্ম্ম রাজ বংশ

"ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা চন্দ্র রাজগণ প্রসঙ্গে লিখিতে যাইয়া বলিয়াছেন— "কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনা চক্রের মধ্যে বঙ্গ পাল সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিল, তাহা জানিবার উপায় নাই। বরেন্দ্র ও মগধে মহীপাল দেবের সমর বিজয় যাত্রার সুযোগেই সম্ভবতঃ চন্দ্রদ্বীপের সামন্তরাজ শ্রী হরিকেল বা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিয়া পাল রাজগণের সংস্রব ছিন্ন করিয়াছিলেন। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে যে রাজমুদ্রা ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা পালগণের রাজমুদ্রা। সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে 'চন্দ্ররাজগণ পালরাজগণের সামন্ত রাজা ছিলেন।' এ-প্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করিব।

ইদিলপুর ও রামপাললিপি

পূর্ব্বে জনসাধারণ, সেনরাজবংশের রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর ছিল তাহাই জানিত। কিন্তু শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন তিনখানি আবিষ্কারের পর বিক্রমপুর অঞ্চলে যে চন্দ্রবংশীয় রাজারা রাজত্ব করিতেন তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। চন্দ্রবংশীয়

* দ্বিতীয় গোপালদেবের তাম্রশাসন [জাজিলপাড়া লিপি] শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বর্ম্মণ এম্-এ. ভারতবর্ষ ২৫ শ বর্ষ-১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা শ্রাবণ ১৩৪৪।

নৃপতিদের আজ পর্য্যন্ত তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এক খানি তাম্রশাসন ফরিদপুর জেলার অন্তঃপাতী ইদিলপুর নিবাসী কোনও জমিদারের গৃহে আছে। স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্কর মহাশয় তাহার যে সংক্ষিপ্ত বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা 'ঢাকা রিভিউ' [১৯১২ সালের অক্টোবর সংখ্যায়] পত্রিকায় মিঃ জে, টি, র‍্যাঙ্কিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। মিঃ র‍্যাঙ্কিনের সহিত আমাদের ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। ইনি প্রথম জীবনে ঢাকা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন, পরে ঢাকা বিভাগের কমিশনার হন। র‍্যাঙ্কিন সাহেব ইতিহাসানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। বিলাত হইতে বিখ্যাত ভাওয়াল মামলার সাক্ষ্য দিতে আসিয়া কলিকাতা নগরীতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। র‍্যাঙ্কিন সাহেবের প্রবন্ধ হইতে জানা যায় এবং লস্কর মহাশয়ের ক্ষুদ্র টীকাকারে প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতেও জানা গিয়াছে যে, তিনি ইদিলপুরের তাম্রশাসন খানির ছাপ মাত্রই আনিতে পারিয়াছিলেন; মূল ফলকখণ্ড স্বত্বাধিকারীর নিকট হইতে কোনও প্রকারেই হস্তগত করিতে পারেন নাই। একান্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, এই তাম্রশাসন খানি এখনও অপঠিত অবস্থায় ইদিলপুরের একটি উচ্চ শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত জমিদার-ভবনে রক্ষিত আছে। এই তাম্রশাসন খানি (১) **'ইদিলপুর লিপি'** নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। অপর লিপিখানি (২) **রামপাল লিপি** [Rampal Copperplate of Srichandra] নামে পরিচিত। এই লিপিখানিরর উদ্ধারকর্ত্তা এবং ইহার পাঠোদ্ধার কার্য্য ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়াছে। (৩) **কেদারপুর লিপি** এই লিপিখানি দক্ষিণ বিক্রমপুরের কেদারপুর গ্রামে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এই তিনখানি লিপির বিষয়েই আমরা আলোচনা করিব।

বিক্রমপুরের ইতিহাসের দিক্ দিয়া চন্দ্রবংশীয় নৃপতিদের তাম্রশাসনের মূল্য খুব বেশী। আমরা প্রথমে রামপালে প্রাপ্ত লিপিখানার বিষয় বলিতেছি। ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয়ের ভাষায় তাম্রশাসন খানির প্রাপ্তির ইতিহাস বলিতেছি। তিনি লিখিয়াছেন: 'বঙ্গের বর্ম্মরাজবংশের ও সেনরাজবংশের রাজধানী বিক্রমপুর অঞ্চলে মধ্যযুগের বঙ্গেতিহাস—সঙ্কলনোপযোগী তথ্যানুসন্ধানের প্রয়োজন অনুভব করিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি আমাকে [বর্ত্তমান সালের গ্রীষ্মাবকাশে] পূর্ব্ববঙ্গে পরিভ্রমণ করিতে উপদেশ দান করিয়াছিলেন। সেই উপদেশ-ক্রমে আমি রাজসাহী হইতে জন্মভূমি ঢাকা নগরীতে আসিয়া বিগত ২৯শে এপ্রিল ১৯১২ খৃঃ অঃ [১৬ই বৈশাখ ১৩২০] তারিখে, কতিপয় বন্ধুসহ তথ্যানুসন্ধানে বহির্গত হই। ঢাকা জেলার অন্তঃপাতী মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পঞ্চসার গ্রাম নিবাসী শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত [বর্ত্তমানে স্বর্গত] যোগীন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও তদীয় অনুজ শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়ের নিকট শুনিতে পাই যে, সেই গ্রামনিবাসী "যদুনাথ বণিক্যের বাড়ীতে বহু বৎসর যাবৎ

একখণ্ড তাম্রশাসন যত্নসহকারে রক্ষিত হইতেছে,— এপর্য্যন্ত কেহই তাহার পাঠোদ্ধার করিতে সমর্থ হন নাই।" এই সন্ধান লাভ করিয়া, আমরা বণিক্য-বাড়ীতে গিয়া, বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির পক্ষ হইতে তাম্র-ফলক খানি ক্রয় করিয়া আনিয়াছি। যদুনাথের নিকট শুনিয়াছি যে, প্রায় ৭৫।৭৬ বৎসর পূর্ব্বে, ইতিহাস—প্রসিদ্ধ রামপাল নামক স্থানে কোনও এক মোসলমান মৃত্তিকা খনন করিবার সময় এই তাম্রপট্ট প্রাপ্ত হইয়া, যদুনাথের পিতা স্বর্গীয় জগদ্বন্ধু বনিক্যকে প্রদান করিয়াছিল। জগদ্বন্ধু প্রায় ৪৫।৪৬ বৎসর নিজগৃহে উহা সযত্নে রক্ষা করিয়া, পরলোক প্রাপ্ত হইলে, তদীয় পুত্র যদুনাথ বিগত ৩০ বৎসর যাবৎ পিতৃদেবের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই তাম্রশাসনখানি ভক্তি-সহকারে রক্ষা করিয়া আসিতেছিল। ইহা এখন বরেন্দ্র-অনুসন্ধান—সমিতি কর্ত্তৃক সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।"

বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতি এই তাম্রশাসনের পাঠোদ্ধারের ভারও বসাক মহাশয়ের উপর ন্যস্ত করেন। কালপ্রভাবে যদিও তাম্রফলক খানির কোনও অনিষ্ট হয় নাই তথাপি প্রায় ৬০ বৎসর পূর্ব্বে যদুনাথ বণিক্য উহার অক্ষর পাঠে সুবিধা হইবে মনে করিয়া তাম্রফলকখানির উপরে তাম্র—দ্রাব অর্থাৎ [নাইট্রিক এ্যাসিড] প্রয়োগ পূর্ব্বক তাম্রফলকের উভয় পার্শ্ব সংঘর্ষণ করিয়া কোনও কোনও স্থানের অক্ষর বিলোপের সহায়তা করিয়াছিল। এই তাম্রশাসন খানির আয়তন ৯।।০×৮ ইঞ্চি। ইহার শীর্ষ দেশে [মধ্যস্থলে] একটী রাজমুদ্রা সংযুক্ত আছে। তন্মধ্যে "শ্রী—শ্রীচন্দ্র দেবঃ" এই নামটী উৎকীর্ণ রহিয়াছে। রাজার নামের উপর বৌদ্ধমত—বিজ্ঞাপক "ধর্ম্ম-চক্র-মুদ্রা।" ধর্ম্মচক্রের উভয় পার্শ্বে সমাসীন দুইটি মৃগমূর্ত্তি। রাজার নামের নিম্ন ভাগে [মধ্যস্থলে] অর্দ্ধচন্দ্র চিহ্ন;—তাহার উভয় পার্শ্বে ও নিম্ন ভাগে ফুলপাতার সাজ। এই রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ছিল বলিয়াই, রাজকীয় মুদ্রায় অর্দ্ধচন্দ্র মূর্ত্তির লাঞ্ছন সংযুক্ত হইয়া থাকিবে। বলা বাহুল্য, পাল-রাজগণের তাম্রশাসনেও উভয় পার্শ্বে মৃগ-মূর্ত্তি-লাঞ্ছিত এই প্রকার "ধর্ম্ম-চক্র-মুদ্রা।" সংযুক্ত আছে। এই তাম্রশাসনের প্রথম পৃষ্ঠায় ২৮পংক্তিতে এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠার ১২ পংক্তিতে পদ্য-গদ্য-ময় সংস্কৃত-ভাষায় রচিত দান লিপি উৎকীর্ণ আছে। এই তাম্রফলকটি ৫০ টি পংক্তিতে পূর্ণ। প্রথম পৃষ্ঠায় ২৮ পংক্তিতে এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় ১২ পংক্তিতে গদ্য-পদ্য-ময় সংস্কৃত-ভাষা-রচিত দান লিপি উৎকীর্ণ আছে। প্রথম

লিপি-পরিচয়

পৃষ্ঠায় ১৩ পংক্তি পর্য্যন্ত আটটি শ্লোকে রাজ-কবি নিজ প্রভুর বংশ বর্ণনা করিয়াছেন, তৎপর ৩৪ পংক্তি পর্য্যন্ত লিপির গদ্যাংশ, এবং সর্ব্বশেষে ধর্ম্মানুশংসী শ্লোক পঞ্চক। তাম্রশাসন-সম্পাদন সম্বন্ধে যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় যে শাস্ত্রীয় প্রমাণ উল্লিখিত আছে তাহা হইতে জানা যায় যে'—রাজা ["স্ব-হস্ত-কাল সম্পন্নং শাসনং কারয়েৎ স্থিরম্"] তাম্রশাসনে নিজ স্বাক্ষর ও সন তারিখ সংযুক্ত

করিবেন ;—কিন্তু এই তাম্রশাসনে সন তারিখ সন্নিবিষ্ট হয় নাই, এবং রাজার কিংবা তাঁহার কোনও প্রধান কর্ম্মচারীর স্বাক্ষর ও ইহাতে সংযুক্ত দেখা যায় না। লিপিকরের-শিল্পীর নামোল্লেখের অভাবও পরিদৃষ্ট হইতেছে। যে অক্ষরে এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ হইয়াছে, তাহা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের বঙ্গাক্ষর বলিয়া প্রতিভাত হয়। সুকৌশলে উৎকীর্ণ হইলেও স্থানে স্থানে লিপিকরের বা শিল্পীর অনবধানতার কিছু কিছু ভ্রম-প্রমাদ সংঘটিত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহচিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে। [৪র্থ ২১, ৩১ পংক্তি] কোনও কোনও স্থানে হয় নাই [১ম, ৭ম, ৩০শ পংক্তি] রেফ-সংযোগে য, হ প্রভৃতি কতিপয় বর্ণ ভিন্ন প্রায় অনেক ব্যঞ্জন বর্ণেরই দ্বিত্ব সাধিত হইয়াছে। এই তাম্রশাসন **রামপাল নামক স্থানে** আবিষ্কৃত হইয়াছিল বলিয়া, ইহা **"রামপাল-লিপি' নামে অভিহিত হইল।**

স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার বলেন : The *characters* are a type of Northern Nagari which is allied to the alphabet found in the copper-plates of the Later Palas and was current in North-eastern India towards the close of the tenth and begining of the eleventh century A. D. The *language* is Sanskrit.

বিক্রমপুর-সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার হইতে, ধর্ম্ম-চক্রমুদ্রা-সংযুক্ত এই তাম্রশাসন সম্পাদিত করাইয়া চন্দ্রবংশীয় পরম সৌগত, মহারাজাধিরাজ শ্রীমত্রৈলোক্যচন্দ্র দেব-পাদানুধ্যাত, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেব [১৫-১৬ পংক্তি মকরগুপ্তের প্রপৌত্র, বরাহগুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গল গুপ্তের পুত্র, শান্তি-বারিক পীতবাস গুপ্ত শর্ম্মাকে [ভগবান্ বুদ্ধ ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া] মাতাপিতার ও নিজের জন্য পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত [২৬-৩১ পংক্তি] সমস্ত রাজ-পাদোপজীবী ও অন্যান্য প্রজাবর্গকে বিজ্ঞাপিত করিয়া, যাবচ্চন্দ্র সূর্য্য ও ক্ষিতি-সমকাল পর্য্যন্ত, যথাবিধি উদক-স্পর্শ পূর্ব্বক পৌণ্ড্র-ভুক্তির অন্তঃপাতী নান্যম-মণ্ডলস্থিত নেহকাষ্ঠি গ্রামে পাটক পরিমিত ভূমি দান করিয়াছিলেন।

আমরা এখানে শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের প্রশস্তি পাঠ মুদ্রিত করিলাম। এই পাঠ ডাঃ বসাক মহাশয়ের কৃত। ডাঃ বসাক মহাশয় ১৩২০ সনের শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যার 'সাহিত্য' মাসিক পত্রে এবং পরে Epigraphia Indica Vol. XII, PP. 836-42—চিত্র সহ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীচন্দ্রদেবের এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধারের পর ঐতিহাসিকগণ নানারূপ বিতর্ক এবং আলোচনা করিয়াছিলেন। সে যাহাই হউক না কেন, আমরা এই লিপি হইতে যেরূপ ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হইতেছি তাহা

দ্বারা ইহা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে **চন্দ্রবংশীয় রাজগণের রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল।**

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্র শাসন

প্রশস্তি-পাঠ

(সম্মুখের পৃষ্ঠা)

১। ওঁ স্বস্তি

বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্ করুণৈ-[ক]-পাত্রং

ধর্ম্মোপ্য সৌ

২। বিজয়তে জগদেক—দীপঃ।

যৎ-সেবয়া-সকল এব মহানুভাবঃ

সং

৩। সার-পার মুপ গচ্ছতি ভিক্ষু—সঙ্ঘঃ ॥ [১ ॥]

চন্দ্রাণামিহ রোহিতা—[গি] র শ্বি (?) ভুজাম্বংশে

৪। বিশাল-শ্রিয়া

ম্বিখ্যাতো ভুবি পূর্ণ চন্দ্র-সদৃশঃ শ্রীপূর্ণচন্দ্রোঽভবৎ

অর্চ্চা

৫। নাস্পদ—পীঠিকাসু পঠিতঃ সন্তানিনামগ্রত—

ষ্টঙ্কোৎকীর্ণ—নবপ্রশস্তিষু জয়-স্তম্ভেষু তাম্রেষুচ ॥ [২ ॥]

৬। বুদ্ধস্য যঃ শ—

শক-জাতক-মস্ক সংস্থং

ভক্ত্যা বিভর্ত্তি ভগবানমৃতা করাঙ্শুঃ।

চন্দ্রস্য তস্য কুল-জাত ইতীব বৌদ্ধ [ঃ]

পুত্রঃ

* শিল্পীর অনবধানতায় যে সকল অক্ষর তাম্রপটে ক্ষোদিত হয় নাই, এবং উৎকীর্ণ হইলেও যে সকল অক্ষর কাল-প্রভাবে বা অন্য কারণে বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে, তাহা [ ] প্রকার বন্ধনী মধ্যে প্রদর্শিত হইল। বর্ণাশুদ্ধি ও অতিরিক্ত অক্ষর ( ) এইরূপ বন্ধনী মধ্যে সংশোধিত হইয়াছে। ১। বসন্ত-তিলক। এই শ্লোকের প্রথম চরণে 'একপাত্রং' পদের 'ক' অক্ষরটি উৎকীর্ণ হয় নাই।

৭। শ্রুতো জগতি তস্য **সুবর্ণ চন্দ্রঃ** ॥ [৩ ॥]
[দর্শে] স্য মাতা কিল দোহদেন
দিদৃক্ষমাণোদয়িচন্দ্র—বিম্বং।
৮। সুবর্ণ-চন্দ্রেণ হি তোষিতেতি
সুবর্ণচন্দ্রং সমুদাহরন্তি ॥ [৪ ॥]
পুত্রস্তস্য পবিত্রিতোভয়-কুলঃ কৌলীন—
৯। ভীতাশয়ে—
স্ত্রৈলোক্য বিদিতো দিশামতিথিভি **স্ত্রৈলোক্যচন্দ্র** গুণৈঃ
১০। রা—জ-ককুদ-চ্ছত্র-স্মিতানাং শ্রিয়াং
যশ্চন্দ্রোপপদে বভূব নৃপতি র্দ্বীপে দিলীপোপমঃ ॥ [৫ ॥]
জ্যোৎস্নেব চন্দ্রস্য
১১। শচীব জিষ্ণো
গৌগ্ ্রী হরস্যেব হরেরিব শ্রীঃ।
তস্য প্রিয়া কাঞ্চন-কান্তি রাশী
চ্ছ্রী (শ্রী) কাঞ্চনেত্যঞ্চিত—
১২। শাসনস্য ॥ [৬ ॥]
স রাজ-যোগেন শুভে মুহূর্ত্তে
মৌহূর্ত্তিকৈঃ সূচিত রাজ-চিহ্নং।
অবাপ তস্যাং তনয়ং
১৩। নয়জ্ঞঃ
শ্রীচন্দ্রমিন্দ (ন্দ্) পমমিন্দ্র—তেভ্যঃ ॥ [৭ ॥]
একাতপত্রাভরণাং ভুবং যো
বিধায় বৈধেয় জনাবিধে—
১৪। য়ঃ।
চকার কারাসু নিবেশিতারি—
র্যশঃ-সুগন্ধীনি দিশাং মুখানি ॥ [৮ ॥]
স খলু শ্রী বিক্রমপু-

১৫। র-সমাবাসিত—শ্রীমজ্জয় স্কন্ধাবারাৎ পরম-সৌগতো
মহারাজাধিরাজ-শ্রীমত্ত্রৈলোক্য চন্দ্র দে

১৬। ব-পাদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ পরম-ভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ
শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেব কুশঃ—

১৭। লী॥ শ্রী পৌণ্ড্র-ভুক্ত্য-স্তঃপাতি-নাব্যমণ্ডলে।
নেহকাষ্ঠি-গ্রামে পাটক-ভূমৌ॥ সমুপগতাশে—

১৮। য—রাজপুরুষ-রাজ্ঞী-রাণক-রাজপুত্র-রাজামাত্য
— মহাব্যূহপতি-মণ্ডলপতি মহাসান্ধি—

১৯। বিগ্রহিক। মহাসেনাপতি। মহাক্ষপটলিক।
মহাসর্ব্বাধিকৃত। মহাপ্রতীহার। কোট্টপাল। দৌঃ

২০। সাধ-সাধনিক। চৌরোদ্ধরণিক। নৌবল হস্ত্যশ্ব-গো
মহিষাজাবিকাদি-ব্যাপৃতক। গৌল্মিক শৌ-

২১। ল্কিক-দাণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক-বিষয়পত্যাদি (ত্যাদি)
১
নন্যাংশ্চ সকল-রাজ-পাদো [প] জীবনোহধ্যক্ষ প্র-
২

২২। চারোক্তানিহাকীর্ত্তিতান্। চাটভ [ট] জাতীয়ান্
ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণোত্তরান্ যথার্হং মান—

২। শার্দ্দূল বিক্রীড়িত। এই শ্লোকে প্রথম পাদে "বোহিতা" অক্ষর-ত্রয়ের পর একটি অক্ষর উৎকীর্ণ হয় নাই, এবং তাহার পরবর্ত্তী যে অক্ষরটী পরিদৃষ্ট হয়, তাহা "খি" বলিয়াই প্রতিভাত হয়। এই পাঁচটী অক্ষর 'ভুক্তাং' অক্ষরদ্বয়ের সঙ্গে সমাসাবদ্ধ থাকিয়া 'চন্দ্রাণাং পদের বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।' "রোহিতাবনি ভুক্তাং" অথবা ঐরূপ কোনও জনপদ-ভোগের কথা উৎকীর্ণ কর্ম্মে সূচিত হইয়াছে কি না, সুধীগণ তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

৩। বসন্ত তিলক। এই শ্লোকে তৃতীয় পাদে "বৌদ্ধ" শব্দের পর বিসর্গ-চিহ্নের অভাব দৃষ্ট হয়। তদভাবেও অর্থ সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে।

৪। উপজাতি। এই শ্লোকের "দর্শে" অক্ষরদ্বয় একটু অস্পষ্ট।

৫। শার্দ্দূল বিক্রীড়িত।

৬। ইন্দ্র বজ্রা। এই শ্লোকের চতুর্থ চরণে "শ্রী' শব্দ দুইবার উৎকীর্ণ হওয়াতে ছন্দোভঙ্গ দোষ ঘটিয়াছে। একটীকে অতিরিক্ত ধরিতে হইবে।

শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল লিপি—প্রথম পৃষ্ঠা

শ্রীচন্দ্রদেবের রামপাল লিপি—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা
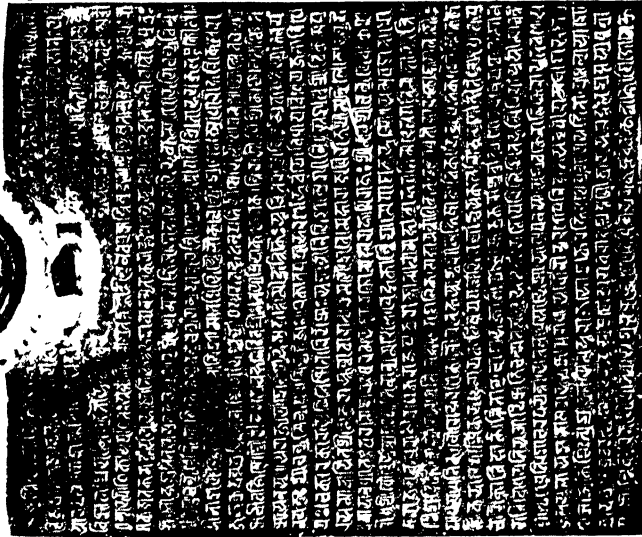
২৩। য়তি বোধয়তি সমাদিশভি চ। মতমস্তু ভবতাং।

যথোপরি-লিখিত ভূমিরিয়ং। স্ব-সীমাবচ্ছী (চ্ছি)

২৪। ন্না। তৃণ-পূতি-গোচর-পর্য্যন্তা। সতলা।

সোদ্দেশা। সাম্র-পনসা। সগুবাক-নালিকেরা সলবণা স—

২৫। জল-স্থলা। সগর্ত্তোষরা সদশাপরাধা। সচৌরোদ্ধরণা

পরিহৃত-সর্ব্বপীড়া অচাট-ভট-প্র—

২৬। বেশা অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা। সমস্ত-রাজভোগ—

৩

কর-হিরণ্য-প্রত্যায়- সহিতা। শখল্য-(শাণ্ডিল্য) স্য (স) গো—

২৭। ত্রায় এ [র্ষি] প্রবরায়। মঙ্করগুপ্তস্য প্রপৌত্রায়

বরাহগুপ্ত-পৌত্রায়

সুমঙ্গলগুপ্তস্য পুত্রা—

২৮। য়। শান্তি-বারিক—শ্রীপীতবাসগুপ্তশর্ম্মণে।

বিধিবদুদক-পূর্ব্বকং কৃত্বা

৪

কোটিহোমি (?) দগা (ঙ্গ)

[পশ্চাতের পৃষ্ঠা]

৫

২৯। ভবতে ভগবন্তং বুদ্ধভট্টা [র] কমুদ্দিশ্য

মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ

১। এই স্থানের (প) অক্ষরটি তাম্র-পট্টে ক্ষোদিত দেখা যায় না।

২। এই স্থানের 'ট' অক্ষরটিও উৎকীর্ণ নাই।

৩। 'শখল্য' কোনও ঋষির নাম বলিয়া বোধ হয় না; এই নিমিত্ত "শাণ্ডিল্য" পাঠ শুদ্ধ হইবে বলিয়া গৃহীত হইল।

৪। এই স্থলে অর্থ-সঙ্গতির জন্য "কোটি-হোমিঙ্গভবতে" পাঠ ধৃত হইল। তাম্রপট্টে "হোমেদগা' পরিদৃষ্ট হয়। 'হোমি'র ইকারের উপরের টানটি এবং 'ঙ' শূন্য চিহ্নটি বিলুপ্ত বলা যাইতে পারে।

৬

৩০। পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে। আচন্দ্রার্ক [ং] ক্ষিতিসমকালং

৭

যাবৎ ভূমি [চ্ছি]—

৮

৩১। দ্র-স্থায়েন। শ্রীমদ্ধর্ম্ম [চ] ক্র-মুদ্রয়া
তাম্রশাসনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ অতো ভবদ্ভিঃ সর্বৈঃ

৩২। রনুমন্তব্যং। ভাবিভিরপি ভূপতিভির্ভূমের্দ্দান-ফল

৯

গৌরবাদপহরণে মহা-নরক-পা—

৩৩। ত—ভয়াচ্চ দানমিদমনুমোদ্যানুপালনীয়ম্ [প্র]
তিবাসিভিঃ ক্ষেত্রকরাং (রৈ) শ্চাজ্ঞাশ্রবণ-বিধে

১০

৩৪। য়ী-ভূ [য়] যথোচিত-প্রত্যায়োপনয়ঃ কার্য্য ইতি॥
ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশংসিনঃ শ্লোকাঃ॥
ভূমিং যঃ

৩৫। প্রতিগৃহ্লাতি যশ্চ ভূমিং প্রযচ্ছতি [।]
উভৌ-তৌ-পুণ্য-কর্ম্মাণৌ-নিয়তং স্বর্গ গামিনৌ॥
ষষ্টিম্বর্ষ- সহস্রা—

৩৬। নি স্বগ্র্গে মোদতি ভূমিদঃ।

৫। এই স্থলের 'র' অক্ষর তাম্রপট্টে উৎকীর্ণ হয় নাই।

৬। এই শব্দটি তাম্রপট্টে ং—চিহ্ন-বিহীন।

৭। এই শব্দের চ্ছি' অক্ষরটি তাম্রফলকে ক্ষোদিত নাই।

৮। 'চক্রের' 'চ' অনুৎকীর্ণ।

৯। এই স্থলের 'প্র' অক্ষরটি ক্ষোদিত নাই।

১০। এই স্থলের 'য়' টি উৎকীর্ণ হয় নাই।

১১

আক্ষেপ্তা চানুমন্তা চ তান্যেব নরকং বসেৎ [ত্]

স্বদত্তাং পরদত্তাম্বা যো হ-

৩৭। রেত বসুন্ধরম্।

১৩

স বিষ্ঠায়াং ক্রিমির্ভূত্বা পিতৃভিঃ [সহ পচ্যতে]॥

১২

বহুভি র্ব [সু] ধা দত্তা রাজভিঃ সগ—

রাদিভিঃ [।]

যস্য যস্য যদা ভূমিস্তস্য তস্য তদা ফলম্॥

১৪

ইতি কমল-দা (দ) [লা] মু-বিন্দু-লোলাং

৩৯। শ্রিয়মনুচিন্ত্য মনুষ্যজীবিতঞ্চ।

সকলমিদমুদাহৃতঞ্চ বুদ্ধা

ন হি পুরুষৈঃপর—

১৫

৪০। কীর্ত্তয়ো বি [লো] প্যাঃ॥ •

১১। 'নরকে' হওয়া উচিত ছিল।

১২। এই শব্দদ্বয় অস্পষ্ট।

১৩। 'বহুধা' শব্দের 'সু' ক্ষোদিত নাই।

১৪। 'দলাম্বুর 'লা' অক্ষর উৎকীর্ণ দেখা যায় না।

১৫। 'বিলোপ্যা' শব্দের 'লো' ক্ষোদিত হয় নাই।

১৬। এই স্থলের ০ এই চিহ্নটি টীকাতে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ।

বঙ্গানুবাদ

১। করুণার একমাত্র আধার, বন্দনার্হ সেই ভগবান্ (১) **জিন** [বুদ্ধদেব] এবং জগতের একমাত্র দীপ-সদৃশ তাঁহার **ধর্ম্ম** (উভয়েই) বিজয়-লাভ করুন। সকল মহানুভব ভিক্ষু-সংঘই তাঁহাদের [বুদ্ধ ও ধর্ম্মের] সেবা করিয়া সংসার [সাগর] পারে উপস্থিত হন।

২। বিপুল লক্ষ্মীক, **রোহিত**·········**ভোগকারী**, চন্দ্রদিগের বংশে, পূর্ণচন্দ্র-সদৃশ **পূর্ণচন্দ্র**-নামক [ব্যক্তি] পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন। প্রতিমার পাদপীঠিকাতে সন্তানিব অগ্রভাগে এবং টঙ্কোৎকীর্ণ (২) নব-প্রশস্তি-সমন্বিত জয়স্তম্ভে ও তাম্রপট্টে তাঁহার নাম পঠিত হইত।

৩। যে ভগবান্ অমৃত-রশ্মি [চন্দ্রমা] ভক্তিবশতঃ [বুদ্ধস্য] বুদ্ধরূপী শশক-শিশুকে (৩) অঙ্কে ধারণ করিতেছেন,—সেই [চন্দ্রমার] কুল-জাত বলিয়াই যেন তাঁহার [পূর্ণচন্দ্রের] পুত্র **সুবর্ণচন্দ্র** জগতে (৪) "বৌদ্ধ" বলিয়া বিশ্রুত ছিলেন।

৪। (৫) জনশ্রুতি এইরূপ যে, এক (৬) অমাবস্যা-রজনীতে তাঁহার [সুবর্ণ চন্দ্রের] মাতা [গর্ভাবস্থায়] (৭) স্পৃহাবশতঃ উদয়ি-চন্দ্র বিম্ব-দর্শনের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলে [স্বামী কর্তৃক) সুবর্ণ নির্ম্মিত চন্দ্র দ্বারা পরিতোষিতা হইয়াছিলেন,—এই নিমিত্ত লোকে [তাঁহার পুত্রকে] সুবর্ণ-চন্দ্র বলিয়া অভিহিত করিত।

৫। [মাতৃ-পিতৃ] উভয়-কুল-পাবন, [সুবর্ণ-চন্দ্রের] পুত্রের অপবাদ-ভীরু (৮) গুণাবলী চতুর্দ্দিকে অতিথিরূপে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুত্র ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন। হরিকেল-রাজ্যের (৯) রাজ-চিহ্নসূচক পুত্র যে রাজ্যলক্ষ্মীর হাস্যরূপে উদ্ভাসিত হইত, সেই রাজলক্ষ্মীর আধার, দিলীপোপম এই পুত্র চন্দ্রদ্বীপে (১০) 'নৃপতি' হইয়াছিলেন।

৬। চন্দ্রের কান্তা জ্যোৎস্না, (১১) ইন্দ্রের কান্তা শচী, হরের কান্তা গৌরী এবং হরির কান্তা শ্রীর ন্যায়, পূজিত-শাসন এই নৃপতিরও শ্রীকাঞ্চনা-নাম্নী কাঞ্চন-কান্তি কান্তা ছিলেন।

৭। ইন্দ্রতেজাঃ নীতিজ্ঞ এই নৃপতি [ত্রৈলোক্যচন্দ্র] (১২) রাজযোগোপলক্ষিত শুভ-মুহূর্ত্তে প্রিয়ার [শ্রীকাঞ্চনার] গর্ভে (১৩) জ্যোতিষিক-সূচিত-রাজ-চিহ্নধারী ইন্দুপম তনয় শ্রীচন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৮। মূর্খ-জনের অবাধ্য (১৪) এই [শ্রীচন্দ্র] রাজ্যকে একতাপত্র সুশোভিতা করিয়া এবং অরিগণকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া দিঙ্মণ্ডল যশঃ-সৌরভে আমোদিত করিয়াছিলেন।

শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত (সংস্থাপিত) জয়স্কন্ধাবার হইতে ; মহারাজাধিরাজ শ্রীমৎ ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেব পাদানুধ্যাত, পরমসৌগত (বৌদ্ধ), পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহা-রাজাধিরাজ, কুশলময়; সেই শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেব—শ্রীপৌণ্ড্রভুক্ত্যন্তঃপাতী—নান্ঠ-মণ্ডলে, নেহকাষ্টি গ্রামে পাটক-পরিমিত ভূমিতে, সমুপগত—(সংবিদিত) সমস্ত (১৬) রাজপুরুষ-দিগকে রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজমাতা, (১৭) মহাব্যূহপতি, (১৮) মণ্ডলপতি, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহাক্ষপটলিক (লেখ্যরক্ষক), (১৯) মহা-সর্ব্বাধিকৃত মহাপ্রতীহার (দৌবারিকশ্রেষ্ঠ), (২০) কোট্টপাল (দুর্গ-রক্ষক), দৌঃসাধ-সাধনিক (দ্বারপাল বা গ্রামপরিদর্শক) চৌরোদ্ধরণিক (দস্যু-তস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক পুলিশ কর্ম্মচারীবিশেষ) নৌবল-ব্যাপৃতক নৌ-সেনাধিকৃত পুরুষ) হস্তিব্যাপৃতক (গজাধ্যক্ষ), অশ্ব-ব্যাপৃতক (অশ্বাধ্যক্ষ), গো-ব্যাপৃতক (গবাধ্যক্ষ) মহিষ-ব্যাপৃতক (মহিষাধ্যক্ষ) অজ-ব্যাপৃতক (ছাগাধ্যক্ষ), অবিকাদি-ব্যাপৃতক (মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ)' গৌল্মিক ('গুল্ম' নামক সেনামণ্ডলীর অধিনায়ক), (২১) শৌল্কিক (শুল্ক-সংগ্রহকারী), দাণ্ডপাশিক (বধাধিকৃতক পুরুষ), দণ্ডনায়ক (চতুরঙ্গবলাধ্যক্ষ) বিষয়পতি (জেলাধিপতি) প্রভৃতি [রাজকর্ম্মচারী-দিগকে] এবং অধ্যক্ষ-প্রচারোক্ত (অধ্যক্ষতালিকাভুক্ত) কিন্তু বর্ত্তমান-শাসনে [পৃথক্ ভাবে] অনুল্লিখিত অন্যান্য সমস্ত রাজপাদোপজীবীদিগকে, চাট-ভট-জাতীয়গণকে ক্ষেত্র-করদিগকে এবং ব্রাহ্মণোত্তমদিগকে, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন, এবং আজ্ঞা করিতেছেন। [নিম্নোল্লিখিত বিষয়ে] আপনাদের সকলের অভিমত হউক। যথা, স্বসীমাবচ্ছিন্ন, তৃণপূতিগোচরপর্য্যন্ত, সতল, সোদ্দেশ আম্র-পনস-গুবাক-নারিকেল-বৃক্ষ সমেত, (২২) লবণোৎপাদক ভূমিসহ, জল-স্থল-গর্ত্ত-উষর ভূমির সহিত, যাহার অর্থাৎ যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতিগ্রহীতার) দশটি অপরাধ (রাজার) সহ্য হইবে, সচৌরোদ্ধরণা, সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়ন রহিত চাট ভট জাতির প্রবেশাধিকার-বিরহিত, যাহা হইতে কোনও প্রকার করাদি গৃহীত হইবে না (অর্থাৎ নিষ্কর করিয়া) রাজ-প্রাপ্য কর ও হিরণ্যাদি [সর্ব্বপ্রকার] আয়ের সহিত, উপরি-লিখিত এই ভূমি মকরগুপ্তের প্রপৌত্র বরাহগুপ্তের পৌত্র, সুমঙ্গলগুপ্তের পুত্র, শাণ্ডিল্য (?) সগোত্র, ত্র্যর্ষিপ্রবর, (২৩) শান্তিবারিক, (২৪) কোটি-হোম-সম্পাদনকারী (?) শ্রীপীতবাস গুপ্ত শর্ম্মাকে যথাবিধি উদক-স্পর্শ পূর্ব্বক ভগবান্ বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া, পিতা-মাতার এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য, যাবৎ-সূর্য্য-চন্দ্র, এবং ক্ষিতিসমকাল-পর্য্যন্ত, ভূমিচ্ছিদ্র ন্যায়ানুসারে শ্রীমদ্-ধর্ম্মচক্র-মুদ্রাদ্বারা তাম্রশাসন করিয়া প্রদান করিলাম। অতএব, আপনারা সকলেই ইহার অনুমোদন করুন। ভাবি ভূপতিগণও ভূমিদান-ফল-গৌরব ও তদপহরণে মহানরক-পাত ভয় [স্মরণ করিয়া] এই দান অনুমোদন-পূর্ব্বক পরিপালন

করিবেন, এবং প্রতিবাসী ক্ষেত্রকরগণও এই আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া যথোচিত প্রত্যায় [প্রতিগ্রহীতার নিকট] নিকট উপস্থিত করিবে। এই অভিপ্রায়ে ধর্ম্মানুশাসনের শ্লোকও আছে [যথা]—

১। যিনি ভূমির প্রতিগ্রহ করেন, এবং যিনি ভূমি-দান করেন, তাঁহারা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মা এবং উভয়েই নিয়ত স্বর্গগামী হন।

২। ভূমিদাতা ষষ্টি-সহস্র বৎসর স্বর্গভোগ করেন, এবং ভূমির অপহর্ত্তা ও [অপহরণের] অনুমোদনকারী তৎপরিমিত কাল নরকে বাস করেন।

৩। ভূমি স্বদত্তই হউক, আর পরদত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই বিষ্ঠার (২৫) কৃমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন।

৪। সগরাদি অনেক নৃপতিগণ ভূমিদান করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু যখন যাঁহার (যে নৃপতির) ভূমি, তখন [ভূমিদানের] ফল তাঁহারই হইয়া থাকে।

৫। লক্ষ্মীকে এবং মনুষ্য-জীবনকে পদ্ম-পত্রস্থিত জলবিন্দুবৎ চঞ্চল মনে করিয়া, এবং [উপরি] উদাহৃত সমস্ত বিষয় স্মরণ রাখিয়া কোনও ব্যক্তিরই পরকীর্ত্তির লোপ-সাধন কর্ত্তব্য নয়। (২৬) ॥০

(১) জিন:— "সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধো ধর্ম্মরাজস্তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রো ভগবান্ মারজিৎ লোকজিৎ জিনঃ। ইত্যমরঃ।

এই শ্লোকে রাজকবি বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সংঘাখ্য ত্রি-রত্নের উল্লেখ করিয়া নিজ প্রভুকে বৌদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া সূচিত করিয়াছেন।

(২) অর্চ্চা—প্রতিমা। "টঙ্কঃ পাষাণ-দারণঃ ইত্যমরঃ। "টঙ্কৈমনঃ শিলগুহেব বিদার্য্যমাণা" ইতি মৃচ্ছকটিকে ১।২০ "পীঠমাসনম্" ইতি চামরঃ। সম্মানি-শব্দ পারিভাষিক বলিয়া বোধ হয়।

(৩) বুদ্ধদেব শশকরূপে একবার ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এইরূপ এক পৌরাণিক কাহিনী বৌদ্ধ-জাতকমালায় বর্ণিত আছে। যব-দ্বীপের বোর-বুদুরের স্থাপত্য-শিল্পে বুদ্ধদেবের "শশক-জাতক" উৎকীর্ণ রহিয়াছে। "Monumental Java" গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

(৪) সুবর্ণচন্দ্রকুলজাত, এবং চন্দ্রের সঙ্গে বুদ্ধদেবের [উপর্য্যুক্ত টীকাতে উল্লিখিতরূপ] সম্বন্ধ আছে—এই নিমিত্তই লোকে সুবর্ণচন্দ্রকে "বৌদ্ধ" বলিত।

(৫) কিল—ঐতিহ্যে।

(৬) দর্শ—"অমাবাস্যাত্বমাবস্যা দর্শঃ সূর্য্যেন্দুসঙ্গম' ইত্যমরঃ। একত্র-স্থিতচন্দ্রার্ক-দর্শনাদ্দর্শ উচ্যতে।

(৭) দোহদ—"অথ দোহদং ইচ্ছাকাঙ্ক্ষা-স্পৃহেহা-তৃড় বাঞ্ছা-লিপ্সা-মনোরথঃ, কামোঽভিলাষস্তর্ষশ্চ ইত্যমরঃ। গর্ভাবস্থায় স্পৃহার্থেই 'দোহদ' শব্দের প্রয়োগ। যথা, "প্রজাবতী দোহদ-শংসিনী তে"—রঘু, ১৪।৪৫। কিন্তু,—"যঃ কশ্চিদ্ গর্ভদোহদোঽস্যাঃ সোঽবশ্যমচিরাসম্পাদয়িতব্য ইতি"—উত্তর-চরিতে ১ম অঙ্ক।

(৮) "স্যাৎ কৌলীনং লোকবাদে" ইত্যমরঃ। যথা, "[রঘু, ১৪।৮৪] "কৌলীনভীতেন গৃহান্নিরস্তা

ন তেন বৈদেহসুতা, মনস্তঃ। নিন্দা-অর্থে প্রয়োগ—[রঘু, ১৪।৩৬) "কৌলীনমাত্মাশ্রয়মাচচক্ষে তেভ্যঃ পুনশ্চেদমুবাচ বাক্যম্।"

(৯) হরিকেল—বঙ্গের প্রাচীন নাম। "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়া অঙ্গাশ্চম্পোপলক্ষিতাঃ" ইতি হেমচন্দ্রঃ। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র পরে বঙ্গরাজ হইয়াছিলেন বলিয়াই রাজকবি তাঁহার পিতাকে "হরিকেলরাজ ককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়াং আধারঃ" রূপে বর্ণনা করিয়া থাকিতে পারেন।

(১০) চন্দ্রদ্বীপ—মধ্যযুগে এই প্রদেশ বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ, খুলনা ও ফরিদপুর জেলার অংশ-বিশেষ লইয়াই সমুদ্র পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। মোগল-সাম্রাজ্যে এই চন্দ্রদ্বীপই 'বাকলা-চন্দ্রদ্বীপ' পরগণা নামে অভিহিত হইত। বিশ্বকোষ (ষষ্ঠ ভাগ, ১৪৫ পৃঃ) ব্রজসুন্দর মিত্র প্রণীত "চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশ" নামক গ্রন্থের প্রমাণে লিখিত হইয়াছে,—'বিক্রমপুর হইতে সমাগত দনুজমর্দ্দনদেবই চন্দ্রদ্বীপের প্রথম রাজা।" বলা বাহুল্য, এই সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে না।

(১১) জিষ্ণু—এই স্থলে ইন্দ্র-সমানার্থক। যথা, "জিষ্ণুর্লেখর্ষভঃ শক্রঃ শতমন্যুর্দিবস্পতিঃ ইতি ইন্দ্র-পর্য্যায়ে অমরঃ। পুরুষোত্তম, সূর্য্য ও অর্জ্জুন অর্থেও 'জিষ্ণু' শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

(১২) রাজযোগ—গ্রহনক্ষত্রাদির যে শুভযোগ-সময়ে জন্ম-গ্রহণ করিলে ভূমিষ্ঠ শিশু কালে 'রাজা 'হইবে বলিয়া সূচিত হয়, সেই যোগকে 'রাজযোগ' বলে। 'শ্রীচন্দ্র' বঙ্গের 'রাজা' হইবেন ইহাই শ্লোকে ইঙ্গিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত আপ্তের অভিধানে এই শব্দটি এইভাবে ব্যাখ্যাত'—"a configuration of planets, asterisms etc. at the birth of a man, which indicates that he is destined to be a king.

(১৩) মৌহূর্ত্তিক— "সাংবৎসরো জ্যোতিষিকো দৈবজ্ঞ-গণকাবপি।
স্যান্মৌহূর্ত্তিক-মৌহূর্ত্ত-জ্ঞানি-কার্ত্তান্তিকা অপি।" ইত্যমরঃ।

(১৪) বৈধেয়—"অজ্ঞ-মূঢ়-যথাজাত মূর্খ-বৈধেয়-বালিশাঃ" ইত্যমরঃ। শ্রীচন্দ্র সর্ব্বদাই পণ্ডিত-মণ্ডল পরিবেষ্টিত থাকিতেন, এবং তাঁহাদেরই 'বিধেয়' ছিলেন।

১৫। এ স্থলে কোন্ 'অরি' সূচীত হইয়াছে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়না। হয়ত বর্ম্ম-বংশের শেষ রাজাই শ্রীচন্দ্র কর্তৃক কারা-নিবদ্ধ হইয়া থাকিবেন; এবং বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্র এই ঘটনার পরেই বঙ্গের রাজসিংহাসন বর্ম্ম-রাজের হস্ত-ভ্রষ্ট করিয়া বিক্রমপুর রাজধানী হইতে রাজ্য-শাসন-পরিচালন আরম্ভ করিয়া থাকিবেন।

(১৬। 'মহাব্যূহপতি'—শব্দটি বেলাব-লিপিতে ও হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনেও পাওয়া গিয়াছে।

১৭ 'মণ্ডলপাত শব্দটি অশেষ-শ্রদ্ধা-ভাজন বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয়ের "মহামাণ্ডলিক ঈশ্বর ঘোষের তাম্রশাসন" প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। 'মণ্ডল' শব্দ হইতে 'মহামাণ্ডলিক' শব্দ পারিবারিক অর্থে] ব্যবহৃত হইয়াছে। 'বিশ্বে' মণ্ডল-শব্দের বিবিধার্থ বিজ্ঞাপনার্থ যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে সেকালের 'মণ্ডল' নামক বিভাগের কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা দ্বাদশ রাজক নামক কথিত হইত যথা,—

সাম্যণ্ডলে দ্বাদশ রাজকে চ।
দেশে চ বিষে চ জনপদে চ।

ভরত অমর টিকায় ইহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। মেদিনী কোষেও মণ্ডল "দ্বাদশ রাজক" বলিয়া উল্লিখিত আছে। মণ্ডলের শাসনকর্তা 'মণ্ডলেশ," 'মণ্ডলাধিপতি' "মণ্ডলেশ্বর" প্রভৃতি নামে কথিত হইতেন;

অভিধানে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। কামন্দকীয় নীতিসারে দেখিতে পাওয়া যায়, মণ্ডলাধিপেরও কাষ-দণ্ড অমাত্য মন্ত্রি-দুর্গাদি সহায় ছিল। যথা,—সাহিত্য, ১৩২০ সালের বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

উপেতঃ কোষ দণ্ডাভ্যাং সামাতঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
দুর্গস্থ শ্চিন্তয়েৎ সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাধিপঃ॥

ইহাই মণ্ডলাধিপতি "দুর্গস্থ" থাকিয়া মণ্ডল শাসন করিতেন বলিয়া পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ-জন্ম খণ্ডে [৮৬ অধ্যায়ে] দেখিতে পাওয়া যায়, "মণ্ডলেশ্বরের" পদমর্য্যাদা নৃপ-শব্দবাচক সাধারণ রাজ-রাজন্যকের পদমর্য্যাদা অপেক্ষা অনেক অধিক ছিল। যথা.—

চতুর্যোজন পর্য্যন্ত মধিকারং নৃপস্য চ।
যো রাজা তচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশ্বর॥

এই বচনের প্রমাণে মণ্ডলেশ্বর ও "রাজ" পদবাচ্য ছিলেন বলিয়া বুঝিতে পারা যায়, কিন্তু তাঁহার অধিকার সাধারণ "রাজ" পদবাচ্য ব্যক্তির অধিকার অপেক্ষা শতগুণ অধিক ছিল। "মণ্ডলাধিপতিগণ" পরমেশ্বর পরম ভট্টারক রাজাধি রাজের "সামন্ত" মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। সেকালের শাসন-ব্যবস্থায় রাজাধিরাজ "পরম ভট্টাকর" ছিলেন; তাঁহার পরেই মণ্ডলাধিপতির স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল।

মাণ্ডলিক-শব্দ এই মণ্ডলাধিপতি শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। মধ্যযুগের গৌড়ীয় সাম্রাজ্যে "মাণ্ডলিক" ও "মহামাণ্ডলিক" শব্দ যে সত্য সত্যই প্রচলিত ছিল, "রামচরিত" কাব্যের যে অংশের টীকা প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, তাহাতে তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। "কয়ঙ্গলীয় মঙ্গলাধিপতি" প্রভৃতি রাজপুরুষগণ [টীকায়] "সামন্ত" বলিয়া স্পষ্ট উল্লিখিত থাকায়, বুঝিতে পারা যায়—তৎকালে "মণ্ডলাধিপতিগণ বা "মাঙ্গলিকগণ" রাজাধিরাজ "সামন্ত" মধ্যেই পরিগণিত হইতেন।

১৮ "মহাসর্ব্বাধিকৃত"—শব্দটিও হরিবর্ম্মার ও ঈশ্বর ঘোষের তাম্র-শাসনে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে 'সর্ব্বাধিকারী' উপাধির সৃষ্টি, বোধহয়, এই শব্দ হইতেই সাধিত হইয়া থাকিবে।

১৯ 'কোট্টপাল' শব্দটি পৃথ্বীপালগণের তাম্রশাসনে বহুবার পাওয়া গিয়াছে।

২০ শৌল্কিক' শব্দটি আধুনিক 'Custom officer' এর পদ-বিজ্ঞাপক বলিয়া প্রতিভাত হয়।

'সলবণা'—ভূমির এই বিশেষণটি বেলাব-লিপিতে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। উৎসৃষ্ট ভূমিখণ্ড সমুদ্র তীরবর্ত্তী ছিল, ইহাই কি এই বিশেষণের সার্থকতা? আমাদেরও তাহাই মনে হয়।

২১ 'শান্তি-বারিক'—যজ্ঞের শান্তি—জলাধিকৃত ব্রাহ্মণকে লক্ষিত করিয়া থাকিবে।

২২ 'হোমি'—এই শব্দটি ঘৃত, জল, বহ্নি ও চিত্রক-বৃক্ষ অর্থে প্রযুক্ত। এই স্থলে ইহার অনলার্থ গ্রহণ করিয়া 'কোটি-হোম'কে 'কোটি-হোমি'-সমানার্থক ধরা যাইতে পারে।

২৩ 'ক্রিমি'—'কৃমি' রূপেও পঠিত হয়

২৪ এই • কেন্দ্র-চিহ্নটি কি সূচিত করিতেছে, তাহা ঠিক বলা যায় না। লিপি-শেষ-বিজ্ঞাপক চিহ্নও হইতে পারে; ইহার দ্বারা বৌদ্ধদিগের শূন্য-বাদও সূচিত হইয়া থাকিতে পারে। ইহা তাম্রশাসন সম্পাদন-বিজ্ঞাপক শ্রীচন্দ্রের সাঙ্কেতিক স্বাক্ষর বলিয়াও গৃহীত হইতে পারে]

পর্ণশবরী—নয়নন্দ

হেরুকা
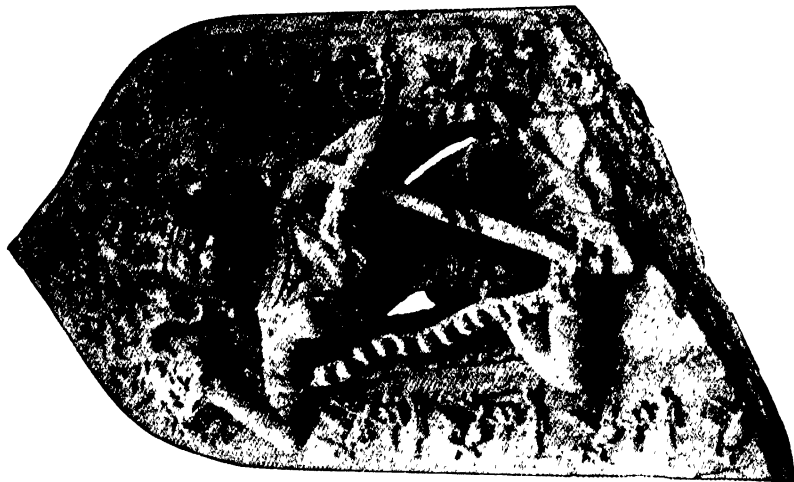
দ্বিভুজ লোকনাথ—দশলঙ্গ

শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুর লিপি

আমরা রামপাল লিপির বিষয় বলিয়াছি, এইবার শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুরের তাম্রশাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিব। কেদারপুরের তাম্রশাসনখানি ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনী-কান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের যত্নে ও শ্রমে পাঠোদ্ধার হইয়াছে এবং জনসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।

এই তাম্রফলকের পাঠোদ্ধারকারী এবং আবিষ্কারক ডাক্তার ভট্টশালী মহাশয় বলেন:—এই তাম্রশাসনখানি শ্রীচন্দ্রদেবের তৃতীয় তাম্রশাসন। উহা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফরিদপুর জেলার মাদারীপুর মহকুমার অন্তর্গত কেদারপুর গ্রামে মৃত্তিকা খনন কালে পাওয়া গিয়াছে। কেদারপুর মধ্যইংরেজী স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে উহা সংরক্ষিত হয়। আমি জনৈক বন্ধুর নিকট ইহা অবগত হই। ফরিদপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ জে, এন্, রায়, আই-সি-এস ও মাদারীপুরের মহকুমা হাকিম মিঃ এন, সেন মহোদয়দ্বয়ের সৌজন্যে মাননীয় মিঃ টি, ইমারসন, সি-আই-ই, আই-সি-এস মহোদয় কর্ত্তৃক ঢাকা যাদুঘরের জন্য উহা সংগৃহীত হয়।

এই তাম্রশাসনখানি ৮॥ ইঞ্চি ও ৭। ইঞ্চি প্রস্থ, রামপালে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানি ৯॥ ইঞ্চি দীর্ঘ ও ৮ ইঞ্চি প্রস্থ, সুতরাং ইহা অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। এই তাম্রফলকের শীর্ষদেশের ঠিক মধ্যভাগে চন্দ্র রাজগণের রাজকীয় মোহর অঙ্কিত আছে। ইহার উভয় পার্শ্বে দুইটি শায়িত উন্নত-শীর্ষ মৃগ "ধর্ম্মচক্র" সূচনা করিতেছে এবং উহা ডিয়ার পার্কের (মৃগদাব) কাশীর অন্তর্গত বর্ত্তমান সারনাথের "ধর্ম্ম চক্রের প্রথম ঘূর্ণনের" নিদর্শন স্বরূপ। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, চন্দ্রদেবের পূর্ব্ববর্ত্তী বঙ্গের "পালবংশের" রাজগণেরও অনুরূপ মোহর ছিল এবং এই পালরাজগণও বৌদ্ধ-ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই চক্রের নিম্নদেশে 'চন্দ্রদেবের' নাম গ্রথিত আছে।

কেদারপুর লিপির পরিচয়

এই তাম্রশাসনখানি অসমাপ্ত এবং দেখিয়া বোধ হয় ইহার দ্বারা কোনও "দান" সম্পাদিত হয় নাই। ইহাতে কেবল দানের মঞ্জুরীকৃত অংশগুলি খোদিত হইয়া বক্রী অংশ অবস্থানুযায়ী অনুশাসন দ্বারা পূর্ণ করিবার অপেক্ষায় মুদ্রা-গৃহে সংরক্ষিত হইয়াছিল। এই তাম্রশাসনখানি মুদ্রাকরের গুরুতর ভ্রম প্রমাদে পরিপূর্ণ। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, কেদারপুর গ্রাম, যেখানে এই তাম্রফলকখানি প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে, সেখানে প্রশস্ত পরিখা-বেষ্টিত রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ ও বিনষ্ট প্রায় এক বিশাল দীর্ঘিকার চিহ্ন বর্ত্তমান। দীর্ঘিকাটী মোগল শাসনের প্রাক্কালে যে পরাক্রান্ত দ্বাদশ ভৌমিকগণ বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়াছেন, তাঁহাদের অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ কেদার রায়ের স্মৃতির সহিত বিজড়িত।

এই তাম্রফলকের কেবল একদিক মুদ্রিত এবং নিম্নদেশে প্রায় দুই ইঞ্চি পরিমিত স্থান শূন্য। ইহাতে ১৮ পংক্তি খোদিত লিপি আছে। এই অক্ষরগুলি ৩৪ হইতে ৩০ ইঞ্চি উচ্চ, এবং অধিকাংশ স্থলেই সুস্পষ্ট রূপে মুদ্রিত হইয়াছে। অক্ষর খোদাইকার বা লেখকের ভ্রম প্রচুর পরিমাণেই পরিলক্ষিত হয় এবং তদ্দরুন পরিশুদ্ধ পাঠ উদ্ধার কার্য্য ও বিষম কষ্টকর ব্যাপারে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

এই অনুশাসনে চন্দ্ররাজ বংশোদ্ভব-শ্রীচন্দ্রদেবের রাজত্বের উল্লেখ আছে। উত্তর বঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে বর্ম্ম ও সেন রাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে ইহারা পূর্ব্ববঙ্গে কতিপয় শতাব্দী পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহা দশম একাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালা অক্ষরে খোদিত। কেবল মুদ্রাকরের ভ্রমাত্মক অংশ ব্যতীত সমুদয় উৎকীর্ণ বিবরণটী বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় ও পদ্যে লিখিত। শেষ তিন পংক্তি গদ্যে লিখিত।

বর্ণাশুদ্ধি বিদ্যা সম্বন্ধে ইহাতে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই নাই। পূর্ব্ব ভারতীয় গৃহগাত্রোৎকীর্ণ লিপিতে "র" এর পরিবর্ত্তে "ব" লেখাই একরূপ রীতি ছিল এবং আধুনিক বাঙ্গালা ভাষার ন্যায় এতদুভয়ের ব্যবহারে তখন কোনও বৈষম্য—করা হইত না। "অবগ্রহ" কখনও ব্যবহৃত কখন বা পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনুস্বার সম্বলিত "নিস্ত্রিংশ" শব্দের বর্ণবিন্যাস উল্লেখযোগ্য। (রেফ্) অধিকাংশ স্থলেই ব্যঞ্জন বর্ণকে দ্বিত্ব করিয়াছে।

"ঢাকা রিভিউ"তে প্রকাশিত ইদিলপুরের শ্রীচন্দ্র দেবের তাম্রশাসনের সহিত বর্ত্তমান তাম্রশাসনের তুলনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, উভয় তাম্রফলক একই মুসাবিদার প্রতিলিপি। ইদিলপুর তাম্রশাসনের শেষভাগে শ্রীচন্দ্রের রামপাল তাম্রশাসন হইতে গৃহীত একটি শ্লোক অতিরিক্ত সন্নিবেশিত হইয়াছে, এতদ্ব্যতীত উহার প্রতিলিপি ইদিলপুর ও কেদারপুর তাম্রশাসন হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এস্থলে ইহা প্রণিধানযোগ্য যে, তিনখানি তাম্রশাসনেরই আবাহন শ্লোক অভেদাত্মক।

এ পর্য্যন্ত চন্দ্ররাজগণের যে তিনখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহার প্রত্যেক খানিই শ্রীচন্দ্রের নামাঙ্কিত, কাজেই মনে হয় তিনিই চন্দ্র বংশের একমাত্র প্রতাপশালী রাজা, যিনি তাম্রশাসন প্রদানের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ইতিহাস সঙ্কলনের নিমিত্ত যে সমস্ত অনুলিপি উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা একত্র সংগ্রহ করিবার অভিপ্রায়ে 'ঢাকা রিভিউ' পত্রিকায় প্রকাশিত বাবু গঙ্গামোহন লস্করের ইদিলপুর, অনুশাসনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে আবশ্যক অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি। তাম্রশাসনখানি এখনও বর্ত্তমান আছে বলিয়া শোনা যায়, কিন্তু উহা যাহাদের হেপাজতে আছে, তাহারা উহা অন্য কাহাকেও দেখাইতে অনিচ্ছুক।

"অনুশাসনে তিন জন রাজার নাম খোদিত আছে—(১) **সুবর্ণচন্দ্র**। (২) তাঁহার ছেলে **ত্রৈলোক্যচন্দ্র** (৩) ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র **(শ্রী) চন্দ্রদেব**। এই রাজাদের মধ্যে শেষোক্ত রাজা সতত **পদ্মাবতী ভুক্তির** অধীন কুমার তালিকা মণ্ডলে অবস্থিত লেলিয়া গ্রামে কতকগুলি জমি দানের আদেশ **বিক্রমপুর ছাউনি** হইতে প্রদান করেন। সতত পদ্মাবতীর আক্ষরিক অর্থ তীর সমাহিত পদ্মার ঘর এবং খুব সম্ভবতঃ পদ্মার তীরে অবস্থিত কোন ভুক্তির নাম ছিল। কোন কোন দানে গৃহীতার নাম এখনও পড়া যায় এবং আসরফ্ পুর অনুশাসনের ন্যায় পরিমাপ কাঠিকে দানের ভূমির দ্রোণ এবং পাটক নামে অভিহিত করা হইয়াছে। সার্ব্ব-ভৌমিকত্ব সূচক উপাধি, যথা পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক এবং মহারাজাধিরাজ (শ্রী) চন্দ্রদেবের নামের সহিত সংযোজিত হইয়াছে। পরম সৌগত (সৌগত-বুদ্ধের পরম ভক্ত পূজক) উপাধি দাতার নামের পূর্ব্বে ব্যবহৃত হইয়াছে। ১২শ শতাব্দীর বাঙ্গলা অক্ষরের অনুরূপ লিপি সম্ভবতঃ ব্যবহৃত হইয়াছে। অনুশাসনের উর্দ্ধভাগের মোহর বঙ্গদেশের পালরাজাদের অনুশাসনের মোহরের অনুকৃতি।

মুসলমান কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ বিজিত হইবার কিছু পূর্ব্বে বৌদ্ধ রাজত্ব যে পূর্ব্ববঙ্গে বর্ত্তমান ছিল, আসরফ্ পুরের দেবখড়্গ অনুশাসনের ন্যায় বর্ত্তমান আলোচনার বিষয়ীভূত অনুশাসনখানি তাহার পরিচয় দেয়, তজ্জন্য এই অনুশাসনখানি অতি প্রয়োজনীয়।

অনুশাসনখানি এক দিকে সম্পূর্ণ ভাবে খোদিত বিপরীত দিকে কতকাংশ খোদিত। বিপরীত দিকের লেখা প্রায় মুছিয়া গিয়াছে। লুপ্তপ্রায় অংশে দান-গৃহীতার নাম ও জমির পরিচয়। সর্ব্ব সাকুল্যে ৩৬ লাইন লেখা ইহাতে আছে।

পংক্তি ১-৪ সম্ভবতঃ বুদ্ধের সম্মানের জন্য এক পংক্তি পদ্য। পংক্তি ৪-৫ সুবর্ণচন্দ্র নামে এক রাজা যাঁহাকে অগ্নি দ্বারা পবিত্রীকৃত কিংবা তুলাদণ্ডে ওজন করা হয় নাই, যিনি প্রকৃতি কর্ত্তৃক মহত্ব দ্বারা ভূষিত হইয়াছিলেন, যাঁহার কার্য্য সকল সাধু ছিল বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পংক্তি ৫-৬ রাজাকে কেন সুবর্ণচন্দ্র বলা হইত, ইহা পদ্যে বলা হইয়াছে।

পংক্তি ৬-৯ উপরিলিখিত রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন, তিনি পবিত্র দর্শন ছিলেন—তাঁহার পরলোকের ভয় ছিল। তিনি জীব-জগতের সান্ত্বনা-স্বরূপ ছিলেন। ত্রিভুবনে তাঁহার যশস্বী কার্য্যাবলী সকল সর্ব্বত্র বিদিত ছিল।

পংক্তি ৯-১০ সেই রাজা সম্বন্ধে আরও কতকগুলি শব্দ—তিনি সমস্ত পৃথিবী জয় করিয়া আশা পূরণ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার শত্রুদের অগ্নি নির্ব্বাপণ করিয়াছিলেন। পংক্তি—১১-১৩ ত্রৈলোক্য দেব সম্বন্ধে আরও কতকগুলি প্রশংসাসূচক (শব্দ) বাক্য। পংক্তি ১৪-১৫ উপরি উল্লিখিত রাজার (শ্রী) চন্দ্র নামে এক

পুত্র ছিল। তিনি ইন্দ্রের সমতুল্য ছিলেন এবং তাঁহার বীর্য্য ইন্দ্রের ন্যায় ছিল এবং তিনি শুভ মুহূর্ত্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার জন্ম সময়ে শুভ-চিহ্নসকল রাজৈশ্বর্য্য দ্যোতক ছিল।

পংক্তি ১৫-১৮ (শ্রী) চন্দ্রদেব সম্বন্ধে কতকগুলি প্রশংসা বাক্য।

পংক্তি ১৮-১৯ **বিক্রমপুরস্থিত** বিজয়-বাহিনী ছাউনী হইবে।

পংক্তি ২০ সৌগতের (বুদ্ধের) ঐকান্তিক পূজক পরম ভট্টারক পরমেশ্বর মহারাজাধিরাজ ত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবের পাদপদ্ম ধ্যানকারী পুত্র।

পংক্তি ২১ মহারাজাধিরাজ শ্রীমান শ্রীচন্দ্রদেব সুস্থ শরীরে লেলিয়া গ্রামে সমবেত নিম্নলিখিত রাজকীয় কর্ম্মচারীবৃন্দকে ও গ্রামবাসীদিগকে সম্মান করিয়া—

পংক্তি ২২ সতত পদ্মাভুক্তিতে অবস্থিত কুমার তালিকা মণ্ডলে

পংক্তি ২২ এইরূপে উপরি উল্লিখিত কর্ম্মচারীবৃন্দকে আদেশ দিতেছেন।

পংক্তি ২৯ - ৩০ দান গৃহীতাদের নাম লেখা আছে।

বর্ত্তমান কেদারপুর অনুশাসনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় এই :——বৌদ্ধমতাবলম্বীদের ত্রিরত্ন বুদ্ধ, ধর্ম্ম, সঙ্ঘ অভিবাদন প্রণাম (নমস্কার) করিয়া অনুশাসন খানি আরম্ভ হইয়াছে। ইহার পর বর্ণিত হইয়াছে পূর্ণচন্দ্র নামে একজন লোক ছিলেন—তাঁহার বহু সৈন্য-সামন্ত ছিল। তিনি রাজবংশ-সম্ভূত ছিলেন না কিন্তু কোন উচ্চ বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু সুবর্ণচন্দ্র (স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল) পবিত্র নামে এক পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। সুবর্ণচন্দ্র ধার্ম্মিক লোক বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। এবং তাঁহার পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র ছিল। ত্রৈলোক্যের দেশ জয় বহুদূর বিস্তৃত ছিল এবং তিনি তাঁহার শত্রুগণের ভীতি উৎপাদক ছিলেন। ত্রৈলোক্যের পুত্র শ্রীচন্দ্র—তিনি অত্যন্ত ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ বিজয়ী ছিলেন—তাঁহার যুদ্ধ-খ্যাতি স্বর্গে পৌছিয়াছিল। এই শেষ রাজা শ্রীচন্দ্রদেব—যাঁহার **শ্রীবিক্রমপুরের বিজয় ছাউনি হইতে এই অনুশাসনখানি প্রদান করিবার কথা ছিল**———এই পর্য্যন্ত আসিয়া অনুশাসন লিপি সমাপ্ত হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রদেবের এই তাম্রশাসনখানির বিষয়ে ডাক্তার; ভট্টশালী মহাশয় তাম্রলিপির চিত্র ব্যতীত একটী প্রবন্ধও Epigraphia Indica. Vol XVIII P. P. 188-92তে প্রকাশ করেন। স্বর্গত ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ননীগোপাল মজুমদার এম, এ মহাশয় তৎসম্পাদিত Inscriptions of Bengal. Vol IIIএর ১০-১৩ পৃষ্ঠায়ও এই লিপিখানির প্রতিলিপি ও পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি ডাক্তার ভট্টশালী মহাশয়ের লিখিত মন্তব্য "এই তাম্রশাসনখানি অসমাপ্ত এবং দেখিয়া বোধহয় ইহার দ্বারা কোনও 'দান'

সম্পাদিত হয় নাই—ইহাতে কেবল দানের মঞ্জুরীকৃত অংশগুলি খোদিত হইয়া বক্রী অংশ অবস্থানুযায়ী অনুশাসন দ্বারা পূর্ণ করিবার অপেক্ষায় মুদ্রাগৃহে সংরক্ষিত হইয়াছিল।” সম্বন্ধে বলেন :—

“Mr Bhattasali thinks that it is no grant at all, but only a plate kept ready, with the stereo-typed portion of the grant inscribed in the office of issue to be filled in with the necessary remaining portions as occasion arose (Loc. cit. p.188)- How far this view is tenable it is not possible to say. But other explanations such as the collapse of the power of the Chandras under Sricnandra or the death of the donce, just when the plate was being engraved, may not be altogether unworthy of Consideration.”

তাম্রশাসনখানির পাঠ সম্পর্কে ও ডা: ভট্টশালী মহাশয়ের পাঠের সহিত অন্ত পাঠের কিছু পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়। ভট্টশালী মহাশয় প্রথমে আরম্ভ করিয়াছেন—সিদ্ধিরস্তস্বস্তি, মজুমদার মহাশয় পাঠ করিয়াছেন—ওঁ স্বস্তি। মূল লিপি দৃষ্টে মজুমদার মহাশয়ের পাঠই বিশুদ্ধ বলিয়া মনে হয়। আমরা নিম্নে শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুর গ্রামে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের যে-পাঠ উদ্ধৃত করিলাম, তাহাতে ডা: ভট্টশালী মহাশয়ের পাঠ এবং ননীবাবুর পাঠ মিলাইয়া প্রকাশিত হইল।

প্রশস্তি-পাঠ

শ্রীচন্দ্রদেবের কেদারপুর তাম্রশাসন

১। ওঁ স্বস্তি। বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্ করুণৈকপাত্রং।

২। ধর্ম্মোচ্যসৈ বিজয়তে জগদেকদীপঃ যৎসেবয়া।

৩। সকল এব মহানুভাবঃ সংসারপারমুপগচ্ছতি ভিক্ষুসঙ্ঘঃ॥ পূর্ণ

৪। চন্দ্র ইতি শ্রীমানাসীন্নাসীরজং রজঃ। যস্মো যবমাত পত্র মপত্র য়োষৎ বৃ-

৫। পাঃ॥ নাগ্নৌ বিশুদ্ধো ন তুলাধিরূঢ়ঃ কিন্তু প্রকৃত্যৈব যুতো গরিম্ণা। তথাপি ক-

৬। ল্যাণ সুবর্ণকল্পঃ সুবর্ণচন্দ্রস্মকৃতী ততোভূত্॥ পুণ্যাবলোকঃ পরলো-

৭। কণ্ডীরোলো্ক্যঃ সমাশ্বাসিত জীবলোকঃ ত্রৈলোক্যসংকীর্ত্তিত পুণ্যকীর্ত্তে

৮। লোক্যচন্দ্রোহস্ত [র] ভুব পুত্রঃ। চতুঃপয়োরাশিসমাপ্ত পৃথ্বীজয়া ভিলাষী বি-

৯। ষয়েষলুব্ধঃ যুদ্ধেষু নিস্ত্রিংশলতাজলেন যো বৈরিবহ্নি সময়াঞ্চকার।

১০। শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেবঃ সমজনি তনয়স্তস্য মদ্বর্ম্ম ব (র) ন্ধ্যোঃ ক্রুরারম্বে (দ) য়ালুঃ

১১। পরগুণমুখরো দোষবাদৈকমূকঃ প্রেক্ষ্যঃ পীনো গুণানাং নিধিরিতি

১২। বিষয়াসক্তিপঙ্কাদ্বিপক্ষে যস্মিমা (ন্না) ধত্ত বেধা (ঃ) শ্রিয়মতিরভসা দর্থ তো না-

১৩। মতশ্চ। স্পৃষ্টঃ পার্থিবপাংসুদোহরসশ্লঘাঘনগ্ গজৈ নেত্রাণা-মণিমে-

১৪। ষতঃ পরিহৃতো দূরেণ বৃন্দারকৈঃ কেশেষম্পরসামপূর্ব্বপলিতভ্রাস্তং

১৫। সমারোপয়ন্ সন্তানো রজসাং রণেস্থ্যু জয়িনো যস্য ত্র্যমাগর্গৎ গতঃ।

১৬। স খলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাত্ পরমসৌগতো

১৭। মহারাজাধিরাজঃ শ্রীত্রৈলোক্যচন্দ্রদেবপদানুধ্যাতঃ পরমেশ্বরঃ প-

১৮। রমভট্টারকো মহারাজাধিরাজঃ শ্রীমান্ শ্রীচন্দ্রদেবঃ কুশলী।

অনুবাদ

১। সিদ্ধি লাভ হউক। মঙ্গল হউক ;

করুণার একমাত্র পাত্র, ভগবান্ জিন বন্দ্যনীয়। জগতে একমাত্র আলোক ধর্ম্মেরই জয় হয়। ইহাদের উপাসনা করিয়া উদারচেতা ভিক্ষু সঙ্ঘ পরপারে চলিয়া যান।

২। ভাগ্যদেবীর বরপুত্র পূর্ণচন্দ্র নামে এক ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহার যুদ্ধ বাহিনী উত্থিত ধূলিকণায় চন্দ্রাতপের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই পূর্ণচন্দ্রকে সূর্য্যদেবের পত্নী সাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন।

৩। (সুবর্ণ ও রাজার ন্যায়) অগ্নিদ্বারা শুদ্ধিকৃত অথবা তুলাদণ্ডে তৌলিত না হইয়াও প্রকৃতি দত্ত মহত্ত্ব থাকায় তাঁহা হইতে সুবর্ণ-দীপ্তি-বিশিষ্ট সুবর্ণচন্দ্রের উদ্ভব হইল।

৪। পরলোক-পাপভীত, ত্রিভুবনবিদিত যশস্বী সুবর্ণচন্দ্রের পুণ্যদর্শন, সুশ্রী ও মানব জাতির সান্ত্বনাদায়ক ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে এক পুত্র ছিল।

৫। বিষয়ে অনাসক্ত হইলেও চতুঃসাগর বেষ্টিত এই পৃথিবী জয়াভিলাষী হইয়া তিনি জলদ্বারা অগ্নিনির্ব্বাপণের ন্যায় যুদ্ধে তরবারীদ্বারা শত্রু নিপাত করিয়াছিলেন।

৬। সাধুজনের বন্ধু এই ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীচন্দ্রদেব নামে মহা সৌভাগ্যশালী এক পুত্র জন্মিয়াছিল। তিনি সকলের প্রতি এমন কি ক্রূরকর্ম্মাদের প্রতি ও দয়ালু, পরগুণ

কীর্ত্তনকারী, পরের দোষ সম্পর্কে সম্পূর্ণ নির্ব্বাক ছিলেন। তাঁহার প্রিয়দর্শন সুগঠিত দেহ সর্ব্বগুণের আধার ছিল। জাগতিক সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত ইঁহাকে সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ নামেও কার্য্যতঃ "শ্রী" অর্থাৎ লক্ষ্মীযুক্ত করিয়াছিলেন।

৭। সমরজয়ী সেই নৃপতি যে ধূলিরাশি উত্থিত করিয়াছেন, দিঙ্‌নাগগণ সেই ধূলিপটলের সংস্পর্শ লাভ জনিত গর্ব্ব অনুভব করিতে অভিলাষী হইয়াছিলেন। দেবতাগণ দূর হইতেই সেই পাংশুজাল পরিহার করিয়াছিলেন,—কেন-না, তাঁহাদের লোচন নিমেষ শূন্য (সুতরাং তাঁহারা লোচন নিমীলিত করিতে অসমর্থ)। সেই রজোরাশি আকাশ মার্গে উত্থিত হইয়া অপ্সরোগণের কেশে সংলগ্ন হইয়াছিল এবং বার্দ্ধক্যবশতঃ তাঁহাদের কেশ শুভ্রবর্ণ হইয়াছে, এই অপূর্ব্ব ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়াছিল।

১৬-১৮পংক্তি :—পরম সৌগত (সৌগত—সুগতের উপাসক, বৌদ্ধ) মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর, পরমভট্টারক (প্রজাগণের রক্ষাকর্ত্তা), শ্রীমান্, কুশলী চন্দ্রদেব শ্রীত্রৈলোক্য-চন্দ্র দেবের পাদপদ্ম ধ্যান করিয়া থ'কেন। তাঁহার সমৃদ্ধিশালী (শ্রীমৎ) **রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর হইতে**—[Now from the illustrious 'camp of victory' situated in *Vikrampura*, the devout worshipper of Sugata (i. e. Buddha) the *Paramesvara*, *Paramabhattarak*, Maharajadhiraja the illustrious *Srichandradeva*, meditating on the feet of the *Maharajadhiraja* Trailokyachandra deva being in good health]

আমরা বিক্রমপুরের এই স্বাধীন বৌদ্ধ নৃপতিগণের যে বংশাবলী তাঁহাদের লিপি হইতে জানিতে পারিতেছি তাহা এইরূপ :—

আমরা ইদিলপুর, রামপাল এবং কেদারপুর-লিপি হইতে সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারিতেছি যে, বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল এবং তিনি **বঙ্গপতি** ছিলেন। **বিক্রমপুরে দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ পর্য্যন্ত চন্দ্রবংশীয়েরা রাজত্ব করিতেন।** বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্যযুগে বৌদ্ধনরপতি ছিলেন।

এখন আমাদিগকে দেখিতে হইবে যে, কি ভাবে কেমন করিয়া কোন্ অবস্থায়, ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপের রাজা হইয়াছিলেন এবং তাঁহার পুত্র চন্দ্রই বা কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনা-চক্রের আবর্ত্তে পড়িয়া বিক্রমপুর রাজধানী হইতে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতে আরম্ভ করেন। এ বিষয়ে নানারূপ মতভেদ দৃষ্ট হয়। এ সম্বন্ধে আনুমানিক সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য কোনরূপ কারণ নির্দ্দেশ করিবার সম্ভাবনা অতি অল্প। তখন বাঙ্গলার অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহারই আলোচনা করিয়া আমরা কোনও একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার চেষ্টা করিতেছি।

বিক্রমপুর রাজধানী ও চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ

স্বর্গত ঐতিহাসিক প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহোদয় রামপালের তাম্রশাসন হইতে এবং ময়নামতীর ও গোপীচাঁদের গানের পুথি হইতে চন্দ্রবংশের নিম্নলিখিতরূপ বংশতালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন :—

নগেন্দ্র বাবু এই বংশলতা হইতে শ্রীচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্রকে এক বংশোদ্ভব মনে করেন। তাঁহার মতে :—"যদি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ডাক নাম ধাড়িচন্দ্র হয়, তাহা হইলে শ্রীচন্দ্রকে সম্পর্কে গোবিন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠতাত বা খুল্লতাত বলিয়া ধরা যায়। কিন্তু উত্তরবঙ্গে ও দক্ষিণভারতে প্রচলিত ময়নামতীর গানে গোবিন্দচন্দ্রের মাতা ময়নামতীর রাজা ত্রৈলোক্যচন্দ্রের বা তিলকচাঁদের কন্যা বলিয়াই পরিচিতা হইয়াছেন। উভয় ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে যদি অভিন্ন বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে ত্রৈলোক্যচন্দ্র মাণিকচন্দ্রের পিতা না হইয়া শ্বশুর হইয়া পড়েন।" [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড, পৃঃ ২৬১] গোবিন্দচন্দ্র গীতে লিখিত আছে :

"সুবর্ণচন্দ্র মহারাজা ধাড়িচন্দ্র পিতা।
তার পুত্র মাণিকচন্দ্র শুন তার কথা।"

"বৃহৎ বঙ্গ" প্রণেতা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে এই চন্দ্র রাজবংশীয়দের বিষয়ে লিখিয়াছেন : বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশ। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ পূর্ণচন্দ্র আধুনিক রোটাস্-নগরের রাজা ছিলেন। তৎপরবর্ত্তী রাজা সুবর্ণচন্দ্র বিক্রমপুর অঞ্চলের রাজা হন। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র ত্রৈলোক্যচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গের অনেক স্থলের অধিপতি হইয়াছিলেন। ইঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র তৎপরে সিংহাসন অধিকার করেন। এই সময়ে তিনি মিহিরকুলের [ত্রিপুরা] রাজা তিলকচন্দ্রের কন্যা ময়নামতীর পাণিগ্রহণ করিয়া ত্রিপুরদেশের এক বিস্তৃত অংশের অধিকারী হন। তাঁহার রাজধানী ছিল পটিজায়,—আধুনিক পাটিকারতে। এখনও তথায় মাণিকচন্দ্রের রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। মাণিকচন্দ্রের পত্নী ময়নামতী পরম সুন্দরী ও গুণবতী ছিলেন। মাণিকচন্দ্রের মৃত্যুর পর তৎপুত্র গোবিন্দচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন। অনেকে এই গোপীচন্দ্র বা গোবিন্দচন্দ্রকে রাজেন্দ্র সেনের শিলালিপির বঙ্গাধিপ বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।"

স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ও ডাক্তার দীনেশচন্দ্র সেন প্রভৃতি ময়নামতীর বা গোপীচাঁদের গানের উল্লিখিত রাজগণের সহিত বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয়গণের ঐক্যতা সম্পাদনের অনুরাগী। তবে সেন মহাশয় এ বিষয় আলোচনা করিতে যাইয়া ইহাও লিখিয়াছেন যে "আমি কতকগুলি কিংবদন্তীর উল্লেখ করিয়াছি, কিন্তু আমার মনে এখনও সে সম্বন্ধে ভালরূপ সমাধান হয় নাই। ১। গোরক্ষনাথ ও গোবিন্দচন্দ্রের সময়। ২। গোপীচন্দ্রের (গোবিন্দচন্দ্রের) সম্বন্ধ এবং তাঁহাদের কাল। ৩। গোবিন্দচন্দ্র এবং রাজেন্দ্রচোলের সময়ের গোবিন্দচন্দ্র এক ব্যক্তি কি না?" আমরা এ বিষয়ে একমত নহি। রাখালবাবুর কথায় বলা যাইতে পারে:—"বিজ্ঞান সম্মত প্রণালী অনুসারে চন্দ্রবংশের সহিত ময়নামতীর বা গোপীচাঁদের গানে উল্লিখিত রাজগণের কোন সম্পর্কই এখন পর্যান্তও স্বীকার করা যাইতে পারে না।" আমরাও এই মতের পরিপোষক।

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন সম্পর্কে ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক বলেন—"শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন হইতে আমরা কি কি ঐতিহাসিক তথ্য প্রাপ্ত হইতে পারি, তাহা কিঞ্চিৎ বিচার আবশ্যক। লিপি-প্রারম্ভে [প্রথম শ্লোকে] রাজ-কবি, বুদ্ধ-ধর্ম্ম-সঙ্ঘ-এই "ত্রিরত্নের"—উল্লেখ করিয়া, রাজবংশের বৌদ্ধ মতানুরক্তির পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, বংশ-বিবৃতি-বিজ্ঞাপক দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে চন্দ্র বংশে **পূর্ণচন্দ্র নামক** কোনও সুপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া, পৃথিবীতে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। চন্দ্র বংশে জন্ম বলিয়া, এই অভিনব রাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় ছিলেন,—এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।"

পূর্ণচন্দ্র কোনও স্থানের রাজা ছিলেন বলিয়া উল্লেখ নাই তিনি একজন বীর মাত্র ছিলেন। ইহাই দ্বিতীয় শ্লোকের আভাস। তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোকে পূর্ণচন্দ্রের পুত্র সুবর্ণচন্দ্রের উৎপত্তি ও নামকরণ কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। পঞ্চম শ্লোকে কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে। সুবর্ণচন্দ্রের পুত্র অশেষ-গুণ-বিভূষিত বলিয়া ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন। তিনি 'হরিকেল' রাজলক্ষ্মীর আধার রূপে চন্দ্রদ্বীপে 'নৃপতি হইয়াছিলেন। এই 'হরিকেল' শব্দটি বঙ্গ-দেশেরই নামান্তর। "বঙ্গাস্তু হরিকেলীয়া"—হেমচন্দ্রেরই এই বাক্যই ইহার প্রমাণ। বর্ত্তমান খুলনা, বাখরগঞ্জ ও ফরিদপুরের অংশ বিশেষ লইয়াই সেকালের 'চন্দ্রদ্বীপ' দক্ষিণে সাগর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই স্থানই পরবর্ত্তী কালে [মোগল-সাম্রাজ্যে] বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপ নামেও কথিত হইয়াছিল। "দিগ্বিজয়-প্রকাশ-বিবৃতি" নামক গ্রন্থে বাক্‌লা-চন্দ্রদ্বীপের ভৌগোলিক বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। চন্দ্রদ্বীপের কুলীন কায়স্থ বলিয়া এক শ্রেণীর কায়স্থ এখনও কৌলীন্য-মর্য্যাদা লাভ করিতেছেন। ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্লোকে

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসনের ব্যাখ্যা-পরিচয়

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের শ্রীকাঞ্চনা নাম্নী পত্নীর গর্ভে রাজ-যোগ-মুহূর্ত্তে **শ্রীচন্দ্রের** জন্ম বৃত্তান্ত বিবৃত হইয়াছে মাত্র। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের ভার্য্যাকে রাজকবি 'প্রিয়া' মাত্র বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন, 'মহিষী' বলেন নাই। এই কারণে এবং ত্রৈলোক্যচন্দ্রের নৃপতি-মাত্র উপাধি-দর্শনে, মনে হয়,—তিনি কোনও প্রবল-পরাক্রমশালী রাজাধিরাজের সামন্ত শ্রেণী ভুক্ত হইয়া, 'নৃপতি' উপাধি লইয়াই চন্দ্রদ্বীপ শাসন করিতেছিলেন তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র ভবিষ্যতে 'রাজা' হইবেন, ইহাই জ্যোতিষিগণ তাঁহার জন্ম-সময়ে সূচিত করিয়াছিলেন, অষ্টম শ্লোকেও আমরা কিছু ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রাপ্ত হইতে পারি। এই শ্রীচন্দ্র সতত বিবুধ মণ্ডল পরিবেষ্টিত থাকিয়া, এবং দেশকে একচ্ছত্রাধিপত্যে বিভূষিত করিয়া, অরাতি-কুলকে কারা-নিবদ্ধ করিয়া, আত্মযশে দিক্‌মণ্ডল সৌরভ-যুক্ত করিয়াছিলেন। **বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরস্থিত** রাজধানী হইতে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছিলেন। সর্ব্ব বর্ণের উন্নতিতেই দেশের উন্নতি,—সে কালের রাজগণ ইহা বুঝিতেন, নচেৎ বৌদ্ধ নরপতি শ্রীচন্দ্র ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিবেন কেন? **বিক্রমপুরই শ্রীচন্দ্রের রাজধানী ছিল। ইহাতে তিনি বঙ্গপতি ছিলেন, এই কথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বিক্রমপুরে শ্রীচন্দ্রই মধ্য যুগের বৌদ্ধ নরপতি বলিয়া প্রতিভাত।** শ্রীচন্দ্রের পর তাঁহার বংশধর অন্য কেহ বঙ্গরাজ ছিলেন কিনা, তাহা বর্ত্তমান অবস্থায় [অন্য কোনও প্রমাণ না থাকায়] নিঃসন্দেহে বলা যায় না।

শ্রীচন্দ্রদেবের উদারতা ও মহত্ত্ব বিক্রমপুর রাজধানী

এখন জিজ্ঞাস্য—কোন্ সময়ে, ত্রৈলোক্যচন্দ্র চন্দ্রদ্বীপে 'নৃপতি' হইয়াছিলেন, এবং কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনা-চক্রে, তৎপুত্র শ্রীচন্দ্র বঙ্গে রাজ্য-স্থাপন করিয়া বিক্রমপুর হইতে শাসন-দণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন,—এবং কোন্ সময়ে, কিরূপ ঘটনা চক্রেই বা এই অভিনব চন্দ্র বংশীয় বৌদ্ধ নরপতির [বা নরপতিগণের] রাজ্য পতন সংঘটিত হইয়াছিল? এই প্রশ্ন ঐতিহাসিক সমস্যার আধার। লিপি কাল—বিচার ও সম-সাময়িক অন্যান্য ঘটনার সমালোচনা করিয়া এই সমস্যার যথাযোগ্য মীমাংসা করা যাইতে পারে না। অক্ষর হিসাবে এই লিপির স্থান দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে। এই শাসনের 'ত' 'ন' ও 'ম' বর্ম্ম বংশীয় ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব লিপি ও হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ভট্ট ভবদেবের প্রশস্তির 'ত' 'ন' ও 'ম' এর অনুরূপ। কিন্তু আলোচ্য শাসনে 'প' এবং 'থ' কিছু বেশী আধুনিক। 'র' বিজয়সেন দেবের দেবপাড়া লিপির অনুরূপ। বেলাব লিপিতে ও ভট্ট-ভবদেবের ভুবনেশ্বর প্রশস্তিতে অবগ্রহচিহ্ন :- আদৌ ব্যবহৃত হয় নাই। কিন্তু শ্রীচন্দ্রের শাসনে কোনও কোনও স্থানে অবগ্রহ চিহ্ন ব্যবহৃত হইয়াছে, কোনও কোনও স্থানে হয় নাই। এই সমস্ত কারণে, এই

শ্রীচন্দ্রদেবের রাজ্য কাল নির্ণয়

লিপির কাল যেন বর্ম্ম রাজগণের লিপিকালের অব্যবহিত পরে এবং সেনরাজগণের লিপি কালের পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে; অর্থাৎ সেনরাজ বিজয়সেনদেবের বিক্রমপুর অধিকারের পূর্ব্বে এবং বর্ম্মরাজ হরিবর্ম্মদেবের পুত্রের রাজ্য নাশের পরেই কোন সুযোগে চন্দ্রদ্বীপাধিপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক কিছুকালের জন্য এক অভিনব বৌদ্ধরাজ্য সংস্থাপিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, বিক্রমপুরে যে সমস্ত বৌদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা মধ্য যুগের এই কালেরই পরিচয় প্রদান করে। বেলাব লিপির সাহায্যে আমরা বিক্রমপুরে বর্ম্মরাজ গণের অভ্যুত্থানের কথা আলোচনা করিতে যাইয়া দেখিতে পাইয়াছি যে ভোজ বর্ম্মদেব এবং তৎপরবর্ত্তী বর্ম্মরাজগণ শেষ পাল রাজগণের সময়েই বিক্রমপুর হইতে বঙ্গ রাজ্য শাসন করিতেন। এদিকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামপালদেবের তনুত্যাগের পর তৎপুত্র * কুমারপাল দেব বরেন্দ্র ভূমিতে (রামাবতীর নগর হইতে) রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। কুমার-পালদেবের সময় হইতেই পাল সাম্রাজ্যের বন্ধন বিঘটিত হইয়া আসিতেছিল। কুমারপালদেবের প্রধান সহায় ছিলেন তাঁহার সচিব ও সেনাপতি বৈদ্যদেব। এই সময়ে রাজ্যে বিদ্রোহ উপস্থিত হইলে, বৈদ্যদেবই "অনুত্তর-বঙ্গে" অর্থাৎ দক্ষিণ বঙ্গে, নৌ-বল লইয়া বিদ্রোহ দমনে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই ঐতিহাসিক তথ্য আমরা তদীয় [কমৌলিতে প্রাপ্ত] তাম্রশাসনে উল্লিখিত দেখিতে পাই। বৈদ্যদেব কর্ত্তৃক এই দক্ষিণ-বঙ্গের বিদ্রোহ-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইলেই হয়ত পাল-রাজ সর্ব্ব-গুণ-বিমণ্ডিত বৌদ্ধ ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে উপযুক্ত পাত্র মনে করিয়া, চন্দ্রদ্বীপের সামন্ত-রূপে নিযুক্ত করিয়া 'নৃপতি' উপাধিতে বিভূষিত করিয়া থাকিবেন। এই বিদ্রোহ সময়েই হয়ত চন্দ্রদ্বীপ বঙ্গ-রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, এবং এই সময় হইতেই হয়ত বর্ম্মরাজগণের দুর্দ্দিন উপস্থিত হইয়া থাকিবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, রাজ কবি ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে 'হরিকেল' (বঙ্গ) রাজলক্ষ্মীর আধার বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সময়েই ভট্ট-ভব-দেব-মন্ত্র-নিয়ন্ত্রিত হরিবর্ম্মা-তদাত্মজ [অজ্ঞাত নামা রাজার] অধিকার হইতে বঙ্গ রাজ্যের অন্তর্গত চন্দ্রদ্বীপ হস্তচ্যুত হইয়াছে। তৎপর বৈদ্যদেব যেমন * তিনি সামন্ত রূপে চন্দ্রদ্বীপকে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইরূপে বোধহয়, পালরাজাগণের ও বর্ম্মরাজগণের দুর্ব্বলাবস্থা অবলোকন করিয়া, ত্রৈলোক্যচন্দ্র-পুত্র শ্রীচন্দ্রও বর্ম্ম বংশীয় শেষ নরপতিকে কোনও কারণে সিংহাসন ভ্রষ্ট করিয়া স্বয়ং 'পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক

বিক্রমপুরে বৌদ্ধ মূর্ত্তি

* গৌড় রাজমালা ৫২ ৫৩ পৃঃ

মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়া বঙ্গে সার্ব্বভৌম নরপতি সাজিয়া বসিয়াছিলেন অথবা, বর্ম্মরাজ্য অন্য কোনও কারণে উন্মূলিত হইলে, শ্রীচন্দ্রই বঙ্গে একচ্ছত্রাধিপত্য বিস্তৃত করিয়া, শত্রুকুলকে কারানিবদ্ধ করিয়া, বিক্রমপুর হইতে শাসন পরিচালনা করিয়াছিলেন। আলোচ্য শাসনের অষ্টম-শ্লোকে এইরূপ ঐতিহাসিক তথ্য ইঙ্গিতে সূচিত হইয়া থাকিবে।

শ্রীচন্দ্রদেব বঙ্গাধিপতি রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর

অপর দিকে এই সময়েই বিজয়সেন পাল সাম্রাজ্যের দুরবস্থা ও দুর্ব্বলতা দেখিয়া, বরেন্দ্রীতে রাজ্য পাতিবার উপক্রম করিতেছিলেন, এবং পরে সেই বিজয় সেন কর্তৃকই হয়ত বৌদ্ধ শ্রীচন্দ্রের সংস্থাপিত রাজ্যের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকিবে। বিজয়সেন যে বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে দানাদেশ করিয়াছিলেন, এই সংবাদ স্বর্গত ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ, মহাশয় এক প্রবন্ধে প্রকাশিত করিয়াছিলেন। লিপিখানি বিজয়সেন দেবের একত্রিংশদ্বর্ষীয় লিপি বলিয়া জানিতে পারা যাইতেছে।

সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, যখন বরেন্দ্রীতে কুমারপালদেব এবং বঙ্গে হরিবর্ম্মদেব ও তদীয় পুত্র সিংহাসনারূঢ় ছিলেন এবং বিজয়সেন গৌড়ে রাজ্যস্থাপনের সুযোগ অন্বেষণ করিতেছিলেন, এবং কুমারপালদেবের দক্ষিণ-বাহু-রূপী প্রধান সচিব বৈদ্যদেব তিগ্মদেবকে সিংহাসন-চ্যুত করিয়া কামরূপে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিয়াছিলেন, তখনই চন্দ্রদ্বীপ নৃপতি ত্রৈলোক্যচন্দ্রের পুত্র শ্রীচন্দ্র, বর্ম্ম রাজকে বিতাড়িত করিয়া, অথবা অন্য কারণে বর্ম্ম রাজ্যের নাশ ঘটিলে পর, বঙ্গে স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন পূর্ব্বক বিক্রমপুর রাজধানী হইতে দেশ শাসন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এই সিদ্ধান্ত সর্ব্বাংশে সমর্থিত হইবে কিনা, তাহা বলা যাইতে পারে না।"

আমরা ডাক্তার বসাক মহাশয়ের এই মত সমর্থন করি না। আমাদের মতে শ্রীচন্দ্ররাজগণের পরে বিক্রমপুরে বর্ম্মরাজবংশীয়দের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে বর্ম্মরাজগণের বিষয়ে আলোচনা করিতে যাইয়া বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছি। একথা সত্য যে শ্রীচন্দ্রদেবের যে তিন খানি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, উহাতে সন তারিখ না থাকিলেও তাম্রফলকের অক্ষর দেখিয়া বিশেষজ্ঞেরা প্রায় সকলেই উহার লিপিকাল দশম কি একাদশ শতাব্দীর লিপি বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন।

আমরা নানাদিক্ দিয়া এবং বিক্রমপুরের অসাধারণ বৌদ্ধ প্রভাব এবং অসংখ্য বৌদ্ধ দেব দেবীর মূর্ত্তি দেখিয়া ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাকের এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়াই মনে করি। অতি অল্প দিন হইল বিক্রমপুর মধ্যপাড়া গ্রামের একটি খাল খনন করিতে যাইয়া অবসর প্রাপ্ত এঞ্জিনিয়ার রায়সাহেব শ্রীযুক্ত রোহিণীকুমার সেন মহাশয় একটি

বুদ্ধ মূর্ত্তি—ভূমিস্পর্শ মুদ্রা

[বিক্রমপুর মধ্যপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত]

বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কার করিয়াছেন, ঐ মূর্ত্তিটির পাদ-পীঠে একাদশ বা দ্বাদশ শতাব্দীর দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত আছে "**দানপতি শ্রীনিরূপমস্ত**" কাজেই বৌদ্ধ নৃপতি শ্রীচন্দ্রদেবের সমকালে বিক্রমপুরে বিশেষ ভাবে বৌদ্ধ-প্রভাব বিদ্যমান ছিল এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা বুদ্ধমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া বিহার বা মন্দিরে বোধ হয় তাহার প্রতিষ্ঠাও করিতেন।

এখানে একটা কথা বিবেচনা করিতে হইবে, তাহা এই যে শ্রীচন্দ্রদেব বিক্রমপুর রাজধানী হইতে যে বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন, সেই বঙ্গরাজ্য কত দূর বিস্তৃত ছিল। তাহা জানিবার জন্য সকলের মনেই একটা কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। ডাঃ রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় সে কালের বঙ্গরাজ্য কিরূপ বিস্তৃত ছিল, তৎসম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন তাহা আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। এবং সেই সঙ্গে আমাদের মতবাদও আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীচন্দ্রের অধিকৃত বঙ্গরাজ্য

সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাক্তার হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরী ও চন্দ্র রাজগণের সময়ে বঙ্গরাজ্য কত দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল, তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান ও আলোচনা করিয়াছেন। আমরা ডাক্তার রায়-চৌধুরীর "বঙ্গ কোন্ দেশ" নামক সুলিখিত প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম। ইহা পুনরাবৃত্তি বিবেচিত হইলেও একটি অমীমাংসিত বিষয়ের আলোচনা ও মীমাংসার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় বোধেই উহা উল্লেখ করিলাম। ইহার দ্বারা পাঠকগণ সহজেই সে কালের **বিক্রমপুর বা স্বাধীন** বঙ্গরাজ্য সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা করিতে পারিবেন।

বঙ্গ কোন্ দেশ

প্রকৃত পক্ষে বঙ্গের পুরাতত্ত্ব আলোচনা করিতে হইলে বঙ্গ নামে কোন্ জনপদ বিশেষ ভাবে সূচিত হইত তাহা বুঝা :কর্ত্তব্য। শক্তি-সঙ্গম-তন্ত্রে লিখিত আছে—

রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্ম পুত্রান্তগঃ শিবে
বঙ্গদেশো ময়া প্রোক্তঃ সর্ব্বসিদ্ধি প্রদর্শকঃ। ১

অর্থাৎ সমুদ্র হইতে ব্রহ্মপুত্র নদ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডই বঙ্গ বলিয়া কথিত। এই শ্লোকে বঙ্গ ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্বভাগে কি পশ্চিমভাগে অবস্থিত তাহা ঠিক বুঝা গেল না। বাৎস্যায়নের কামসূত্রের টিকাকার যশোধর লিখিয়াছেন, "বঙ্গা লোহিত্যাৎ পূর্ব্বেণ" ?

অর্থাৎ বঙ্গদেশবাসীরা (লৌহিত্য বা ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব্বতীরবাসী। বর্ত্তমান কালেও ব্রহ্মপুত্র যমুনার পূর্ব্বকূলে অবস্থিত মৈমন্‌সিংহ, ঢাকা, শ্রীহট্ট. ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলের অধিবাসিগণই বিশেষ ভাবে "বাঙ্গাল" বলিয়া অভিহিত হন। যশোধর খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক। তাঁহার পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্রের পশ্চিমেও যে বঙ্গদেশ

বিস্তৃত ছিল সে বিষয়ে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাভারতে ভীমের দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে যে মধ্যম পাণ্ডব গিরিব্রজ, মোদাগিরি, পুণ্ড্র, কৌশিকী—কচ্ছ জয় করিয়া বঙ্গরাজকে আক্রমণ করিয়াছিলেন—"বঙ্গরাজ মুপাদ্রবৎ।" পরে তাম্রলিপ্ত কর্ব্বট, সুহ্ম, এবং সাগরতীরবর্ত্তী ম্লেচ্ছগণকে বশীভূত করিয়া লৌহিত্য তীরে উপনীত হন। তিনি লৌহিত্য অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্ব্বতীরবর্ত্তী ভূখণ্ডে গিয়াছিলেন তাহার কোনই প্রমাণ নাই। সুতরাং মহাভারত রচনার যুগে বঙ্গ যে লৌহিত্যের পশ্চিমে বিস্তৃত ছিল ইহা সুনিশ্চিত।"

"মহাভারত, রঘুবংশ, প্রজ্ঞাপনা এবং যশোধর-কৃত জয়মঙ্গলা প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠে স্পষ্টই মনে হয় যে "বঙ্গ" দুই অর্থে ব্যবহৃত হইত, একটী ব্যাপক, অপরটী সঙ্কীর্ণ। ব্যাপক অর্থে বঙ্গ বলিতে সময়ে সময়ে লৌহিত্যের পূর্ব্ব হইতে কপিশা পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড বুঝাইত। সঙ্কীর্ণ বঙ্গ মগধ, মোদাগিরি, পুণ্ড্র, তাম্রলিপ্ত, কর্ব্বট, সুহ্ম এমন কি সাগরানূপ হইতেও পৃথক বলিয়া মহাভারতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। **লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসনের 'বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে এবং যশোধরের টীকায় বঙ্গা লোহিত্যাৎ পূর্ব্বেণ' প্রভৃতি বাক্যে মনে হয় বিক্রমপুরও তৎসন্নিহিত ব্রহ্মপুত্রের পূর্ব্ব কূলস্থিতভূখণ্ডই** এই সঙ্কীর্ণ বঙ্গ। উত্তরকালে বঙ্গ যে সাগরানূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, "শক্তি সঙ্গমতন্ত্রই" তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরাহমিহির কর্তৃক রচিত বৃহৎসংহিতায় কূর্ম্মবিভাগ নামক চতুর্দ্দশ অধ্যায়েও সমুদ্রকূলবর্ত্তী "সমতট" ভূমি বঙ্গ হইতে পৃথক্ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে।"

"রাজেন্দ্র চোল দেবের তিরুমলয় লিপি ও চেদিপতি কর্ণদেবের গোহেরবালিপিতে "বঙ্গাল" নামক দেশের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই অভিনব নামটী কোন্ সময়ে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা বলা দুরূহ। প্রাচীন সাহিত্য, শিলালেখ বা তাম্রপট্টে "বঙ্গ" নামেরই ব্যবহার ও প্রসিদ্ধি দেখা যায়। অদ্যাবধি আবিষ্কৃত প্রমাণ দৃষ্টে মনে হয় যে, দক্ষিণাপথ ও তুরস্ক দেশাগত ভূপতিগণই মধ্যযুগে "বাঙ্গাল" বা বাঙ্গালা এই অভিনব নামের প্রয়োগ আরম্ভ করেন। (১) আইন-ই-আক্‌বরি প্রণেতা আবুলফজল লিখিয়াছেন যে বাঙ্গালা প্রাচীন বঙ্গের নামান্তর মাত্র। পুরাকালে এতদ্ অঞ্চলের রাজণ্যবর্গ সমগ্র প্রদেশে দশগজ

(১) শব্দকল্পদ্রুমে "বঙ্গ" শব্দ দ্রষ্টব্য।

(২) Kamasutra, Published by the Proprietor of the Chowkhamba Sanskrit Book Depot P 295.

(৩) Keith—Sanskrit literature P 459

(১) Ind Ant 1891, 375, J A S B 1908, 290.

উর্দ্ধ ও বিংশ গজ আয়ত এক একটী আল অর্থাৎ মৃত্তিকা স্তূপ প্রস্তুত করিয়া জলপ্লাবন নিবারণ করিতে চেষ্টা করিতেন। বঙ্গ+আল্ এই দুই শব্দের যোগে বাঙ্গাল শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।"

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কলচুর্য্য-বংশোদ্ভব বিজ্জলের অবলূর লিপিতে বঙ্গ ও বঙ্গাল পৃথক বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ১ অভিধান-চিন্তামণি-প্রণেতা জৈন হেমচন্দ্র লিখিয়াছেন —"বঙ্গাস্ত হরিকেলিয়া"। বঙ্গের সহিত অভিন্ন এই হরিকেল যে "বঙ্গাল" দেশ নহে, পরন্তু একটী স্বতন্ত্র ভূখণ্ড, ডাকার্ণব গ্রন্থে তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ২ অতএব আবুলফজলের গ্রন্থে বঙ্গ ও বঙ্গাল এক দেশেরই ভিন্ন নাম বলিয়া লিখিত হইলেও পূর্ব্বে যে ঐ দুই নামে দুইটী পৃথক দেশ সূচিত হইত, তাহা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। বঙ্গ বা হরিকেল হইতে স্বতন্ত্র "বঙ্গাল" বলিতে কোন্ রাজ্য বুঝাইত এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না—বঙ্গাল যে দক্ষিণ ও উত্তর রাঢ়া হইতে বিভিন্ন এবং চন্দ্রোপাধি বিশিষ্ট গোবিন্দ নামক নরপতির অধীন ছিল, তিরুমলয় লিপিই—তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অধ্যাপক ব্লকম্যান লিখিয়াছেন যে, সুলতান সুজার রাজত্বকালে রঙ্গপুর ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী ভূখণ্ড "বঙ্গাল ভূম" বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল কিন্তু Blaev, Sansson, Purchas প্রমুখ লেখকগণের মানচিত্র ও গ্রন্থে চট্টগ্রামের অভিমুখে অবস্থিত সাগরতীরবর্ত্তী ভূখণ্ডে Bengala নগরীর উল্লেখ দৃষ্ট হয়। ব্লকম্যান এই নগরীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন (১) কারণ ইবনবতুতা, সিজার ফ্রেডারিক, De Barros' প্রভৃতি পর্য্যটক ও লেখকগণ ইহার কথা লিখিয়া যান নাই। ১৫৬১ খৃষ্টাব্দে অঙ্কিত Gsataldiর মানচিত্রে কিন্তু Bengalaর স্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং সাগরানূপে সত্য সত্যই এই নামে একটী নগরী ছিল এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসঙ্গত নহে।"

আমি The 'Travels of Cornelius Le Bruyan নামক একজন ভ্রমণকারীর গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট Route Exacte De Gramron a Batavia Gramronএর মানচিত্রে বাঙ্গলা দেশের একটি নগরী "Bengale"র নাম দেখিতে পাই। উহার অবস্থান বঙ্গোপসাগরের উপকূলে নির্দ্দিষ্ট আছে। এই বইখানি মদীয় গ্রন্থাগারে সংগ্রহীত আছে। বইখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর [১৭০১ খৃঃ সঃ]। এই বইখানিতে ভারতের আরও মানচিত্র আছে।

১। অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় কর্ণ দেবের Gohaswa Plate এর প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। উক্ত লিপিতে কর্ণদেবের বৃদ্ধ প্রপিতামহ লক্ষ্মণরাজ "বঙ্গাল ভঙ্গ নিপুণ" বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছে। কিন্তু লক্ষ্মণ রাজ ও উত্তরাপথের রাজা ছিলেন।

১ Ep Ind, V 257 of Elliot, iii 295 (As if) ২ Majumdar Inscriptions of Bengal P61 ৩ J A S B, 1873, 233.

ডাক্তার রায় চৌধুরী বলেন :—

এই Bengala নগরীর চতুস্পার্শ্বস্থিত রাজ্যই কি চন্দ্রোপাধিক নরপতি-শাসিত বঙ্গালদেশ? শ্রীচন্দ্রের রামপাললিপি পাঠে কিন্তু তাহাই মনে হয়। উক্ত লিপিতে শ্রীচন্দ্রের পিতা ত্রৈলোক্যচন্দ্রকে চন্দ্রদ্বীপের নৃপতি এবং "হরিকেল রাজ ককুদচ্ছত্রস্মিতানাং শ্রিয়ামাধারঃ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। চন্দ্রদ্বীপ বলিতে সমুদ্রতীরবর্ত্তী বর্ত্তমান বরিশাল এবং তৎসন্নিহিত ভূখণ্ড বুঝাইত। ইহাই শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনে চন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের স্বরাজ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। হরিকেল অর্থাৎ বঙ্গ ইহা হইতে স্বতন্ত্র ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। চীন পরিব্রাজক ইৎসিং লিখিয়াছেন যে, হরিকেল ভারতের পূর্ব্ব সীমান্তে অবস্থিত। রাজশেখর রচিত কর্পূরমঞ্জরী নামক গ্রন্থে পূর্ব্ব দিগঙ্গনাগণের সম্পর্কে চম্পা, রাঢ়া, কামরূপ ও হরিকেলের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এই সকল উক্তির সহিত লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসন ও যশোধরের টিকা মিলাইয়া লইলে মনে হয় **যে বিক্রমপুর লৌহিত্যের পূর্ব্বতীরস্থ ভূখণ্ডই সপ্তম হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত "বঙ্গ" বা হরিকেল নামে প্রসিদ্ধ ছিল।** সাগর-তীরবর্ত্তী "সাগরানূপ" বা "সমতট" যে ইহার বহির্ভূত ছিল মহাভারত ও বৃহৎসংহিতা গ্রন্থে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। "চন্দ্রদ্বীপ" ও "বঙ্গাল" এই উভয় দেশই বঙ্গ বহির্ভূত সাগরানূপে অবস্থিত এবং চন্দ্রোপাধিক নৃপতি শাসিত। ইহাদের ভৌগোলিক অবস্থান এবং চন্দ্রবংশের সহিত সংযোগ বিচার করিলে এই দুই দেশ যে অভিন্ন বা পরস্পর সংসৃষ্ট ইহা অনুমান করা বোধহয় নিতান্ত অসঙ্গত হইবেনা।"

বিজ্জন বা বিজ্জল দেবের অবলুর লিপি হইতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, শ্রীচন্দ্রদেবের বিক্রমপুর-বিজয় সত্বেও খ্রীষ্টিয় দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত বঙ্গ এবং বাঙ্গলা সম্পূর্ণ ভাবে একীকৃত হয় নাই। "রাঢ়" ও "বরেন্দ্র" ও স্বতন্ত্রতা রক্ষা করিতেছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মুসলমান লেখকগণ "বঙ্গ" শব্দ সঙ্কীর্ণ অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। "তবকাৎইনাসিরি" গ্রন্থে বঙ্গ-স্পষ্টতঃ যাজনগর, কামরূপ, ও ত্রিহুতের ন্যায় লক্ষ্মণাবতী হইতে বিভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে কিন্তু রাল (রাঢ়) ও বরিন্দ (বরেন্দ) লক্ষ্মণাবতীর অন্তর্গত ছিল। ব্লকম্যান দেখাইয়াছেন যে তুঘলুক শাহের রাজত্ব কালেই ১৩২০ খৃঃ অব্দে) লক্ষ্মণাবতী, সপ্তগ্রাম ও সুবর্ণগ্রাম মিলিত হইয়া অখণ্ড বাঙ্গলাদেশ গঠিত হইয়াছে। জৈন প্রজ্ঞাপনায় এই মিলনের সূচনা দেখা যায়। বঙ্গপতি পালরাজগণ এবং প্রৌঢ়া রাঢ়ার অধীশ্বর সেন-নৃপতিবৃন্দ রাঢ়, গৌড়, বরেন্দ্র ও বঙ্গে একচ্ছত্র রাজ্য স্থাপন করিয়া ভাবী মিলনের পথ আরও সুগম করিয়া দিয়াছিলেন। মুসলমানগণ-কর্ত্তৃক লক্ষ্মণাবতী জয়ের ফলে এই মিলন সুদৃঢ় হইতে পারে নাই। কিন্তু তুঘ্‌লুক্‌সাহ পুনরায় একচ্ছত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়া স্থায়ী ঐক্য বিধান করেন। পরবর্ত্তীকালে বঙ্গভঙ্গের সকল চেষ্টাই ব্যর্থ হইয়াছে।

সম্রাট আকবরের সময়ে সুবা বাঙ্গলা সুরমা-তীরবর্ত্তী-শ্রীহট্ট হইতে কৌশিকী-ধৌত পূর্ণিয়া ও গঙ্গার দক্ষিণস্থিত Kankjol (কাঁকজল) পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেদিনীপুর, হিজলী, চট্টগ্রাম এবং কোচবিহার তখনও এই প্রদেশের অন্তর্ভূত হয় নাই। মেদিনীপুর ও হিজলী উড়িষ্যার এবং চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। কোচবিহার সীমান্তবর্ত্তী স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইত। সম্রাট শাহজাহান ও ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকালে ক্রমে ক্রমে এই সকল ভূখণ্ড বাঙ্গালার অন্তর্নিবিষ্ট হয়। প্রত্যেক শ্বেতদ্বীপের মহামাত্রগণ বাঙ্গালার উত্তর সীমা হিমবন্ত প্রদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত করিয়াছেন বটে, কিন্তু লৌহিত্য ও কৌশিকীর পূর্ব্বতীরস্থিত শ্রীহট্ট, পূর্ণিয়া প্রভৃতি কতকগুলি দেশ বাঙ্গলা হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ইহাকে সুবা বাঙ্গালা অপেক্ষা হ্রস্বায়ত করিয়াছেন।"

চন্দ্ররাজগণের তাম্রশাসন হইতে আমরা স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য বলিতে যে বঙ্গ রাজ্য এবং রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরের পরিচয় পাইতেছি, তাহা হইতে সেকালের **শ্রীবিক্রমপুর** রাজধানী ও তাহা হইতে শাসিত বৃহৎ বঙ্গরাজ্যের যে পরিচয় পাইলাম, তাহা যে কত বড় গৌরব-ব্যঞ্জক এবং বাঙ্গালী মাত্রেরই গৌরবের কারণ তাহা সকলেরই বোধগম্য।

চন্দ্ররাজগণের তাম্রশাসন তিনখানি আবিষ্কৃত হওয়ায় বিক্রমপুরের ইতিহাসের পৃষ্ঠা গৌরবোজ্জল হইয়াছে।

চন্দ্ররাজবংশীয়েরা বাঙ্গালার আদি অধিবাসী নহেন। শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে জানিতে পারিতেছি যে বিপুল লক্ষ্মীক, রোহিত...ভোগকারী, চন্দ্রদিগের বংশে, **পূর্ণচন্দ্র** সদৃশ পূর্ণচন্দ্র নামক [ব্যক্তি] পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়াছিলেন।" ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে চন্দ্রেরা পূর্ব্বে বিহারের অন্তর্গত সাহাবাদ জেলার রোটাস্‌গড়ে রাজত্ব করিতেন। তাঁহারা সম্ভবতঃ পাল নৃপতিগণের ক্ষমতা হ্রাস দেখিতে পাইয়া তাহাদের শক্তিহীনতার সুযোগ পাইয়া বঙ্গে [পূর্ব্ববঙ্গে] একটি রাজ্য সংস্থাপনের জন্য মনোযোগী হইয়াছিলেন। এবং [মাতৃ-পিতৃ] উভয়-কুল-পাবন, [সুবর্ণচন্দ্রের] পুত্র অপবাদ-ভীরু গুণাবলী চতুর্দ্দিকে অতিথিরূপে ভ্রমণ করিত বলিয়া, সেই পুত্র ত্রৈলোক্যে ত্রৈলোক্যচন্দ্র নামে বিদিত হইয়াছিলেন * * দিলীপোপম এই পুত্র চন্দ্রদ্বীপে 'নৃপতি হইয়াছিলেন। ত্রৈলোক্যচন্দ্রের মহারাজাধিরাজ উপাধি হইতে উপলব্ধি হয় যে ত্রৈলোক্যচন্দ্রই পূর্ব্ববঙ্গে চন্দ্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার রাজ্য হরিকেল—পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন নাম] এবং সমুদয় চন্দ্রদ্বীপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

চন্দ্র রাজাদের সম্বন্ধে অন্যান্য কথা

"The Chandras do not seem to have originally belonged to Bengal. In verse 2 it is stated that they were rulers of Rohitagiri, which is identifiable with Rohtasgudh in the Sahabad district of Bihar. They emigrated to Eastern Bengal, aud most probably taking advantage of the weakness of the declining Pala power carved out kingdom for themselves. Trailokya Chandra, to whom the title of Maharajadhiraj has been assigned, was very likely responsible for the rise of this new power in Eastern Bengal. His kingdom was Harikel i e Eastern Bengal, including Chand a-dvipa, which was the home territory of this dynasty. Inscription of Bengal N. G Mazumdar."

চন্দ্রদ্বীপ যে অতি প্রাচীন স্থান তাহা সহজেই সপ্রমাণ হয়। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়-স্থিত পুস্তাকাগারে "অষ্টসাহস্রিকা-প্রজ্ঞাপারমিতা" নামক একখানা প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথি আছে, ঐ গ্রন্থখানা ১০১৫ খ্রীষ্টাব্দে নকল হইয়াছিল বলিয়া পণ্ডিতগণ নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ গ্রন্থে চন্দ্রদ্বীপস্থ 'ভগবতী তারা' নামক এক দেবীর চিত্র আছে। ভগবতীতারাকে দেখিবার জন্য নানাস্থান হইতে যাত্রিগণ আসিতেন। অতএব দেখা যাইতেছে যে চন্দ্রদ্বীপ একাদশ শতাব্দীর পূর্ব্ব হইতেই প্রসিদ্ধ স্থান বলিয়া পরিচিত ছিল। খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীতে সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্র ব্যাকরণ রচয়িতা চন্দ্রদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তিব্বতের জ্ঞানভাণ্ডার টেঙ্গুর গ্রন্থে লিখিত আছে, বরেন্দ্রের ক্ষত্রিয় বংশে চন্দ্রগোমির জন্ম। আচার্য্য স্থিরমতির নিকট ইনি সূত্র ও অভিধর্ম্মপিটক অধ্যয়ন করেন এবং বিদ্যাধরাচার্য্য অশোকের নিকট বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত হন। তিনি অবলোকিতেশ্বর ও তারার বড় ভক্ত ছিলেন। * * চন্দ্রগোমীর নামানুসারে এই ভূ-ভাগ চন্দ্রদ্বীপ নামে পরিচিত হইয়াছিল। *

শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন খানি আবিষ্কৃত হইবার পূর্ব্বে চন্দ্রদ্বীপ সম্বন্ধে যে সকল আখ্যান প্রচলিত ছিল তাহা এখন অলীক বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

বিক্রমপুরে স্বাধীন বর্ম্ম রাজগণ—রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর

চন্দ্রবংশীয় রাজাদের কথা বলিয়াছি। এইবার বিক্রমপুরের বর্ম্ম রাজাদের কথা বলিতেছি। চন্দ্রবংশীয় ও বর্ম্মবংশীয় নৃপতিগণের মধ্যে কে পূর্ব্বে এবং কে পরে রাজধানী "শ্রীবিক্রমপুরে"র রাজধানী হইতে রাজত্ব করিয়াছিলেন সে বিষয় বিভিন্নরূপ মত চলিয়া আসিতেছে। কেহ কেহ বলেন—"সেনরাজ বিজয়সেনদেবের বিক্রমপুর অধিকারের পূর্ব্বে এবং বর্ম্মরাজ হরিবর্ম্মদেবের পুত্রের রাজ্য নাশের পরেই কোন সুযোগে শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুরে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন পূর্ব্বক বৌদ্ধ রাজ্য স্থাপন করেন।" আবার কেহ কেহ বলেন—"চন্দ্ররাজগণের শাসনপাট উন্মূলিত হইবার পরেই বর্ম্মরাজগণের অভ্যুদয় হইয়াছিল।"

বর্ম্ম রাজগণের কাল নির্দ্ধারণ

স্বর্গত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন :—"যে সময়ে বরেন্দ্রে বা গৌড়ে পালবংশ, বঙ্গে চন্দ্রবংশ ও রাঢ়ে শূরবংশ আধিপত্য করিতেছিল, সেই সময়েই প্রথিত বর্ম্ম বংশের অভ্যুদয় হয়।" প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক স্বর্গত বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন : 'আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিম সীমায় পঞ্চনদ প্রদেশের সিংহপুর নগর প্রাচীন যাদব জাতির পুরাতন রাজধানী। চীন দেশীয় ভ্রমণকারী ইউয়ান্-চোয়াং খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে সিংহপুর রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন।

"হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে লক্ষামণ্ডল নামক স্থানে প্রাপ্ত এক খানি শিলালিপি হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বর্ম্মবংশীয় দ্বাদশ জন রাজা খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। মহারাজাধিরাজ ধর্ম্মপালদেব চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের

চন্দ্রদ্বীপ রাজবংশ -শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত। নারায়ণ—প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম সংখ্যা। ১১৮৮—১১৯৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। J. A. S. B. 1874, History of Bakarganj Beveridge, ফরিদপুরের ইতিহাস-আনন্দনাথ রায় প্রণীত। স্বর্গত ব্রজসুন্দর মিত্র মহাশয় লিখিত—রাজা দনুজমর্দ্দনের গুরু চন্দ্রশেখরের নামানুসারে চন্দ্রদ্বীপের নাম হইয়াছে ইহা কাহিনী মাত্র তাহা বোধ হয় এখন সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

Catalogue of the Buddhist Sanskrit Manuscripts in the University Library, Cambridge by Cecil Berdull M. A. P. 151. A. Foucher Page 192. * ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ২৪৭ পৃষ্ঠা। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-রাজন্যকাণ্ড ২১৮ পৃষ্ঠা।

সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত করণোদ্দেশ্যে বোধ হয়, এই সিংহপুরের যাদবরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। রাজেন্দ্র চোল, দ্বিতীয় জয়সিংহ, অথবা গাঙ্গেয়দেবের সহিত এই যাদব-বংশজাত বজ্রবর্ম্মা নামক জনৈক সেনাপতি উত্তরাপথের পশ্চিমার্দ্ধ হইতে পূর্ব্বার্দ্ধে আসিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। ঢাকা জেলার বেলাব গ্রামে আবিষ্কৃত বজ্রবর্ম্মার তাম্রশাসন হইতে অবগত হওয়া যায় যে, যাদব-সেনার সমর বিজয়-যাত্রাকালে বজ্রবর্ম্মা মঙ্গল স্বরূপ গণ্য হইতেন। **বজ্রবর্ম্মার পূর্ব্বে বিক্রমপুরে চন্দ্রবংশীয় রাজগণের অধিকার ছিল।"**

বর্ম্মরাজবংশীয় নৃপতিরা বিক্রমপুরে বেশী দিন রাজত্ব করেন নাই। [The Varmans, who ruled over Vikrampura for only a short period came originally from sinhapur.]

শ্রীচন্দ্রদেবের পরে ভোজবর্ম্ম বিক্রমপুরে রাজত্ব করেন ইহাই তাম্রলিপি বিচারে অনুমিত হয়। *

ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি, ভবদেব ভট্টের কুল-প্রশস্তি, হরিবর্ম্মদেবের বেজনীসার তাম্রলেখ প্রভৃতি হইতে বঙ্গ রাজ্যের অধিপতি [বিক্রমপুর রাজধানী] বর্ম্ম বংশীয় রাজাদের পরিচয় পাওয়া যায়। বেজনীসার তাম্রলেখের প্রথমাংশ অগ্নিদাহে দগ্ধ হওয়ায় অক্ষর সমূহ অস্পষ্ট হওয়ায় তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণের পরিচয় জানিতে পারা যায় না। কিন্তু ঐ তাম্রশাসনে "সখলু শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহা রাজাধিরাজ" ইত্যাদি রহিয়াছে। কাজেই তাঁহারা যে 'শ্রীবিক্রমপুর" রাজধানী হইতেই বঙ্গদেশ শাসন করিতেন, তদ্বিষয় কোনরূপ দ্বিধা করিবার কারণ বিদ্যমান নাই।

বেলাব-লিপি

বেলাব-লিপি প্রাপ্তির ইতিহাস এইরূপ:—ঢাকা জেলার [ব্রহ্মপুত্রের পুরাতন খাতের ও শীতললক্ষার মধ্যবর্ত্তী] মহেশ্বরদি পরগণার অন্তঃপাতী "বেলাব" নামক

* (১) বাঙ্গলার ইতিহাস প্রথম ভাগ রাখালদাস বন্দোপাধ্যায়।

[About this time probably occurred a migration of people from West to East Benga', and in the Belava plate we find Jatavarma's grandson, Bhojavarma ruling at Vikrampur. He came there evidently after Srichandra, whose grants are also issued from Vikrampur. The Indian Historical Quarterly Vol VII, No. 3 September, 1931.]
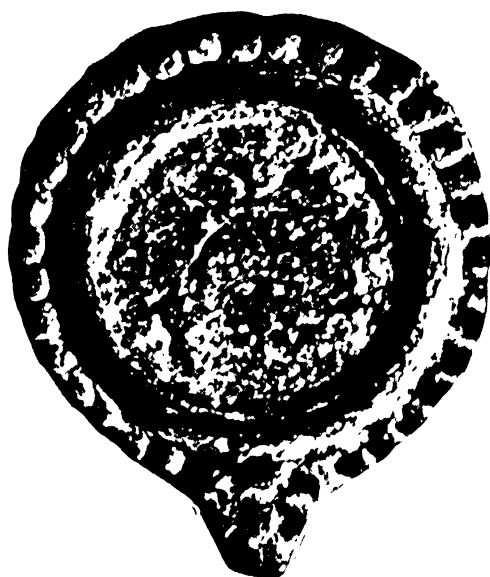
ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব-লিপির মুদ্রা

[রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে]

গ্রামের জনৈক মুসলমান গৃহস্থ নিজ কুটীরের নিকট গর্ত্ত খনন করিবার সময় [এপ্রিল ১৯১২ খ্রীঃ অঃ] এই তাম্রশাসন খানি প্রাপ্ত হয়। সে এই শাসন খানিকে আকাশ হইতে পতিত সুবর্ণ পাত্র মনে করিয়া ইহাকে গোপনে পরীক্ষা করিবার জন্য তাম্রফলকের শীর্ষ দেশস্থ রাজ মুদ্রাটি চাঁছিয়া ফেলিয়াছিল। সেটেলমেন্ট কার্য্যোপলক্ষে সাবডেপুটি কালেক্টর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ দত্ত বি এ, মহাশয় এই তাম্রশাসনের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া [১৯১২ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে] ইহা ২৲ টাকা মূল্যে ক্রয় করিয়া ঢাকা নগরীতে আনয়ন করিলে, এই তাম্রশাসনের কথা প্রকাশিত হয়। সে সময় ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় ঢাকা নগরীতে অবস্থান করিতেছিলেন। দত্ত মহাশয় পাঠোদ্ধারের জন্য এই তাম্রশাসনখানি বসাক মহাশয়ের পূর্ব্বতন ছাত্র শ্রীযুক্ত শ্যামলাসুন্দর করের ও শ্রীমান নিকুঞ্জবিহারী সেনের দ্বারা তাঁহার নিকট [২৪ শে জুন ১৯১২ খ্রীঃ অঃ] প্রেরণ করিয়াছিলেন।

ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি প্রশস্তি-পরিচয় ও আবিষ্কার কাহিনী

এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার ডাক্তার বসাক মহাশয় কর্ত্তৃকই প্রথম সম্পাদিত হয়। এই তাম্রপট্টখানির আয়তন ১০½ × ৯¾ ইঞ্চ। ইহাতে প্রথম পৃষ্ঠে ২৬ পংক্তি, এবং দ্বিতীয় পৃষ্ঠে ৩৫ পংক্তি সংস্কৃত-ভাষা নিবদ্ধ দানলিপি উৎকীর্ণ আছে। শিল্পীর নাম উল্লিখিত নাই। আরম্ভে "ওঁ সিদ্ধি" লিখিত আছে। তাহাতে বিসর্গ চিহ্নের অভাব। বংশ-বিবৃতি সূচক ১৩ টি শ্লোকের শেষে ২৪ পংক্তি হইতে ৪০ পংক্তি পর্য্যন্ত গদ্যাংশ এবং সর্ব্বশেষে একটি শ্লোক, তৎপরে লিপিকাল ও স্বাক্ষর উৎকীর্ণ আছে। অক্ষরগুলি একাদশ শতাব্দীর পুরাতন বঙ্গাক্ষর। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদারের মতে "The characters represent a type of Northern Nagari that was current in Eastern India about the 12 th century A. D. being somewhat more advanced than those of the Rampal copperplate of srichandra and akin to those of the inscriptions of the Senas. অর্থাৎ এই তাম্রফলকের অক্ষরগুলি পূর্ব্ব ভারতে প্রচলিত উত্তর নাগরীর অনুরূপ। এইরূপ অক্ষর দ্বাদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল। রামপাল লিপির অক্ষর হইতে ইহার অক্ষর অনেকটা উন্নত এবং সেনরাজাদের তাম্রশাসন লিপির অক্ষরের সাদৃশ্য ইহাতে অধিক। রাধাগোবিন্দ বাবুর মতে "অক্ষরগুলি একাদশ শতাব্দীর পুরাতন বঙ্গাক্ষর।"

লিপি-পরিচয়

"এই তাম্রশাসন উৎকীর্ণ করাইয়া [চন্দ্রবংশীয়] মহারাজাধিরাজ শ্রীসামলবর্ম্ম-দেবপাদানুধ্যাত-পরম - বৈষ্ণব - পরমেশ্বর - পরম - ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীমদ্ভোজ

[২৫ | ২৬ পংক্তি] তদীয় রাজ্য সংবতের পঞ্চম সংবৎসরে ১৯ শ্রাবণ দিনে [৪১ পংক্তি সাবর্ণ গোত্রীয় ভৃগু-চ্যবন-আপ্লুবৎ-ঔর্ব্ব-জমদগ্নি-প্রবরের ব্রাহ্মণবংশোদ্ভব পীতাম্বর-দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ দেবশর্ম্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মার পুত্র শ্রীরাম দেবশর্ম্মাকে [৪১-৪৪ পংক্তি] 'সপাদনবদ্রোণাধিকপাটক' পরিমিত ভূমি [২৮।২৯ পংক্তি] ভগবান বাসুদেব ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া মাতাপিতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির নিমিত্ত [৪৬ ৪৭ পংক্তি] দান করিয়াছিলেন।

এই তাম্রলিপিটি ঢাকা যাদুঘরে রক্ষিত আছে। "ঢাকারিভিউ ও সম্মিলন" পত্রিকায় [Dacca Review, vol.I I. No 4 July 1912] ও এই লিপির বিবরণ প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটীর নাম ছিল The Belabo Copper Plate of Bhojavarman. এই প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তদনীন্তন সেটেলমেণ্ট অফিসার মিঃ এফ, ডি আস্কলি [F. D. Ascoli] লিখিত একটি ভূমিকা লিপি [Prefatory note] ছিল। তাহাতে তিনি লিপিখানি কিরূপে আবিষ্কৃত হয় সে কথা বলিয়াছেন।

বাখরা-কাহিনী

অ্যাস্কলি সাহেব উহার আবিষ্কার কাহিনী বলিয়া লিপিখানির বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে বলিবার পর তিনি পাঠোদ্ধারকারী ঢাকা কলেজের অধ্যাপক স্বর্গত বিধুভূষণ গোস্বামী, অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র, ডাঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী এবং স্বর্গত কামিনীকুমার সেন মহাশয়গণকে পাঠোদ্ধার, অনুবাদ এবং ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

মিঃ অ্যাস্কলির ভূমিকালিপিতে সেকালের অর্থাৎ বর্ম্ম রাজাদের রাজত্বকালে বিক্রম-পুরের রাজ্যসীমা কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা উল্লেখযোগ্য।

এই তাম্রশাসন খানির আবিষ্কারের ফলে বিক্রমপুরের বর্ম্ম রাজগণের প্রামাণিক ইতিহাসেরও যেমন সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তেমনি ভৌগোলিক সিদ্ধান্তের ও সুযোগ ঘটিয়াছে। বিক্রমপুর রাজ্য কতদূর বিস্তৃত ছিল এই তাম্রশাসনখানির সাহায্যে তাহার সন্ধানের পথ আমরা পাইয়াছি। [the copperplate is of great importance from the points of view of both historical and geographical research].

যে মুসলমান কৃষক এই তাম্রশাসনখানি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সে ইহার রাজমুদ্রাটি চিহ্নহীন করায়, তাহার 'লাঞ্ছন' কিরূপ ছিল, তাহা দর্শন করিবার উপায় নাই। সৌভাগ্যক্রমে ৪৮ পংক্তিতে রাজমুদ্রাটির যে বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে জানিতে পারা গিয়াছে যে, রাজমুদ্রায় বিষ্ণুচক্র মুদ্রিত ছিল। কিন্তু তাহার মধ্যে রাজার নাম খোদিত ছিল কিনা তাহা জানিবার উপায় নাই।

[ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি]

প্রশস্তি-পাঠ

[প্রথম পৃষ্ঠা।]

ওঁ সিদ্ধি [ঃ]

১। স্বায়ম্ভুব মিহাপত্যং মুনি রাত্রি দি (র্দি) বৌকসাং।
তস্য যন্নায়নং তেজ স্তেনাজা—
য়ত চন্দ্রমাঃ॥ (১)

২। রৌহিণেয়ো বুধ স্তস্মাদস্মাদৈলঃ পুরূরবাঃ [।]
জজ্ঞে স্বয়ংবৃতঃ কী [র্ত্যা]
চোর্বশ্যা চ ভুবা চ যঃ॥ (২)

৩। সোপ্যায়ুং সমজীজনন্মনুসমো রাজ্ঞ স্ততো জজ্ঞিবান্
ক্ষ্মা—

৪। পালো নহুষ স্ততোজনি মহারাজো যযাতিঃ সুতম্ [।]
সোপি প্রাপ যদুং ততঃ ক্ষিতি [ভু]—
জাং বংশোয় মুজ্জস্ততে

৫। বীরশ্রীশ্চ হরিশ্চ যত্র বস্ত [হু] শঃ প্রত্যক্ষ মেবৈক্ষ্যত॥ [৩]
সোপী [হ]

৬। গোপীশত-কেলিকারঃ
কৃষ্ণো মহাভারত-সূত্রধারঃ [।]
অর্ঘ্যঃ পুমানংশ-কৃতাবতা—
রঃ

৭। প্রাদুর্বভূবোদ্ধৃত-ভূমিভারঃ॥ (৪)
পুংসা মাবরণং ত্রয়ী ন চ তয়া হীনা ন নগ্না ইতি

৮। ত্রয্যান্ (?) চাদ্ভুত-সঙ্গরেষু চ রসাদ্রোমোদ্গমৈ বর্ম্মিণঃ [।]
বর্ম্মাণোতি-গভীর-নাম দধতঃ

৯। শ্লাঘ্যো ভুজৌ বিভ্রতো
ভেজুঃ **সিংহপুরং** গুহামিব মৃগেন্দ্রাণাং হরে র্বান্ধবাঃ॥ (৫)

১০। অভবদথ কদাচিত্থাদবীনাং চমূনাং
সমর—বিজয়যাত্রা-মঙ্গলং বজ্রবর্ম্মা [।
শম—

১১। ন ইব রিপূণাং সোমবদ্বান্ধবানাং
কবি রপি চ কবীনাং পণ্ডিতঃ [প] ণ্ডিতানাম্॥ (৬)
জা—

১২। ত-বর্ম্মা ততো জাতো গাঙ্গেয় ইব শান্ত নোঃ [।]
দয়া ব্রতং রণঃ ক্রীড়া [ত্যা] গো যস্য মহো—

১৩। ৎসবঃ॥ (৭)
গৃহ্নন্ বৈণ্য পৃথুশ্রিয়ং পরিণয়ন্ কর্ণ্ণস্য বীরশ্রিয়ং
যো * * প্রথয়ঞ্ছ্রিয়ং পরিভবং—

১৪। স্তাং কামরূপ-শ্রিয়ম্ [।]
নিন্দন্দিব্য-ভুজশ্রিয়ং বিকলয়ন্ গোবর্দ্ধনস্য শ্রিয়ং
কুর্ব্বন্ শ্রোত্রিয়—

১৫। সাচ্ছ্রিয়ং বিততবান্ যাং সার্বভৌম-শ্রিয়ম্
বীরশ্রিয়ামজনি সামলবর্ম্মদেবঃ

১৬। শ্রীমাঞ্জগৎ—প্রথম-মঙ্গল-নামধেয়ঃ [।]
কিস্বর্ণ্ণয়াম্যখিল-ভূপ-গুণোপপন্নো
দোষৈ—

১৭। [র্ম্ম] নাগাপি পদং ন কৃতঃ প্রভু র্ম্মে। (৯)
তস্যোদয়ী-স্বমু রভূৎ প্রভূত
* * * বীরেম্বপি সজ্ঘ—

১৮। রেষু [।]
য শ্চন্দ্রহা [স]—প্রতিবিম্বিতং স্ব—
মেকং মুখং সম্মুখ মীক্ষতে স্ম॥ (১০)
তস্য মালব্যদেব্যা—

ভোজ বর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি—প্রথম পৃষ্ঠা

ভোজ বর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি—দ্বিতীয় পৃষ্ঠা

[রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির সৌজন্যে]

১৯। সীৎ কন্যা ত্রৈলোক্য-সুন্দরী [।]
জগদ্বিজয়মল্লস্য বৈজয়ন্তী মনোভুবঃ ॥ (১১)
পূর্ব্বে'প্যশে

২০। য-ভূপাল-পুত্রীণা মবরোধনে [।]
তস্যাসীদগ্র-মহিষী [সৈব] সামলবর্ম্মণঃ ॥ (১২)
আসী—

২১। ত্তয়োঃ সু (সূ) নু রিহান্তরং (?) যঃ
শ্রীভোজবর্ম্মোভয়—ংশ [দী] পঃ [।]

২২। পাত্রেষু সর্বাসু দশাসু যে—
ন
স্নেহো ন লুপ্তশ্চ হতং তমশ্চ ॥ (১৩)
হা ধিক (ক্ক) ষ্ট মবীর মন্ত ভুবনং ভূয়োপি কং
(কিং) রক্ষসা—

২৩। মুৎপাতোয় মু [প] স্থিতোস্ত কুশ-লী শঙ্কাস্ব-
লঙ্কাধিপঃ ॥ (১৪)
ইতি যং গুণগাথাভি স্তুষ্টা—

২৪। ব পুরুষোত্তমঃ [।]
মজ্জয়ন্নিব বাগ্‌ব্রহ্ম-ময়ানন্দ-মহোদধৌ ॥ (১৫)
স খলু শ্রীবিক্রমপু—

২৫। র-সমাবাসিত—শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ
মা (ম) হারাজাধিরাজ—শ্রীসামলধর্ম্ম—দেবপা—

২৬। দানুধ্যাত—পরমবৈষ্ণব-পরমেশ্বর-পরমভট্টারক—
মহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্ভোজ [ঃ]
[দ্বিতীয় পৃষ্ঠা।]

২৭। শ্রীপৌণ্ড্র-ভুক্ত্যন্তঃপাতি-অধঃপত্তনমণ্ডলে
কৌশাম্বী-অষ্টগচ্ছ—খ—

২৮। গুল—সং [বদ্ধ] (১৬) উপ্যলিকা-গ্রামে গুবাকাদি-
সমেত-সপাদ—
নবদ্রোণাধি—

২৯। ক-পাটকভূমৌ-সমুপগতাশেষ-রাজরাজন্যক-রাজ্ঞীরাণক-রা

৩০। জ পুত্র-রাজামাত্য-পুরোহিত-পীঠিকাবিত্ত-মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ
মহাসান্ধিবি—

৩১। গ্রহিক-মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত-অন্তরঙ্গ—
বৃহদুপরিক-মহাক্ষপ—

৩২। টলিক-মহাপ্রতীহার মহাভোগিক-মহাব্যূহপতি—
মহাপীলুপতি-মহার্গ—

৩৩। ণস্থ-দৌস্সাধিক-চৌরোদ্ধরণিক-(নৌবলহস্ত্য) শ্ব—
গোমহিষাজাবিকাদি—

৩৪। ব্যাপৃতক-গৌল্মিক-দণ্ডপাশিক-দণ্ডনায়ক—
বিষয়পত্যাদীন্ অন্যাংশ্চ সক—

৩৫। ল—রাজপাদোপজীবিনো ধ্যক্ষ-প্রচারোক্তান্ ইহাকীর্ত্তিতান্
চট্টভট্টজাতী—

৩৬। য়ান্ জনপদান্ ক্ষেত্রকরাংশ্চ ব্রাহ্মণান্ ব্রাহ্মণোত্তরান্
যথার্হ্মানয়তি

৩৭। বোধয়তি সমাদিশতি চ মতমস্তু ভ [ব] তাম্
যথোপরিলিখিতা ভূমি রিয়ং স্ব—

৩৮। সীমাবচ্ছিন্না তৃণপূতিগোচরপর্য্যন্তা সতলা—সোদ্দেশা
সাম্রপনসা স—

৩৯। গুবাক-নালিকেরা (নারিকেলা) সলবণা সজলস্থ
[লা] (১৮)

৪০। সগর্ত্তোষরা-সহৃদশাপরাধা পরি—
হৃতসর্ব্বপীড়া অচাডভড প্রবেশা
অকিঞ্চিৎপ্রগ্রাহ্যা সমস্ত—রাজভোগ (গ্য) ক—

৪১। র-হিরণ্য-প্রত্যায়-সহিতা
সাবর্ণ-সগোত্রায় ভৃগু-চ্যবন-আপ্নবান্-ঔ—

৪২। বর্ব-জমদগ্নি-প্রবরায়
বাজসনেয়-চরণায় যজুর্ব্বেদ-কণ্বশাখাধ্যায়ি—

৪৩। নে মধ্যদেশ-বিনিগর্গত [স্য] উত্তর-রাঢ়ায়াং
সিদ্ধলগ্রামীয়—পীতাম্বর দেব—

৪৪। শর্ম্মণঃ প্রপৌত্রায় জগন্নাথ দেবশর্ম্মণঃ পৌত্রায়
বিশ্বরূপ দেবশর্ম্ম—

৪৫। ণঃ পুত্রায় শান্ত্যাগারাধিকৃত-শ্রীরাম দেবশর্ম্মণে।
শ্রীমতা ভোজ—

৪৬। বর্ম্মদেবেন পুণ্যে অহনি বিধিবদুকপূর্বকং
কৃত্বা ভগবন্তং বাসুদেবভ—

৪৭। ট্টারক মুদ্দিশ্য মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ পুণ্যযশোভিবৃদ্ধয়ে
আচন্দ্রার্কং ক্ষি—

৪৮। তি-সমকালং যাবদ্ভু (দ্ভূ) মিচ্ছিদ্রন্যায়েন শ্রীমদ্বিষ্ণুচক্র
মুদ্রয়া-তাম্রশা

৪৯। সনীকৃত্য প্রদত্তাস্মাভিঃ (?) ॥ ভবন্তি চাত্র ধর্ম্মানুশাং
সিনঃ শ্লোকাঃ ॥

৫০। স্বদত্তা স্পরদত্তা স্বা যো হরেত বসুন্ধরাম্ [।]
সবিষ্ঠায়াং কি (কৃ) মি ভূর্ত্বা পিতৃভিঃ সহ প—
চ্যতে ॥ (২০)

৫১। শ্রীমদ্ভোজবর্ম্মদেবপাদীয় সম্বৎ ৫ শ্রাবণদিনে ১৯
নি অনু মহাক্ষ নি।

বঙ্গানুবাদ

১। এই বিশ্বে দেবর্ষি অত্রি সয়ম্ভুব অপত্য [ছিলেন]। তাঁহার নয়ন হইতে যে তেজঃ সমুত্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে চন্দ্রমা জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। সেই [চন্দ্রমা] হইতে রোহিণী-নন্দন বুধ [জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন] এবং বুধ হইতে ইলার পুত্র পুরূরবা জন্মগ্রহণ করিয়া কীর্ত্তি এবং উর্ব্বশী এবং বসুন্ধরা কর্ত্তৃক [স্বয়ংবৃত] স্বয়ংবরে পতিরূপে গৃহীত হইয়াছিলেন।

৩। সেই মনু প্রতিম [পুরূরবাও] আয়ুর জন্মদান করিয়াছিলেন। সেই রাজা [আয়ু] হইতে পৃথিবী—পালক নহুষ জন্মগ্রহণ করেন। নহুষ হইতে মহারাজ যযাতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনিও যদুকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা হইতে যে রাজবংশ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল, সেই রাজবংশে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যেক্ষ-বৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন।

৪। [ইহ] এই বংশে, সেই পূজ্য পুরুষ [বলরামের] অংশাবতার, মহা-ভারত-সূত্রধার শ্রীকৃষ্ণও প্রাদুর্ভূত হইয়া শত শত গোপীর সহিত কেলি করিয়াছিলেন, এবং পৃথিবীর ভার উদ্ধার করিয়াছিলেন।

৫। ত্রয়ী [বেদবিদ্যাই] পুরুষের [প্রকৃত] পরিধেয় (১০)। তাহার অভাব ছিল না বলিয়া অনগ্ন অপিচ [বেদবিদ্যা-সংযুক্ত বলিয়া বৌদ্ধ ক্ষপণকাদি হইতে বিভিন্ন বেদ-চর্চ্চায় এবং অদ্ভুত সমর-ক্রীড়ায় অনুরাগবশতঃ যে রোমাঞ্চ উপস্থিত হইত, তাহাতেই [বর্ম্মিণঃ] বর্ম্মাবৃত-কলেবর [বলিয়া প্রতিভাত] হবির জ্ঞাতিবর্গ, বর্ম্মা [উপাধিধারী] গণ অতি গভীর নাম এবং শ্লাঘ্য বাহুযুগল ধারণ করিয়া, সিংহ-বিবর-তুল্য সিংহপুর নামক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

৬। অনন্তর কোনও এক সময়ে, যাদব-সেনার সমর-বিজয়যাত্রা-মঙ্গলরূপী বজ্রবর্ম্মা [নামক ব্যক্তি] জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রিপুকুলের পক্ষে শমন, বান্ধব-কুলের পক্ষে [প্রিয়দর্শন] চন্দ্র, কবিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবি, এবং পণ্ডিত-কুলের মধ্যে প্রধান পণ্ডিত ছিলেন।

৭। শান্তনু হইতে যেমন গাঙ্গেয় ভীষ্মদেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইরূপ বজ্রবর্ম্মা হইতেও জাতবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। দয়াই তাঁহার ব্রত ছিল, যুদ্ধই তাঁহার ক্রীড়া ছিল, এবং ত্যাগই তাঁহার মহোৎসব ছিল।

৮। তিনি বেণের পুত্র পৃথুর শ্রীকে ধারণ করিয়া কর্ণের [কন্যা] বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া, * * * শ্রীকে বিস্তৃত করিয়া, সেই [সুবিখ্যাত] কামরূপ [রাজ্য] শ্রীকে পরাভূত করিয়া, দিব্য [নামক কৈবর্ত্ত নায়কের] ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া গোবর্দ্ধনের শ্রীকে বিকল করিয়া, শ্রোত্রিয় [ব্রাহ্মণগণকে] ধনরত্ন প্রদান করিয়া, সার্ব্বভৌমশ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন।

৯। জগতে প্রথম মঙ্গলনামধারী শ্রীমান্ সামলবর্ম্মদেব বীরশ্রীর গর্ভে জন্ম

গ্রহণ করিয়াছিলেন। অধিক কি আর বর্ণনা করিব? অখিল-নরপাল-গুণ-বিভূষিত আমার প্রভুতে দোষ সমূহ কিয়ৎপরিমাণেও স্থান প্রাপ্ত হয় নাই।

উদয়ী সূনু তাঁহার [সামলবর্ম্মদেবের] … … … ছিলেন। তিনি বীর [পরিপূর্ণ] যুদ্ধক্ষেত্রে ও [স্বহস্ত ধৃত] খড়্গ-ফলকে তাঁহার আপন মুখই কেবল সম্মুখে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইতেন।

১১। তাঁহার মালব্যদেবী নাম্নী, জগদ্বিজয়-মল্ল কামদেবের বিজয়-বৈজয়ন্তী-রূপিণী ত্রৈলোক্যসুন্দরী এক কন্যা ছিলেন।

১২। অশেষ-ভূপাল-কন্যাগণ কর্ত্তৃক বাজান্তঃপুব পরিপূর্ণ থাকিলেও সেই [মালব্য দেবীই] এই সামলবর্ম্মার "অগ্র-মহিষী" [প্রধানা মহিষী] ছিলেন।

১৩। অনন্তর [পিতৃ-মাতৃ] উভয়কুল-প্রদীপ শ্রী ভোজবর্ম্মা নামক তাঁহাদের পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সকল প্রকার অবস্থাতেই উপযুক্ত পাত্রে স্নেহের লোপ করিতেন না, [হৃদয়ের] অন্ধকার বিনষ্ট করিয়া দিতেন।

১৪। হা ধিক্। কষ্টের বিষয়! অদ্য ভুবন বীরশূন্য হইয়াছে। রাক্ষসকুলের উৎপাত-বিধাতা [অলঙ্কাধিপঃ] রাম পুনবায় উপস্থিত হইয়াছেন কি! [এই] শঙ্কাকুল অবস্থায় [অয়ং] ভোজবর্ম্মদেব কুশলী হউন।

১৫। এইরূপে বাগ্—ব্রহ্মানন্দ মহাসমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়া যাঁহাকে পুরুষোত্তম গুণগাথা-সমূহে পরিতুষ্ট করিয়াছিলেন :—

শ্রীবিক্রমপুরে সমাবাসিত (সংস্থাপিত) জয়স্কন্ধাবার (সেনা নিবেশ) হইতে, মহারাজাধিরাজ—শ্রীসামলবর্ম্মদেব-পাদানুধ্যাত, পরমবৈষ্ণব, পরমেশ্বর, পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ সেই শ্রীমদ্ভোজ—শ্রীপৌণ্ড্রভুক্তির অন্তঃপাতী অধঃপত্তন-মণ্ডলে কৌশাম্বী-অষ্টগচ্ছ খণ্ডল [সম্বন্ধ] উপ্যলিকা গ্রামে, ১ পাটক, ৯¼ দ্রোণ (পরিমিত) ভূমিতে,—সমুপগত (সংবিদিত) সমস্ত রাজা, রাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র রাজামাত্য, রাজপুরোহিত, পীঠিকাবিত্ত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ (শ্রেষ্ঠ বিচারাধিপতি), মহা সান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত (রাজকীয় "মোহরের" রক্ষক), অন্তরঙ্গ বৃহদুপরিক (রাজাপ্তজনদিগের অধিনায়ক) মহাক্ষপটলিক (অধিকরণিক, অথবা রাজকীয় লেখ্যের রক্ষক) মহাপ্রতীহার (দৌবারিক শ্রেষ্ঠ) মহাভোগিক (প্রধান অশ্বরক্ষক) মহাব্যূহপতি, মহাপীলুপতি (প্রধান গজ-রক্ষক), মহাগণস্থ ("গণ" নামক সেনা-মণ্ডলীর নেতা) দৌঃসাধিক (দ্বারপাল অথবা গ্রাম-পরিদর্শক), চৌরোদ্ধরণিক (দস্যুতস্করাদির হস্ত হইতে উদ্ধারক পুলিশ-কর্ম্মচারী বিশেষ), নৌবল-ব্যাপৃতক (নৌ সেনাধিকৃত পুরুষ) হস্তিব্যাপৃতক (হস্ত্যধ্যক্ষ) অশ্বব্যাপৃতক (অশ্বাধ্যক্ষ), গো-ব্যাপৃতক (গবাধ্যক্ষ),

মহিষ-ব্যাপৃতক (মহিষাধ্যক্ষ, অজ-ব্যাপৃতক (ছাগাধ্যক্ষ) ও অবিকাদি ব্যাপৃতক (মেষ প্রভৃতির অধ্যক্ষ), গৌল্মিক ("গুল্ম" নামক সেনামণ্ডলীর অধিনায়ক) দণ্ডপাশিক (বধাধিকৃত পুরুষ) দণ্ডনায়ক, (চতুরঙ্গ বলাধ্যক্ষ) বিষয়-পতি (জেলাধিপতি) প্রভৃতি (রাজকর্ম্মচারী-দিগকে) এবং অধ্যক্ষ-প্রচারে উক্ত (অধ্যক্ষ-তালিকাভুক্ত) কিন্তু এই শাসনে (পৃথগ্ ভাবে) অকথিত অন্যান্য রাজপাদোপজীবীদিগকে, চট্ট-ভট্ট-জাতীয় জনপদবাসিগণকে, ক্ষেত্রকর ব্রাহ্মণগণকে ও ব্রাহ্মণোত্তমগণকে, যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করিতেছেন, বিজ্ঞাপন করিতেছেন এবং আজ্ঞা করিতেছেন, (নিম্নোল্লিখিত বিষয়ে) আপনাদের সকলের অভিমত হউক—যথা স্বসীমাবচ্ছিন্ন তৃণ-পূতি-গোচর পর্য্যন্ত, সতল, সোদ্দেশ, আম্র, পনস, গুবাক ও নারিকেল বৃক্ষ সমেত, লবণোৎপাদক ভূমির সহিত, জল ও স্থলের সহিত গর্ত্ত ও উষর ভূমির সহিত, যাহার (অর্থাৎ, যে ভূমি সম্বন্ধে প্রতি-গ্রহীতার) দশটী অপরাধ (রাজার) সহ্য হইবে, সর্ব্বপ্রকার উৎপীড়ন রহিত, চাট-ভাট জাতির প্রবেশাধিকারবিরহিত, যাহা হইতে কোন প্রকারের করাদি গৃহীত হইবে না, রাজভোগ্য কর ও হিরণ্যাদি (সর্ব্বপ্রকারের) আয়ের সহিত উপরি লিখিত ভূমিখণ্ড সার্ব্বিণ গোত্রোৎপন্ন, ভৃগু চ্যবন আপ্নবান—ঔর্ব-জমদগ্নি-প্রবর, বাজসনেয় চরণোক্ত (ক্রিয়াকলাপের) অনুষ্ঠাতা, যজুর্ব্বেদের কণ্বশাখাধ্যায়ী, মধ্যদেশ হইতে বিনির্গত উত্তর রাঢ়ায় অবস্থিত—সিদ্ধল গ্রামবাসী পীতাম্বর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, জগন্নাথ দেব-শর্ম্মার পৌত্র, বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মার পুত্র, শান্তি গৃহাধিকৃত শ্রীরাম দেব শর্ম্মাকে—এই পুণ্য দিবসে যথাবিধি উদকস্পর্শ পূর্ব্বক ভগবান বাসুদেব-ভট্টারককে উদ্দেশ্য করিয়া মাতাপিতার এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য, যাবৎ সূর্য্য চন্দ্র এবং ক্ষিতি-সমকাল পর্য্যন্ত, ভূমিচ্ছিদ্র-ন্যায়ানুসারে শ্রীমদ্বিষ্ণু চক্র-মুদ্রাদ্বারা তাম্রশাসন করিয়া আমি শ্রীমান ভোজবর্ম্মদেব প্রদান করিলাম।

এই অভিপ্রায়ে ধর্ম্মানুশাসনের শ্লোকও আছে:—ভূমি স্বদত্তই হউক, আর অন্য দত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই বিষ্ঠার ক্রিমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন। শ্রীমদ্ ভোজবর্ম্মদেব-পাদীর সংবৎ ৫, শ্রাবণ ১৯ দিনে, নি-বদ্ধ অঙ্ক। মহাক্ষ (পাটলিক) নি (বদ্ধ)।

বিক্রমপুর 'জয়স্কন্ধাবার'

এই তাম্রশাসন খানি পাঠে অবগত হই যে শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত (সংস্থাপিত) জয়স্কন্ধাবার (সেনানিবেশ) হইতে, মহারাজাধিরাজ-শ্রীসামলবর্ম্ম দেব-পাদানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব-পরমেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ সেই শ্রীমদ্ভোজ ইত্যাদি। 'জয়স্কন্ধাবার' শব্দে রাজধানীকেও বুঝায়। এখানে 'জয়স্কন্ধাবার শব্দে রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরকেই বুঝাইতেছে। তবে

সকলেই প্রায় জয়স্কন্ধাবার শব্দে (সেনানিবেশ) বা Victorius camp অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। স্বর্গত রাখাল বাবু এই তাম্রশাসন-প্রসঙ্গে বলেন—"The inscription is written in protobengali characters of the eleventh or early twelfth century A. D. It refers itself to the reign of PARAMAVAISNAVA-PARAMESVAR-PARAMA--BHATTARAKA-MAARJADHIRAJ SRIBHOJA (DEVA) who meditated on the feet of MAHARAJADHIRAJ SAMALVARMADEVA, and was issued from the victorius camp of Vikrampur.

এই তাম্রশাসন খানা আবিষ্কৃত হইবার ফলে আমরা যে রাজবংশের পরিচয় পাইলাম, তাঁহাদের বংশীয় নৃপতিরা পূর্ব্বেও বিক্রমপুরে শাসন করিতেন। বর্ম্ম বংশীয় যাদব নৃপতিরা যে পাল রাজাদের রাজ্য সীমা উত্তীর্ণ হইয়া বঙ্গে [পূর্ব্ববঙ্গে] স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন এ বিষয়টিই আমাদের অজ্ঞাত ছিল। বর্ম্ম বংশীয় যাদব নৃপতিরা তিনপুরুষ পর্য্যন্ত যে বিক্রমপুরের রাজধানী হইতে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে এখন নিঃসন্দেহ হওয়া গিয়াছে। নিম্নে বাঙ্গলা দেশের পাল নৃপতিদের, এবং ত্রিপুরির কলচুরির হৈহয় এবং যাদবদের বংশ তালিকা উদ্ধৃত হইল :—
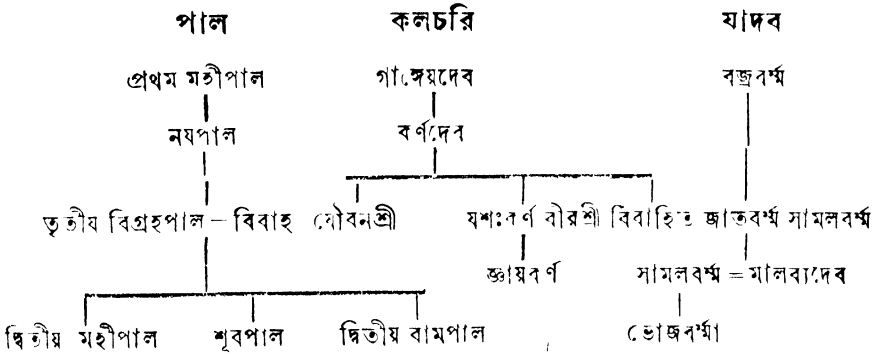
ভোজবর্ম্মদেবের বেলাব-লিপি হইতে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে একাদশ শতাব্দী কিংবা দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গ স্বাধীন রাজ্য ছিল। [the inscription proves that for three generations at least in the 11th or 12th centuries A. D. Eastern Bengal was independent.] এই তাম্রশাসন খানি হইতে আরও জানিতে পারি যে—বর্ম্মা নৃপতিরা যাদব বংশীয় ছিলেন। [তৃতীয় পংক্তি] আর তাঁহারা সিংহ-বিবর তুল্য সিংহপুর নামক স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। [শ্লাঘ্যো ভুজো বিভ্রতো ভেজুঃ **সিংহপুরং** গুহামিবঃ মৃগেন্দ্রাণাং হরের্বাংশ্বাঃ।]

সিংহবিবরতুল্য সুরক্ষিত সিংহপুরে বর্ম্মা বংশ বা যাদব বংশীয় নৃপতিগণের আদিম বাস স্থান ছিল। সিংহপুরে এই বংশীয়েরা দীর্ঘকাল যাবৎ বাস করিয়া আসিতেছিলেন। এই সিংহপুর কোথায়? এসম্বন্ধে বিভিন্নরূপ মত চলিয়া আসিতেছে। ডাক্তার রাধগোবিন্দ বসাক মহাশয় সিংহপুরকে 'মহাবংশের উল্লিখিত সিংহপুরম্ বলিতে চাহেন। অধ্যাপক ষ্টেন্ (Prof sten) র সহিত ["We know of princes with names ending in Varman, who ruled in Simhapura, and who were kings of Kalinga] অর্থাৎ কাহারও মতে ইঁহাদের আদি নিবাস ছিল কলিঙ্গের অন্তর্গত সিংহপুর। কেহ দক্ষিণ রাঢ়ায় এই সিংহপুর অবস্থিত বলেন। সিংহপুরের অবস্থা সম্বন্ধে কেহ কোনরূপ স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারেন নাই। * স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় সিংহপুর সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া যাহা লিখিয়াছেন তাহা পাদটিকায় উদ্ধৃত হইল।

"ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন, "সিংহপুর রাজধানীর বর্ত্তমান নাম কেতস্। ইউয়ান চোয়াং খৃষ্টিয় সপ্তম শতাব্দীর মধ্য ভাগে সিংহপুর রাজ্য দর্শন করিয়াছিলেন।" পণ্ডিতেরা "তর্ক করুন কোথায় সিংহপুর!" সে বিষয়ে আর অধিক আলোচনা অনাবশ্যক, তবে যাদব বর্ম্মবংশ যে শ্রীবিক্রমপুর রাজধানীতে অবস্থান করিয়া রাজ্য শাসন করিতেন, তৎসম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ কিন্তু কি ভাবে কেমন করিয়া তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার করিলেন তাহাই এখন আলোচনা করিতে হইবে।

* ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ১৭৩ পৃষ্ঠা। Insscriptions of Bengal Vol III by N. G. Mazumdar দ্রষ্টব্য।

"The identification of Sinhapura is not certain, According to some it may be the same as modern Singupuram betewen Chicacole and Narasamapeta. This records proves that a dynasty, who had varman as heir title and Yadava lineage, ruled over Sinhapura. Another inscription, to which Mr. R. D. Banerjee draws our attention, bears testimony to the same fact. This is Lakkhamandal inscription from the Jaunsar Bawar Dstrict on the upper Jamuna, wich records the dedication of a siva temple by Isvara, wife of a king of Jalandhara in the Punjab. She is described as having descended from a line of Yadava Kings of singhapura. From a list of twelve kings of the dynasty given in the inscription it appear that all of their names ended in varman. Bulher thinks it very probable that the ancestors of Isvara, queen of the Jalandhara prince, ruled over a district that lay also in the Punjab aud identified Sinhapura with Sang-ho-pu lo described by Hinen Tsang. But it should be noted that there nothing in the epigraph itself which supports this conclusion, or makes it in any way necessary"

বিষ্ণু মূর্ত্তি—রামপাল গ্রামে প্রাপ্ত

আমরা ভোজবর্ম্মার বেলাব-লিপি হইতে কোনরূপ সুস্পষ্ট ধারণা করিতে পারি না যে বর্ম্ম রাজাদের মধ্যে কে কবে প্রথম পূর্ব্ববঙ্গে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন! [The inscription does not state definitely who founded the kingdom of the Jadavas in the extreme east.] এই বংশের বংশলতা বজ্রবর্ম্মা হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বর্ম্ম রাজবংশ প্রতিষ্ঠা

বজ্রবর্ম্মা যাদব সেনার অধিনায়ক ছিলেন, তিনি রাজা ছিলেন না। কেননা তাম্রফলক হইতে জানিতে পারিতেছি যে—তিনি (বজ্রবর্ম্মা) যাদবসেনার সমর-বিজয়-যাত্রা-মঙ্গল-রূপী ছিলেন, তিনি রিপুকুলের পক্ষে শমন ছিলেন।

বজ্রবর্ম্মা

বজ্রবর্ম্মা হইতে জাতবর্ম্মা জন্মগ্রহণ করেন। জাতবর্ম্মা সম্বন্ধে দেখিতে পাই তাঁহাকে "সাচ্ছিয়ং বিতত্তবান্দ্যাং সার্ব্বভৌম শ্রিয়ম্" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে, ইহার দ্বারা অনুমিত হয় যে জাতবর্ম্মা স্বাধীন সার্ব্বভৌম নৃপতি ছিলেন—"তিনি বেণের পুত্র পৃথুর শ্রীকে অর্থাৎ বিপুল শ্রী ধারণ করিয়া, কর্ণের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়া * * শ্রীকে বিস্তৃত করিয়া, সেই [সুবিখ্যাত] কামরূপ [রাজ্য] শ্রীকে পরাভূত করিয়া, দিব্য [নামক কৈবর্ত্তনায়কের] ভুজশ্রীকে নিন্দা করিয়া, গোবর্দ্ধনের [ব্যক্তি বিশেষের নাম] শ্রীকে বিকল করিয়া, শ্রোত্রিয় [ব্রাহ্মণগণকে] ধনরত্ন প্রদান করিয়া, সার্ব্বভৌমশ্রী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। আমরা পূর্ব্বেও প্রসঙ্গ-ক্রমে উল্লেখ করিয়াছি যে তৃতীয় বিগ্রহপালের পিতা নয়পালের শাসন সময়ে, কর্ণের সহিত যুদ্ধে গৌড় সেনার প্রথমে পরাজয়ের এবং পরে বিজয় লাভের ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের যত্নে মৈত্রী সংস্থাপিত হইবার একটী কাহিনী দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের [তিব্বতীর ভাষায় রচিত] জীবন-চরিতে উল্লিখিত আছে। এই কর্ণ কর্ণচেদী নামে কথিত। রামচরিত কাব্যে [১৯ শ্লোকে) লিখিত আছে—তিনি পরাজিত হইয়া, গৌড়েশ্বর তৃতীয় বিগ্রহপালকে "যৌবনশ্রী" নাম্নী কন্যা দান করিয়াছিলেন। তাঁহার অপর কন্যা "বীরশ্রীব" সহিত 'জাতবর্ম্মার' পরিণয়ের কথা এই শ্লোকে উল্লিখিত হইয়া 'জাতবর্ম্মার অভ্যুদয় কালের পরিচয় প্রদান করিতেছে। তৃতীয় বিগ্রহপালের পরলোক-গমনের সঙ্গে সঙ্গে, কৈবর্ত্তনায়ক দিব্যের বা দিব্যোকের বিদ্রোহে, বরেন্দ্রী হইতে পালরাজগণের শাসন উন্মূলিত হয়, এবং পাল সাম্রাজ্য ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়। **সেই সুযোগে পাল সাম্রাজ্য ভুক্ত "কামরূপ" অধিকার করিয়া জাতবর্ম্মা পূর্ব্ববঙ্গে "সার্ব্বভৌমশ্রী"** বিস্তৃত করিয়াছিলেন।" * এইরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে।

জাতবর্ম্মা

জাতবর্ম্মা কর্তৃক পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়

* সাহিত্য ২৩ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা ৩৯০-৩৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও এই মতাবলম্বী। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরা বেলাপ-লিপি হইতে জানিতে পারি যে জাতবর্ম্মা কর্ণদেবের কন্যা বীরশ্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। কাজেই জাতবর্ম্মা এবং পালনৃপতি তৃতীয় বিগ্রহপাল বিবাহ সম্পর্কে পরস্পরে আত্মীয়তা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন : [Jatavarma married Virsri, the daughter of Karna, so he was the brother-in-law of the Pal Emperor Vigrahapal III] কেন না সন্ধ্যাকর নন্দী "রামচরিতে" লিখিয়াছেন যে তৃতীয় বিগ্রহপাল চেদীরাজের কন্যা যৌবনশ্রীকে' বিবাহ করেন। জাতবর্ম্মা অঙ্গ রাজ্য পর্য্যন্ত স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, কাজেই এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে তিনি কলচুরি চেদী গাঙ্গেয় এবং কর্ণদেব এক পক্ষে এবং প্রথম মহীপাল, নয়পাল ও বিগ্রহপালের মধ্যে যে দীর্ঘকাল রণ-সংঘর্ষ চলিয়াছিল তাহাতে জাতবর্ম্মাও যোগদান করিয়াছিলেন। জাতবর্ম্মা তৃতীয় বিগ্রহ পালের ভৃত্য দিব্য বা দিব্যোকের বিদ্রোহ ও দমন করেন। জাতবর্ম্মা গোবর্দ্ধনের শ্রীকে ও বিকল করিয়া অবশেষে "সার্ব্বভৌমশ্রী" বিস্তৃত করিয়াছিলেন। এই গোবর্দ্ধন কে ছিলেন? "রামচরিতে" "দ্বোরপবর্দ্ধন" (Dvorapavardhana) নাম আছে। রাখাল বাবু বলেন—[which seems to be the copyists mistake for Govardhan] তাঁহার মতে" রামচরিতে দ্বোরপ-বর্দ্ধন নামক জনৈক কৌশাম্বী অধিপতির নাম আছে। লিপিকর প্রমাদে শ্রী গোবর্দ্ধন স্থানে তাহা "দ্বোরপোবর্দ্ধন" হইয়াছে, এই গোবর্দ্ধনই জাতবর্ম্মা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এই গোবর্দ্ধন রাজসাহী জেলার অন্তর্গত 'কুসুম্বা' বা কুসাম্বি'র একজন ক্ষুদ্র রাজা ছিলেন, এলাহাবাদের কৌশাম্বী বা কোসাম নহে। [It should be noted that the King of Kausambi mentioned in the Ramcharita of Sandhyakar nandi was not a king of Kausambi in the *Madhyadesha* (kosam near Allahabad) but a ***minor prince of Bengal,*** because the Belabo grant proves that there was a Kausambi in the *Pundrabhukti.* It is most probably the modern Pargana of Kausumba or Kusambi in the Rajshahi District].

জাতবর্ম্মার বীরত্ব

দিব্য ও জাতবর্ম্মা

আমরা রাজসাহী জেলার অন্তর্গত কৌসম্বা দেখিয়াছি। উহা কুসাম্বি নামেই পরিচিত। ঐ স্থানে বহু প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। কাজেই রাখাল বাবুর সিদ্ধান্তই সত্য বলিয়া মনে হয়।

জাতবর্ম্মার পুত্র সামলবর্ম্মা। সামলবর্ম্মদেব বীরশ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

তাম্রফলকে লিখিত আছে, "জগতে প্রথম মঙ্গল নামধারী শ্রীমান্ সামলবর্ম্ম দেব বীবশ্রীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। অখিল-নর পাল গুণ-বিভূষিত ছিলেন এই সামলবর্ম্ম দেব।'

জাতবর্ম্মার পুত্র সামলবর্ম্মা

জাতবর্ম্মার মৃত্যুর পর সামলবর্ম্মা পিতৃ সিংহাসন লাভ করেন। সামল-বর্ম্মার শ্বশুর কুলের পরিচয় ও বেলাব-লিপির ১০ম ও ১১শ শ্লোকে আছে। "উদয়ী সূনু তাঁহার [সামলবর্ম্মদেবের] * * * ছিলেন। তিনি বীর [পরিপূর্ণ] যুদ্ধক্ষেত্রের [স্বহস্ত ধৃত] খড়্গ ফলকে তাঁহার আপন মুখই কেবল সম্মুখে প্রতিবিম্বিত দেখিতে পাইতেন। তাঁহার মালব্য দেবী নাম্নী জগদ্বিজয়-মল্ল কামদেবের বিজয়-বৈজয়ন্তী, ত্রৈলোক্যসুন্দরী এক কন্যা ছিলেন। * * * * সেই (মালব্য দেবীই) এই সামলবর্ম্মার 'অগ্রমহিষী' [প্রধানা মহিষী] ছিলেন।—ঐতিহাসিকগণের 'উদয়ী' এবং "জগদ্বিজয় মল্ল' সম্বন্ধে বিভিন্ন মতামত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতানুসরণ করিয়া উদয়ী নামের সহিত পরমার রাজবংশের উদয়াদিত্য এবং ১১ শ্লোকের জগদ্বিজয়মল্লকে উদায়দিত্যদেবের তৃতীয় পুত্র জগদ্দেব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডাক্তার রাধাগোবিন্দ বসাক বলেন, "উদয়ী" শব্দ কোনও যোদ্ধ পুরুষের নামবাচক সংজ্ঞা শব্দ বলিয়াই বোধ হয়। তাঁহার 'সূনু'র সহিত সামলবর্ম্মার সেনাবিভাগের কোনরূপ সম্পর্ক ছিল।" * * * আবার উদয়ীকে মালব্য দেবীর জনককুলের ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ না করিলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় না বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সকল বিভিন্ন মত আলোচনা করিয়া লিখিয়াছেন যে— "The identity of Jagadvijayamalla the father-in-law of Samalvarman, must remain an open question so long as fresh material is not available."

উদয়ী ও জগদ্বিজয় মল্ল

সামলবর্ম্মার পর তাঁহার পুত্র শ্রীভোজবর্ম্মা নৃপতি ছিলেন। তিনি পিতৃমাতৃ উভয় কুল-প্রদীপ ছিলেন। তাঁহার প্রদত্ত এই তাম্রশাসন। এবিষয় পূর্ব্বেও বলা হইয়াছে।

ভোজবর্ম্মাদেবের এই তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হইবার বহু পূর্ব্বে স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় 'বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস' দ্বিতীয় ভাগে পাশ্চাত্য বৈদিকগণের কুলশাস্ত্র হইতে শ্যামলবর্ম্মার পরিচয় সংগ্রহ করিয়া বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে স্বর্গত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৎ প্রণীত 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম খণ্ড ১৩২—১৩৭ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভাবে সমালোচনা করিয়াছেন। এবং উহার সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।

সামলবর্ম্মা ও শ্যামল বর্ম্মা

'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় মহাশয়ও এ সম্বন্ধে তদীয় ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ডে ২৮১—২৯৫ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত অতি সুন্দর ভাবে আলোচনা করিয়া নিম্ন লিখিতরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন :

(১) কুলশাস্ত্রের শ্যামলবর্ম্মা ও যাদব বংশের জাতবর্ম্মার পুত্র সামলবর্ম্মা এক ব্যক্তি নহেন।

(২) শ্যামলবর্ম্মা ও সামলবর্ম্মা একই ব্যক্তি। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই যে কুলশাস্ত্রের কোনও ঐতিহাসিক মূল্য নাই। কারণ কুলশাস্ত্রের লিখিত শ্যামলবর্ম্মার পরিচয়ের সহিত বেলাব তাম্রশাসনোক্ত সামলবর্ম্মার বংশ-পরিচয়ে ঐক্য নাই।"

সন্ধ্যাকরনন্দীর 'রামচরিতের' একটি শ্লোক

স্বপরিত্রাণনিমিত্তং পত্যা যঃ প্রাগ্ দিশীয়েন।
বর-বারণেন চ নিজ-স্যন্দসদানেন বর্ম্মণারাধে॥

রামচরিত, ৩। ৪৪।

অর্থাৎ বর্ম্মবংশীয় পূর্ব্বদেশের জনৈক রাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য, নিজের হস্তী ও রথ প্রভৃতি রামপালকে উপহার দিয়া তাঁহার আরাধনা করিয়াছিলেন। বর্ম্মবংশীয় নরপতি কর্ত্তৃক রামপালের আশ্রয় গ্রহণের দুইটি কারণ অনুমান করা যাইতে পারে; প্রথম রামপাল কর্ত্তৃক বঙ্গ আক্রমণ এবং দ্বিতীয় সেনবংশীয় সামন্তসেন কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ অধিকার। সম্ভবতঃ ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার পুত্র রামপালের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।" বলাবাহুল্য ইহা অনুমান মাত্র। কেননা 'রামচরিতে' বর্ম্মবংশীয় পূর্ব্বদেশের কোন্ নৃপতি নিজের পরিত্রাণের জন্য নিজের হস্তী ও রথ প্রভৃতি রামপালকে উপহার দিয়া আরাধনা করিয়াছিলেন তাঁহার নামের উল্লেখ নাই। কাজেই বর্ম্মবংশীয় এই নরপতি কে ছিলেন? তৎ সম্বন্ধে অনুমান ব্যতীত সঠিক ভাবে কিছু বলা যাইতে পারে না। কামরূপের বর্ম্ম রাজারা যে নহেন, তাহা নিশ্চিত, কেন না, নবম শতাব্দীর অবসানের সহিতই কামরূপে বর্ম্মরাজগণের শাসন লোপ হইয়াছিল।

বর্ম্ম বংশীয় নৃপতি ও রামপাল

একাদশ শতাব্দীতে কামরূপে রামপালের সমসাময়িক রূপে পালরাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন। কাজেই 'প্রাগ্ দিশীয়েন্' নৃপতি কামরূপের বর্ম্মরাজাদের মধ্যে কেহই নহেন। এ প্রসঙ্গে স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন, "যেখানে সামলবর্ম্মা গৌড়াধিপ রামপালকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানই বোধ হয় এক্ষণে বিক্রমপুরের মধ্যে **"রামপাল"** নামে পরিচিত হইয়াছে। নগেন্দ্রবাবুর মতে রামপালের অর্চ্চনাকারী এই প্রাগ্দেশীয় বর্ম্মরাজা ভোজবর্ম্মার পিতা সামলবর্ম্মা। ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী

ও এই মতাবলম্বী। তিনি বলেন:—"ভোজবর্ম্মার বেলাব-শাসনে রাক্ষসদের উপস্থিত উৎপাতে রামপালের কুশলের জন্য প্রার্থনায় মনে হয় ভোজবর্ম্মাই রামচরিতে উল্লিখিত বর্ম্মরাজা।" বেলাব তাম্রশাসনে লিখিত আছে :—

হা ধিক (ক্‌) ষ্ট মবীর মন্য ভুবনং ভূয়োপি কং [কিং] রক্ষসামুৎপাতোয় মু [প] স্থিতোস্ত কুশলী শঙ্কাস্থ-লঙ্কাধিপঃ। হা ধিক্! কষ্টের বিষয়! অদ্য ভুবন বীরশূন্য হইয়াছে! রাক্ষসকুলের উৎপাত-বিধাতা [অলঙ্কাধিপঃ] রাম পুনরায় উপস্থিত হইয়াছেন কি? এই শঙ্কাকুল অবস্থায় [অয়ং] ভোজবর্ম্মদেব কুশলী হউন।

বর্ম্ম বংশীয় রাজগণের কথা বলিতে যাইয়া "গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন :— "পালবংশীয় গণের রাজত্ব কালের শেষভাগে তাঁহাদিগের অধীন যে সকল রাজবংশ সামন্ত রাজরূপে বাংলার ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে শাসন-দণ্ড পরিচালনা করিতেন, তন্মধ্যে বর্ম্মবংশ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। * * বর্ম্মবংশীয় রাজগণ যখন বিক্রমপুর অধিকার করেন, তখন বিক্রমপুরের পার্শ্ব দিয়া পদ্মা প্রবাহিত ছিল। এখন উহার মধ্য দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হওয়ায় বিক্রমপুর দ্বিধা বিভক্ত হইয়াছে। বর্ম্মরাজারা পাল রাজাদের সামন্ত নৃপতি ছিলেন ইহার মূলে কোনও সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না, একমাত্র একজন বর্ম্মনৃপতির রামপালের আশ্রয় গ্রহণের কথা আছে মাত্র।

ভোজবর্ম্মা দেবের বেলাব-লিপি হইতে জানা যায় যে হরিবর্ম্মদেব "যদুবংশে বীরশ্রী এবং হরি বহুবার প্রত্যক্ষবৎ দৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই স্থানে প্রশস্তিকার ইঙ্গিতে জানাইয়াছেন যে, যাদব-বর্ম্মবংশে হরিবর্ম্ম নামে একজন রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।" এই হরিবর্ম্ম রাজার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অনেক গুলি প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। একখানি শিলালিপি, একখানি তাম্রশাসন এবং দুইখানি হস্তলিখিত গ্রন্থ হইতে হরিবর্ম্ম দেবের অস্তিত্বের কথা অবগত হওয়া যায়। শিলালিপি খানি উড়িষ্যা প্রদেশে পুরী জেলায় ভুবনেশ্বর গ্রামে অনন্ত-বাসুদেব-মন্দির-প্রাঙ্গণে আবিষ্কৃত হইয়াছিল। ইহা হরিবর্ম্ম দেবের মন্ত্রী ভবদেব ভট্টের কুলপ্রশস্তি। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, সাবর্ণগোত্রীয় রাঢ় প্রদেশের সিদ্ধল গ্রাম নিবাসী শ্রোত্রিয় বংশে প্রথম ভবদেবভট্ট জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গৌড়েশ্বরের নিকট হইতে হস্তিনীভিট্ট গ্রাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ভবদেবের বৃদ্ধ প্রপৌত্র আদিদেব বঙ্গরাজের মহামন্ত্রী-মহাপাত্র-মহাসান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। আদিদেবের পৌত্র "বালবলভীভুজঙ্গ" উপাধিধারী

"গৌড়ের ইতিহাস"—রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রথমখণ্ড, হিন্দু রাজত্ব ১৪৪-১৫০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। বাঙ্গলার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথমখণ্ড ২৭৩ পৃষ্ঠা। Epigraphia Indica. Vol, VI, P. P. 2057

ভবদেবভট্ট দীর্ঘকাল হরিবর্ম্মদেবের মন্ত্রী ছিলেন। এবং তাঁহার পরে তাঁহার পুত্রেরও উপদেশদাতা ছিলেন। দ্বিতীয় ভবদেবভট্ট রাঢ়দেশে একটি জলাশয় খনন করাইয়াছিলেন এবং ভুবনেশ্বর নারায়ণ, অনন্ত ও নরসিংহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন।

এই শিলালিপির অক্ষর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া ইহা স্থিরীকৃত হইয়াছে যে বিহারে আবিষ্কৃত বৈদ্যদেবের তাম্রশাসন অপেক্ষা হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনের অক্ষর প্রাচীন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের যত্নে নেপালে হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকালে লিখিত দুইখানি হস্ত-লিখিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রথম খানি "অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা", ইহা হরিবর্ম্ম দেবের উনবিংশ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হইয়াছিল। দ্বিতীয়খানি কালচক্রযান টীকা, ইহার নাম বিমলপ্রভা, ইহা হরিবর্ম্মদেবের ৩৯শ রাজ্যাঙ্কে লিখিত হইয়াছিল। নূতন আবিষ্কার না হইলে হরিবর্ম্ম দেবের রাজত্বকাল নির্ণীত হইতে পারে না। তবে ইহা স্থির যে, হরিবর্ম্মদেব শ্যামলবর্ম্মা অথবা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী কালে আবির্ভূত হন নাই এবং বজ্রবর্ম্মা বা জাতবর্ম্মার পূর্ব্ববর্ত্তী নহেন।"

নৃপতি হরিবর্ম্মা "নিখিল-শাস্ত্র-নিপুণ, বিশ্ববিখ্যাত সপ্ত সচিবের সাহায্যে স্বীয় এবং পরকীয় রাষ্ট্রের সর্ব্বকার্য্য সুসম্পন্ন করিতেন। তাঁহার তাম্রশাসন হইতে জানা যায়— "মহারাজাধিরাজ জ্যোতিবর্ম্ম পাদানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বরপরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীহরিবর্ম্মদেব বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু বলেন,—"ভবভূমিবার্ত্তা ও ভবদেবের প্রশস্তি হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, বঙ্গাধিপ হরিবর্ম্ম দেবের সময়ে বৌদ্ধ ও জৈনগণ প্রবল ছিলেন। হরিবর্ম্মা অস্ত্রবলে এবং ভবদেব শাস্ত্রীর যুক্তি বলে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। যেমন বঙ্গাধিপ গোবিন্দচন্দ্রের সময়ে দক্ষিণাপথ-পতি জৈনধর্ম্মানুরাগী রাজেন্দ্র-চোল রাঢ় বঙ্গ আক্রমণ করেন, হরিবর্ম্মদেবের হস্তে তাঁহারা পরাজিত হন। খুব সম্ভব সেই সময়েই হরিবর্ম্মা কলিঙ্গ পর্য্যন্ত অধিকার করেন এবং ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে ১০৮ দেব মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। * * *

বৌদ্ধ ও জৈন প্রভাব

হরিবর্ম্ম দেবের রাজত্বকালে বঙ্গভূমি বৌদ্ধ প্রভাব শূন্য হইতে পারে নাই, এই সময়ে বহু সংখ্যক বৌদ্ধাচার্য্য হরিবর্ম্মদেবের অধিকার মধ্যে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের হস্তলিখিত বা রচিত গ্রন্থ এখনও নেপাল হইতে বাহির হইতেছে। তিব্বতের টেঙ্গুর গ্রন্থ মধ্যেও হরিবর্ম্মদেবের সময়ে রচিত বহু বৌদ্ধতন্ত্রের অনুবাদ পাওয়া যাইতেছে। ঐ সকল প্রমাণ হইতে মনে হয় যে, প্রথম প্রথম হরিবর্ম্মদেব বৌদ্ধদিগের প্রতিকূলতাচরণ করেন নাই, ক্রমে ক্রমে নিজ আধিপত্য বিস্তারের সঙ্গে ভবদেব ভট্ট প্রভৃতি স্মার্ত্ত বা মীমাংসকগণের পরামর্শে তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ প্রভাব খর্ব্ব করিতে যত্নবান্ হইয়াছিলেন।"

হরিবর্ম্মদেবের রাজত্বকাল লইয়া নানারূপ গোলযোগ চলিতেছে। বিলহর্ণের মতে ১২০০ খৃষ্টাব্দের সমসমায়িক। তিনি ভবদেব ভট্টের প্রশস্তির লিপিকাল হইতে উহা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার কাহারও কাহারও মতে হরিবর্ম্মার রাজত্বকাল ১০২৫—১০৬৭ পর্য্যন্ত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ও শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালীর মতে হরিবর্ম্মা ভোজবর্ম্মার পরবর্ত্তী কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের মতে তিনি বজ্রবর্ম্মার ও পূর্ব্ববর্ত্তী। *

'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় বলেন—"কোন্ সময়ে কিরূপ ঘটনা চক্রে হরিবর্ম্মার অনামক পুত্রের অধিকার বঙ্গদেশ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছিল, এবং কোন্ সুযোগে যাদববর্ম্ম বংশ, বঙ্গের শাসন দণ্ড গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা অবগত হইবার কোন উপায় অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। বেলাব-লিপিতে এই বর্ম্মবংশের যেরূপ পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, যযাতির বংশে এই রাজ বংশের উদ্ভব এবং বজ্রবর্ম্মা হইতে এই বংশের ধারাবাহিক পরিচয় আরম্ভ।" স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বলেন—"রাজেন্দ্র চোল, দ্বিতীয় জয়সিংহ, অথবা গাঙ্গেয় দেবের সহিত এই যাদব বংশজাত বজ্রবর্ম্মা নামক জনৈক সেনাপতি উত্তরাপথের পশ্চিমার্দ্ধ হইতে পূর্ব্বার্দ্ধে আসিয়া একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন।" *

আমরা রাজা হরিবর্ম্মদেবের ৪২ বর্ষাঙ্কিত ফরিদপুর জেলার সামন্তসার গ্রামে প্রাপ্ত একখানি অসম্পূর্ণ তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি (১) হরিবর্ম্মার পিতা জ্যোতিবর্ম্মা ছিলেন। (২) বালবল্লভীভুজঙ্গ ভবদেবভট্টের পিতা। গোবর্দ্ধন ইঁহার সভাপণ্ডিত ছিলেন। (৩) হরিবর্ম্মা **বিক্রমপুর** সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবার হইতে এই তাম্রশাসন প্রদান করেন। (৪) হরিবর্ম্মা পরম-বৈষ্ণব-পরমেশ্বরপরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। (৫) তাঁহার প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতী পঞ্চকুসুম শৈল উপরি নিচক্র বিষয়ের বড় পর্ব্বত গ্রামে ছিল। (৬) স্ব শ্রী ত্রিষষ্ট্যাধিকষড়্-দ্রোণ্যুপেতহলভূমৌ শব্দে বোধ হয় প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ প্রকাশিত হইয়াছে। (৭) বাৎস্য-গোত্রীয় ভার্গব-চ্যবন আপ্নুবৎ ঔর্ব্ব জামদগ্ন্য প্রবর ঋগ্বেদ আশ্বলায়ন শাখাধ্যায়ী ভট্টপুত্র জয়বাচি শ্রীদেবের প্রপৌত্র, ভট্ট পুত্র বেদগর্ভ শর্ম্মার পৌত্র, ভট্টপুত্র পদ্মনাভের পুত্র ভট্টপুত্র বেদার্থ বাচিক শ্রীকৃষ্ণধর মিশ্রকে তাম্রশাসন লিখিত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—রাজন্যকাণ্ড ২৮৪-২৮৫ পৃষ্ঠা The Dacca Review, 1912. July. P. 138 প্রবাসী ১৩২০ ৪৫৭ পৃষ্ঠা।

* বাঙ্গালার ইতিহাস ২৮৬ পৃষ্ঠা।

হরিবর্ম্মদেব নিজ রাজত্বের ৪২ বৎসরে এই তাম্রশাসন প্রদান করেন। এই তাম্রশাসনেও চট্ট ভট্ট জাতির উল্লেখ আছে।

রামচন্দ্র কবিশেখর রচিত ভবভূমিবার্ত্তা পাঠে জানা যায়: (ক) হরিবর্ম্মা প্রথম অবস্থায় দাক্ষিণাত্যের নরপতি ছিলেন, পরে **বিক্রমপুরে** রাজ্য স্থাপন করেন। (খ) বালভট্ট, গর্গ ভট্টাচার্য্য, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি বিশ্ববিখ্যাত সাতজন পণ্ডিত হরিবর্ম্মার সভা সমলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। (গ) হরিবর্ম্মা একাম্রকাননে অর্থাৎ ভুবনেশ্বরে হরিহর ব্রহ্মা সীতা, রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান প্রভৃতি অষ্টোত্তর শত বিগ্রহ, বহু সংখ্যক মন্দির ও সরোবর প্রতিষ্ঠা করেন। (ঘ) অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ প্রভৃতি দেশে হরিবর্ম্মার ধর্ম্ম-কাহিনী বিস্তারিত হইয়াছিল।

সুলতান মামুদের ভারত-অভিযানের সময় তিনি যখন কনোজ আক্রমণ করেন "সে সময়ে সেখানকার অনেক ব্রাহ্মণ পলায়ন করিয়া বঙ্গদেশে আগমন করেন।

বৈদিক ব্রাহ্মণদের আগমন

হরিবর্ম্ম দেব তাঁহাদিগকে আশ্রয় দান করেন। এই সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে গঙ্গাপতি বৈষ্ণব মিশ্র একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। ইনি কান্যকুব্জের কর্ণাবতী সমাজে বাস করিতেন। নানাস্থান ভ্রমণ করিয়া কোটালিপাড়া নামক স্থানে আপন বাসস্থান মনোনীত করেন [৯৪০ শক]। কনোজ রাজ্য হইতে সমাগত ব্রাহ্মণেরা পাশ্চাত্য বৈদিক নামে খ্যাত। হরিবর্ম্মা হিন্দুধর্ম্মের উৎসাহদাতা এবং জৈন ও বৌদ্ধদিগের "শর্ম্মসংমর্দ্দনকারী" ছিলেন। ভবভূমিবর্ত্তায় লিখিত আছে যে, হরিবর্ম্মা নগেন্দ্র পত্তনাদি জয় করিয়াছিলেন, এবং জননীর বারাণসী গমন পূর্ব্বক, বিশ্বেশ্বর পাদপদ্ম দর্শনেচ্ছা শ্রবণ করিয়া, তাঁহার স্বচ্ছন্দগমনের জন্য একটি সুপ্রশস্ত বর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কোথা হইতে কতদূর পর্য্যন্ত এই বর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছিল, তাহার কোন উল্লেখ নাই। হরিবর্ম্মদেব ১০৫৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন।"

"হরিবর্ম্মদেব অসাধারণ পরাক্রমশালী ছিলেন। দক্ষিণাপথাধীশ্বর দিগ্‌বিজয়ী জৈন রাজা রাজেন্দ্রচোল গৌড়-বঙ্গ-রাঢ় ও দণ্ডভুক্তিকা জয় করিতে এই সময় আগমন করেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রকে পরাজিত করিলেও হরিবর্ম্মদেবকে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

অনেকে অনুমান করেন বিক্রমপুর-রামপাল হইতে যে সুপ্রশস্ত রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে, তাহাই হরিবর্ম্মার রাস্তা।

গৌড়ের ইতিহাস—শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী প্রণীত প্রথমখণ্ড ষষ্ঠ অধ্যায়—১৪৪-১৪৭ পৃষ্ঠা। ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, ২৭৬ পৃষ্ঠা।

বিষ্ণু মূর্ত্তি—পাঁচগাঁ

বিষ্ণু মূর্ত্তি—গারুডগাঁ

বাসুদেব—বাঘড়া
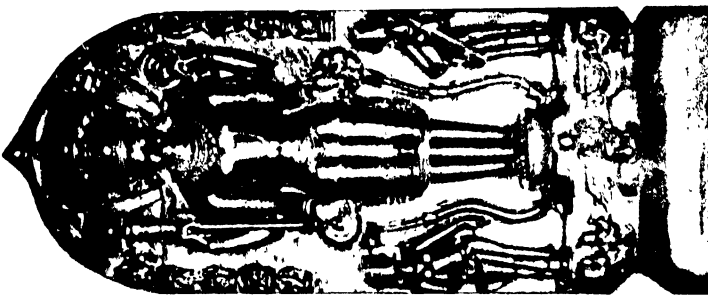
বেলাব-লিপি আবিষ্কারের পর হইতেই বর্ম্মরাজগণের সম্পর্কে আমরা প্রকৃত ঐতিহাসিক সত্য জানিতে সক্ষম হইয়াছি। মিঃ অ্যাস্কলি সাহেব যথার্থই লিখিয়াছেন:— [Historically we are given a clue to the origin of the Varma dynasty of Vikrampur, the line of descent is traced from the first king Bajravarman, through Jait varma and Syamala varma to Bhoja varma, the 4th representative of the dynasty. Much of this Information is new, and, to the best of my knowledge, it forms the first connected account of any historical facts in Bikrampur, previus to the Sen dynasty.] বর্ম্ম রাজাদের সময় বিক্রমপুরের রাজ্য সীমা কতদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল এইবার সে বিষয়ে আলোচনা করিতেছি। সম্ভবতঃ বিক্রমপুরের রাজ্য-সীমা সে সময়ে উত্তর দিকে সুবর্ণগ্রাম বা সোনারগাঁর প্রায় কুড়ি মাইল উত্তর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মিঃ অ্যাস্কলি সাহেবের মতে—"In all probability the Kingdom must have extended to the first natural physical boundary of the old Brahmaputra near Rampur Hat this brings us in dangerous proximity to the old remains of the Lakhma, and Banar Rivers. The extent of the Kingdom opens up a vast field for future enquiry; for we now find that at least the whole area of Sunargaon, which in the time of Bara Bhuiya as was under the Sway of Isha Khan, must be added to the Bikrampur of Chand Ray and Kedar Ray, to form the Kingdom of the Varma dynasty."—সম্ভবতঃ বর্ম্মরাজাদের সমকালে বিক্রমপুরের রাজ্যের সীমা রামপুরহাটের নিকটবর্ত্তী প্রাচীন ব্রহ্মপুত্র নদের তীর পর্য্যন্ত প্রাকৃতিক সীমা রূপে নির্দ্দিষ্ট ছিল। লক্ষ্যা ও বানার নদীর প্রাচীন গতি-প্রবাহও বোধ হয় ঐদিকেই ছিল। সমুদয় সুবর্ণগ্রাম ও বর্ম্ম-রাজাদের রাজ্যের অন্তর্ভূত ছিল। বারভূঁইয়াদের সময়ে সুবর্ণগ্রাম ঈশাখাঁর অধিকারভুক্ত ছিল, পরে উহা চাঁদরায় কেদার রায়ের রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। বর্ম্মরাজাদের সময়ে সুবর্ণগ্রাম যে তাঁহাদের রাজ্যভুক্ত ছিল সে বিষয়ে আমাদের সন্দেহ করিবার কোনও কারণ বিদ্যমান নাই।

বর্ম্মরাজাদের বিক্রমপুর রাজ্য সীমা

বর্ম্মবংশ বিক্রমপুর হইতে কি ভাবে কোন্ সময়ে লোপ পাইল তাহা নির্ণয় করা

কঠিন। ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় এই রাজবংশের নিম্নলিখিত রূপ বংশ-তালিকা প্রকাশ করিয়াছেন :—
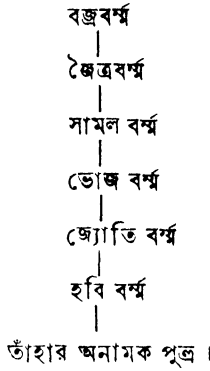
এবং তাঁহার মতে হরিবর্ম্ম দেবের পুত্রের সময় বিক্রমপুরের বর্ম্ম রাজ্যের অবসান হয় এবং সেন রাজাদের করতলগত হয়। [The dynasty perhaps came to an end with the son of Hariburman and the Sovereignity of Vikrampura passed into the hands of the Sena kings]. কুলপঞ্জীর মতে হরিবর্ম্মার ১০৭২ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুরে রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। বর্ম্মরাজাদের তিনজন নৃপতি আনুমানিক ৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বিক্রমপুরে স্বাধীন ভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে গৌড়ের পালরাজাদের পূর্ব্ববঙ্গে কোনও প্রভাবই ছিলনা বলিয়া জানা যায়।

ভোজবর্ম্ম দেবের বেলাবলিপি হইতে জানা যাইতেছে যে—সিদ্ধলের সাবর্ণ ব্রাহ্মণেরা মধ্যদেশ কনোজ হইতে এ সময়ে বঙ্গদেশে আসেন। ডাঃ ভট্টশালী মহাশয় ইহার দ্বারা পঞ্চ ব্রাহ্মণের বঙ্গদেশে আগমনের সম্ভাবনার ইঙ্গিত করিয়াছেন। *

সপ্তম অধ্যায়

স্বাধীন সেনরাজবংশ—বিজয়সেন-বিক্রমপুর

বিক্রমপুরের ইতিহাসের সহিত সেনরাজবংশের নাম বিশেষ ভাবে বিজড়িত। আমরা বাল্যকালে পাল, চন্দ্র, বর্ম্ম, বংশীয় রাজাদের কথা শুনি নাই, কিন্তু সেনরাজাদের কথা শুনিয়াছি; বিশেষ করিয়া নৃপতি বল্লালসেনের সম্বন্ধে প্রাচীন ও প্রাচীনা-

* The Dacca Review Vol 2 No. 4 July, 1912 Pages 128—129.

দের মুখে কতরূপ অদ্ভুত গল্পই না শুনা গিয়াছে। কতদিন আষাঢ়ের সন্ধ্যায় দিদিমার মুখে বল্লালের নানা অদ্ভুত কীর্ত্তি কাহিনীব কথা, কত যুদ্ধ-বিগ্রহের কথা শুনিয়াছি। বল্লালসেনের নাম বিক্রমপুরবাসীর কাছে কতই না বিচিত্র স্বপ্নরাজ্যের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছে।

ঐতিহাসিকেরা বলেন—সেনবংশীয় রাজগণের পূর্ব্ব পুরুষ কবে কোন্ শুভ মুহূর্ত্তে বাঙ্গলাদেশে আসিয়াছিলেন, তাহা আজ পর্য্যন্তও সঠিক্ ভাবে জানা যায় নাই। সেন রাজগণের যে সমুদয় তাম্রলিপি ও শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে—তাঁহারা কর্ণাট দেশবাসী চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় ছিলেন।

সেনরাজাদের পূর্ব্বকথা

স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় "গৌড়রাজ মালার" উপক্রমণিকায় সেন রাজাদের কথা লিখিতে যাইয়া লিখিয়াছেন"—সেনরাজ বংশ বাঙ্গালার শেষ হিন্দু রাজবংশ হইলেও, কিরূপে সে রাজবংশ এদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহা এখনও তমসাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। অন্ধকার ভেদ করিয়া, ঐতিহাসিক তথ্যের আবিষ্কার সাধন করিবার উপযোগী অধিক প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। জনশ্রুতি এই রাজবংশকে নানা কল্পনা জল্পনার আধার করিয়া তুলিয়াছে। এই রাজবংশের অধঃপতন কাহিনীর ন্যায় ইহার অভ্যুদয় কাহিনীও প্রহেলিকাপূর্ণ হইয়া রহিয়াছে।"

কথা কয়টি অতি সত্য।

সেনরাজ বংশের প্রকৃত পক্ষে প্রতাপশালী প্রথম রাজা বিজয়সেন দেবের [রাজসাহীর অন্তর্গত দেবপাড়ায় প্রাপ্ত] প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দির-লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায় :—

> বংশে তস্যামরস্ত্রীবিতরতকলা সাক্ষিণো দাক্ষিণাত্যে—
> ক্ষৌণীন্দ্রৈর্ব্বীরসেন প্রভৃতিবভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্ব্বভূবে।
> যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচর্যোয় শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
> পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসর প্রীণনায় প্রণীতাঃ॥

উমাপতি ধরের এই বাক্যে জানা যাইতেছে—সেন বংশ, কৌরব বা পাণ্ডব-বংশ হইতে উৎপন্ন।

লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন হইতেও জানিতে পারি :—

> "পৌরাণীভিঃ কথাভিঃ প্রথিত গুণগণে বীরসেনস্য বংশে
> কর্ণাট ক্ষত্রিয়ানামজনি কুলশিরোদাম সামন্ত সেনঃ॥
> কৃত্বা নির্ব্বীর মুর্ব্বীতল মবিকতরাস্তু পাতানাক নদ্যাং
> নির্ম্মিক্তো যেন যুব ত্রি পুরুধিরকণা কীর্ণবীরঃ
> কৃপাণঃ॥"

এই কয়েকটী শ্লোক হইতে জানিতে পারা যায় যে সেন রাজারা "দাক্ষিণাত্য ক্ষৌণীন্দ্র বীরসেনের বংশসম্ভূত।" 'বল্লাল-চরিতের' দ্বাদশ অধ্যায়ে এই বীরসেনের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে।*

'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা সেনরাজবংশের প্রবর্ত্তকের নাম বীরসেনের কথা বলিতে যাইয়া লিখিয়াছেন:—"বীরসেন দাক্ষিণাত্য-ক্ষৌণীন্দ্র ছিলেন, এবং চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেন।"

বীরসেন

স্কন্দপুরাণের সহ্যাদ্রি খণ্ডে বীরসেন নামক এক দাক্ষিণাত্য বীরের নাম আছে; যথা—

"সৌমিনীদেবতাভক্তঃ শাণ্ডিলাখ্য-ঋষেঃ কুলে।
মহারাজ ইতি খ্যাতস্ততোহভূত্ত বশঙ্করঃ।
তদন্বয়ে চক্রবর্ত্তী দ্যুমৎসেন ইতীরিতঃ।
তদন্বয়ে বীরসেনঃ কান্তিমালী ততোহপি চ॥"

সহ্যাদ্রিখণ্ডে পূর্ব্বার্দ্ধে ৩৪।২৫-২৬ শ্লোঃ।

হাণ্টার সাহেব মনে করেন, বীরসেন অযোধ্যা হইতে বাঙ্গালায় আগমন করেন। দেবীপুরাণে "অযোধ্যায়" বীরসেন নামক রাজার নাম আছে। আনন্দভট্টের "বল্লাল-চরিতে" আছে—বীরসেন কর্ণের বংশে জন্ম পরিগ্রহ করেন, এবং অঙ্গদেশ হইতে গৌড়ে আগমন করেন। * ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বীরসেন নামক অনেক রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। "হর্ষ-চরিতে" আছে-রাজ-গজাধ্যক্ষ স্কন্দগুপ্ত হর্ষবর্দ্ধনকে বলিতেছেন, মহাদেবীর গৃহের গূঢ় ভিত্তিতে লুক্কায়িত থাকিয়া মহাদেবীর ভ্রাতা বীরসেন স্ত্রী-বিশ্বাসী কলিঙ্গ-রাজের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। "হর্ষচরিতেই" সৌবীরপতি অন্য এক বীরসেন নাম পাওয়া যায়। এই সকল বীরসেন—সেনবংশের পূর্ব্ব পুরুষ নহেন; উমাপতি ধর স্পষ্ট লিখিয়াছেন,—বীরসেন দাক্ষিণাত্য—ক্ষৌণীন্দ্র ছিলেন। সেন রাজবংশীয় অনেক রাজা শঙ্কর গৌড়েশ্বর উপাধি ধারণ করিতেন; ইহাতে বোধহয়, সহ্যাদ্রি খণ্ডে যে বীরসেনের নাম আছে, তিনিই সেনবংশের পূর্ব্বপুরুষ।" বলা বাহুল্য ইহা বিচার সহ নহে, অনুমান মাত্র।

বীরসেনের বংশে সামন্তসেন জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবতঃ সামন্ত সেনের পূর্ব্ববর্ত্তী সেন নৃপতিরা রাঢ়দেশে বাস করিতেন। কাটোয়া হইতে ছয় মাইল দূরবর্ত্তী সীতাহাটি গ্রামে আবিষ্কৃত বল্লাল সেন দেবের তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় যে তাঁহার (সেই চন্দ্রদেবের) সমৃদ্ধ বংশে অনেক রাজপুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশ্বনিবাসীগণকে নিরন্তর অভয় দান করিয়া বদান্য বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন; এবং ধবল কীর্ত্তিতরঙ্গে আকাশ তলকে বিধৌত

সামন্ত সেন

Journal and Proceedings of the Asiatic Society of Bengal. Vol. V. New series P. 471.

করিয়াছিলেন। তাঁহারা সদাচার পালন-খ্যাতি গর্ব্বে গর্ব্বান্বিত রাঢ় দেশকে অনন্যভূত [অশ্রুতপূর্ব্ব] প্রভাবে বিভূষিত করিয়াছিলেন।"

"তাঁহাদিগের বংশে,—প্রবল প্রতাপান্বিত, সত্যনিষ্ঠ, অকপট, করুণাধার, শত্রু-সেনা সাগরের প্রলয়-তপন, **সামন্ত সেন** জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি কীর্ত্তি-জ্যোৎস্নায় সমুজ্জ্বল শোভাপ্রাপ্ত হইয়া প্রিয়জনরূপ কুমুদ-বনের উল্লাস-লীলা সম্পাদক শশধর রূপে প্রতিভাত হইতেন; এবং আজন্ম স্নেহপাশ-নিবদ্ধ বন্ধুগণের মনোরাজ্যে সিদ্ধি প্রতিষ্ঠার শ্রীপর্ব্বতের ন্যায় বিরাজমান ছিলেন।

আমরা পূর্ব্বে দেবপাড়া গ্রামে আবিষ্কৃত প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দিরের শিলালিপি হইতে জানিতে পারি যে "সামন্ত সেন কর্ণাট লক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারী দস্যুগণকে একাকী বধ করিয়াছিলেন। সামন্ত সেন বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাতীরে হোমধূম-সুগন্ধী ঋষিগণের বাস স্থানে বিচরণ করিতেন। সামন্ত সেনের কোন খোদিত লিপি বা তাম্রশাসন অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। তাঁহার পত্নীর নামও সেন রাজগণের কোনও লিপিতে দেখা যায় না।

সামন্ত সেন শেষ বয়সে গঙ্গা-পুলিনে আসিয়া বাস করেন যথা:—

"উদ্গন্ধীন্যাজ্য ধূমৈর্ম্মৃগ শিশুরসীতখিন্ন বৈখানসস্ত্রী
স্তন্য ক্ষীরাণি কীর-প্রকর-পরিচিত ব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্তে শেষ বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্ম্মস্করীন্দ্রৈঃ
পুর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি।

সামন্ত সেনকে "ব্রহ্মপারায়ণানি" বা ব্রহ্মবাদী বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ তিনি কর্ণাট হইতে রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া আসিয়া, গঙ্গাতীরে বাস পূর্ব্বক শেষ বয়স ধর্ম্মচিন্তায় অতিবাহিত করেন। প্রথম ভবদেব ভট্ট সামন্তসেনের মন্ত্রী ছিলেন। অনেকে অনুমান করেন, সামন্ত সেন হইতে নবদ্বীপের পত্তন হয়।"

সামন্ত সেন হইতে হেমন্ত সেন দেব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বৃষভলাঞ্ছন মহাদেবের পদপঙ্কজে ভ্রমরবৎ [লীন] থাকিতেন। গুণগ্রামই তাঁহার অহঙ্কার ছিল। তিনি [সরোবর-শোভা বিধ্বংসী] হেমন্ত কালের ন্যায় মাত্র সরোবরের প্রলয় বিধান করিতেন।" দেবপাড়ার শিলা-লিপিতে হেমন্ত সেন সম্বন্ধে ও এইরূপ লিখিত আছে যে তিনি:—

হেমন্ত সেন

"অচরমপরমাত্মজ্ঞানভীত্যাদমুষ্মা-
ন্নিজভুজমদমত্তা রাতিমারাঙ্কবীরঃ।
অভবদন বসানোজ্জিন্ন নির্ণীক্ত তত্তদ্
গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্ত সেনঃ।

নিজ ভুজমদমত্ত অরাতিগণকে বিনাশ করিয়া তিনি বীরত্ব প্রদর্শ করিয়াছিলেন।

হেমন্ত সেনের পত্নীর নাম ছিল যশোদেবী।

যথা :—

"ম—হারাজ্ঞী যস্য স্বপর নিখিলান্তঃ পুরবধূ-
শিরোরত্ন শ্রেণী কিরণ সরণি স্মের চরণা।
নিধিঃ কান্তেঃ সাধ্বী-ব্রতবিতত নিত্যোজ্জ্বল যশা
যশোদেবী নাম ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ।

কুলজীগ্রন্থে লিখিত আছে যে হেমন্ত সেন,—সুবর্ণরেখাতীরে কাশীপুরীতে রাজত্ব করিতেন। সেখান হইতে দক্ষিণ বঙ্গ দিয়া আসিয়া পূর্ব্ববঙ্গাধিকার করেন। মেদিনীপুর জেলার কাশীয়াড়ির প্রাচীন নাম কাশীপুরী। ঈশ্বরের বৈদিক কুলপঞ্জী হইতে জানা যায়, হেমন্ত সেনের নামান্তর ত্রিবিক্রম। রামদেবের বৈদিক কুলমঞ্জরীতে হেমন্ত সেন ত্রিবিক্রম নামে অভিহিত হইয়াছেন। *

হেমন্ত সেন হইতে **বিজয় সেন** নামধেয় পৃথ্বীপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র নরপালগণের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া অকৈতব [ছল শূন্য] বিক্রমে সাহসাঙ্ক [বিক্রমাদিত্যকে] তিরস্কৃত করিয়াছিলেন; তাঁহার যশোগীতি দিক্‌পাল গণের রাজনগরীতে কীর্ত্তিত হইত"।

বিজয় সেন—শ্রীবিক্রমপুর

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"বিজয় সেনই সেনরাজ বংশের প্রথম স্বাধীন নরপতি। অনুমান হয় যে, বিজয় সেন প্রথমে রাঢ়দেশের অংশ বিশেষের এবং পরে সমগ্র রাঢ় দেশের অধিপতি হইয়াছিলেন। উৎকলরাজ অনন্ত বর্ম্মা চোড়গঙ্গ যখন গৌড় রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন তখন বিজয় সেন বোধ হয় পালবংশীয় গৌড়েশ্বরের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন। যুদ্ধান্তে বোধ হয় সমগ্র উত্তর রাঢ়া ও দক্ষিণ রাঢ়া তাঁহার করতলগত হইয়াছিল। **বিজয় সেনই বোধ হয় পূর্ব্ববঙ্গে** বর্ম্ম বংশীয় ভোজবর্ম্মা অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীর অধিকার লোপ করিয়াছিলেন। পাল বংশীয় গৌড়েশ্বর গণের সহিত সেন বংশীয় রাজগণের প্রীতি বন্ধন ছিল না, কারণ রামপাল যখন দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবা সাহায্য ভিক্ষাব জন্য দেশ ভ্রমণ করিতেছিলেন, তখন সেন রাজগণ তাঁহাকে সাহায্য করেন নাই। তাঁহারা কৈবর্ত্তবিদ্রোহ দমনে যোগদান

বিজয় সেন কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গ অধিকার

* About the time of the Kaivarta rebellion (C. A. D. 1080) or a few years later, Chorganga the powerful king of Kalinga (A D. 1076), extended his conquests to the extreme north of Orissa. Either a chief named Samanta Deva who came from the Deccan, and probably was an officer of Choraganga, or Samanta Deva's son Hemantasen, founded a principality at Kasipuri, now Kasiari in the Mayurbhanja State. Neither of those chiefs seems to have acquired extensive power. V.A. Smithis Early History of Northern Inda, P. 403 গৌড়ের ইতিহাস, প্রতিভা, ১ম বর্ষ ৯ম সংখ্যা ৪৬৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

করিলে সন্ধ্যাকর নন্দী অবশ্যই রাম-চরিতের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাঁহাদিগের নামোল্লেখ করিতেন।"

বিজয় সেন বীরপুরুষ এবং দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন। বল্লালসেন দেবের তাম্রশাসন হইতে তাহা বেশ সুস্পষ্ট ভাবে জানিতে পারা যায়। "তাঁহার শত্রু বনিতাগণ বিধবা হইয়া পলায়নার্থ বনান্তে ভ্রমণ করিতে করিতে নয়ন-জল-মিশ্রিত কজ্জল-চিহ্নিত হার-মুক্তাদল সমূহ ছিন্ন করিয়া (ইতস্তত:) ভূমিতলে বিক্ষিপ্ত করিলে, তাঁহাদিগের কুশবিক্ষত চরণতলের রুধির লিপ্ত (সেই) মুক্তাফল সমূহ, গুঞ্জামালাধারিণী রমণীয় রমণীগণের স্তনকলসে ঘনালিঙ্গন লোলুপ পুলিন্দগণ (গুঞ্জা-ভ্রমে-লালকুঁচ) সযত্নে চয়ন করিয়া লইত।"

[এই] রাজা অবিনয়ের নিবারকরণ মানসে [স্বয়ং] ধনুর্ব্বাণ হস্তে, কার্ত্তবীর্য্যের ন্যায় প্রতি গৃহে ভ্রমণ করিতেন। তাঁহার অভিষেক-ক্রিয়ায় [উচ্চারিত] মন্ত্রপদ সকল জীব লোককে [সর্ব্ব প্রকার] ঈতি শূন্য করিয়া বিনয় মার্গে সংস্থাপিত করিয়াছিল।"

দেবপাড়া লিপি হইতে জানা যায় যে বিজয় সেন সমগ্র বরেন্দ্রভূমি স্বীয় করতলগত করিয়াছিলেন। বিজয় সেন গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিয়া কামরূপাধিপতিকে দমন করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গ নৃপতিকেও পরাজিত করিয়াছিলেন। কামরূপ ও কলিঙ্গ বিজয়ের পরে বিজয় সেন রাজা, বীর, রাঘব ও বর্দ্ধন নামধেয় নরপতিগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন। বিজয় সেন মিথিলার রাজা নান্যদেবকেও পরাজিত করিয়াছিলেন।*

গৌড়েশ্বরের পরাজয়

বিজয় সেন—"পুরুষোত্তমের [বিষ্ণুর] কান্তা পদ্মালয়ার [লক্ষ্মীর] ন্যায় চন্দ্রশেখরের [মহাদেবের] কান্তা গৌরীর ন্যায়, এই জগদীশ্বরের [বিজয়সেন দেবের] অন্তঃপুর চূড়ামণি প্রধানা মহিষী **বিলাসদেবী** দীপ্তিলাভ করিতেন। তিনি সুতপস্যার পুণ্য ফলে গুণ-গৌরবে অতুলনীয় **বল্লাল সেন** [নামক] পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন।

বিজয় সেন শূরবংশের কন্যা বিলাসদেবীকে বিবাহ করেন, তাঁহার পুত্রের নাম বল্লাল সেন। বিজয় সেন প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন।

*The real founder of the Sena kingdom was Hemanta Sen's son, Vijayasena who reigned from about 1100 to 1165. His wife was a member of the Sura family, and this alliance may have increased his prestige. * * He defeated Navya and Vira, attacked the lord of Gauda, humbled the king of Kamrupa, protected the king of Kalinga, made many lesser rulers captive and sailed his fleet up the Ganges. Of these the lord of Gauda has been identified as Madanapala, who was driven out of Bengal by the Senas * * Vijayasena found Pala territory divided up among a number of Petty dynasties, of which till his time the Senas had themselves been one. Cambridge shorter History Page 148.

বিজয় সেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই তাম্র শাসন খানি প্রচারের জন্য স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঐতিহাসিক মহাশয়ের নিকট বাঙ্গালী মাত্রেই ঋণী থাকিবেন। তিনি এই তাম্রশাসনের বিবরণ ১৩১৯ সালের শ্রাবণ সংখ্যার "প্রবাসী" পত্রিকায় এবং ১৩২০ সালের আষাঢ় সংখ্যা "মানসী" পত্রিকায় প্রকাশিত করিয়াছিলেন। রাখাল বাবু লিখিয়াছেন"—বিজয় সেনের ৩১শ রাজ্যাঙ্কে সম্পাদিত একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বিজয় সেন স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন, এবং বিলাস দেবীর গর্ভজাত তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন পিতৃরাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বিজয়সেনদেবের একখানি শিলালিপি ও একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শিলালিপিখানি পূর্ব্বোক্ত দেবপাড়ার শিলালিপি। ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিজয়সেন প্রদ্যুম্নেশ্বর নামক শিবলিঙ্গের জন্য একটি বৃহৎ মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং তাহার সম্মুখে একটি বৃহৎ হ্রদ খনন করিয়াছিলেন। রাজসাহী জেলার দেবপাড়া গ্রামে এই বৃহৎ হ্রদ তীরে পাষাণ নির্ম্মিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। প্রসিদ্ধ কবি উমাপতি ধর কর্ত্তৃক এই প্রশস্তি রচিত হইয়াছিল এবং ইহা বারেন্দ্রক শিল্পি-গোষ্ঠীচূড়ামণি রাণক শূলপাণি কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বিজয়সেনের তাম্রশাসনখানি কোন্ স্থানে আবিষ্কৃত হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে জনৈক ভদ্র ব্যক্তি ইহা পাঠোদ্ধারের জন্য আমার নিকট আনিয়াছিলেন। পাঠোদ্ধার শেষ হইলে তিনি উহা লইয়া গিয়াছেন এবং প্রতিশ্রুত হইয়াও আমাকে উহার উদ্ধৃত পাঠ প্রকাশ করিবার অবসর প্রদান করেন নাই। এখন শুনিতেছি, ইহা সুমেকার (Schumacher) নামক জনৈক বিদেশীয় ভদ্রলোকের সম্পত্তি তৎকালে এই তাম্রশাসন সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া রাখিয়াছিলাম তদবলম্বনেই নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছি। এই তাম্রশাসনখানির দ্বারা বিজয়সেনদেব তাঁহার মহিষী বিলাসদেবীর কনকতুলা-পুরুষ মহাদানের হোমের দক্ষিণাস্বরূপ পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির খাড়ি বিষয়ের ঘাসসম্ভোগভাট্ট বড়া গ্রামে চারিটি পাটক, কাস্তিজোঙ্গী নিবাসী মধ্যদেশবিনির্গত রত্নাকর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, রহস্কর দেবশর্ম্মার পৌত্র, ভাস্কর দেবশর্ম্মার পুত্র বাৎস্য গোত্রীয়, ঋগ্বেদের আশ্বলায়নশাখাধ্যায়ী ষড়ঙ্গের অনুশীলনকারী উদয়কর শর্ম্মাকে তাঁহার একত্রিংশ রাজ্যাঙ্কে প্রদান করিয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন "বিক্রমপুরোপকারিকামধ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল এবং ইহা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, বিলাসদেবী শূরবংশজাতা।"*

তাম্রশাসনের পরিচয়

আমরা ইহা হইতে এইরূপ অনুমান করিতে পারি যে **বিজয়সেনের ৩১ রাজ্যাঙ্কের পূর্ব্বেই বিক্রমপুরে** বিজয় সেনের রাজ্য এবং রাজধানী সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এবং বর্ম্মরাজগণের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়। এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে বিজয়সেনই বর্ম্মবংশীয় ভোজবর্ম্মা বা তাঁহার উত্তরাধিকারীর হাত হইতে বঙ্গের আধিপত্য হস্তগত করিয়াছিলেন। 'গৌড়রাজমালা' প্রণেতা বলেন, "বর্ম্মবংশের অভ্যুদয় এবং মদনপালের দুর্ব্বলতা নিবন্ধন গৌড়রাষ্ট্র যখন বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তখন সামন্ত সেনের পৌত্র [হেমন্ত সেন ও রাজ্ঞী

বিজয়সেন রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর ও বিক্রমপুর রাজ্য

* বাঙ্গালার ইতিহাস ২৯১-২৯২ পৃষ্ঠা।

যশোদাদেবীর পুত্র] বিজয়সেন বরেন্দ্র ভূমিতে একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হেমন্ত সেন একজন বড় যোদ্ধা ছিলেন। কিন্তু তিনি বাহুবলে গৌড় রাজ্যের কোন অংশ করতলগত করিতে পারিয়াছিলেন কিনা, বলা যায় না। হেমন্ত সেনের পুত্র বিজয় সেন, রাঢ়ে এবং বঙ্গে, বর্ম্মরাজ্যের সহিত প্রতিযোগিতা করিতে অসমর্থ হইয়াই সম্ভবতঃ স্বীয় অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য বরেন্দ্র অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। অথবা হেমন্তসেনই হয়ত বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এবং পরে সুযোগ পাইয়া, বিজয় সেন তথায় স্বতন্ত্র রাজ্য স্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন।"* "গৌড় রাজমালার" এই মত নির্ব্বিবাদে গ্রহণযোগ্য নহে। কেননা হেমন্তসেন যে বরেন্দ্রে আশ্রয় লইয়াছিলেন তাহারা কোনও প্রমাণ নাই।

বিজয় সেন, সেন বংশের প্রধান নৃপতি এবং তাঁহার সময় হইতেই যে রাজ্য বিস্তৃত হয় সেকথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অনেক রাজাই তাঁহার অধীনতা স্বীকাব করেন। বল্লাল সেন স্বকৃত "দানসাগর" গ্রন্থে লিখিয়াছেন :—

বিজয়সেনের আবির্ভাব কাল

"তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রো
দিশি বিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বম্।
শিখরবিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তঃ
প্রণতিপবিগৃহীতা প্রাংশবো রাজবংশাঃ।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অতি প্রাচীন কুলগ্রন্থোক্ত রাঢ়ীয়-বারেন্দ্র-দোষ নামক কারিকায় আছে,—অনেক বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বন করিয়াছিলেন ;—বিজয়সেনের গৌড়াধিকারের পর বৈদিক ব্রাহ্মণদেব চেষ্টায় হিন্দু সমাজে প্রবিষ্ট হন।

উমাপতিধর লিখিয়াছেন, বিজয়সেনের কীর্ত্তিমালা প্রাচেতস্ অর্থাৎ বাল্মীকি কিংবা পরাশরনন্দন বর্ণনা করিতে পাবেন,—আমি কেবল বাক্য পবিত্র করিবার জন্য কিঞ্চিৎ বর্ণনা করিলাম। উমাপতিধর কৃত এই প্রশস্তি-পত্র বারেন্দ্র-শিল্পী-কুলচূড়ামণি রাণক শূলপাণি খনন করিয়াছিলেন [চণ্ডান]। শূলপাণি, ধর্ম্মোপনপ্তা মদন দাসের নপ্তা ও বৃহস্পতির পুত্র ছিলেন। এখন যেমন দলিলে লেখকের নাম থাকে, তখনও সেইরূপ তাম্রশাসনে খনকের নাম থাকিত।

বিজয়সেনের রাজত্ব কালে মহাপ্রতাপশালী চোড়গঙ্গদেব কলিঙ্গাধিপতি ছিলেন। চোড়গঙ্গদেব ৯৯৯ শকে কলিঙ্গের রাজা হন। বিজয়সেনের প্রশস্তিতে লিখিত আছে,

* গৌড়রাজমালা ৩৯ পৃষ্ঠ।

বিজয়সেন কলিঙ্গরাজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। বিজয়সেনের সহ চোড়গঙ্গের বন্ধুত্ব ছিল। বিজয়সেন কলিঙ্গ রাজ্য জয় করিয়া বন্ধু চোড়গঙ্গকে প্রদান করেন, ইহাই সম্ভব। ৯৯৯ শকে বিজয়সেনের বয়স ৪৮ বৎসর ছিল। নীলকণ্ঠ রচিত "যশোধর বংশমালা" নামক বৈদিককুলগ্রন্থ মতে বিজয়সেন ৯০৪ শকে গৌড়ে রাজা হন। বিজয়সেনের নামান্তর ধীসেন, যথা :—

"দ্বিয়া ধীসেনসংজ্ঞোঽহসৌ বিজিতারাতি সংহতিঃ।
বিজয়নামকশ্চাসীৎ সর্ব্বভূমিভুজাং বরঃ।
সাতকড়ি ঘটক কৃত কুলপঞ্জী

বিজয়সেনের [**বৃষভশঙ্করগৌড়েশ্বর**] উপাধি ছিল, উপাধি দেখিলে বোধ হয় তিনি শৈব ছিলেন। "সেকশুভোদয়ায়" লিখিত আছে, তিনি শিবপূজা না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। ১০৪১ শকে ৯০ বৎসর বয়সে বিজয়সেনের মৃত্যু হয়।

'গৌড়রাজমালার' লেখক রায়বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ ডাঃ কিলহর্ণের মতানুসরণ করিয়া সামন্ত সেনকে খৃষ্টিয় একাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে হেমন্ত সেনকে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে এবং বিজয়সেনকে দ্বিতীয়পাদে [আনুমানিক ১১২৫-১১৫০খ্রীষ্টাব্দ] স্থাপিত করিতে চাহেন।

বিজয় সেন যে অমিতবিক্রমশালী বীরপুরুষ ছিলেন সে বিষয় পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। বল্লাল সেনের সীতাহাটি তাম্রশাসনে বিজয় সেনের পরিচয়-প্রসঙ্গে লিখিত হইয়াছে :—"সেই [হেমন্তসেনদেব হইতে বিজয় সেন নামধেয় পৃথিপতি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র নরপালগণের রাজচক্রবর্ত্তী হইয়া অকৈতব [ছল শূন্য] বিক্রমে সাহসাঙ্ক বিক্রমাদিত্যকে তিবস্কৃত করিয়াছিলেন. তাঁহার যশোগীতি দিক্‌পালগণের রাজনগরীতে কীর্ত্তিত হইত।" *

বিজয় সেনের নৌবিতান

দেবপাড়া প্রশস্তি হইতে ইহাও জানিতে পারা যাইতেছে যে বিজয় সেনের নৌ-বিতান বা নৌ-বিহার ছিল। যথা ঃ—

"পাশ্চাত্য জয় চক্র কেলিষু যস্যযাবদ্
গঙ্গা প্রবাহ মনুধাবতি নৌবিতানে
ভগ র্গস্য মৌলি সরিদম্ভাসি ভস্মপঙ্ক
লগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি॥ [দেবপাড়া প্রস্তরলিপি ২২ শ্লোক]

অনেকে অনুমান করেন যে বিজয়সেন সাহসাঙ্ক নামক একজন নৃপতির সহিত যুদ্ধ

* গৌড়ের ইতিহাস ১৬১-১৬২ পৃষ্ঠা। Epigraphia Indica Vol. 1, page 309.

করিয়া বিজয়ী হইয়াছিলেন, এইরূপ অনুমান করা সঙ্গত নহে। আমাদের মনে হয় প্রশস্তিকার ভারত প্রসিদ্ধ বিক্রমাদিত্যের সহিত তুল্য জ্ঞান করিয়া সাহসাঙ্ক নামে পরিচিত করিয়াছেন।

[In verse 7 Vijayasena is qualified by the phrase Nirvayaja Vikrama tiraskrita-Sahasanka which according to Mr. Banerji means-that "Vijayasena defeated a king named Sasanka (Sahasanka). He concludes that Sahasanka is to be identified with a prince called Salvahandndeva, mentioned in a grant of his son Somavarmadeva, which the late Professor Keelhorn referred to about 1050 A. D. But it is doubtful whether the passage in question has any historical bearing at all. The poet seems to indicate by means of a rhetoric that Vijayasena weilded great power (Vikrama) which eclipsed even that of Vikramaditya. This most probably bears an allusion to the mythical hero of that name and not to any of Vijayasena's contemporaries. See Inscriptions of Bengal N. G. Majumdar, Rajshahi, 1929].

অর্থাৎ "পাশ্চাত্য চক্র জয় করিবার জন্য ক্রীড়াচ্ছলে তিনি গঙ্গা-প্রবাহ-পথে যে নৌ-বিতান প্রেরণ করিয়াছিলেন তন্মধ্যে একখানি ভর্গের মৌলিস্থিত গঙ্গার পঙ্কে [মহাদেবের শিরস্থিত] নিমজ্জিত হইয়া ভস্মে ইন্দুকলার ন্যায় জ্বলিতেছে।"

এই নৌ-বিতান বিজয়সেন গঙ্গার বীচিমালা বিক্ষুব্ধ করিয়া কোন্ রাজার বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা জানা যায় নাই।—'গৌড়রাজমালা' প্রণেতার মতে "গৌড়-রাষ্ট্রের পশ্চিমাংশ [পাশ্চাত্য চক্র] জয় করিবার জন্য, তিনি যে 'নৌ-বিতান' প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহা অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। দক্ষিণ দিকে, বঙ্গে এবং রাঢ়ে, বর্ম্মরাজ" কর্ত্তৃক বিজয়সেনের গতি রুদ্ধ হইয়াছিল।

এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে হয় যে "পাশ্চাত্য চক্র জয় করিবার জন্য বিজয়সেনের যে নৌ-বিতান গঙ্গার প্রবাহ পথে প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইবার কোনই প্রয়োজন নাই। বিশেষতঃ বর্ম্মরাজগণের প্রভাব প্রতিহত হইবার পরেই **বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার** হইতে সম্ভবতঃ এই নৌ-বিতান প্রেরিত হইয়াছিল।" 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা যতীন্দ্রবাবুর এই অনুমান আমরা সমর্থন করি। আমাদের ও মনে হয় যে নদী-মাতৃক-দেশ **বিক্রমপুর হইতেই পরবর্ত্তীকালে এই নৌ-বিতান প্রেরিত হইয়াছিল।**

একথা সম্পূর্ণ সত্য যে :—

"It was Vijaya Sen who once for all established the supremacy of the Senas, and practically brought the whole of Eastern India under his sway. It was he who conquered Varendra and Pundra from a Pala king described as Gaudendra in Sena Epigraphs."

বিজয়সেন যে পূর্ব্ব ভারতের বহুস্থান জয় করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ বিদ্যমান নাই। এই নৃপতি বিজয়সেনই গৌড়েন্দ্র উপাধিক একজন পাল-নৃপতির হস্ত হইতে বারেন্দ্র এবং পৌণ্ড্র অধিকার করিয়াছিলেন। *

বিজয়সেনের মন্ত্রী

দায়ভাগ রচয়িতা জীমূতবাহন, বিজয়সেনের অমাত্য ও প্রাড়্‌বিপাক্‌ ছিলেন। বিজয়সেনের এক নাম ছিল বিশ্বক্‌সেন। এড়ু মিশ্রের কারিকায় আছে :—

"পঞ্চ গৌড়ে তদা সম্রাট্‌ বিশ্বকসেনো মহাব্রতঃ।
জীমূতোহপি নৃপামাত্যঃ স প্রাড়্‌বিবাক ঈরিতঃ।

বিজয়সেনের রাজধানী বিজয়পুর ও শ্রীবিক্রমপুর

"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন—"বিজয়সেন, ভূরশুটে **বিজয়পুর** নামক একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন।" অনেকে অনুমান করেন যে রাজসাহীর নিকটবর্ত্তী বিজয়নগর গ্রামই প্রাচীন বিজয়পুর। দেবপাড়া প্রশস্তি অর্থে বিজয়সেনের স্তুতি পূর্ণ শ্লোক সমূহ হইতে বিশেষ করিয়া বিজয়সেন কর্ত্তৃক প্রদ্যুম্নেশ্বর দেবের মন্দির প্রতিষ্ঠার বিষয়ই বর্ণিত হইয়াছে। দেবপাড়া লিপির পরে আমরা বিজয়সেনদেবের যে তাম্রশাসনখানা [বারাকপুর] পাই তাহার ২২-২৩ পংক্তিতে সুস্পষ্ট ভাবে লিখিত আছে :—

"শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ"

কাজেই ইহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে বিজয়সেন বিজয়পুর নামক নগর প্রতিষ্ঠা করিলেও তাঁহার প্রকৃত রাজধানী স্কন্ধাবার শ্রীবিক্রমপুরেই ছিল। যদি তাহা না হইত তাহা হইলে তাঁহার পত্নী বল্লালসেন দেবের জননী বিলাসদেবী "কনক-তুলা-পুরুষ মহাদান' বিক্রমপুরোপকারিকা মধ্যে, করিবেন কেন ?

Samantasen's grandson, Vijayasena, certainly raised himself to the rank of an independent sovereign early in the twelfth century (? A. D. III) and wrested a large part of the Bengal province from the Palas, thus firmly establishing the Sena dynasty. He also carried on successful wars with other powers, and enjoyed a long reign of about forty years, more or less. He kept on terms of friendsbip with Choragang of Kalinga who ruled that kingdom for the extraordinary term of seventy one years. The Early History of India of Vincent A. Smith. Page 103.

'জয়স্কন্ধাবার' শব্দে যে রাজধানী বুঝায় তাহা আমরা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। ডাক্তার কিলহর্ণের (Dr Kielhorn) মতে স্কন্ধাবার [Skandhavara) শব্দে রাজধানীকেই বুঝায়। হেমচন্দ্র কৃত 'অভিধানচিন্তামণিতে' আছে :—

স্কন্ধাবারো রাজধানী কোট্ট দুর্গেঃ পুনঃ সমে।
গয়াযু গয়ারাজর্ষৈ কন্যাকুব্জং মহোদয়ম্॥

হলায়ুধ বলেন :—

স্কন্ধাবারঃ ইতি প্রোক্তৈঃ রাজধানী নিগদ্যতে।
শানানগরমাখ্যাতং তথোপনগরংবুধৈ॥

'স্কন্ধাবার' শব্দ যে চন্দ্র, বর্ম্ম ও সেন রাজগণের তাম্রশাসনেও **'সখলু শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত** শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ বলিতে 'সেনানিবাস' বিক্রমপুরকে না বুঝাইয়া রাজধানী বিক্রমপুরকেই বুঝাইতেছে, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারন নাই। বিজয়সেনের বারাকপুর তাম্রশাসন হইতে জানা যায় যে :—

"**বিক্রমপুরোপকারিকামধ্যে** সতি সোমগ্রহে অস্মন্মহাদেবী শ্রীমদ্বিলাসদেব্যা কনকতুলাপুরুষমহাদানে হোমকর্ম্ম দক্ষিণা……"

স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্তব্য এখনে উদ্ধৃত হইল :—

To this Mr. Majumder had added a lengthy note, suggesting that this passage makes it highly probable that *Vikrampura* was one of the Capitals, if not the capital of Vijayasena; and in our opinion he is right when he says, that *The word upakarika*, it may be argued, means only a temporary camp for royal residence, and not a fixed palace, But the very fact that the queen performed an elaborate *tulapurusha-maha-dana* within the *Vikrampura-upakarika* is itself sufficient to show that Vijayasena had something like permanent residence, and not a temporary camp at Vikramapura. *This together with the fact that the Sena inscriptions invariably mention Vikramapura [as the Skandhavara, uumistakably demonstrates, that it was Vikramapura which was the capital of the Sena kings of Bengal.*

* *Abhidhan chintamani* by Hemchandra, edited by N G. Bhattacharjya Calcutta P, 25. *Abhidhanaratnvmala* by Halayudha, edited by Thomas Aufrecht 1861.

* The Capital of tle sena kings of Bengal. Indian Culture Vol. II NO 9 Adris Banerji.

বল্লালসেন

বিজয়সেনের পর তাঁহার পুত্র বল্লালসেন রাজা হইলেন। তাম্রশাসনে উক্ত হইয়াছে :—পুরুষোত্তমের [বিষ্ণুর] কান্তা পদ্মালয়ার [লক্ষ্মীর] ন্যায়, চন্দ্রশেখরের [মহাদেবের] কান্তা গৌরীর ন্যায়, এই জগদীশ্বরের [বিজয়সেন দেবের] অন্তঃপুর-চূড়ামণি প্রধানা মহিষী বিলাসদেবী দীপ্তি লাভ করিতেন।"

বল্লালসেন

"তিনি সুতপস্যার পুণ্য ফলে গুণগৌরবে অতুলনীয় বল্লালসেন [নামক] পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন। সেই অদ্বিতীয় বীর, নরদেব সিংহ পুত্র পিতার অব্যবহিত পরেই সিংহাসনাদ্রিশিখরে আরোহণ করিয়াছিলেন।"

বল্লালসেনের নাম ইতিহাসে অমর হইয়া আছে। তিনি পিতার উপযুক্ত পুত্র ছিলেন। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে নানা অলীক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, সে সমুদয় যে বিশ্বাসযোগ্য নহে তাহা সুধী ব্যক্তিমাত্রেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। আমাদের দেশে যাঁহারা বড় হন, তাঁহাদিগকে 'অবতার' করিয়া তোলা এবং তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া নানারূপ অলৌকিক কাহিনী রচনা করা আমাদের স্বভাবসিদ্ধ, কাজেই আমরা ঐ সমুদয় কিংবদন্তী ও কুলপঞ্জীর উপন্যাস সযত্নে পরিহার করিলাম।*

ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"বল্লালসেনের রাজ্যকালের কোন ঘটনাই অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই।" একথা সত্য। তাঁহার লিখিত 'দানসাগরে লিখিত সেনবংশ বর্ণনা হইতে জানা যায় :—

"ধর্ম্মস্যাভ্যুদয়ায় নাস্তিক পাদোচ্ছেদায় জাতঃকলৌ।
শ্রীকান্তোহোপি সরস্বতীং পরিবৃতঃ প্রত্যক্ষ নারায়ণঃ।"

বল্লালসেন সম্বন্ধে বিবিধ কিংবদন্তীর মূলে **'প্রত্যক্ষ নারায়ণ'** এই শব্দ দুইটি যে অনেক কাজ করিয়াছে তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। যিনি **'প্রত্যক্ষ নারায়ণ'** তাঁহার জন্মের ইতিহাসে অলৌকিকত্ব আরোপিত হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

বল্লালসেনের আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে নানারূপ তর্ক বিতর্ক ও আলোচনা চলিয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে পণ্ডিতগণ বিবিধ গবেষণার দ্বারা সেনরাজাদের একটা কাল নির্দ্দেশ

* "বল্লালসেনের জন্ম ইত্যাদি সম্বন্ধে যাঁহারা কিংবদন্তী ইত্যাদি জানিতে সমুৎসুক তাঁহারা স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয়ের "সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস," 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রথম খণ্ড শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, 'ঢাকার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড—শ্রীযতীন্দ্রমোহন রায়, সেনরাজ বংশ, শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রতিভা, ১৩১৮, ৪৩২-৪৭৮ পৃষ্ঠা। বিবিধ কুলপঞ্জী, ঢাকুর, রামজয় কৃত বৈদ্যকুল-পঞ্জী, প্রভৃতি দেখিতে পারেন।

করিয়াছেন। তাহা এখানে উদ্ধৃত হইল। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "দান সাগরের" এবং 'অদ্ভুত সাগরের' রচনা-কাল বিজ্ঞাপক শ্লোক গুলিকেও প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করেন। বিক্রমপুর ধলছত্র গ্রাম-নিবাসী বৈদিক ব্রাহ্মণ সুপণ্ডিত ও বাগ্মী স্বর্গত তারকচন্দ্র সাংখ্যসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে বল্লালসেন কৃত একখানি 'দানসাগর' গ্রন্থ ছিল, সেই বই খানা ঢাকার তদানীন্তন কমিশনার মিঃ টী র‍্যাঙ্কিন মহাশয় উক্ত সাংখ্যসাগর মহাশয়ের নিকট হইতে লইয়া গিয়াছিলেন, সেই মূল গ্রন্থখানা বর্ত্তমানে কোথায় আছে তাহা আমরা অবগত নহি, সে বইখানার অনুসন্ধান আবশ্যক, তাহা হইলে হয়ত বা প্রকৃত সত্য কিছু পাইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে।

বল্লালসেনের আবির্ভাব কাল

বর্ত্তমান সময়ে সেনরাজগণের বংশলতা নিম্নলিখিত রূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে :

সেনরাজ বংশলতা
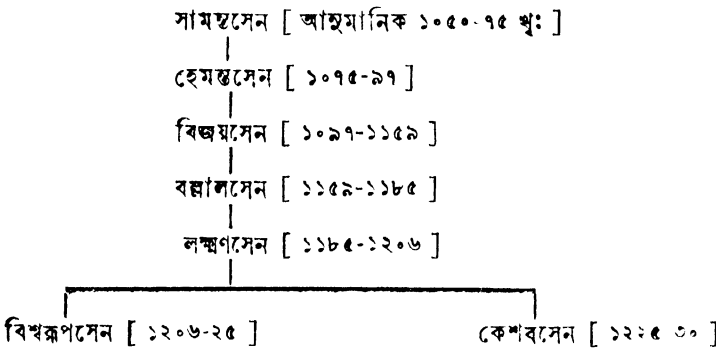
এ বিষয় বাদানুবাদ নিষ্প্রয়োজন। সেন-নৃপতিরা দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে গৌড়-বঙ্গে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। (১) 'দানসাগর' রচনা কাল সম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া সুপণ্ডিত ও বিচক্ষণ ঐতিহাসিক রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ 'গৌড়রাজমালায়' লিখিয়াছেন :—"দানসাগর স্মৃতি নিবন্ধ এবং "অদ্ভুতসাগর" জ্যোতিষের নিবন্ধ। যাঁহারা স্মৃতি ও জ্যোতিষ-শাস্ত্রের অনুশীলন করিয়াছেন, তাঁহারাই এই সকল

*গৌড়রাজমালা, ৬২ পৃষ্ঠা। (1) The Chandra dynasty ruled over the entire realm of Vanga including Samatata, Harikela and Chandra dwipa (Mod. Backergonj District). But they were supplanted by the Varmans in the beginning of the 11th century who in their turn were very soon ousted by the senas. During their rule Vanga was included in Pundravardhan bhukti. Dr. B. C. Law Indian Culture. July 1934. Page 63.

পুস্তকের প্রতিলিপি প্রস্তুত করিতেন বা করাইতেন। স্মৃতি, জ্যোতিষ প্রভৃতি শাস্ত্রের অনুশীলনকারীগণ, গ্রন্থকারের জীবনী সম্বন্ধে বা গ্রন্থের রচনা কাল সম্বন্ধে চিরকালই উদাসীন। সুতরাং কোন কোন লিপিকর, অনাবশ্যক বোধে, আদর্শ পুস্তকের কাল বিজ্ঞাপক রচনা পরিত্যাগ করিয়া থাকিতে পারেন।"

আমাদের নিকট 'গৌড়রাজমালা' প্রণেতার এই মত সমীচীন বলিয়া মনে হয়।

বল্লালের রাজ্য-শাসন দক্ষতা

বল্লালসেন শাসন দক্ষ নৃপতি ছিলেন। তাঁহার নাম বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্তও সমভাবে উচ্চারিত হইয়া আসিতেছে। 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা বলেন "বাঙ্গালার কোন হিন্দু রাজা বল্লাল সেনের ন্যায় প্রসিদ্ধ হন নাই। তাঁহার সম্বন্ধে এই জন্যই নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। কথিত আছে তিনি বাঙ্গালা দেশের শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য বারেন্দ্র, বঙ্গ, বাগ্‌ড়ি, রাঢ়, মিথিলা সমগ্র বঙ্গদেশকে এই পাঁচটী ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন।

নৃপতি বল্লাল শাসন-শৃঙ্খলার জন্য প্রত্যেক বিভাগে এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন। আমরা নিম্নে হেমিল্টনের গ্রন্থ হইতে ঐ বিভাগের বিবরণ উদ্ধৃত করিলাম। তুর্কিগণ কর্ত্তৃক বঙ্গ-বিজয়ের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত যে এই বিভাগ অব্যাহত ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই বলিয়া ব্লকম্যান সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন।" একথা সত্য যে বল্লালের অনেক পূর্ব্ব হইতেই রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড্র, উপবঙ্গ প্রভৃতি নানা ভাগে বিভক্ত ছিল, এবিষয়ে

1. Barendra—bounded by the Mahananda on the west; by Padma, or great branch of Ganges, on the south; by the Korotoya on the East by adjacent Governments on the North.

2. Banga—or the territory east from Krotoya towards the Brahmaputtra. The capital of Bengal both before etc. afterwards, * * * in the province of Banga, the name is said to have been communicated to the whole.

3. Bagri—or the Delta called also Dwipa, or the island bounded, on the one side by the Padma, or the great branch of the Ganges; on another by sea and other bounded by the Hughly River or Bhagirathi.

4. Rarhi—bounded by the Hugli and Padma on the north and east and by adjacent kingdoms on the west and South.

5. Maithila—bounded by the Mahananda and Gour on the east, the Hughli or Bhagirathi on the south and on the west.

Hamilton's Hindusthan Vol. No 1, P. 114.

দ্বিপাড়া গ্রামের প্রাচীন পঞ্চমুখ বিশিষ্ট শিবলিঙ্গ

হজগা গ্রামের প্রাচীন শিবলিঙ্গ
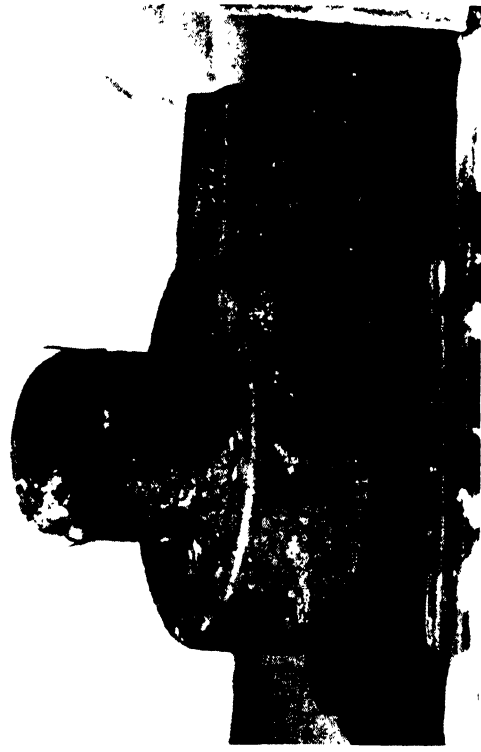
আমরা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছি। "ঢাকার ইতিহাস" প্রণেতা বলেন—"সুতরাং বল্লালসেনকে এই বিভাগের কর্ত্তা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। হেমিল্টন সাহেব কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা জানা যায় না। বল্লালসেন 'গৌড়েশ্বর' উপাধি গ্রহণ করিয়া গৌড়বঙ্গে একাধিপত্য লাভ করিলে তিনি যে শাসনসৌকর্য্যার্থ বিভিন্ন প্রদেশের জন্য পৃথক শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাহা অসম্ভব না হইলেও অদ্যাপি তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এ-বিষয়ে আনন্দভট্ট কর্ত্তৃক বিরচিত 'বল্লাল-চরিতের' পরিশিষ্টে লিখিত আছে :—

"দানসাগর গ্রন্থস্য প্রণেতা লিখিতস্তথা।
বিজয়সেনাত্মজশ্চৈব হেমন্তসেন পৌত্রকঃ।
বিখণ্ডিতং তেন রাজ্যং পঞ্চখণ্ডেন্ তদ্ যথা।
বঙ্গ বাগড়িবারেন্দ্র রাঢ়াশ্চ মিথিলা তথা॥

"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন—"বল্লালসেন রাজা হইয়া আপনার রাজ্য রাঢ়, বারেন্দ্র, বঙ্গ বাগড়ি ও মিথিলা এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন, এবং প্রত্যেক ভাগে এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করেন। লক্ষ্মণ সেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে পূর্ব্ববঙ্গের ভার পান। পূর্ব্ব হইতে গৌড় রাজ্য রাঢ়, বঙ্গ, পুণ্ড্র ও উপবঙ্গ এই কয়টী ভাগে বিভক্ত ছিল। শূর বংশের রাজত্বকালে পুণ্ড্র দেশের বারেন্দ্র নাম হয়। পরবর্ত্তী কালে উপবঙ্গের বাগড়ি নাম হয়। (১) "দিগ্বিজয়প্রকাশ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থে আছে,—

ভাগীরথ্যাঃ পূর্ব্বভাগে দ্বিযোজনতঃ পরে
পঞ্চযোজন পরিমিতোহ্যুপবঙ্গোহি ভূমিপ।
উপবঙ্গে যশোরাদিদেশাঃ কাননসংযুতাঃ
জ্ঞাতব্যা নৃপ-শার্দ্দূলবহুলাসু নদীষু চ॥"

এই উপবঙ্গ নদীও জঙ্গলে সমাচ্ছন্ন ছিল। বোধ হয় বাগুরি বা বাউরি জাতির নামানুসারে বাগড়ি নাম হইয়াছে। উপবঙ্গের গঠনকালে বারংবার আগ্নেয়-উৎপাত ঘটিয়াছিল। কলিকাতা অঞ্চল খনন করিয়া দেখা গিয়াছে, সে-প্রদেশের অরণ্য, অরণ্য-জন্তু সহ বারংবার বসিয়া গিয়াছিল। বঙ্গ ও উপবঙ্গ ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনাদ (মেঘনা) ও গঙ্গার বদ্বীপে গঠিত। রাঢ়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও মিথিলা পূর্ব্ব হইতেই ধন-জন পরিপূর্ণ ছিল; কিন্তু বাগড়িতে মনুষ্যের বাস ছিল না, এই স্থান সমুদ্র-গর্ভ হইতে মস্তক উত্তোলন করিতেছিল। আকবরনামায় ইহার ভাটি নাম দেখা যায়। বাগড়ির দৈর্ঘ্য ৫৫০ মাইল ও বিস্তার ৩১২ মাইল। পূর্ব্বে বিক্রমপুর পদ্মার দক্ষিণে ছিল, তখন ধলেশ্বরী দিয়া পদ্মা প্রবাহিত হইত; অতএব বিক্রমপুর, পূর্ব্বে বাগড়ির অন্তর্গত ছিল। এখন উহা বঙ্গের অন্তর্গত হইয়াছে। বাগড়ির এই অংশই প্রাচীন সমতট।" তাঁহার এই উক্তি প্রমাণসহ নহে।

বল্লালসেনের পক্ষে রাজ্য-শাসনের সুবিধার জন্য এইরূপ বিভাগ করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক এবং তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও হেতু নাই। বল্লালসেন রাজ্যের শাসন-শৃঙ্খলার জন্য রাজ্যকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করিয়াছিলেন, ইহা করা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

'যশোহর খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা বলেন—

"বল্লালসেনের সমগ্র :রাজ্য পাঁচটি প্রধান "ভুক্তি" বা প্রদেশে বিভক্ত ছিল, যথা:—বঙ্গ, মিথিলা বারেন্দ্র রাঢ় ও বাগড়ী, মিথিলার পূর্ব্ব নাম তীরভুক্তি। এই ভুক্তিগুলি পুনরায় "মণ্ডল" বা মণ্ডলিকায় বিভক্ত ছিল। মণ্ডল অতি প্রাচীন হিন্দু শব্দ। ভাগবতাদি পুরাণেও মণ্ডলের কথা আছে। মুসলমান যুগ হইতে মহল বা জেলা শব্দ একই অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে। প্রত্যেক জেলায় যেমন এক্ষণে কতকগুলি করিয়া সবডিভিসন বা উপবিভাগ আছে, সেন রাজত্বে মণ্ডল সমূহ ও সেইরূপ কতকগুলি "বিষয়" বা শাসনে বিভক্ত ছিল। এখনও 'বিষয়' কথা চলিয়া আসিতেছে, ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদার প্রভৃতি "বিষয়ী" লোকে বিষয় কার্য্য দেখে এবং বিষয় রক্ষা করে। দেশে কুশাসন থাকিলেও এখন আর "শাসন" কথার পূর্ব্ব অর্থ নাই, ব্রহ্মশাসন প্রভৃতি গ্রামের নাম পূর্ব্ব শাসনের নাম চিহ্ন রাখিয়াছে।"

বিক্রমপুরে 'শাসন' সংযুক্ত অনেক গ্রাম আছে। এখানে শুধু একটি গ্রামের নাম করিলাম, যেমন 'শাসন গাঁ'।

বল্লালসেনের পূর্ব্বেও এইরূপ বিভাগ ছিল এবং তাহা স্বাভাবিক, কেননা শাসন সৌকর্য্যার্থে এইরূপ বিভাগ ভারতের সর্ব্বত্রই নৃপতিরা করিয়া আসিয়াছেন, কাজেই বল্লালসেনের ন্যায় একজন নৃপতির পক্ষে এইরূপ বিভাগ করিয়া বিভিন্ন খণ্ডরাজ্য বা ভুক্তির জন্য স্বতন্ত্র রাজধানী এবং শাসনকর্ত্তা নিয়োগ করা স্বাভাবিক, ইহাতে বল্লালের কৃতিত্বেরই কারণ রহিয়াছে, অকৃতিত্বের কোনও কারণ বিদ্যমান নাই।

কৌলিন্য প্রথা

বল্লালের নাম একটি কারণে বাঙ্গলাদেশে চিরস্মরণীয় হইয়া আছে, তাহা হইতেছে তৎকর্তৃক কৌলিন্য, বা আভিজাত্য সংস্থাপন। এক সময় বিক্রমপুর-ব্রাহ্মণ সমাজে কৌলিন্যের নিদারুণ পীড়নে সমাজ যখন বিধ্বস্ত হইয়াছিল তখন বিক্রমপুরের গ্রামে-গ্রামে, মাঠে-মাঠে গীত হইত :—

"ভাল কল্লো কস বল্লালীতে,
মিল্লো বর এক কচমা ছেলে।"

কিংবা—

বাঙালী তুই যারে বাংলা ছেড়ে।
ডুবলো ভারত কদাচারে, সোনার বাংলা যায়রে ছারেখারে।

ইত্যাদি গীত শুনা যাইত—এজন্য বল্লালের নাম বিক্রমপুর অঞ্চলে বিশেষ ভাবে স্মরণীয় হইয়া আছে। কৌলিন্যের প্রবর্ত্তক বল্লালসেনের নাম বংশপরম্পরাগত পরিকীর্ত্তিত হইয়া আসিতেছে।

কোন কোন ঐতিহাসিক বল্লালসেন কৌলিন্য-প্রথার প্রবর্ত্তক কিনা সে-বিষয়েই

সন্দেহ করেন। স্বর্গতঃ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই এই সংশয় উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি বলেন—"বল্লালসেনের রাজ্য কালের কোন ঘটনাই অদ্যাবধি নির্দ্ধারিত হয় নাই। কুলশাস্ত্র সমূহে দেখিতে পাওয়া যায় যে বল্লালসেন কৌলিন্য-প্রথার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং, তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন এবং পৌত্র কেশবসেন ও বিশ্বরূপ তাঁহাদিগের তাম্রশাসন সমূহে নব প্রচলিত আভিজাত্য বিধির কোনই উল্লেখ করেন নাই। এবং শাসন-গ্রহীতা ব্রাহ্মণগণের নামোল্লেখ কালেও তাঁহাদের নূতন পদমর্য্যাদা উল্লিখিত হয় নাই, এই কারণে কৌলীন্য প্রথা বল্লালসেন কর্ত্তৃক সৃষ্ট হইয়াছিল কিনা, সে-বিষয়ে সন্দেহ জন্মে।"

বল্লালসেন ও কৌলীন্য প্রথা

এ সম্বন্ধে আমরা রাখালবাবুর অভিমত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। বংশপরম্পরা-গত প্রবাদ ও বিবিধ কুলগ্রন্থ হইতে আমরা এই কৌলিন্য সংস্থাপনের প্রমাণ পাই। সেনরাজগণের তাম্রশাসনে ইহার উল্লেখ নাই বলিয়াই যে ইহা অবিশ্বাস্য এবং কুলশাস্ত্রে অনেক সময়ে অতিরঞ্জিত কথা থাকে বলিয়াই যে তাহার সমুদয় অংশই পরিত্যজ্য তাহা নহে।

"বল্লালী কুলপ্রথা বলিতে কোন জিনিষ ছিল না, এরূপ বলা যায় না। দেশশুদ্ধ পণ্ডিত ঘটকেরা একেবারে বায়বীয় মন্দির গঠন করিয়াছেন, এরূপ কল্পনা করা অন্যায়। বিশেষতঃ এই কৌলিন্য সম্বন্ধীয় প্রবাদ কথা এরূপ ভাবে বাঙ্গালীর অস্থি মজ্জায় প্রবেশ করিয়াছে, এবং বাঙ্গালীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এই বল্লালী আভিজাত্যের সহিত পরিচিত যে, ইহাতে অবিশ্বাস করিতে পারা যায় না। প্রবাদ বাদ দিয়া বোধ হয় জগতের কোন দেশের ইতিহাস রচিত হয় নাই। প্রবাদে রঞ্জিত পল্লবিত কাহিনী থাকিলেও সকল ঐতিহাসিকের নিকট ইহার মূল্য স্বীকৃত হইয়াছে। বাঙ্গলাদেশে বল্লালসেনের মত পরিচিত কোন হিন্দু রাজা নাই; বল্লালের ইতিহাস বাদ দিলে বঙ্গের হিন্দুর ইতিহাসে কিছু থাকে না, আর সেই বল্লালী ইতিহাসের নির্য্যাস এই আভিজাত্য।"

ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তদ্ রচিত 'বৃহৎ বঙ্গে' রাখালবাবুর কৌলীন্য-প্রথার মন্তব্য সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া লিখিয়াছেন—"বল্লালসেন কর্ত্তৃক স্থাপিত কৌলীন্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিব। রাখাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই কৌলীন্য যে বল্লাল কৃত তাহাতে সন্দেহ করেন। কিন্তু আমাদের মতে এই বিষয়টিতে সন্দেহ করিবার কোন অবকাশ নাই। তিনি বলেন, তাম্রশাসনে তাহার উল্লেখ নাই। * তাম্রশাসনে কোন রাজার সম্বন্ধে যাবতীয় কথা উল্লেখ থাকিবার কথা নয়। * * যদি বল্লাল সেন এই প্রথা প্রবর্ত্তিত না করিয়া থাকেন, তবে এই অদ্ভুত কৌলীন্য-প্রথার উদ্ভাবক অন্য কেহ অবশ্যই থাকিত, অন্ততঃ জনশ্রুতিতেও তাহার নাম পাওয়া

যাইত। কিন্তু সমস্ত বঙ্গদেশে, সর্ব্বশ্রেণীর মধ্যে প্রাচীন শত শত কুলীন গ্রন্থে এই কথাটি পাওয়া যায় কৌলীন্য প্রথা বল্লালসেন প্রবর্ত্তিত। যাঁহারা এই কৌলীন্য লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরই বংশধরগণ এই কথা পুরুষানুক্রমে জানিয়া আসিয়াছেন এবং তাঁহাদের কুলজ্ঞী পুস্তকে লিখিয়া গিয়াছেন। দান সম্বন্ধীয় পুস্তকে কিংবা জ্যোতিষের গ্রন্থে বল্লালাসন কেনই-বা সমাজ-সংস্কারের মত অপ্রাসঙ্গিক কথার অবতারণা করিবেন। সুতরাং দানসাগর ও অদ্ভুতসাগরে কৌলীন্যের অনুল্লেখ অগ্রাহ্য হইতে পারে না।" রায়বাহাদুর ডাক্তার দীনেশচন্দ্রের এই মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য।*

ঢাকুরে বল্লালসেন সম্বন্ধে লিখিত আছে :—

> "কাহাকে কুলীন পদ দিয়া বাড়াইল
> কাহার কুলিন পদ কাড়িয়া লইল।"

বৈদ্যকুল গ্রন্থকার চতুর্ভুজ বলিয়াছেন :—

> "তেন হি ভুমি পালেন বল্লালসেন মাহাত্মনা।
> স্থাপিতা কুল মর্য্যাদা সিদ্ধাদিবংশজন্মনাং॥

"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন—"বল্লালসেনের সময় রাঢ় বরেন্দ্রে কান্যকুব্জাগত ব্রাহ্মণগণ প্রাধান্য লাভ করেন। বল্লালসেন ইহাদিগকে রাজসংসারের সহ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে সংবদ্ধ করিবার জন্য ইহাদের সংখ্যা গ্রহণ করেন, ও গুণানুসারে ইহাদের মধ্যে পদ-মর্য্যাদার প্রতিষ্ঠা করেন। মর্য্যাদা প্রাপ্ত ব্যক্তিগণ কুলীন নামে খ্যাত হন। এই কার্য্যের জন্য বল্লালসেনের নাম বঙ্গদেশে চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। বল্লালসেন যে সম্মান দান করেন, তাহা বংশগত নয়—ব্যক্তিগত, এখন কৌলীন্য বংশগত হওয়ায়, বিবিধ বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে। বিজয় সেন বৈদিক মার্গানুগত ছিলেন, বল্লাল সেন তান্ত্রিক মতের সমাদর করিতেন। যাঁহারা বল্লাল সেনের তান্ত্রিক কুলাচারের সমর্থন করিয়াছিলেন, বল্লাল সেন তাঁহাদেরই সম্মান বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে কৌলিন্য-মর্য্যাদা প্রদান করেন। তন্ত্রের যে নববিধ আচার আছে, বল্লালসেন সেই আচার লক্ষ্য করিয়া কুলীনত্ব দেওয়ার নিয়ম করেন। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে বল্লালসেনের পূর্ব্বেও সমাজে কৌলীন্য-প্রথা প্রচলিত ছিল।"

বল্লালসেন নিয়ম করেন যে, প্রতি ছত্রিশ বৎসর অন্তর, কুলীনদের নির্ব্বাচন হইবে। এই সময়ে কৌলিন্যপদপ্রাপ্ত দুঃশীল ব্যক্তিগণ কৌলিন্যভ্রষ্ট এবং অকুলীন সদাচার ব্যক্তিও কৌলিন্য পাইতে পারিবেন। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের সময় ইহার নির্ব্বাচনের সময় অত্যন্ত গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায়, তিনি নির্ব্বাচন-প্রথা উঠাইয়া দেন, এবং নিয়ম করেন যে, কৌলিন্য-মর্য্যাদা বংশানুগত হইবে।

* বৃহৎ-বঙ্গ প্রথম খণ্ড ৭৯-৮০ পৃষ্ঠা

যশোহর খুলনার ইতিহাস প্রথম খণ্ড ২৮০-২৮১ পৃষ্ঠা।

আদিশূর নৃপতি শকাব্দ সহস্র শতাব্দের মধ্যভাগে কান্যকুব্জ দেশ হইতে গৌড়দেশে ব্রাহ্মণ আনেন কান্যকুব্জাগত বিপ্র-সন্তানেরা বারেন্দ্র এবং রাঢ়দেশে বসতি করিয়া বংশবিস্তার করেন। আদিশূরের ৭।৮ পুরুষ পরে যখন বল্লালসেন রাজা হইয়াছিলেন, তখন তিনি কান্যকুব্জাগত বিপ্র সন্তানগণকে অসদাচার-পরায়ণ এবং বেদজ্ঞানী-বিমূঢ় দেখিয়া তাঁহাদের উন্নতির মানসে তাঁহাদিগকে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র, এই দুই শ্রেণীতে বিভাগ করিয়া, রাঢ় দেশবাসী রাঢ়ীয়গণের মধ্যে আদিশূরের প্রপৌত্র ধরাশূর কর্ত্তৃক স্থাপিত কৌলীন্য মর্য্যাদার উৎকর্ষ বিধান তথা বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের মধ্যে কৌলিন্য মর্য্যাদা স্থাপন করিয়াছিলেন। বল্লালসেন ঐরূপ কৌলিন্য মর্য্যাদার উৎকর্ষ বিধান করিয়াই নিরস্ত হন নাই, যাহাতে কুলীনগণ সদাচারপরায়ন থাকেন, তদর্থে ঘটক নিয়োগ করিয়াছিলেন। যথা:—

"বংশাংশভাবগুণদোষবিচারকর্ত্তা, ন্যূনাতিরিক্তপরিণামযথার্থবক্তা।
পর্য্যাংবিপর্য্যগণনঞ্চ করোতি যশ্চ, শঙ্খস্বরূপেন গদিতো ঘটকঃ স এব॥

"গৌড়ে ব্রাহ্মণ" প্রণেতা শ্রীমহিমাচন্দ্র মজুমদার কর্ত্তৃক প্রণীত ৫/০।১/০ কৌলিন্য-প্রথা, লালমোহন বিদ্যানিধি প্রণীত 'সম্বন্ধ নির্ণয়' 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা পণ্ডিত রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, এবং 'ঢাকার ইতিহাস প্রণেতা ও বিস্তারিতভাবে কৌলিন্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

বল্লালসেন কর্ত্তৃক শ্রেণী বিভাগ এবং ঘটক নিয়োগ হইবার পূর্ব্বে রাঢ় দেশ-গামী শ্রীহর্ষ তনয় শ্রীনিবাস গৌড়ে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আগমন বিষয়ে, একখানি গ্রন্থ লেখেন। পরে উদায়নচার্য্য ভাদুড়ি বারেন্দ্রকুল বর্ণন করিয়া একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই সকল প্রাচীন কুলগ্রন্থ এখন অনুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। কুলঘটিত প্রাচীন পুস্তক প্রাপ্ত হইবার আশা করা বৃথা। বর্ত্তমান সময়ে রাঢ়ীয় এবং বারেন্দ্র ঘটক-দিগের যে সকল কুলগ্রন্থ দেখা যায়; তাহার কোনখানিই শকাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের লিখিত বলিয়া বোধ হয় না।

কাহারও কাহারও মতে যাঁহারা বল্লালসেনের তান্ত্রিক কুলাচারের সমর্থন করিয়া-ছিলেন, বল্লালসেন তাঁহাদেরই সম্মান বাড়াইয়া তাঁহাদিগকে কৌলিন্য মর্য্যাদা প্রদান করেন।

আচারো বিনয় বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থ দর্শনম।
নিষ্ঠা বৃত্তি স্তপো দানং নবধাকুললক্ষণম্॥

রাঢ়ীয় ঘটকদিগের নিকট, ধ্রুবানন্দ মিশ্রকৃত মহাবংশাবলী, মিশ্রাচার্য্যকৃত মিশ্রগ্রন্থ, [সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত] শ্লোকসংখ্যা ২,১২০। ইহাকে মিশ্রগ্রন্থ কহে। ইহা হইতেই রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের নাম মিশ্রগ্রন্থ হইয়াছে গোপাল শর্ম্মা কৃত ধ্রুবানন্দমতব্যাখ্যা। ফুলিয়া কুল বর্ণন। বাচষ্পতি মিশ্র ঘটক-কৃত কুলরাম। রামহরি তর্কালঙ্কার কৃত মেলমালা [বাঙ্গলা পদ্যে লিখিত, মধ্যে মধ্যে সংস্কৃত শ্লোকও আছে। কুলার্ণব-সাগর-প্রকাশ, কুলচন্দ্রিকা, কুলদীপিকা প্রভৃতি বিবিধ গ্রন্থে কৌলিন্যের নানা কথা আছে। রাঢ়ীয় কুলগ্রন্থের

সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত

অধিকাংশ সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত। ঘটকের কার্য্য দোষাবহ বিবেচনায় বারেন্দ্র অধ্যাপক-গণ ঘটকের কর্ম্মে না যাওয়াতে বারেন্দ্র কুলের কুলগ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইয়াছে, এখনও রাঢ়ীয়

ঘটকদের মধ্যে বিদ্বান্‌ ও সংস্কৃতজ্ঞ লোক পাওয়া যায়। বারেন্দ্র ঘটকদের অবস্থা অতীব শোচনীয়। তাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ ইহা মনে করা দুরাশা মাত্র, অনেকে বাঙ্গলাভাষাই ভালরূপ জানেন না।—গৌড়ে ব্রাহ্মণ, উপক্রমণিকা ।/• ।৵• দ্রষ্টব্য।

প্রত্যেক ঐতিহাসিকই একবাক্যে বল্লালসেনের দ্বারা কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তনের কথা স্বীকার করিয়াছেন। *

বল্লালসেনের পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা

বল্লালসেন প্রতিভাশালী ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার রচিত "দানসাগর" ও "অদ্ভুত সাগর" বিখ্যাত গ্রন্থ। 'দানসাগর' গ্রন্থ ৭০ অধ্যায়ে বিভক্ত। এই গ্রন্থে ১৩৭৫ প্রকার দানের বিষয়, সময় ও পাত্রাদির আলোচিত হইয়াছে। "অদ্ভুত সাগরে"—বৃদ্ধগর্গ, পরাশর, বশিষ্ঠ, বরাহমিহিরাচার্য্য, আর্য্য ভাগবত, আগ্নেয়, মৎস্যপুরাণ, রামায়ণ, ভারতাখ্যান, হরিবংশ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর প্রভৃতি উপপুরাণ ও শাস্ত্রসমূহ হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। বল্লালসেনের পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে ঐতিহাসিকেরা বলেন: He was celebrated for his learning, several compilations being attributed to him. He reigned from about 1165 to 1185.

পুরাণ

১০৯১ শাকে 'দানসাগর' এই গ্রন্থ বিরচিত হয়;—নিখিল নৃপচক্রতিলক শ্রীমদ্‌ বল্লালসেনের পূর্ণশশি নবদশমিতে শক বর্ষে 'দানসাগরো রচিতঃ। রচনায় দুই বৎসর কাল লাগিয়াছিল। এই গ্রন্থ অদ্যাপি পণ্ডিত সমাজে সবিশেষ সমাদৃত।

* ডাক্তার হেমচন্দ্র রায়-চৌধুরী ও ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন: (১) বিজয় সেন বঙ্গদেশে যে নূতন রাজবংশ স্থাপন করিলেন তাহা সেন বংশ নামে পরিচিত। সেনরাজারা ব্রাহ্মণ ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। এই বংশটি দক্ষিণ ভারতের কর্ণাট দেশ হইতে বাংলায় আগমন করিয়াছিল। সামন্ত সেন নামক একব্যক্তির অধিনায়কত্বে ইঁহারা পশ্চিম বঙ্গে প্রসিদ্ধ লাভ করেন। সামন্ত সেনের পৌত্র বিজয় সেন শূরবংশের সহিত পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ হইয়া বাংলায় প্রভুত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেন বঙ্গদেশে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তক। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস, ৯৪ পৃষ্ঠা।

"(২) The dominions acquired by Vijayasena were transmitted (C. A. D. 1158) to his son Vallalsena, famous in Bengal tradition as Ballalsen, who is credited with having re-organized the caste system and introduced the practice of—Kulinism among Brahmans, Baidyas, and kayasthas. Early history of India, V A. smith P. 403"

(৩) বল্লালসেন [আনুমানিক ১১৫৯-৮৫] বিজয়সেনের শূরবংশীয়া রাণীর গর্ভজাত পুত্র বল্লালসেন। সেন বংশের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত নরপতি। বাংলাদেশের সামাজিক ইতিহাসে বল্লালের স্থান অতি উচ্চে। তিনি এদেশের উচ্চশ্রেণীর হিন্দু অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থগণের মধ্যে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস ৮১ পৃষ্ঠা গৌড় বঙ্গের সেনবংশ। শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার ৮১ পৃষ্ঠা।

বল্লালসেন "দানসাগর" গ্রন্থে নিজ বংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন ইহা হইতেই বল্লালসেন কিরূপ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন তাহা বুঝা যাইতেছে।

ছন্দোভিশ্চৈকবন্দ্যোশ্রুতিনিয়মগুরু ক্ষত্র চারিত্র চর্য্যা
মর্য্যাদা গোত্র শৈলঃ কলিচকিত সদাচার সঞ্চার সীমা।
সদ্‌বৃত্ত স্বচ্ছ বর্ণোজ্জ্বল পুরুষ গুণাচ্ছিন্ন সন্তানধারা
বন্দ্যোমুক্তামরশ্রীনিরগমদবনের্ভূষণং সেনবংশঃ।
তত্রালঙ্কৃত সৎপথঃ স্থিরঘনচ্ছায়াভিরামঃ সতাং
স্বচ্ছন্দ প্রণয়োপভোগ সুলভ কল্পদ্রুমো জঙ্গমঃ।
হেমন্ত পরিপন্থি পঙ্কজসরঃ স্থান্দস্থনৈঃ সদ্ধিকৈ—
রুদ্গীত স্বগুণৈরুদাত্ত মহিমা হেমন্ত সেনোঽজনি।
'তদনু বিজয়সেনঃ প্রাদুরাসীদ্বরেন্দ্রো—
দিশিবিদিশি ভজন্তে যস্য বীরধ্বজত্বং।
শিখর বিনিহিতাজ্ঞা বৈজয়ন্তীং বহন্তং
প্রণতি পরিগৃহীতাঃ প্রাংশবোরাজ বংশাঃ।
সর্ব্বাশাঃ পরিপূরয়ন্ পচিত শ্রীর্দ্দানবারাং ঘনৈ
রাসারৈরভিষিক্ত নির্ম্মল যশঃ শালেয় ভূমণ্ডলঃ।
দৈন্যোত্তাপভৃতা মকালজলদ সর্ব্বোত্তরপ্লাভৃতাং
শ্রীবল্লাল নৃপস্ততোঽজনি গুণাবির্ভাব গর্ব্বেশ্বরঃ॥
বেদার্থ স্মৃতি সঙ্কলাদি পুরুষঃ শ্লাঘ্যোবরেন্দ্রীতলে
নিস্তন্দ্রোজ্জ্বলবীচিলাস নয়নঃ সারস্বতং ব্রহ্মণি।
ষট্‌কর্ম্মাভবদার্য্য শীল মলয়ঃ প্রখ্যাত সত্যব্রতো
বৃত্যাবেরিব শীষ্প তির্গিরপতেরস্যানিরুদ্ধো গুরুঃ॥
বিদ্বৎসভা কমলিনী রাজহংসেন ভূভুজা।
শ্রীমদ্বল্লালসেন কৃতোঽয়ং "দানসাগরঃ।"

'সময়প্রকাশ' গ্রন্থকার ও স্মার্ত্ত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য 'দানসাগর,' গ্রন্থ হইতে প্রভূত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

বল্লালসেনের রচিত একটি শ্লোক 'সদুক্তি কর্ণামৃত' গ্রন্থে উল্লিখিত আছে :—

বিরম তিমির সাহসাদমুষ্মা—
দ্দিনমমণি নিরন্ত মুপাগতস্ততঃ কিং।
কলয়সি ন পুরোমহো মহোর্ম্মি—
র্ম ত বিয়দভ্যুদয়তায়ং সুধাংশু।"

বল্লালসেনের অদ্ভুত সাগর গ্রন্থের আরম্ভ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা পরিসমাপ্ত

করিয়া যাইতে পারেন নাই। ১০৯১ শকে এই গ্রন্থের আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু স্বীয় পুত্র লক্ষ্মণসেনের রাজ্যাভিষেক ব্যাপারে ব্যস্ত থাকার দরুন বল্লালসেন ঐ গ্রন্থ সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। লক্ষ্মণসেনকে নিজকৃতি নিষ্পত্তির জন্য আজ্ঞা দিয়া যান, লক্ষ্মণসেন উহা পরিসমাপ্ত করিয়াছিলেন। বল্লালসেন, 'দানসাগর' গ্রন্থে আপনাকে "নিঃশঙ্ক-শঙ্কর-গৌড়েশ্বর' বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন।

বল্লালসেনের তাম্রশাসন

১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে বল্লালসেনেনের একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হওয়ায় নৃপতি বল্লাল সেন সম্বন্ধে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি। এই তাম্রশাসনখানি প্রাপ্তির ইতিহাস এইরূপ—"সীতাহাটির জমিদার শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ চট্টোপাধ্যায় স্বগ্রামের একটি রাস্তা সংস্কারের জন্য কয়েকজন মজুর নিযুক্ত করেন। রাস্তাটি ভাগীরথী তীরে অবস্থিত। তাহার অনেক অংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। তীর হইতে অনুমান একশত গজ দূরে মাটি কাটিবার সময়ে মজুরেরা দুই হাত মাটির নিম্নে একখানি তাম্রশাসন প্রাপ্ত হয়। ভূস্বামী বৈদ্যনাথ বাবু মজুরদিগের নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করেন। সীতাহাটি কাটোয়া হইতে দু' মাইল মাত্র ব্যবধান। "প্রসূন"-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু জ্যোতিপ্রসাদ সিংহ তাম্রশাসন প্রাপ্তির সংবাদ অবগত হইয়া সীতাহাটি গমন করেন এবং বৈদ্যনাথ বাবুর নিকট হইতে উহা সংগ্রহ করেন। জ্যোতিঃ বাবু শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয়কে তাম্রশাসন খানা দেখিতে দেন। উহা প্রাপ্তির পর কাটোয়ার তদানীন্তন মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু বনোয়ারী-লাল গোস্বামী ও তারকচন্দ্র রায় মহাশয় উহার পাঠোদ্ধার কর্য্যে ব্রতী হন। এবং অবশেষে সন ১৩১৭ সালের সপ্তদশখণ্ড ৪র্থ সংখ্যায় 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়' নবাবিষ্কৃত বল্লালসেনের তাম্রশাসন নাম দিয়া শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র রায় মহাশয় উহার পাঠ প্রকাশ করেন। শ্রীযুক্ত বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয় উক্ত তাম্রশাসনের পাঠ-লিপি ১৩১৭ সালের 'প্রবাসী' পত্রের ৫৩০-৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করেন। স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় এবং ডাক্তার শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক ১৩১৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'সাহিত্য' পত্রে উহার একটি বিশুদ্ধ পাঠ প্রকাশ করেন। অতঃপর স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

The sena kings were Saivas. Their seal bore an image of Sadasiva and as the Gupta Emperors had *virudas* ending with *aditya*, they had *virudas* ending with sankara: thus Vijayasena was Vrsabha-Sankara, *Vallalsena* was *Nihasanka Sankara* and so on. It is curious to note that some Vaidya families of Bengal affect this sort of name even at the present day.—Finger posts of Bengal History P. 455. BijoyNath Sarker. The Indian Historical quarterly. Vol. VII, No 3 September, 1931.

The Cambridge Shorter History of India Cambridge. P. 148.

শিব মন্দির—রায়পুরা [তালতলা]

[কথিত আছে এই প্রাচীন মন্দিরটি মহারাজা বল্লাল সেন নিম্মাণ করেন। পরে উহা ধ্বংসের পথে অগ্রসর হইলে মহারাজা রাজবল্লভ উহার সংস্কার করেন। মন্দিরটির মধ্যে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত আছে।]

Epigraphia Indica পত্রে Vol XIV pp. 156-63 পৃষ্ঠায় প্রতিলিপি সহ প্রকাশ করিয়াছেন। তৎপর স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় নূতন করিয়া ছাপ লইয়া ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে এই তাম্রলিপিখানি কলিকাতা যাদুঘরে [Indian Museum] সুরক্ষিত আছে।

তাম্রশাসনখানির আকার হইতেছে ১৩$\frac{১}{৪}$+১৫´´ ইঞ্চি। শীর্ষদেশে সদাশিব মূর্ত্তি সংযোজিত। এই তাম্রফলকে মোট ৬৪টি পংক্তি রহিয়াছে। এক দিকে বত্রিশ অপর দিকে বত্রিশটি পংক্তি। অক্ষরের আকার ৩´´ইঞ্চি পরিমিত। সংস্কৃত ভাষায় এই দানপত্র খোদিত। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের মতে [The characters belong to a variety of the Northern alphabets, which may be called the precursors of the modern Bengali, as current in North-Eastern India in the 12th century A. D.] এই তাম্রশাসন খানি গদ্যে ও পদ্যে বিরচিত। শার্দ্দুল-বিক্রীতা, মন্দাক্রান্তা, স্রগধারা, আর্য্যা, বসন্ততিলক এবং শিখরিণী প্রভৃতি বিবিধ ছন্দে বিরচিত।

শ্রীবিক্রমপুর সমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার [রাজধানী] হইতে মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়সেন দেব পাদানুধ্যাত, পরমেশ্বর, **পরম মাহেশ্বর** পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ কুশলময় [সেই] শ্রীমদ্ বল্লালসেন দেব "সমুপগত" [সংবিদিত] সমস্ত রাজা, রাজন্যক রাজ্ঞী, রাণক, ইত্যাদিকে বিজ্ঞাপন করিতেছেন। অন্যান্য দানলিপিতে যেরূপ থাকে ইহার পরবর্ত্তী অংশেও তদ্রূপ রহিয়াছে)—"নিম্নলিখিত বিষয়ে আপনাদের সকলের অভিমত হউক।" ইত্যাদি।

বল্লালসেনের তাম্রশাসন

প্রশস্তি-পাঠ

১। ওঁ নমঃ শিবায়॥ সন্ধ্যা-তাণ্ডব-সন্বিধান—
বিলসন্নান্দী-নিনাদোর্শ্মিভি-নির্ম্ম্যাদর—

২। সার্ন্বো দিশতু বঃ শ্রেয়োহর্দ্ধনারীশ্বরঃ। যস্যার্দ্ধে
ললিতাঙ্গহার-বলনৈরর্দ্ধে চ

ভীমো—

৩। দ্ভটৈ র্ন্নাট্যারম্ভ-রয়ের্জ্জয়ত্যভিনয়-দ্বৈধানুরোধশ্রমঃ॥
হর্ষোচ্ছালপরিপ্লাবো নিধিরপাং

৪। ত্রৈলোক্যবীরঃ স্মরো নিস্তন্দ্রাঃ কুমুদাকরা মৃগদৃশো
বিশ্রান্তমানাধয়ঃ। যস্মিন্নভ্যুদিতে—

৫। চকোরনগরাভোগে সুভিক্ষোৎসবঃ স শ্রীকণ্ঠশিরোমণি—
র্ব্বিজয়তে দেবস্তমীবল্লভঃ॥ বংশে

৬। তস্যাভ্যুদয়িনি সদাচার-চর্য্যা-নিরুঢ়ি-প্রৌঢ়াং
রাঢ়ামকলিতচরৈ র্ভূষয়ন্তোহনুভাবৈঃ। শশ্ব—

৭। দ্বিশ্বাভয়-বিতরণ-স্থূললক্ষ্যাবলক্ষৈঃ কীর্ত্ত্যুল্লো-
লৈঃ স্নপিত বিয়তো জজ্ঞিরে রাজপুত্রাঃ॥ তেষাম্বং

৮। শে মহোজাঃ প্রতিভট-পৃতনাম্ভোধি-কল্পাপ্তসূরঃ
কীর্ত্তিজ্যোৎস্নোজ্জ্বলশ্রীঃ প্রিয়কুমুদবনোল্লা—

৯। সলীলামৃগাঙ্কঃ। আসীদাজন্মরক্তপ্রণয়িগণ-মনোরাজ্য—
সিদ্ধিপ্রতিষ্ঠা-শ্রীশৈলঃ সত্যশীলো নি—

১০। রুপধিকরুণাধাম সামন্তসেনঃ॥ তস্মাদজনি
বৃষধ্বজচরণাম্বুজষট্পদো গুণাভরণঃ।

১১। হেমন্তসেনদেবো বৈরিসরঃ—প্রলয়হেমন্তঃ॥ লক্ষ্মীস্নেহার্ত্ত-
দুগ্ধাম্বুধিবলনরয়-শ্রদ্ধয়া মা—

১২। ধবেন, প্রত্যাবৃত্ত-প্রবাহোচ্ছলিত-সুরধুনীশঙ্কয়া-শঙ্করেণ।
হংসশ্রেণী–বিলাসোজ্জ্বলিত—

১৩। নিজপদাহংযুনা বিশ্বধাত্রা, সুত্রামারামসীমাবিহরণ-ললিতাঃ
কীর্ত্তয়ো যস্য দৃষ্টাঃ॥ —

১৪। স্মাদভূদখিল-পার্থিব-চক্রবর্ত্তী, নির্ব্যাজ-বিক্রম–তিরস্কৃত-
সাহসাঙ্কঃ। দিকৃপালচক্রপু—

১৫। ট–ভেদন–গীত-কীর্ত্তিঃ পৃথ্বীপতির্ব্বিজয়সেন–পদপ্রকাশঃ॥
ভ্রাম্যন্তীনাম্ব-নান্তে যদরি-মৃ—

১৬। গ-দৃশাং হারমুক্তাফলানি ছিন্নাকীর্ণানিভূমৌ নয়নজলমিলৎ—
কজ্জলৈ—র্ম্লাঙ্ছিতানি। যস্মাচ্চি—

১৭। স্বস্তি দর্ভক্ষতচরণতলাস্থখিলিপ্তানি গুঞ্জা-স্রগ্ ভূষা-রম্য-রামা-
স্তনকলশঘনা-শ্লেষলোলা :

১৮। পুলিন্দাঃ॥ প্রত্যাদিশন্নবিনয়ং প্রতিবেশ্ম রাজ্ঞা
বভ্রাম কার্ম্মুকধরঃ
কিলকার্ত্তবীর্য্যঃ। অস্যা—

১৯। ভিষেক-বিধিমন্ত্রপদৈর্ন্নিরীতি-রারোপিতো বিনয়বর্ত্মনি জীবলোকঃ॥
পদ্মালয়েব দয়ি—

২০। তা পুরুষোত্তমস্য গৌরীব বাল—রজনীকর-শেখরস্য।
অস্য প্রধানমহিষী জগদীশ্বর—

২১। স্য শুদ্ধান্তমৌলিমণিরাস বিলাসদেবী॥ এষা সুতং সুতপসাং
সুকৃতৈরসূত বল্লালসেনম—

২২। তুলং গুণগৌরবেন অধ্যাস্ত যঃ পিতুরনন্তরমেকবীরঃ সিংহাসনা—
দ্রি—শিখরং নরদেব—

২৩। সিংহঃ। যস্যারিরাজ-শিশবঃ শবরালয়েষু বালৈরলীক—
নরনাথ পদেহভিষিক্তাঃ। দৃপ্তাঃ প্রমোদ—

২৪। তরলেক্ষণয়া জনন্যা নিশ্বস্য বৎসলতয়া সভয়ং নিষিদ্ধাঃ।
ক্রীতাঃ প্রাণতৃণব্যয়েনরভ—

২৫। সাদালিঙ্গ্যং বিদ্যাধরী-রাকল্পং বিহরন্তি নন্দনবনাভোগেষু
সংসপ্তকাঃ। ইত্যালোচ্য নৃপৈঃ

২৬। স্মর-প্রণয়িতা-ভীকৈঃ শ্রিতঃ সর্ব্ববধূনেত্রেন্দীবরতোরণাবলিময়ো
যস্যাসি-ধারাপথঃ॥

২৭। দদানা সৌবর্ণৈঃ তুরগমুপরাগেস্বরমণের্যদস্যোদস্রাক্ষীদহনি
জননী শাসনপদম্।

২৮। নৃপস্তাস্রোৎকীর্ণৈঃতদয়মদিতো[তৈ] বাম্বুবিদুষে সতাং দৈন্যোত্তাপ-
প্রশমন-ফলাকালজলদঃ॥

২৯। সখলুশ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ।
মহারাজাধিরাজ শ্রীবিজয়—

৩০। সেন-দেবপাদানুধ্যাৎ পরমেশ্বর—পরমমাহেশ্বর—পরমভট্টারক-
মহারাজাধিরাজ শ্রী—

৩১। **মল্লালসেনদেবঃ কুশলী**। সমুপাগতাশেষ রাজরাজন্যক—
রাজ্ঞী—রাণকরাজপুত্ররাজা—

৩২। মাত্য-পুরোহিত-মহাধর্মাধ্যক্ষ-মহাসান্ধিবিগ্রহিক—
মহাসেনাপতি-মহামুদ্রাধিকৃত—ইত্যাদি

দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পাঠ অপ্রয়োজন বোধে উদ্ধৃত হইল না। এই তাম্রফলকের অনুবাদ, প্রসঙ্গ—ক্রমে পূর্ব্বেই বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে।

এই তাম্রশাসন দ্বারা বল্লালসেন দেবের জননী সূর্য্যগ্রহণবাসরে "হেমাশ্ব" দানকালে [দক্ষিণারূপে] যে শাসনপদ [ভূমি] উৎসর্গ করিয়াছিলেন, তাহার কথা তাম্রোৎকীর্ণ করিয়া সজ্জনগণের দৈন্যোত্তাপনিবারক অকালজলদরূপী এই রাজা বল্লালসেনদেব তাহা পণ্ডিত ও বাসুকে দান করিয়াছিলেন।

শ্রীবর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্গত উত্তররাঢ়া-মণ্ডলে স্বল্প-দক্ষিণ বীথীতে,—খাণ্ডয়িল্লা শাসনের উত্তরস্থিত সিঙ্গটিয়া নদীর উত্তর, নাড়ীচ-শাসনের উত্তরস্থিত সিঙ্গটিয়া নদীর পশ্চিমোত্তর, অশ্বয়িল্লা—শাসনের পশ্চিমস্থিত সিঙ্গটিয়া (নদীর) পশ্চিম, কুড়ুম্বমার দক্ষিণ সীমালির দক্ষিণ, কুড়ম্বমার পশ্চিমে পশ্চিমগড্ডি সীমালির দক্ষিণ, আউহাগড্ডিয়ার দক্ষিণ গোপথের দক্ষিণ, আবার আউহাগড্ডিয়ার উত্তর গোপথ-নিঃসৃত পশ্চিমগতি সুরকোনাগড্ডিআকীয়ের উত্তরালি পর্য্যন্ত গত সীমালির দক্ষিণ, লাড্ডিনা-শাসনের পূর্ব্বসীমালির পূর্ব্ব, জলসোথী-শাসনের পূর্ব্বস্থিত গোপথার্দ্ধের পূর্ব্ব, মোলাড়ন্দী-শাসনের পূর্ব্বস্থিত সিঙ্গটিয়া (নদী) পর্য্যন্ত (গত) গোপথার্দ্ধের পূর্ব্ব,—এই চতুঃসীমায় বেষ্টিত, '**শ্রীবৃষভশঙ্কর নলের**' পরিমাণে বাস্তভূমি, খালভূমি ও খিলভূমির সহিত, নবদ্রোণ এক আঢ়ক, চত্বারিংশৎ উন্মান ও তিন কাক পরিমিত সপ্তভূপাটকে বিভক্ত প্রতিবর্ষে পঞ্চশত কপর্দ্দকপুরাণ-আয়-বিশিষ্ট ঝাট [কান্তার বা নিবিড়ারণ্য] ও বৃক্ষসমেত গর্ত্ত ও উষরভূমির সহিত, জল ও স্থলের সহিত, গুবাক ও নারিকেল সমেত, যাহার (অর্থাৎ, যে গ্রাম সম্বন্ধে প্রতিগ্রহীতার) দশটি অপরাধ (রাজার) সহ্য হইবে, সর্ব্বপ্রকার-উৎপীড়ন-রহিত তৃণ-বুতি-গোচর পর্য্যন্ত চট্টভট্টের প্রবেশাধিকার-বিরহিত যাহা হইতে কোন প্রকারের (করাদি) গৃহীত হইবে না। রাজভোগ্য কর ও হিরণ্যাদির (সর্ব্বপ্রকারের) আয়ের সহিত যে বাল-হিটা নামক গ্রাম আমার মাতা শ্রীবিলাসদেবী গঙ্গাতীরে সূর্য্যগ্রহণকালে সুবর্ণাশ্ব-

সদাশিব মূর্ত্তি

[বিক্রমপুর আড়িয়ল চিত্রশালায় সংরক্ষিত এবং চিত্রশালার কর্তৃপক্ষের সৌজন্যে ।]

মহা-দানের দক্ষিণাস্বরূপে, বরাহদেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, ভক্তেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, লক্ষীধর দেবশর্ম্মার পুত্র, ভরদ্বাজ গোত্রোৎপন্ন, ভারদ্বাজ—আঙ্গিরস-বার্হস্পত্য-প্রবর, সামবেদের কৌথুমশাখাচরণোক্ত (ক্রিয়াকলাপের) অনুষ্ঠাতা, আচার্য্য শ্রীওবাসুদেবশর্ম্মাকে উৎসর্গ করিয়াছিলেন;—সেই গ্রামেই আমার দ্বারা মাতাপিতার এবং নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যাবৎ-সূর্য্য-চন্দ্র এবং ক্ষিতি-সমকাল পর্য্যন্ত যত দিন ভূমিতে ছিদ্র থাকিবেক, ততদিনের জন্য, তাম্রশাসন করিয়া প্রদত্ত হইল। অতএব ইহা আপনাদের সকলেরই অনুমোদিত হউক; এবং ভাবী নরপতিগণও (ভূমি) অপহরণের নরকপাতের ভয়, এবং তৎপাসনে ধর্ম্মগৌরবের কথা স্মরণ রাখিয়া, ইহা পালন করিবেন। (এই অভিপ্রায়ে) ধর্ম্মানুশাসনের শ্লোকও আছে:—"সগরাদি অনেক নৃপতিগণ ভূমিদান করিয়াছেন, কিন্তু যখন যাঁহার (যে নৃপতির) ভূমি, তখন (ভূমিদানের) ফল তাঁহারই হইয়া থাকে। যিনি ভূমির প্রতিগ্রহ করেন, এবং যিনি ভূমিদান করেন, তাঁহারা উভয়েই পুণ্যকর্ম্মা, এবং উভয়েই (সেই হেতু) নিয়ত স্বর্গ-গামী হয়েন। "আমাদের বংশে ভূমিদাতা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, (এবং) তিনিই আমাদের ত্রাণকর্ত্তা হইবেন," এই মনে করিয়া পিতৃগণ করবাস্থ করিতে থাকেন, এবং পিতামহগণ (আনন্দে) উল্লম্ফন (নৃত) করিতে থাকেন। ভূমিদাতা ষষ্টি সহস্র বৎসর স্বর্গে বাস করেন, এবং ভূমির অপহর্ত্তা ও (অপহরণের) অনুমোদনকারী তৎপরিমিত (৬০০০০ বৎসর) নরকে ভ্রমণ করেন। ভূমি স্ব-দত্তই হউক, আর অন্যদত্তই হউক, যিনিই ইহা হরণ করিবেন, তিনিই বিষ্ঠার কৃমি হইয়া পিতৃগণ সহ পচিতে থাকিবেন।' ইতি। লক্ষ্মীকে এবং মনুষ্য জীবনকে পদ্মপত্রস্থিত জলবিন্দুর ন্যায় চঞ্চল মনে করিয়া, এবং (উপরি) উদাহৃত সমস্ত বিষয় বুঝিয়া, কোনও ব্যক্তিরই পরকীর্ত্তির লোপবিধান উচিত নয়। নিখিল-ক্ষিতিপালের জেতা ভূপাল শ্রীমদ্ বল্লালসেন ও বাসুশাসনে সান্ধিবিগ্রহিক হরিঘোষ (নামক ব্যক্তিকে) দূত নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সাং (সাল) ১১, বৈশাখ মাসের ১৬ই তারিখ। শ্রী নি (বন্ধ)। মহাসাং (ধিবিগ্রহিক) করণ (কায়স্থ) নি (বন্ধ)।

এই তাম্রশানে "শ্রীবৃষভশঙ্কর নলের" উল্লেখ আছে। মদনপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনে বল্লালসেনদেবের পিতা বিজয়সেনদেব 'অরিরাজ-বৃষভ-শঙ্কর-গৌড়েশ্বর' নামে বর্ণিত হইয়াছেন। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে, বল্লালসেনদেবের সময়েও ভূমি পরিমাপকালে তাঁহার পিতার নামই প্রচলিত ছিল এবং তাহাই 'শ্রীবৃষভশঙ্কর নলিন' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। লক্ষ্মণসেনদেবের আনুলিয়ায় প্রাপ্ত শাসনেও 'বৃষভশঙ্কর নলেন' কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

বল্লালসেনের দানলিপির দ্বারা সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে আদি সেনরাজগণ রাঢ়দেশে ও রাজত্ব করিতেন। বিক্রমপুরে তাঁহাদের রাজধানী বিজয় সেনের সময় হইতেই সংস্থাপিত হইয়াছিল। কেহ কেহ এইরূপ অনুমান করেন যে—"প্রথম হইতেই পূর্ব্ববঙ্গ তাঁহাদের অধিকারে থাকিলে, রাঢ়দেশকে ভূষিত করিয়াছিলেন, কেবল এই কথা থাকিত না।" (১) ইহার কোনও অর্থ হয় না, কেননা সেনরাজারা যে পরবর্ত্তীকালে বিজয়সেনের সময় বঙ্গরাজ্য (পূর্ব্ববঙ্গ) অধিকার করেন তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

বল্লালসেনের ধর্ম্মমত

সেন নৃপতিরা শৈব ছিলেন। বল্লালসেনের তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই দেখিতে পাইতেছি, "ওঁ নমঃ শিবায়॥ যাঁহার একার্দ্ধের মনোহর অঙ্গ-সঞ্চালনে এবং অপরার্দ্ধের ভীমোৎকট নৃত্যারম্ভ বেগে বিবিধ অভিনয়সঞ্জাত কায়ক্লেশ জয়যুক্ত হইতেছে ; সন্ধ্যা-তাণ্ডবনৃত্যে বিকশিত আনন্দ নিনাদলহরী-লীলার অকূল রসসাগর (সেই অর্দ্ধনারীশ্বর (মহাদেব) আপনাদের মঙ্গল বিধান করুন।"

যাঁহার তাম্রশাসনের উপরে সদাশিব মূর্ত্তির রাজমুদ্রা, এবং যিনি অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের বন্দনা করিয়াছেন, তিনি যে শৈব ছিলেন তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহের কারণ আছে কি ?

বল্লালসেন এই তাম্রশাসনখানি রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর হইতে প্রদান করিয়াছেন। বল্লালসেনের সর্ব্ব প্রধান রাজধানী যে শ্রীবিক্রমপুরে ছিল তাহার কতকগুলি প্রমাণ বিশেষ ভাবে বিক্রমপুর হইতে উপস্থিত হইয়াছে। কিছুদিন হইল বিক্রমপুরের অন্তর্গত আপরকাঠি নামক গ্রামে একটি প্রস্তর-নির্ম্মিত সদাশিব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি এখন বিক্রমপুর চিত্রশালায় [অড়িয়ল গ্রামে] আছে।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত সদাশিব মূর্ত্তি

বল্লালসেনের মুদ্রামধ্যস্থ সদাশিব মূর্ত্তির সহিত বিক্রমপুরের প্রাপ্ত সদাশিব মূর্ত্তির সাদৃশ্য সহজেই অনুভূত হইবে। সদাশিব মূর্ত্তির ধ্যান নানারূপ দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার হস্তস্থিত আয়ুধ সমূহ ও বিভিন্নরূপ থাকে। মুদ্রামধ্যস্থ সদাশিব মূর্ত্তির ধ্যান এইরূপ :—

> মুক্তাপীতপয়োদমৌক্তিকজবাবর্ণৈর্মুখৈঃ পঞ্চভিঃ
> ত্র্যক্ষৈরঞ্চিতমীশমিন্দুমুকুটং পূর্ণেন্দুকোটিপ্রভম্।
> শূলং টঙ্ক-কৃপাণ-বজ্র দহনান্ নাগেন্দ্র ঘণ্টাঙ্কুশান্
> পাশং ভীতিহরং দধানমমিতা কল্পোজ্জ্বলাঙ্গং ভজে।

(১) সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা ১৩১৭, ১৪৫ পৃষ্ঠা।

(২) The record opens with the auspicious formula *om om namah sivaya* followed by an invocation to Siva as Ardhanariswara. Inscription of Bengal. N. G. Majumder. Page 69.

শ্রীযুক্ত গোপীনাথ রাও তাঁহার "Elements of Iconography, vol II pt. ii app. p. 187 এ সদাশিবের যে ধ্যানের উল্লেখ করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

বদ্ধপদ্মাসনং শ্বেতং স্থিতং পঞ্চাস্য সংযুতম্।
পিঙ্গলাভ জটা চূড়ং দশ দোর্দণ্ড মণ্ডিতম্॥
অভয়ং চ প্রসাদং চ তথাশক্তিং ত্রিশূলকম্।
খট্টাঙ্গং দক্ষভাগস্থৈর্বহন্তং করপল্লবৈঃ।
ভুজঙ্গং চাক্ষমালা চ ডমরু নীলপঙ্কজম্।
বীজাপুরা চ বামস্থৈর্ব হন্তং সুপ্রসন্নকম্॥

"বায়ুপুরাণে" রহিয়াছে,

পঞ্চবক্ত্রো বৃষারূঢ প্রতি বক্ত্রং ত্রিলোচনঃ।
কপালশূলখট্টাঙ্গী চন্দ্রমৌলিঃ সদাশিব।

ধ্যানে আছে সদাশিবের পঞ্চাস্য থাকিবে, কিন্তু আমরা যে মূর্ত্তিটির চিত্র প্রকাশ করিলাম তাহাতে পঞ্চমুখ নাই।

"গরুড় পুরাণে" সদাশিব মূর্ত্তির ধ্যান এইরূপ :—

বদ্ধ পদ্মাসনাসীনঃসিত ষোড়শবর্ষকঃ।
পঞ্চবক্ত্রঃ করাগ্রৈঃ স্বৈর্দশভিশ্চৈব ধারয়ন্॥
অভয়ং প্রসাদং শক্তিং শূলং খট্টাঙ্গমীশ্বরঃ।
দক্ষৈঃ করৈর্বামকৈশ্চ ভুজঙ্গঞ্চাক্ষসূত্রকং॥
ডমরুকং নীলোৎপলং বীজপুরক মুত্তমং।
ইচ্ছাজ্ঞান ক্রিয়াশক্তি স্ত্রিনেত্রোহি সদাশিবঃ।

গরুড়পুরাণ পূর্ব্বার্দ্ধ ২৩ শ অধ্যায়।

"মহানির্ব্বাণ তন্ত্রে" ও সদাশিবের ধ্যান দৃষ্ট হয় :—

ব্যাঘ্র-চর্ম্ম পরিধানং নাগ যজ্ঞোপবীতনম্।
বিভূতি লিপ্ত সর্ব্বাঙ্গং নাগালঙ্কার ভূষিতম্॥
ধূম্র পীতারুণ শ্বেতকৃষ্ণৈ পঞ্চভিয়ানবৈঃ।
যুক্তং ত্রিনয়নং বিভ্রজ্জটাজুট ধরং বিভুম্॥
গঙ্গাধরং দশভুজং শশিশোভিত মস্তকম্।
কপালং পাবকং পাশং পিনাকং পরশুং করৈঃ॥
বামৈ র্দধানং দক্ষৈশ্চ শূলং বজ্রাঙ্কুশং শরম্।
বরঞ্চ বিভ্রতং সর্ব্বৈ র্দেবৈ র্মুনিবরৈঃ স্তুতম্॥
পরমানন্দ সন্দোহোল্লসৎ-কুটিল-লোচনম্॥
হিম-কুন্দেন্দু-সঙ্কাশং বৃষাসন বিরাজিতম্।
পরিতঃ সিদ্ধ গন্ধর্ব্বৈরপ্সরোভিরহর্নিশম্।
গীয়মানমুমাকান্তমেকান্ত শরণম্ প্রিয়ম্।

সদাশিব মূর্ত্তি দশভুজ এবং দ্বাদশভুজ হইয়া থাকেন। তাঁহার দশভুজে যথাক্রমে শূল, টঙ্ক, কৃপাণ, বজ্র, ঘণ্টা অঙ্কুশ, পাশ, অক্ষমালা এবং অভয় মুদ্রা প্রভৃতি রহিয়াছে। মূর্ত্তির

মস্তকোপরি জটা-মণ্ডিত-মুকুট! ললাটে ত্রিনয়নের এক নয়ন। অপর দুই নয়ন আকর্ণ-বিস্তৃত। সদাশিব পদ্মের উপর পদ্মাসনে বা বদ্ধপর্য্যঙ্কাসনে ধ্যান মগ্ন। প্রসন্ন নত দৃষ্টি। কণ্ঠে মালা দোদুল্যমান। ঊর্দ্ধে চালচিত্রের উভয় পার্শ্বে কিন্নর বা অপ্সর-যুগল। সদাশিবের মুখমণ্ডলে সুগম্ভীর ধ্যানের ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সদাশিব মূর্ত্তি তান্ত্রিকদের 'ষট্‌চক্র' অনুভূতির অঙ্গীভূত। সদাশিব ষট্‌শিবের একশিব। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব এবং পরশিব।

[রুদ্র যামলতন্ত্র—রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত। ৫৬,৮৮, ১২৮ পৃষ্ঠা] সদাশিব পঞ্চ মহাপ্রেতের একজন। [Avalon, Principles of Tantra, Vol II. P. 390, n-4 and P. 392] এই প্রসঙ্গে স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় লিখিয়াছেন :— "A description corresponding to the figure on the seals is according to A. K. Moitra. found in *Mahanirvan Tantra*, ullasa XIV. [See Banerjee, EP. Ind. Vol. XII P.P. 6-7] But it must be observed that some of the attributes assigned to the deity are not traceable on the seals and in the stone images deposited in the Museums of the Varendra Research Society, Rajshahi and the Calcutta Sahitya Parishad. Inscriptions of Bengal—p. 81.]

বল্লালসেনের তাম্রশাসনের মুদ্রার লাঞ্ছন **সদাশিব** এবং ইষ্টদেবতা **অর্দ্ধনারীশ্বর** দেব দুইয়েরই উল্লেখ আছে। সদাশিব মূর্ত্তি এবং অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি বাঙ্গালা দেশে কেন ভারতবর্ষেই খুব কম পাওয়া গিয়াছে। সৌভাগ্য-ক্রমে আমরা **সদাশিব মূর্ত্তি** এবং **অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি** দুই মূর্ত্তিই বিক্রমপুরে পাইতেছি।

আমি প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিক্রমপুরের পুরাপাড়া গ্রাম হইতে একটি অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়াছিলাম। ঐ মূর্ত্তিটি এক্ষণে বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতি প্রতিষ্ঠিত রাজসাহী চিত্রশালায় আছে।*

*সদাশিব মূর্ত্তি বাঙ্গালাদেশে খুব বেশী পাওয়া যায় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ-চিত্রশালায় এবং বরেন্দ্র-অনুসন্ধান সমিতির চিত্রশালায় ও সদাশিব মূর্ত্তি আছে। স্বর্গত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইহার উল্লেখ করিয়াছেন—Eastern Indian School of Me-di-eval sculpture p. 10. 9 বন্ধুবর রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয়ের নিকট ধাতু-নির্ম্মিত একটি অতি সুন্দর ক্ষুদ্র সদাশিব মূর্ত্তি আছে। তাঁহার সংগৃহীত কিংবা পরিষদের সংগৃহীত মূর্ত্তির সহিত আমাদের এই চিত্রের মূর্ত্তিটির বিশেষ প্রভেদ নাই। বিক্রমপুরে প্রাপ্ত সদাশিব মূর্ত্তি—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—পৌষ ১৩৩৩।

মহামায়া—কাগজীপাড়া

[ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সৌজন্যে]

বল্লালসেন দেব যে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির উপাসক ছিলেন তাহা তাঁহার তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোক হইতেই সূচিত হইয়াছে। সীতাহাটিতে প্রাপ্ত তাম্রশাসনখানি শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। যিনি অর্দ্ধনারীশ্বর দেবের উপাসক ছিলেন তিনি কি রাজধানীতে অর্দ্ধনারীশ্বর দেবের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করেন নাই? এইরূপ একটী প্রশ্ন আপনা হইতেই মনে আসে। কিন্তু সেই ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে যখন এই মূর্ত্তিটি বিক্রমপুর হইতে আবিষ্কৃত হইল, তখন হইতেই বোধ হয় এই প্রশ্ন সমাধানের সুযোগ ঘটিয়াছিল।

বিক্রমপুরেরও বাঙ্গালার সর্ব্বপ্রথম অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি

এই খানে নৃপতি বল্লালসেনদেবের বিষয় আলোচনা-প্রসঙ্গে যদি অর্দ্ধনারীশ্বর সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করি তাহা হইলে উহা বিশেষ অপ্রাসঙ্গিক হইবে বলিয়া মনে করিনা। আমি একথাটা বিশেষগৌরবের সহিত বলিতে পারি যে আমার পূর্ব্বে কেহ অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই এবং তৎসম্বন্ধে কেহ কোন প্রবন্ধ ও লেখেন নাই।

সে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে একবার বর্ষার সময় যখন বিক্রমপুরের ঐতিহাসিক বিবরণ সংগ্রহ করিবার জন্য নৌকাযোগে গ্রামে গ্রামে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলাম, তখন একদিন বেলা-শেষে শ্রাবণের অশ্রান্ত বারিবর্ষণের মধ্যে পুরাপাড়া নামক গ্রামের খালটি দিয়া যাইবার সময় এক বাড়ীর পাশের একটি ডোবার নিকট অর্দ্ধপ্রোথিত অবস্থায় সুন্দর একটি মূর্ত্তি দেখিতে পাইলাম। আমি নৌকা ভিড়াইয়া সেই বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। গৃহস্বামী সেই অযত্ন-বিক্ষিপ্ত শ্রীমূর্ত্তিখানি আমাকে প্রদান করিতে এতটুকুও ইতস্ততঃ করিলেন না।

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি সংগ্রহের ইতিহাস

দেখিবামাত্রই মূর্ত্তিখানি যে অর্দ্ধনারীশ্বর দেবের তাহা চিনিতে পারিলাম। কি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর গঠন, কি সুন্দর মসৃণ অবয়ব, কি কোমলতা, কি শিল্প নৈপুণ্য, দেখিবামাত্রই আনন্দে অভিভূত হইলাম। বিক্রমপুরে বাঙ্গালীর একটী নিজস্ব শিল্পধারা ছিল। বারেন্দ্রভূমের ধীমান্ ও বীতপালের ন্যায় বিক্রমপুরেও একটি শিল্পীসঙ্ঘ গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাহারা পাথর সংগ্রহ করিয়া আনিয়া বিক্রমপুরেই এই সকল মূর্ত্তি গড়িত। সেই শিল্পিগণ রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরের আশেপাশেই বাস করিত। আমি এ সম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছি। সে বিষয়ে যথাস্থানে আলোচনা করিব।

হেমাদ্রিকৃত "চতুর্ব্বর্গচিন্তামণি" নামক গ্রন্থের ব্রতখণ্ডেও অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির বর্ণনা আছে। তাহা এই—

"অর্দ্ধং দেবস্য নারী তু কর্ত্তব্যা শুভলক্ষণা।
অর্দ্ধন্তু পুরুষঃ কার্য্যঃ সর্ব্বলক্ষণভূষিতঃ।

এক সময়ে বাঙ্গালাদেশে অর্দ্ধনারীশ্বর মহাদেবের পূজাবিধি প্রচলিত ছিল। আজ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার অন্য কোনও স্থান হইতেই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই।*

বিক্রমপুরে যে সকল দেউলবাড়ী আছে, তাহার মধ্যে পুরাপাড়ার দেউল বাড়ীটি বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই দেউলবাড়ীর নিকটেই "তাম্রকুণ্ড' নামক গভীর কুণ্ডের বা ডোবার পাশে এই মূর্ত্তিটি ছিল। আমি তাম্রকুণ্ডের পাশে দণ্ডায়মান অবস্থায় মূর্ত্তিটি দেখিতে পাইয়া উহা সংগ্রহ করিয়াছিলাম একথা প্রথমেই বলিয়াছি। আজ কয়েক বৎসর হইল পুরাপাড়ার দেউলবাড়ী হইতে একটি উমামহেশ্বর মূর্ত্তিও পাওয়া গিয়াছে।

"মৎস্যপুরাণে' যে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির স্তব আছে। তাহা এইরূপ—

অর্দ্ধেন দেবদেবস্য নারী রূপং সুশোভনম্।
ঈশার্দ্ধে তু জটাভারো বালেন্দুকলয়া যুতঃ॥
উমার্দ্ধে তু প্রদাতব্যৌ সীমন্ততিলকাবুভৌ॥
ত্রিশূলং বাপি কর্ত্তব্যং দেবদেবস্য শূলিনঃ।
বামতো দর্পণং দদ্যাদুৎপলং বা বিশেষতঃ
স্তনভারমথার্দ্ধে তু বামে পীনং প্রকল্পয়েত।
ইত্যাদি।

বিক্রমপুরে প্রাপ্ত এই মূর্ত্তিটির দিকে লক্ষ্য করুন। একবার ভাল করিয়া দেখুন —ঊর্দ্ধে বামদিকে ফণিময়—বিলম্বিত জটাজাল, কাঁধের উপর দিয়া আসিয়া-পড়িয়াছে। ললাটে অর্দ্ধ চন্দ্র। বামদিকে সিন্দুরবিন্দু, আকর্ণ-বিস্তৃত-নয়ন, কর্ণে, কর্ণ-ভূষা। অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তবু কি তার বিচিত্র গঠন-নৈপুণ্য। আর দক্ষিণে ফণি-কুণ্ডল। কণ্ঠে নরকপাল-মালা—বামে মণিময়-মালিকা। দক্ষিণে স্থূল যজ্ঞোপবীত, বাম কণ্ঠে পার্ব্বতীর লম্বিত দোদুল্যমান মণিমালার সহিত জড়াইয়া গিয়াছে।

দক্ষিণ হস্ত ভগ্ন। যদি অভঙ্গ থাকিত, তাহা হইলে সে হাতে থাকিত ত্রিশূল। বাম হস্তটীও সম্পূর্ণ ভগ্ন। যদি ইহা অভগ্ন থাকিত তাহা হইলে দেখিতে পাইতাম বাজু ও বলয় এবং অন্যান্য অলঙ্কার। বামে পীন স্তন। সূক্ষ্ম বস্ত্রাবরণে আবৃত। দক্ষিণে মুক্ত ও বিশাল বক্ষঃস্থল, পুরুষোচিত দৃঢ়তার সহিত খোদিত। আর পরিধানে বাঘছাল। কটীতে নরহস্ত। ঊর্দ্ধ লিঙ্গ। বামে স্তরে স্তরে মাল্যাকারে ভূষণসমূহ দোলায়মান।

*Up to now however, so far as known, only one image of Ardhanariswara has been discovered in East Bengal. Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptors in the Dacca Museum. P.—130. N. K. Bhattasali, M. A.

মূর্ত্তিটির পদদ্বয় ভগ্ন। যদি মূর্ত্তিটির পদ যুগল অভগ্ন থাকিত, তাহা হইলে দেখা যাইত যে দক্ষিণ পদখানি বিকশিত শতদলোপরি সুরক্ষিত আর বামপদখানি থাকিত লোহিত-রাগরঞ্জিত-পদালঙ্কার-শোভিত শতদলের উপর।

কবি ভারতচন্দ্রের অর্দ্ধনারীশ্বরের বর্ণনার সহিত মিলাইয়া এই মূর্ত্তিটি দেখিলে পাঠকগণ আনন্দ উপভোগ করিবেন।

আমার সংগৃহীত "অর্দ্ধনারীশ্বর" মূর্ত্তির বদনমণ্ডল ও নানাভাবে ক্ষত-বিক্ষত। এজন্য মুখমণ্ডলের অনেক খানি শোভা হ্রাস পাইয়াছে। তবু কি মসৃণ, কি কোমল! এই মূর্ত্তিখানি যদি অভগ্ন থাকিত তাহা হইলে এই মূর্ত্তিখানি সৌন্দর্য্য-শিল্পানুরাগী ব্যক্তি মাত্রেরই আনন্দের কারণ হইত। এখনও এই মূর্ত্তির উভয় পার্শ্বের সৌন্দর্য্য ভাস্কর-শিল্পানুরাগী ব্যক্তিরই চিত্ত মুগ্ধ করিয়া আসিতেছে। বঙ্গের ভাস্কর্য্য-শিল্প যে কতদূর উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল, এই মূর্ত্তিই ছিল তাহার প্রমাণ এবং এই মূর্ত্তি গঠনের জন্য বিক্রমপুরের কোনও অজ্ঞাত শিল্পির উদ্দেশ্যে আমরা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।

মূর্ত্তির বর্ণনা

শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী বর্ত্তমানে পরিচিত রামপালের বিস্তৃত সীমা মধ্যে পুরাপাড়া দেউল অবস্থিত। দেউল বলিতে দেবালয় বুঝায়। "দেবকুল শব্দ হইতে 'দেউল' শব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। "দেবকুলিকা" শব্দের অর্থ ক্ষুদ্র দেউল বা মন্দির। অধ্যাপক কিলহর্ণ "দেবকুলিকাকে" ক্ষুদ্র দেব মন্দির (small temple) বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু 'দেউল' বলিতে বৃহদাকার দেবমন্দিরকে ও বুঝাইয়া থাকে। বোধ হয় এই কবিতাটি অনেকেরই কণ্ঠস্থ আছে, "আছিল দেউল এক পর্ব্বত প্রমাণ।" কাজেই দেউল বলিতে বৃহদাকারের দেবমন্দিরও বুঝাইতে পারে।

পুরাপাড়া দেউল

শ্রীবিক্রমপুর রামপালের চারিদিকেই দেউল আছে। পূর্ব্বে পুরাপাড়ার দেউল বেশ বৃহদাকারের স্তূপ ছিল। এখন বিলীয়মান হইয়া আসিয়াছে। ঐ দেউল বা দেবালয়ের কাছেই ছিল বৃহৎ তাম্রকুণ্ড। তাম্রকুণ্ড শব্দের অর্থ সকলেরই জানা আছে। দেবপূজার জন্য যে তাম্রপাত্র ব্যবহৃত হয় তাহাই তাম্রকুণ্ড নামে অভিহিত হয়। পূজা শেষে বিল্বপত্র ও পুষ্প ইত্যাদি ঐ কুণ্ডটীর মধ্যে সম্ভবতঃ ফেলা হইত, ঐ জন্য আজও ঐ স্থানটী তামাকুণ্ড নামে পরিচিত।

দেউলবাড়ী

একথা সহজেই অনুমিত হয় যে, রাজধানী শ্রীবিক্রমপুরে যখন সেনরাজাদের অসাধারণ প্রভাবও প্রতিপত্তি সে সময়ে অর্দ্ধনারীশ্বর দেবের প্রতি ভক্তিপরায়ণ নৃপতি

বল্লাল অর্দ্ধনারীশ্বর দেবের এই সুন্দর শ্রীমূর্ত্তিটী গঠন করিয়া উহার জন্য একটি বিরাট মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া উহাতে তাঁহার আরাধ্যদেবতাকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। দেবতার অর্চ্চনার জন্য পুরোহিতগণের বাসস্থান ও সেখানেই নির্দ্দিষ্ট ছিল, সেই পুরোহিত পাড়াই কালবশে **পুরাপাড়া** নামে রূপান্তরিত হইয়াছে। তারপর কে জানে কোন্ এক দুর্দ্দিনে হয় মানুষের হাতে কিংবা কোন দৈব দুর্বিপাকে [মানুষের হাতেই সম্ভবতঃ] ঐ মন্দির ভূমিসাৎ হইল,—মূর্ত্তি পাদপীঠ হইতে ভূলুণ্ঠিত হইল,—কে জানে কি-ভাবে দেব-মূর্ত্তির শরীরের বিভিন্ন অংশ কে বা কাহারা ভাঙ্গিয়া ফেলিল। শৈব সেনরাজগণের ধ্যানধারণার আশ্রয় এই অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির এইরূপ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া নয়নদ্বয় অশ্রুসিক্ত হয়।

আমরা ভক্ত নৃপতি বল্লালের তাম্রশাসনে এই জন্যই নৃত্যোৎফুল্ল অর্দ্ধনারীশ্বর দেবের স্তুতি দেখিতে পাই।

বল্লাল সেনের সর্ব্বপ্রধান রাজধানী জয়স্কন্ধাবার যে শ্রীবিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল, এই মূর্ত্তিটিও তাহার একটি শ্রেষ্ঠ প্রমাণ।

বাঙ্গলাদেশে এই একটি মাত্র 'অর্দ্ধনারীশ্বর' মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ভবিষ্যতে হয়ত আরও পাওয়া যাইতে পারে। আমি খিচিং (ময়ূরভঞ্জ) যাদুঘরে একটি অর্দ্ধ ভগ্ন অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি দেখিয়াছি।

অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি ধ্যান-ধারণার সামগ্রী। নৃতত্ত্ববিশারদ কোন কোন পণ্ডিত ইহার আদর্শকে যৌন-মিলনের বা দাম্পত্য মিলনের শ্রেষ্ঠ কল্পনা বলিয়া থাকেন।

আমার লিখিত "বিক্রমপুর ও বাঙ্গলার সর্ব্বপ্রথম অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধ "ভারতবর্ষ" ষড়বিংশ বর্ষ প্রথম খণ্ড, চতুর্থ সংখ্যা—আশ্বিন ১৩৪৫ এ প্রকাশিত হইলে পর উহা পাঠ করিয়া আমাকে পাটনার পুরাতত্ত্ব বিভাগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বন্ধুবর শ্রীযুক্ত অমলানন্দ ঘোষ মহাশয় নিম্নলিখিতরূপ পত্র লিখেন :—

"প্রিয় যোগেন বাবু :—

ভারতবর্ষে আপনার "অর্দ্ধনারীশ্বর" সংক্রান্ত প্রবন্ধ আগ্রহ সহকারে পড়িলাম। আপনি যে সমস্ত পৌরাণিক উল্লেখ সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহার মধ্যে "মৎস্যপুরাণই"

*মূল কথাগুলি বোধ হয় Mc crindles Ancient India as described in Classical Literature নামক গ্রন্থে আছে। Half man, Half woman অন্য কোনো দেবতার মূর্ত্তি হিন্দুদের মধ্যে প্রচলিত বলিয়া অবগত নহি, সেইজন্য এখানে অর্দ্ধনারীশ্বরের মূর্ত্তি উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া মনে করি। শ্রীঅমলানন্দ ঘোষ। Archæological Survey-Central circle,Patna. 14. 9. 38.

প্রাচীনতম। "মৎস্যপুরাণের" সমসাময়িক অথবা তদপেক্ষা কিছু প্রাচীন একটী উল্লেখ পাইয়াছি, আপনাকে তাহা জানাইতেছি।

"The earliest authentic allusion to it seems to be that of the Indian ambassador to Bardisanes [Birca A. D. 220] who described a cave in the north of India which contained an image of a god, ***half-man, half-woman*** [Fergussion, History of Indian and Eastern architecture Vol I. 427.]

শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনচন্দ্র ভট্টাচার্য্য তদ্‌রচিত "Indian Images" নামক গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—A type of Siva and Parvati in amorous Posture is known as *Ardhanariswar.* Its description is—one halp of Siva has the form of a goddess. The part representing siva has plaited hair, a crescent, and a trident. The other part representing Uma should have parted hair, a cobra in the right ear, a mirror or a lotus, and thick breast.]

"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন—"ইংরাজবাজারের তিন মাইল পশ্চিমে বাগবাড়ী নামক স্থানে বল্লালের একটি উদ্যানবাটিকা ছিল। শুনা যায়, উহার দরজায় অর্দ্ধনারীশ্বর শিব মন্দির ছিল ; এখন ঐ মন্দির বৃহৎ মৃত্তিকাস্তূপে পরিণত হইয়াছে।" ইহা অনুমান মাত্র, আজ পর্য্যন্তও বরেন্দ্রের কোনও স্থান হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই।

সেন রাজগণের সময়ে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির অর্চ্চনা বাঙ্গালার নানাস্থানে প্রচলিত ছিল বলিয়া অনুমিত হয়।

বল্লালসেন হিন্দুধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি মগধ, ভূটান, চট্টগ্রাম, আরাকান, উড়িষ্যা এবং নেপালে হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি তান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিলেন বলিয়া কথিত আছে।*

বল্লালসেনের চরিত্র সম্বন্ধে আনন্দভট্ট রচিত "বল্লাল-চরিতে" অনেক কথা আছে।

* ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় তদ্‌ রচিত—"Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptors in the Dacca Museum নামক গ্রন্থের ১৩০-১৩১ পৃষ্ঠায় অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

(১) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রত্রিকা-১৭শ ভাগ ২৩৭-২৩৮ পৃষ্ঠা।

তাহা হইতে জানা যায় যে বল্লালের চরিত্র ভাল ছিল না। তিনি প্রথমে শৈব ছিলেন, পরে সিংহগিরি নামক ব্যক্তির প্রবর্ত্তনায় ঘোর তান্ত্রিক হইয়া পড়েন। বল্লাল ডোম জাতীয় একটি স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্ত হন এবং সেই ডোমকন্যাকে সমাজে চালাইবার চেষ্টা করেন; তজ্জন্য অনেকে বিরক্ত হইয়া বল্লালের নিকট হইতে দূরে চলিয়া যায়। ময়মনসিংহের অষ্টগ্রাম প্রভৃতির দত্তদিগের কুর্চ্চীনামায় আছে:—

বল্লালসেনের চরিত্র

চন্দ্রতুর্য্যশূন্যাবনি-সংখ্যা শাকে বল্লালভীতঃ খলুদত্তরাজঃ।
শ্রীকণ্ঠনাম্না গুরুণা দ্বিজেন শ্রীমাননন্তস্তু জগাম বঙ্গম্।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ও আনন্দভট্ট বিরচিত 'বল্লাল-চরিতের' উপর নির্ভর করিয়া বল্লালের চরিত্রে দোষারোপ করিয়াছেন। (১) বলা বাহুল্য যে "বল্লাল-চরিত" নৃপতি বল্লালসেনের মৃত্যুর প্রায় তিনশত বৎসর পরে বিরচিত হইয়াছিল। কাজেই বল্লাল-চরিতের লিখিত বিবরণী বা কাহিনী সমুদয়, কোন সুধী ব্যক্তিই বিশ্বাস করিতে পারেন না—এজন্য আমরা বল্লালসেন সম্বন্ধে প্রকাশিত কিংবদন্তী ইত্যাদি সযত্নে পরিহার করিলাম।

বল্লালসেনের চরিত্র সম্বন্ধে কোন তাম্রশাসনেই কোনরূপ নিন্দার উল্লেখ নাই বরং তাঁহাকে গুণ গৌরবে অতুলনীয়, অদ্বিতীয় বীর বলিয়াই বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার নামের পূর্ব্বে পরমেশ্বর, পরমমাহেশ্বর, পরমভট্টারক, মহারাজাধিরাজ, কুশলময় ইত্যাদি বিশেষণ সংযুক্ত থাকায়* বরং তাঁহার মহত্বই সূচিত হইতেছে। বল্লালসেন বৌদ্ধ-বিদ্বেষী ছিলেন। বৌদ্ধেরা তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন না অনেকে এইরূপ বলিয়া থকেন।

বল্লালসেন আনুমানিক ১১৮৫ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র **লক্ষ্মণসেন** গৌড়বঙ্গের সিংহাসনারোহণ করেন।

লক্ষ্মণসেন দেবের যে সমুদয় তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে **তপন-দীঘির** তাম্রশাসনখানিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহার পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেন দেবের কোনও খোদিত-লিপি বা তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয় নাই। খৃষ্টিয় ১৮৭৫ অব্দে দিনাজপুর জেলার তৎকালীন ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত ওয়েষ্টমেকট সাহেব [E. V. Westmacott] উক্ত জেলার গঙ্গারামপুর থানার অধীন তপন দীঘি গ্রামের নিকটবর্ত্তী স্থানে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ভীষণ দুর্ভিক্ষের সময় পুষ্করিণী

তপন দীঘির তাম্রশাসন

* The Hinduism of Ballal Sen was of the tantric kind. The Brahman genealogists assert that he sent numerous missionaries, all Brahmans, to Magadha, Bhotan, Chittagong, Arakan, Orissa and Nepal. V. A. Smiths Early History of India, P. 403,

খননকালে আবিষ্কৃত এই তাম্রশাসনখানির পাঠোদ্ধার করিয়া এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রে প্রকাশ করেন। এই তাম্রশাসনখানি প্রকাশিত হইবার পর সেই প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে ঐতিহাসিক মহলে বিশেষ আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। সৌভাগ্যের বিষয় এই তাম্রশাসন খানি নানা হাত ঘুরিয়া অবশেষে স্বর্গত কাশীমবাজারের মহারাজা বদান্যবর মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুরের অর্থব্যয়ে "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে"র চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। ওয়েষ্টমেকট সাহেবের পাঠ প্রকাশিত হইবার পর স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায়" ইহার একটী পাঠ প্রকাশ করিয়াছেন। *

লক্ষ্মণসেন দেবের যে কয়খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে আমরা এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করিলাম।

১। **তপনদীঘীর তাম্রশাসন**—এই তাম্রশাসনখানি **শ্রীবিক্রমপুরের জয়স্কন্ধাবার** হইতে প্রদত্ত। ইহার দ্বারা হুতাশন দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, মার্কণ্ডেয় দেবশর্ম্মার পৌত্র, লক্ষ্মীধর দেবশর্ম্মার পুত্র, ভরদ্বাজগোত্রীয় ঈশ্বর দেবশর্ম্মা নামক জনৈক ব্রাহ্মণকে পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতী বেলহিষ্টি [কেহ কেহ বিল্বষ্টী পাঠ করিয়াছেন] গ্রামখানি "পুণ্যোযশোহভিবৃদ্ধয়ে দত্তহেমাশ্বরথ মহাদানের সময় দক্ষিণা স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। এই ভূমিতে সংবৎসরে দেড় শত কপর্দ্দক পুরাণ মূল্যের শস্য উৎপন্ন হইত।" এই তাম্রশাসনে লক্ষ্মণসেন পরমেশ্বর-পরমবৈষ্ণব-পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়াছেন। গ্রহীতা ঈশ্বর দেবশর্ম্মা সামবেদের কৌথুমশাখাধ্যায়ী ও তিনি হেমাশ্বরথ মহাদানাচার্য্য উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন।

তপন দীঘির তাম্রশাসনের প্রথম দুইটী শ্লোকে সেনবংশের আদি পুরুষ চন্দ্রের প্রশংসা রহিয়াছে। তাহার পরের সাতটী শ্লোকে সামন্তসেন হইতে লক্ষ্মণসেন পর্য্যন্ত সেনরাজগণের পরিচয় রহিয়াছে। এই তাম্রশাসনে রাজরাজন্যক, রাজ্ঞী, রাণক, রাজপুত্র, রাজামাত্য, পুরোহিত, মহাধর্ম্মাধ্যক্ষ, মহাসান্ধিবিগ্রহিক, মহাসেনাপতি, মহামুদ্রাধিকৃত, অন্তরঙ্গ, বৃহদুপরিক, মহাক্ষপটলিক, মহাপ্রতীহার, মহাভোগিক, মহাপিলুপতি, মহাগণস্থ, দৌঃসাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, নৌ-বলহস্ত্যশ্বগোমহিষাজাবিকাদিব্যাপৃতক গৌল্মিক, দণ্ডপাশিক, দণ্ডনায়ক, বিষয়পতি প্রভৃতি। এই সব বিভিন্ন রাজপুরুষগণের নাম যেমন আছে, পূর্ব্বে যে সমুদয় তাম্রশাসনের কথা উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতেও তেমনি আছে।

*Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol XIIV Part I P. 128-154.18.75 Epigraphia Indica, Vol I 305-315 সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা সপ্তদশ ভাগ দ্বিতীয় সংখ্যা ১৩৫-১৪০ পৃষ্ঠা।

প্রদত্ত ভূমি হইতে বৎসরে পঞ্চাশৎকপর্দ্দক করস্বরূপ রাজকোষে আসিত। ইহার চতুঃসীমা :—

পূর্ব্বে **বুদ্ধবিহারী**দেবত্তানিকরদেয়াম্মণ ভূম্যাটাবাপপূর্ব্বাসী : সীমা। দক্ষিণে নিচডহার পুষ্করিণী সীমা। পশ্চিমে নন্দীহরিপাকুণ্ডী সীমা। উত্তরে মোল্লাণখাড়ী সীমা। এই তাম্রফলকে অনেকগুলি শব্দ ভুল লিখিত আছে।

এই তাম্রশাসন খানির আকার ১৩½+১১½ ইঞ্চি"। শীর্ষদেশে সদাশিব মুদ্রা-সংযুক্ত। তাম্রফলকখানিতে ৫৬ পংক্তি খোদিত লিপি আছে। ভাষা সংস্কৃত। দ্বাদশ শতাব্দীর উত্তর ভারতে প্রচলিত দেবনাগর অক্ষরের অনুরূপ। বাঙ্গলা হরফের পূর্ব্বাবস্থা।

এই তাম্রফলকে যে যে গ্রামের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, আজ পর্য্যন্তও তাহা স্থিরীকৃত হয় নাই। এই তাম্রফলকের তেমন কোনও বিশেষত্ব নাই। আমুলিয়া এবং গোবিন্দপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের অনুরূপ সাতটি শ্লোক রহিয়াছে। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় বলেন : The document was issued from the "Campt of Victory" situated at VIKRAMPURA. এই তাম্রফলকে 'বুদ্ধবিহারের' উল্লেখ আছে। ইহা দ্বারা অনুমিত হয় যে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বঙ্গে ও উত্তর বঙ্গে [বারেন্দ্রে] বুদ্ধপ্রভাব একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই।

২। **জয়নগর তাম্রশাসন**—চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত জয়নগর গ্রামে এই তাম্রশাসনখানি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। স্বর্গত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার লিখিত "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থের শেষভাগে ইহা প্রকাশ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার "সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাবের প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছেন"

তাম্রশাসনের ইতিহাস

বাঙ্গালা অক্ষরের সময় নিরূপণ প্রসঙ্গে রাজা লক্ষ্মণসেনের প্রদত্ত যে তাম্রশাসনের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, তদবিতই সমগ্র বিষয়টি লিথোগ্রাফে মুদ্রিত করিয়া এক এক খণ্ড এই পুস্তক মধ্যে নিবেশিত করিতে আমাদের অতিশয় ইচ্ছা ছিল, কারণ তাহা হইলে, সেই সময়ে এদেশে কিরূপ অক্ষর প্রচলিত ছিল, তাহা পাঠকগণ স্বচক্ষে দেখিতে পাইতেন। কিন্তু বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আমরা বহু অনুসন্ধান করিয়াও সে তাম্রশাসন খানি আর একবার হস্তগত করিতে পারিলাম না। মজীলপুরের জমিদার শ্রীহরিদাস দত্ত মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বাঙ্গালা অক্ষরে লিখিত উহার একটি প্রতিলিপি আমাদের নিকট প্রেরণ করিয়াছেন'। গ্রন্থের শেষভাগে আমরা উহা অবিকল মুদ্রিত করিলাম। ত্রিবেণীর হলধর চূড়ামণি মহাশয় বিস্তর পরিশ্রম করিয়া ঐ সনন্দের লিপি পাঠ করিয়াছিলেন। তিনিও সমুদয় অক্ষর বুঝিতে পারেন নাই—অবুদ্ধ স্থলে স্বয়ং যোজনা করিয়া দিয়াছেন। সন তারিখের স্থল অস্পষ্টই রহিয়াছে। এইরূপে উহার রচনা অনেক বিকৃত হওয়ায় স্থানে স্থানে স্পষ্টরূপ অর্থ বুঝিতে পারা যায় না—এইজন্য আমরা উহার বাঙ্গালা অনুবাদ প্রকাশ করিলাম না, সংস্কৃত পাঠকগণ যতদূর পারেন, উহার অর্থ করিয়া লইবেন। ঐ তাম্রশাসনে "খাড়ি মণ্ডলী" শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়। অদ্যাপি সুন্দরবন মধ্যে ঐ খাড়ী পরগণা ও খাড়ীগ্রাম বর্ত্তমান আছে।"
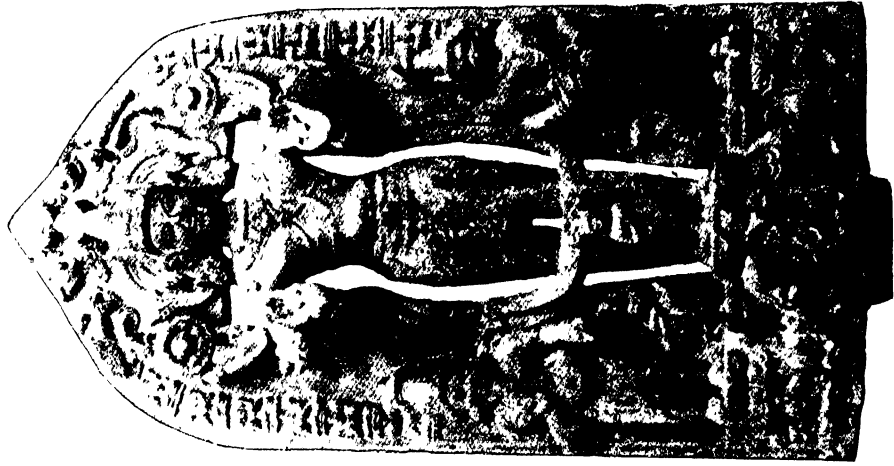
বিষ্ণুমূর্ত্তি—টঙ্গিবাড়ী

দ্বাদশাদিত্য-শোভিত সূর্য্য মূর্ত্তি

[আশুতোষ চিত্রশালার সৌজন্যে]

নৃসিংহ মূর্ত্তি—টঙ্গিবাড়ী
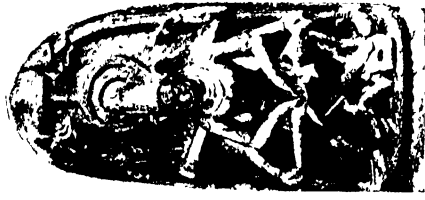
অষ্টভুজা—মহিষমর্দ্দিনী

এই তাম্রশাসনের প্রতিলিপি কোথাও প্রকাশিত হয় নাই। ওয়েষ্টমেকট সাহেব ১৮৭৫ সালের এসিয়াটীক সোসাইটীর পত্রিকার ২য় পৃষ্ঠায় স্যায়রত্ন মহাশয় দত্ত এই তাম্র শাসনের উল্লেখ করিয়াছেন।

সুন্দরবনের এই তাম্রশাসন খানি ও শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার দ্বারা মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লাল সেন পাদানুধ্যানাৎ পরমেশ্বর পরমবীরসিংহ—পরমবৈষ্ণব-মহারাজাধিরাজ শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব :—জগদ্ধর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র নারায়ণ দেবশর্ম্মার পৌত্র, নরসিংহ দেবশর্ম্মার পুত্র, গার্গ-গোত্রীয় অঙ্গিরা-বৃহস্পতি-শৈলগর্গ-ভরদ্বাজ-প্রবর-ঋগ্‌বেদাশ্বলয়ানশাখাধ্যায়ী, শ্রীধর দেবশর্ম্মাকে দেওয়া হইয়াছিল। প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতী খাড়ীমণ্ডলিকার মধ্যস্থ শাস্ত্যশাবিক গ্রামে ছিল। বোধ হয়, কৃষ্ণধর দেবশর্ম্মা শাস্ত্যশাবিক গ্রামবাসী ছিলেন, শাস্ত্যশাবিক, কৃষ্ণধরের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। এই ভূমি নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইয়াছিল। ইহা তিন দ্রোণ পরিমিত ভূমিতে পঞ্চাশৎ পুরাণ মূল্যের শস্যোৎপাদন করিত। পূর্ব্ববাঙ্গালায় এখনও দ্রোণ পরিমাণ প্রচলিত আছে, বি ৪৬॥• ২॥• হাতে দ্রোণ জমি হয়।

প্রদত্ত ভূমি পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তপাতী খাড়িমণ্ডলিকার মধ্যবর্ত্তী তল্লপুর চতুরক গ্রামে পূর্ব্বে শাস্ত্যশাবিকপ্রভা শাসন সীমা, দক্ষিণে চিতাড়ি খাতার্দ্ধ সীমা, পশ্চিমে শাস্ত্যশাবিক-রামদেবশাসনপূর্ব্ব সীমা, উত্তরে শাস্ত্যশাবিক বিষ্ণুপাণিগড়োলী কেশবগড়োলী ভূমি সীমা, ইথং চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন ভূমি নারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে মাতাপিতা এবং স্বীয় পুণ্য ও যশোবৃদ্ধি কামনায় প্রদত্ত হইয়াছে। শাসনভূমি উগ্রমাধব নামীয় স্তম্ভাঙ্কিত দ্বাদশাধিক হস্ত দ্বারা মাপ করা হইয়াছিল। *

৩। **আনুলিয়ার তাম্রশাসন** এই তাম্রশাসন খানি রাণাঘাটের অন্তর্গত আনুলিয়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল।

এই তাম্রশাসনখানি সাহিত্য-পরিষদের চিত্রশালায় রক্ষিত আছে। পণ্ডিত রজনী-কান্ত চক্রবর্ত্তী "ঐতিহাসিক চিত্রে" ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন ও স্বর্গত ঐতিহাসিক

* 'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা বলেন—উগ্রমাধব এক দেবতার নাম। বোধ হয় তাঁহার মন্দিরের নিকটবর্ত্তী কোন উচ্চতা পরিমিত প্রমাণদণ্ড দ্বারা ভূমির দৈর্ঘ্য প্রস্থ মাপা হইতে। ভূমি মাপক রাজকর্ম্মচারিগণের কোনরূপ প্রবঞ্চনা করিবার উপায় ছিল না, নিতান্ত মূর্খ প্রজাও উগ্রমাধব সংলগ্নস্তম্ভ সমান দীর্ঘ মাপদণ্ড দ্বারা আপনাদের ভূমির পরিমাণ হইল কিনা, তাহা পরীক্ষা করিতে পারিত। গৌড়ের ইতিহাস ২০৬ পৃষ্ঠা।

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় তাম্রশাসন খানি সহ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন।*

এই তাম্রশাসন দ্বারা বিপ্রদাস শর্ম্মার প্রপৌত্র, শঙ্কর দেবশর্ম্মার পৌত্র, দেবদাস দেবশর্ম্মার পুত্র কৌশিক গোত্রীয় বিশ্বামিত্র-বন্ধুল কৌশিক-প্রবর যজুর্ব্বেদ কাণ্ব-শাখাধ্যায়ী পণ্ডিত রঘুদেব শর্ম্মাকে শ্রীপুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তপাতি ব্যাঘ্রতটিস্থিত পূর্ব্বে অশ্বত্থবৃক্ষ সীমা, দক্ষিণে জলপিল্লী সীমা। পশ্চিমে শান্তিগোপশাসন সীমা, উত্তরে মালামঞ্চ-বাটী সীমা। এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন মাথুরিয়া-খণ্ড ক্ষেত্রনারায়ণ ভট্টারকের উদ্দেশ্যে মাতাপিতা ও স্বীয় পুণ্য যশোবৃদ্ধি কামনায় প্রদত্ত হইয়াছে। শাসন ভূমিতে সম্বৎসরে এক শত কপর্দ্দক পুরাণ ও মূল্যের শস্য উৎপন্ন হইত।

ইহার অক্ষর দেবনাগর ও বঙ্গাক্ষরের মধ্যবর্ত্তী। এই তাম্রশাসনখানির আকার ১৩½ × ১১½" ইঞ্চি পরিমিত। উর্দ্ধে দশভুজসমন্বিত সদাশিব মূর্ত্তি সংযোযিত। ৫৬ পংক্তি খোদিত। এই লিপি সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত।

আমুলিয়ার তাম্রশাসন খানিও **শ্রীবিক্রমপুর** জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল।

৪। **মাধাইনগর তাম্রশাসন**—এই তাম্রশাসন খানা পাবনা জেলার সিরাজগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত মাধাইনগরে পাওয়া গিয়াছে। মাধাইনগরের নিকটবর্ত্তী নিমগাছী অঞ্চলে রঘুনাথ বুনিয়া নামক এক ব্যক্তি উহা পায়। পাবনার সরকারী উকীল প্রসন্ননারায়ণ রায়-চৌধুরী মহাশয় "ঐতিহাসিক চিত্রে" ইহার পাঠ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত পাঠ প্রকাশিত হইবার পর উহা স্বর্গত গঙ্গামোহন লস্করের হাতে আসে। তাঁহার মৃত্যুর পর এসিয়াটীক সোসাইটীর অধিকারভুক্ত হয়। কিছুদিন পরে এই তাম্রশাসন সম্পর্কে প্রবন্ধ এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায়ও প্রতিলিপি ও পাঠ সহ প্রকাশিত হইয়াছে।*

৫। **শক্তিপুর শাসন**—মুর্শিদাবাদ সদরের অন্তর্গত শক্তিপুর গ্রামের এক বিধবা এই তাম্রশাসনখানির স্বত্বাধিকারিণী ছিলেন, তাঁহার মৃত্যুর পর সাতকড়ি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে ইহা "বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের" চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে। এই তাম্রশাসনখানি শক্তিপুর গ্রামে পাওয়া গিয়াছে বলিয়া ইহা "**শক্তিপুর তাম্রশাসন**" নামে পরিচিত। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার ১৩৩৭ বঙ্গাব্দের চতুর্থ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত রমেশ বসু মহাশয় সর্ব্বাগ্রে এই তাম্রশাসনখানির পাঠ প্রকাশ করেন। ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২২শে শ্রাবণ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের দ্বিতীয় মাসিক

*ঐতিহাসিক চিত্র, ১ম বর্ষ, পৃঃ ২৮৭, Journal of the Asiatic Society of Bengal Vol. 1907 Part I P. 61 J. A. S. B. Vol. VII, Part II P. 43 Epigraphia Indica Vol. X. J.A.S,B. Vol. 1896 Pt. I P. 6.

অধিবেশনে এই শাসনের সম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এই প্রবন্ধটীর নাম—"লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত শক্তিপুর শাসন ও প্রাচীন বঙ্গের ভৌগোলিক বিভাগ।" ডাক্তার ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে তাম্রশাসনোক্ত ভূ-ভাগের স্থান নির্দ্দেশ করিতে যাইয়া পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির সীমা নির্ণয়, করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং তৎসম্পর্কে বিশেষ গবেষণার পরিচয় দিয়েছেন।

এই তাম্রফলকখানির দুইদিকেই খোদিত লিপি আছে। শাসনখানি অন্যান্য লেখেরই অনুরূপ। সেনরাজগণের মুদ্রা সদাশিব ইহার উর্দ্ধভাগে সংযোজিত রহিয়াছে।

শাসন-পরিচয়

শাসনখানি মোট ৫৮ পংক্তিতে সম্পূর্ণ হইয়াছে। প্রত্যেক দিকে ২৯ পংক্তি করিয়া লিপি রহিয়াছে। এই তাম্রশাসনের অক্ষরগুলি সুস্পষ্ট। পড়িতে কোনরূপ অসুবিধা হয় না।

শাসনখানির ভাষা সংস্কৃত গদ্য ও পদ্যে বিরচিত। তাম্রশাসন খানা হইতে জানা যায় যে হেমন্ত সেনের প্রপৌত্র বিজয়সেনের পৌত্র এবং বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন সূর্য্যগ্রহণোপলক্ষে কুবের নামক ব্রাহ্মণকে ৮৯ দ্রোণ পরিমিত ভূমি দান করিয়াছেন। সেই ভূমি কঙ্ক গ্রামভুক্ত্যন্তঃপাতি দক্ষিণবীথ্যামুত্তর রাঢ়ায় অবস্থিত। অর্থাৎ এই শাসন দত্ত ভূমিগুলি কঙ্কগ্রাম ভুক্তির দক্ষিণাংশে উত্তর-রাঢ় প্রদেশে কুম্ভীনগর (বিষয়ে ?) মধুগিরি মণ্ডলে কুমারপুর চতুরকে অবস্থিত ছিল। প্রদত্ত জমী দুইখণ্ডে মোট ৮৯ দ্রোণ পরিমিত ছিল। প্রথম খণ্ড ৩৬ দ্রোণ, দ্বিতীয় খণ্ড ৫৩ দ্রোণ।

এই তাম্রশাসনে দূতকের নাম "সান্ধিবিগ্রহিক ত্রিপুরিনাথ। গোবিন্দপুর শাসনের সংবতের অঙ্ক ২, ২৮শে ভাদ্র, আনুলিয়ার সংবত ৩, ৯ই ভাদ্র, তপনদীঘির ও মদ্জিলপুর শাসন গুলি দ্বিতীয় সংবৎসরের। এই চারিখানি শাসনেই দূত মহাসন্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্ত। কিন্তু এই শক্তিপুর শাসন খানির মধ্যে সান্ধিবিগ্রহিকের নাম ত্রিপুরারি রহিয়াছে। সম্ভবতঃ ইনি নারায়ণ দত্তের পরে সান্ধিবিগ্রহিকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এই তাম্রশাসন খানিও **শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবার** হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। যথা :—"সখলু শ্রীবিক্রমপুরসমাবাসিত জয়স্কন্ধাবারাত্। মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেন দেবপাদানুধ্যাত। পরমেশ্বর পরম-ভট্টারক-**পরম-বৈষ্ণব** মহারাজাধিরাজ শ্রীমন্মহারাজাধিরাজ শ্রীলক্ষ্মণ সেন দেবঃ কুশলী। ইত্যাদি। দেখা যাইতেছে যে লক্ষ্মণসেন দেবের পাঁচখানি তাম্রশাসনই **শ্রীবিক্রমপুর** জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

৬। **গোবিন্দপুর শাসন**—এই তাম্রশাসনখানি ২৪ পরগণার অন্তর্গত বারুইপুরের নিকটবর্ত্তী গোবিন্দপুর গ্রামে পুষ্করিণী খনন-কালে উক্ত গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রাপ্ত হন। তৎপরে ঐ শাসনখানি সুপ্রসিদ্ধ

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হয়। তিনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুরোধক্রমে বঙ্গীয়-সাহিত্য পরিষদের এক মাসিক অধিবেশনে এই তাম্রশাসনখানি প্রদর্শন করেন।

তাম্রশাসন খানির আয়তন ১৩½"×১২½" ইঞ্চি। ইহার শিরোদেশে দশভুজসমন্বিত সদাশিব মূর্ত্তি তাম্রফলকের সহিত দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত রহিয়াছে। এই মূর্ত্তিটি খোদিত নয়—ছাঁচে ফেলা বলিয়াই বোধ হয়। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনেও এইরূপ রাজমুদ্রা আছে, তাহাতে **"শ্রীসদাশিব মুদ্রয়া মুদ্রয়িত্বা"** বাক্যে রাজমুদ্রার পরিচয় দেওয়া আছে। এই তাম্রশাসনের রাজমুদ্রা রাসায়নিক পরীক্ষায় বিশুদ্ধ তাম্র বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এই তাম্রশাসনখানি "পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীবল্লালসেনের পাদানুধ্যান তৎপর পরমেশ্বর পরমভট্টারক **পরমনারসিংহ** (নরসিংহদেবের উপাসক) মহারাজাধিরাজ কুশলী শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন **শ্রীবিক্রমপুর-সমাবাসিত** [স্থাপিত] শ্রীমজ্জয়-স্কন্ধাবার [রাজধানী] হইতে শ্রীবর্দ্ধমানভুক্তির অন্তঃপাতী পশ্চিমবাটীকাতে বেঠড্ডচতুরকে পূর্ব্বে জাহ্নবী অর্দ্ধসীমা, দক্ষিণে লেঘদেবমণ্ডপীসীমা, পশ্চিমে ডালিম্ব-ক্ষেত্রসীমা, উত্তরে ধর্ম্মনগরসীমা, এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্ন তদ্দেশীয় ব্যবহারিক ৫৬ হস্ত পরিমিত নলদ্বারা সপ্তদশ উন্মানাধিক, ৬০ দ্রোণ পরিমিত এক প্রত্যেক দ্রোণে ১৫ পুরাণ উৎপত্তি নিয়মে বৎসরে ৯০০ উৎপত্তিবিশিষ্ট বিড্ডরশাসন, সসাটবিটপ, জল ও স্থলের সহিত, খাত ও উষর অর্থাৎ অনুর্ব্বর ভূমির সহিত গুবাক, নারিকেল ইত্যাদি বৃক্ষসম্পন্ন সহদশাপরাধসর্ব্বলোকের পীড়ারহিত অচট্টভট্ট প্রবেশ অকিঞ্চিৎ প্রগ্রাহ্য তৃণপূত গোচর পর্য্যন্ত, গোস্বামী দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র হলদেব শর্ম্মার পৌত্র, শ্রীনিবাস দেবশর্ম্মার পুত্র বাৎস্য গোত্র বাৎস্য আপ্লুবান্ ঔর্ব্ব জামদগ্ন্যপ্রবর সামবেদের কৌথুম শাখাচরণানুষ্ঠানপর উপাধ্যায় শ্রীব্যাসদেবশর্ম্মাকে পুণ্যদিনে বিধিবৎ উদকস্পর্শ পূর্ব্বক ভগবান্ নারায়ণ ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া মাতা পিতা ও নিজের পুণ্য ও যশ বৃদ্ধির জন্য রাজ্যাভিষেককালে উৎসর্গীকৃতত্বহেতুক, চন্দ্র, সূর্য্য ও পৃথিবীর অস্তিত্বকাল যাবৎ, ভূমিছিদ্রন্যায়েন তাম্রশাসন করিয়া তাহাদিগের দ্বারা প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে আপনারা সকলে অনুমতি করুন। ইত্যাদি।

গোবিন্দপুরের তাম্রশাসন খানিও **শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার** হইতেই প্রদত্ত হইয়াছে।

এই তাম্রফলকখানি ক্ষৌণীন্দ্র [পৃথিবীপতি] শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ব্যসশাসনে **সান্ধিবিগ্রহিক নারায়ণ দত্তকে** দূত করিয়াছিলেন।

গোবিন্দপুরের শাসনেও আমরা লক্ষ্মণসেনের বীরত্বের পরিচয় পাই। যথা:—"ক্ষাত্রধর্ম্মের আশ্রয়স্বরূপ সুজনগণনাগ্রগণ্য শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন বল্লালসেনের অপত্য। ইনি বাহুবলে শত্রুগণের সমরস্পৃহা নিবারণ করিয়াছিলেন; ইনি এমন শক্তিসম্পন্ন যেন মনে হয় দিগীশবৃন্দ স্ব স্ব অধিকৃত দিগাঙ্গনাগণের সম্ভোগ-লালসায় আপনাদিগের অংশ প্রদান করিয়া এই লক্ষ্মণসেনকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ সমস্ত দিক্ ইহার বীর্য্যে বশীভূতছিল।"

এই ফলকখানার ও প্রথম শ্লোক ওঁ নমোনারায়ণায়। বিদ্যুদ্‌যত্র মণিদ্যুঃতি ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং॥ ইত্যাদি।

আমাদের এই সমুদয় তাম্রশাসন সম্পর্কে আর অধিক বিস্তারিত আলোচনা নিস্প্রয়োজন। এ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ নানা ভাবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক পত্র ও পত্রিকাতে আলোচনা করিয়াছেন এবং বিভিন্নরূপ মতামতও প্রকাশ করিয়াছেন।

১। তপনদীঘির তাম্রশাসন, ২। সুন্দরবনের নিকটে প্রাপ্ত শাসন, ৩। আনুলিয়ার প্রাপ্ত শাসন, ৪। শক্তিপুর তাম্রশাসন, ৫। গোবিন্দপুর শাসন এই পাঁচখানি তাম্রশাসনই বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হইয়াছে। কেবল মাধাইনগর তাম্রশাসন শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে প্রদত্ত হয় নাই। মাধাইনগর তাম্রশাসনখানি ধার্য্যগ্রাম-পরিসরসমাবাসিত স্থান হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। এই শাসনে লক্ষ্মণসেন গৌড়েশ্বর বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন।

লক্ষ্মণসেনদেবের তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকটি প্রায় প্রত্যেক তাম্রশাসনের প্রথম ভাগে দেখা যায়। শ্লোকটি এই:—

> "বিদ্যুদ্‌যত্র মণিদ্যু তিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
> বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালাবলাকাবলীঃ।
> ধ্যানাভ্যাস সমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
> ভূয়াৎঃস ভবার্ত্তিতাপভিদুরং শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ। ইত্যাদি

বল্লালসেন দেবের তাম্রশাসন আরম্ভ হইয়াছে "ওঁ নমঃ শিবায়" বলিয়া। আর লক্ষ্মণসেন দেবের তাম্রশাসনের আরম্ভ হইয়াছে "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া।

লক্ষ্মণ সেন পরম বৈষ্ণব বিশেষণে বিশেষিত

তপনদীঘির তাম্রশাসনে, সুন্দরবনের তাম্রশাসনে, আনুলিয়ার তাম্রশাসনে, শক্তিপুরের তাম্রশাসন প্রভৃতিতে তাঁহাকে "পরমবৈষ্ণব" বিশেষণে বিশেষিত করা হইয়াছে। কাজেই লক্ষ্মণসেন যে পরম বৈষ্ণব ছিলেন সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ হইতে পারি।

লক্ষ্মণসেনের নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন অধ্যাপক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ভারতবর্ষ ১৩শ বর্ষ ২য় খণ্ড—৩য় সংখ্যা ৪৪১—৪৪৫ পৃষ্ঠা। ফাল্গুন ১৩৩২

* Saktipur Copper Plate of Lakshmansena Epigraphia Iadica Vol. XI. No, 37 Page 211-213.

"লক্ষ্মণ সেন দেবের রাজত্বকালে সেন রাজবংশের চরম উন্নতির সময়। ডাঃ হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন, "বল্লালসেনের পরে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন রাজা হন। কাহারও মতে ১১১৯ খৃষ্টাব্দে যে লক্ষ্মণ সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল, লক্ষ্মণসেনই তাহার প্রবর্ত্তক। তিনি .কাশীর রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। কামরূপের রাজাও পরাজিত হইয়া তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করেন। অবশেষে প্রভুত্বের চিহ্ন স্বরূপ দক্ষিণ সমুদ্র তীরে তিনি একটী বিশাল জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। লক্ষ্মণসেন পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন।"

সেনরাজবংশ ও লক্ষ্মণসেন

কেশবসেনের তাম্রশাসনে আছে :—

বিখ্যাতঃ ক্ষিতিপালমৌলিরভবৎ শ্রীবিশ্ববন্দ্যো নৃপঃ।
ন গগনতলে এব শীতরশ্মির্ন কনকভূধর এব কল্পশাখী।
ন বিবুধপুর এব দেবরাজো বিলসতি যত্র ধরাবতারভাজি।
বাহুবারণহস্তকাণ্ডসদৃশৌ বক্ষঃ শিলাসংহতং
বাণাঃ প্রাণহরা দ্বিষাং মদজলপ্রস্যন্দিনো দন্তিনঃ।
যস্যৈতাং সমরাঙ্গন প্রণয়িনীং কৃত্বা স্থিতিং বেধসা
কো জানাতি কুতঃ কুতো ন বসুধাচক্রে হমুরূপোরিপুঃ।

লক্ষ্মণসেন বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন। বিশ্বের বন্দ্যনীয় ছিলেন তিনি। পৃথিবীতলে কল্পশাখা সদৃশ এমন দানবীর কোথায়। তিনি দেখিতে কিরূপ ছিলেন ?—

লক্ষ্মণসেনের বাহুদ্বয় ছিল বারণ-হস্তকাণ্ড সদৃশ, বক্ষঃদেশ ছিল শিলাবৎ সংহিত, বাণ ছিল তাঁহার শত্রু প্রাণহর, লক্ষ্মণসেনের হস্তিগণ মদজল ক্ষরণ করিত। বিধাতা এ সকলকে সময়োপযোগী করিয়া তাঁহার অনুরূপ রিপু যে কোন্ স্থানে সৃষ্টি করিয়াছিলেন কে জানে!"

লক্ষ্মণসেন যে ধনুর্ব্বিদ্যায় অসাধারণ নিপুণ ছিলেন, তাহা "সেক শুভোদয়া" গ্রন্থেও উল্লিখিত আছে। তিনি গঙ্গাতীরে যাইয়া শরাভ্যাস করিতেন। তাঁহার নিক্ষিপ্ত শর অপর তীরে যাইয়া পড়িত।

* (১) ভারতবর্ষের ইতিহাস, ডাঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন।

(২) Lakshmanasena, to whom the inscriptions give imposing titles which suggest great military achievments. A literary source states he reached the hills of Malaya (Travancore) in his "conquest of the world". Inscription also record that he erected pillars of victory at puri" Benares, and Prayaga, to mark the limits of his conquests, and that he overcame Kamarupa.. He seems to have swept away the last remnants of Pala power, and so to have come into contact with the Gahadavalas, who, in the twelfth century, had been advancing gradually into Magadha. The Cambridge shorter History of India. P. 148.

লক্ষ্মণসেন কামরূপ এবং আরাকানরাজকে যে পর্য্যুদস্ত করিয়াছিলেন তাহার পরিচয়ও আমরা শাসন-লেখ হইতে পাইতেছি। লক্ষ্মণসেনের এবং বিশ্বরূপ সেনের প্রশস্তিকার, লক্ষ্মণ সেন কর্ত্তৃক কাশিরাজের [কান্যকুব্জ রাজের] পরাজয়ের বিষয়ও লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে জানিতে পারি যে বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষ্মণসেন :—

বেলায়াং দক্ষিণাব্ধের্মুষলধরগদাপাণি সংবাসবেদ্যাং
ক্ষেত্রে বিশ্বেশ্বরস্য স্ফুরদসিবরুণাশ্লেষগঙ্গোর্ম্মিভাজিং।
তীরোৎসঙ্গে ত্রিবেণ্যাঃ কমলভবমখারম্ভ নির্ব্যাজপূতে।
যেনোচ্চৈর্যজ্ঞযূপৈঃ সহ সমরজয়স্তম্ভ মালান্যধায়ি॥

ইহা হইতে জানিতে পারিতেছি যে লক্ষ্মণসেন, দক্ষিণ সমুদ্রের বেলাভূমিতে মুষলধর ও গদাপাণির সংবাসবেদীতে, অসি বরুণার গঙ্গা-সঙ্গম বারাণসীক্ষেত্রে ব্রহ্মার পবিত্র যজ্ঞক্ষেত্র ত্রিবেণীতে, যজ্ঞযূপের সহিত সমর বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহার দ্বারা এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে লক্ষ্মণসেন একদিকে ত্রিবেণী এবং বিশ্বেশ্বরের ক্ষেত্র [বারাণসী] এবং অপর দিকে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরস্থিত জগন্নাথ ক্ষেত্র [মুষলধর গদাপাণি সংবাস বেদ্যাং] পর্য্যন্ত তদীয় বিজয়-বৈজয়ন্তী উড্ডীন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। *

লক্ষ্মণসেনের দিগ্বিজয় সমর জয়স্তম্ভ

লক্ষ্মণসেন যেমন পরাক্রমশালী নৃপতি ছিলেন, তেমনি তিনি গুণগ্রাহী এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ছিলেন। লক্ষ্মণসেন নিজে সুপণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তাঁহার সভার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছিলেন, গোবর্দ্ধন, শরণ, জয়দেব, উমাপতি, ধোয়ি এই পঞ্চ রত্ন। লক্ষ্মণসেনের অমাত্য বটুদাসের পুত্র শ্রীধরদাস কর্ত্তৃক সংগৃহীত "সদুক্তিকর্ণামৃতে" তাঁহার রাজত্ব কালের কবিগণের বহু শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়। রামপাল দেবের রাজত্ব কাল হইতে গৌড়ীয়-শিল্প উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। এই যুগের নিদর্শন গুলি এখন পালসাম্রাজ্যের শিল্প নিদর্শন সমূহের সমতুল্য না হইলেও তদপেক্ষা অধিক হীন নহে। লক্ষ্মণসেনদেব প্রায় ত্রিংশবর্ষ কাল গৌড়সিংহাসনে আসীন ছিলেন। ১১৭০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। *

লক্ষ্মণসেনের

* (১) J. A. S. B 1896, P. I P. II.

(২) জয়দেব, শরণ, গোবর্দ্ধনাচার্য্য, উমাপতিধর ও ধোয়ী কবিরাজ, লক্ষ্মণসেনের সভায় বিরাজ করিতেন। রূপ ও সনাতন লক্ষ্মণসেনের সভামণ্ডপ দ্বারে—

"গোবর্দ্ধনশ্চ শরণো জয়দেব উমাপতিঃ।
কবিরাজশ্চ রত্নানি পঞ্চৈতে লক্ষ্মণস্য চ।"

* J. A. S. B. 1906. P. 174.

উমাপতিধর দাক্ষিণাত্য বৈদিক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি বিজয়সেন প্রতিষ্ঠিত প্রদ্যুম্নেশ্বর মন্দিরস্থিত যে প্রশস্তি রচনা করেন, তাহার বিষয় আমরা প্রসঙ্গ-ক্রমে পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। জয়দেবের সুবিখ্যাত "গীতগোবিন্দের" তৃতীয় শ্লোকে আছে,—

> বাচঃ পল্লবয়ত্যুমাপতিধরঃ সন্দর্ভশুদ্ধিং গিরাং
> জানীতে জয়দেব এব শরণঃ শ্লাঘ্যো দুরূহদ্রুতে।
> শৃঙ্গারোত্তরসৎপ্রমেয়রচনৈরাচার্য্য গোবর্দ্ধন—
> স্পর্দ্ধী কোঽপি ন বিশ্রুতঃ শ্রুতিধরো ধোয়িকবিক্ষ্মাপতি।

লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্বের প্রথম অবস্থায় জয়দেবের "গীতগোবিন্দ" এবং ধোয়ী কবির 'পবনদূত' বিরচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

পবনদূত

ধোয়ী কাশ্যপ গোত্রীয় পালধী গ্রামীণ ছিলেন। তিনি কালিদাসের "মেঘদূতের" অনুকরণ করিয়া পবনদূত রচনা করেন। কবির কাব্যের বিষয়-বস্তু এই—লক্ষ্মণসেন দিগ্বিজয় করিতে যাইয়া ভারতের দক্ষিণভাগে মলয় পর্ব্বতে যাইয়া উপস্থিত হন। তাঁহার অপূর্ব্ব রূপ লাবণ্য দর্শনে কুবলয়বতী নামক এক গন্ধর্ব্ব কন্যা মুগ্ধা হন। তিনি পবনকে দূত করিয়া লক্ষ্মণসেনের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ও পথের নির্দ্দেশ করিয়া দিতেছেন। ধোয়ী কবির পবন দূতে সুহ্মের বর্ণনা আছে।

গৌড় দেশের বর্ণনা করিতে যাইয়া কবি লিখিয়াছেন—"সেখানে মহাদেবের নগর শ্বেত অট্টালিকাবলীতে কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায় শোভমান। সেখানে গঙ্গানদীর তীরে অর্দ্ধ গৌরীশ্বর মূর্ত্তি বিরাজমান। মহাদেবের ক্ষেত্র হইতে গঙ্গা অল্প দূরস্থ।" অর্দ্ধ গৌরীশ্বর মূর্ত্তির উল্লেখ দেখিয়া মনে হয় যে সে সময়ে অর্থাৎ সেন রাজাদের রাজত্বকালে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তির পূজা বিশেষ ভাবে প্রচলিত ছিল, এ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন ও পবনদূতের বর্ণনা হইতে তৎকালীন দেশের অবস্থা অবগত হইতে পারি।

লক্ষ্মণসেনের সময় রাজ্যের অবস্থা

লক্ষ্মণসেনের সময়ে বঙ্গের রাজধানীর রাজপথ সায়ংকালে বারবিলাসিনীগণের মঞ্জীর নিক্কনে চমকিত হইত। * * * নিশীথে স্বেচ্ছা বিহারিণী অভিসারিকাগণের অব্যাহত গতিতে মুখরিত হইত! প্রেমালিপ্স কামিনীগণের প্রেমালাপে সমস্ত বিভাবরী উদ্‌ভ্রান্ত হইত। ইহা হইতেই বুঝিতে পারা যায় সেকালে কিরূপ বিলাস-স্রোতে নগরী ভাসমান ছিল।

লক্ষ্মণসেন যে শ্রীবিক্রমপুরের [বঙ্গে-পূর্ব্ববঙ্গে] রাজধানীতে দীর্ঘকাল বাস

চণ্ডী মূর্ত্তি

শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবের [রাজত্বের] তৃতীয় সংবৎসরে মালদেব [দেব] সুত অধিকৃত দামোদর চণ্ডী দেবীর [মূর্ত্তি] আরম্ভ করেন এবং নারায়ণ কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই মূর্ত্তিটি শ্রীবিক্রমপুর রামপাল হইতে ঢাকাতে নীত হইয়াছিল। বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে জীবনবাবুর প্রতিষ্ঠিত একটি মন্দিরে চণ্ডী দেবী প্রতিষ্ঠিতা আছেন।

করিয়াছিলেন, সে সম্বন্ধে আমরা নানারূপ প্রমাণ পাইয়া থাকি। লক্ষ্মণসেনের মহাসামন্ত বটুদাসের পুত্র মহামাণ্ডলিক শ্রীধর দাসের "সূক্তিকর্ণামৃতে" আছে :—

শাকে সপ্তবিংশত্যাধিকশতোপেত দশশতে শরদাম্
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেবক্ষিতিপস্য রসৈকত্রিংশে।
সবিতুর্গত্যা ফাল্গুনবিংশেষু পরার্থহেতাবকুতুকাৎ।
শ্রীধরদাসেনেদং "সূক্তিকর্ণামৃতং চক্রে"।"

অর্থাৎ শ্রীধরদাস ১১২৭ শকের ২০শে ফাল্গুন "সূক্তিকর্ণামৃত" রচনা করেন। তখন লক্ষ্মণসেনের রাজত্বের আনুমানিক ৩১ বৎসর অতীত হইয়াছিল এবং তিনি পূর্ব্ববঙ্গে অবস্থান করিতেছিলেন। সমগ্র গৌড়রাজ্যের কিয়দংশ হস্ত-বহির্ভূত হইলেও, তিনি তাঁহার দাবী পরিত্যাগ করেন নাই। সম্ভবতঃ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেন সিংহাসনাধিরোহণ করেন। সচারাচর ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে গৌড় নগর মুসলমানদের অধিকৃত হয়, এইরূপ বলা হয়। মুসলমানেরা ঐ অব্দে গৌড়রাজ্য আক্রমণ করে। লক্ষ্মণসেনের কোন পুত্র গৌড়ে অবস্থান করিয়া দীর্ঘকাল মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিহত করিয়াছিলেন। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে (৬০২-৩ হিজারায়) গৌড় নগর সম্পূর্ণ রূপে মুসলমানদের অধিকৃত হয়।

হলায়ুধ লক্ষ্মণসেনের ধর্ম্মাধিকারী ছিলেন। তিনি স্বকৃত "ব্রাহ্মণ-সর্ব্বস্ব" লিখিয়াছেন,—লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে বাল্যে রাজ পণ্ডিতের পদ ও প্রৌঢ়াবস্থায় ধর্ম্মাধিকারীর পদ প্রদান করেন যথা :—

"বাল্যে খ্যাপিতরাজপণ্ডিতপদঃ শ্বেতাংশু বিম্বোজ্জ্বল-
চ্ছত্রোৎসিক্ত—মহামহত্তমপদং দত্ত্বনবে যৌবনে।
যস্মৈ যৌবনশেষ যোগ্যমখিল-ক্ষ্মাপালংনারায়ণঃ
শ্রীমল্লক্ষ্মণসেনদেব নৃপতি ধর্ম্মাধিকারং দদৌ।

এইরূপ হইলে লক্ষ্মণসেনের রাজত্ব অতি দীর্ঘ হইয়া পড়ে। বোধহয়, লক্ষ্মণসেনের যৌবরাজ্য সহ রাজত্বের উল্লেখ করা হইয়াছে। লক্ষ্মণসেন, গৌড় ও নবদ্বীপ হইতে তাড়িত হইয়া পূর্ব্ববঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বহু ব্রাহ্মণ পরিবার গৌড় ও নবদ্বীপের সন্নিহিত স্থান ত্যাগ করিয়া রাজার সঙ্গী হন। এইজন্য বিক্রমপুর অঞ্চলে সদ্‌ব্রাহ্মণের সংখ্যা এত বেশী। লক্ষ্মণসেন পূর্ব্ববঙ্গে কতদিন রাজত্ব করেন, তাহা জানা যায় না। সে সময়ে লক্ষ্মণসেনের যতটুকু রাজ্য ছিল, হলায়ুধকে তাহার ধর্ম্মাধিকার প্রদান করিয়াছিলেন। হলায়ুধ আপনাকে "গৌড়েন্দ্র ধর্ম্মাপরাধিকারী" বলিয়াছেন। গৌড় হইতে তাড়িত হইলেও, সেন-বংশ গৌড়েন্দ্র পদবী হইতে শীঘ্র বঞ্চিত হ'ন নাই।

হলায়ুধ পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম ধনঞ্জয় ও মাতার নাম ছিল উজ্জলা।

তিনি বাৎস্যগোত্রীয় ছিলেন। মহাপণ্ডিত হলায়ুধ, শ্রুতি, স্মৃতি পুরাণ ও তন্ত্রের সার সংগ্রহ করিয়া "মৎস্যসূক্ত" রচনা করেন। সে সময় গৌড়বঙ্গ তান্ত্রিকতায় সমাচ্ছন্ন হইয়াছিল। যাহাতে হিন্দু সদাচার রক্ষা হয়, তান্ত্রিকতারও প্রতিকূল না হয়, ইহার ব্যবস্থা করিবার অভিপ্রায়েই "মৎস্যসূক্ত" রচিত হইয়াছিল। "মীমাংসা-সর্ব্বস্ব", "বৈষ্ণব-সর্ব্বস্ব", "শৈবসর্ব্বস্ব", "পুরাণ সর্ব্বস্ব", "পণ্ডিত সর্ব্বস্ব" হলায়ুধের রচিত। হলায়ুধের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম পশুপতি। ইনি লক্ষ্মণসেনের মন্ত্রীত্ব করিয়াছিলেন। পশুপতির "পশুপদ্ধতি" নামক স্মৃতি-গ্রন্থ বিখ্যাত। হলায়ুধের অপর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ঈশান, স্মৃতি ও মীমাংসা শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। "আহ্নিক পদ্ধতি" প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। এই তিন ভ্রাতাই বিবিধ শাস্ত্রে বিশারদ পরম পণ্ডিত ছিলেন।

হলায়ুধ পণ্ডিত

শূলপাণি

সে সময়ে শূলপাণি ও একজন প্রধান পণ্ডিত ছিলেন। তিনি "দীপকলিকা" নামক যাজ্ঞবল্ক সংহিতার টীকা সম্পাদন করেন।

পুরুষোত্তম দেব নামক বিখ্যাত পণ্ডিত "ত্রিকাণ্ড শেষ" নামক অভিধান রচনা করেন। পুরুষোত্তমদেব বৌদ্ধ ছিলেন। লক্ষ্মণসেন তাঁহাকে পাণিনি ব্যাকরণের বৈদিক প্রয়োগাংশ বাদ দিয়া ভাষাবৃত্তি রচনা করিতে আদেশ করেন। পুরুষোত্তম দেবের রচিত এই বৃত্তির নাম "লঘুবৃত্তি।"

পুরুষোত্তম দেব ও "ত্রিকাণ্ড শেষ"

জয়দেব, গোবর্দ্ধন, শরণ, উমাপতিধর ও ধোয়ি কবিরাজ প্রভৃতির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

লক্ষ্মণসেন দেবের মাতার নাম ছিল রামদেবী। রামদেবী চালুক্যবংশের কন্যা ছিলেন। মাধাইনগরে আবিষ্কৃত তাম্রশাসনে লিখিত আছে :—

তাম্রশাসন ও লক্ষ্মণসেন

ধরাধরান্তঃপুরমৌলিরত্নচালুক্যভূপালকুলেন্দুরেখা
তস্য প্রিয়াভূদ্বহমানভূমির্লক্ষ্মী পৃথিব্যোরপি রামদেবী।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে সেনবংশীয় নৃপতিগণের সহিত দাক্ষিণাত্যপ্রদেশের নৃপতিগণের বৈবাহিক সম্বন্ধ বরাবরই অক্ষুন্ন ছিল। মাধাইনগরের তাম্রশাসনে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আছে :

কর্ণাটক্ষত্রিয়াণমজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেন : ইত্যাদি। ইহার দ্বারা লক্ষ্মণসেন আপনার বংশকে কর্ণাট ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

লক্ষ্মণসেনের ১। সুন্দরবনের তাম্রশাসন খানি তাঁহার রাজ্যাঙ্কের দ্বিতীয় বর্ষে মাঘ মাসের দশমদিনে প্রদত্ত হইয়াছিল। ২। লক্ষ্মণসেন দেবের দিনাজপুরের তপনদীঘির

তাম্রশাসন খানি তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে ভাদ্রমাসের তৃতীয় দিবসে হেমশ্বরথ দানের দক্ষিণা স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল। ৩। আনুলিয়ার তাম্রশাসনখানিও বিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবার হইতে তাঁহার তৃতীয় রাজ্যাঙ্কের ভাদ্রমাসের নবম দিনে প্রদত্ত হইয়াছিল। ৪। মাধাইনগরের তাম্রশাসনখানি ৫৭।৫৮ পংক্তি অস্পষ্ট থাকায় কোন্ বৎসরে উহা প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা অবগত হওয়া যায় না। ৫। গোবিন্দপুরের তাম্রশাসনখানি তাঁহার রাজত্বের ৩য় সংবৎসরে প্রদত্ত হইয়াছিল।

তাম্রশাসনের কাল নির্দ্দেশ

আমরা বাল্যকালে যখন ঢাকা বাঙ্গালাবাজারের মেসে কিছুদিন ছিলাম, তখন প্রতিদিন বুড়ীগঙ্গা নদীতে স্নান করিবার জন্য জীবন বাবুর প্রতিষ্ঠিত একটী মন্দিরে এক দেবী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা দেখিয়াছি। সুন্দর কারুকার্য্য-খচিত প্রস্তরনির্ম্মিত তোরণের ভিতর দিয়া মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইত। কতবার এ মূর্ত্তি দেখিয়াছি, কিন্তু তখন কিই বা বুঝিতাম! কিন্তু একদিন পাষাণের ঘুম ভাঙ্গিল! পাষাণ কথা কহিল। প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় একবার ঢাকায় আসিয়াছিলেন, তাঁহার দৃষ্টিতে পাষাণময়ী দেবী আত্মপ্রকাশ করিলেন, অন্ধ ঢাকাবাসীর চোখ খুলিল, তাঁহারা দেখিল দেবী পাষাণের মুখ দিয়া কথা বলিয়াছেন! এই দেবী চণ্ডীর মূর্ত্তি লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে বঙ্গে নারায়ণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

ঢাকা নগরের ডাল বাজারের আবিষ্কৃত লক্ষ্মণসেনের ৩য় রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠিত চণ্ডী মূর্ত্তি

রাখাল বাবু এবং ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই লিপিখানির পাঠোদ্ধার করেন। তাহা এই— প্রথম পংক্তি :—শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবস্য সং ৩

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পংক্তি:

২। মালদেই সুতঅধিকৃত শ্রীদামোদ্র

৩। ণ শ্রীচণ্ডীদেবী সমাবণা তদ্ভ্রাদকন্ধা"

তৃতীয় অংশ প্রথম পংক্তিতে আছে—শ্রীনারায়ণেন প্রতিষ্ঠিতেতি ৪র্থ ॥

অর্থাৎ শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেন দেবের [রাজত্বের] তৃতীয় সংবৎসরে মাল দেই [দেব ?] সুত অধিকৃত দামোদর চণ্ডীদেবীর [মূর্ত্তি] আরম্ভ করেন এবং নারায়ণ কর্ত্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। * এই মূর্ত্তিটি শ্রীবিক্রমপুর [রামপাল] হইতে আনীত হইয়াছিল।*

* The unique four armed image of Chandi * * was found in the ruins of Rampal in the Dacca District. It was obtained by the late Babu Baikunthanath Sena along with a number of other images, and presented to the late Babu Jivana Chandra Raya who erected a temple for this fine image and installed it there.

Iconograply of Buddhist and Brahmanical Sculpture. Page. 202-4 বাঙ্গালার ইতিহাস, ২৪৮ পৃষ্ঠা; 'ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ৩২১-৩২২ পৃষ্ঠা। Journal & proceedings of the Asiatic Society of Bengal, New Series Vol IX. P, 299 P. I. XXII—&c,

এই লিপি সম্বন্ধে নানারূপ বিতর্ক চলিয়াছে, তবে আমরা ঢাকার এই লিপিখানি যে তাঁহার জীবিত কালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। তাঁহার যে কয়খানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই তদীয় তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে প্রদত্ত হইয়াছে, অতএব লক্ষ্মণসেন দেবের রাজত্বের তৃতীয় বৎসরে এমন কোন কিছু ঘটনা ঘটিয়াছিল, যেজন্য নৃপতি লক্ষ্মণসেন আনন্দে ও উৎসাহে দান ধ্যান কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন।

"লক্ষ্মণসেন দেবের রাজ্যাভিষেক কাল হইতে একটি নূতন অব্দ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, 'লক্ষ্মণাব্দ' 'লক্ষ্মণ সংবৎ' নামে পরিচিত। এই অব্দটি সম্বন্ধে স্বর্গত রাখাল দাস বন্দ্যোপাধ্যায় তৎপ্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাসের" একাদশ পরিচ্ছেদে [২৯৯-৩০১ পৃষ্ঠা] আলোচনা করিয়াছেন। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা যতীন্দ্রবাবু—'পরগণাতি সন, সন বল্লালি ও লক্ষ্মণ সম্বৎ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে "ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিক্রমপুর অঞ্চলে হিন্দু নরপতিগণের শাসনাধীনে ছিল। সুতরাং এই অব্দটি কেশবসেনের পরবর্ত্তী কোনও সেন রাজা কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। পরগণা যদি "পারসী শব্দ হয়, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে, পরগণা বিভাগ সময়ে এই সনটীকে পরগণাতি সন বলিয়াই পরিচিত করা হইয়াছিল।" ডাঃ ভট্টশালী মহাশয়ের মত এই যে, দ্বিতীয় লক্ষ্মণাব্দ বর্ত্তমান সময়ে পরগণাতিসন নামে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে।" আমরা সম্ভবতঃ সকলের আগে 'আরতি' পত্রে ও 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' প্রথম সংস্করণে পরগণাতি সন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছিলাম।*

লক্ষ্মণ সংবৎ

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় জগদ্বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গত ডাঃ কিলহর্ণের মত গ্রহণ করিয়া স্থির করিয়াছেন যে; এই অব্দ ১১১৮-১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে গণিত হইতেছে। লক্ষ্মণাব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ আছে। ডাঃ কিলহর্ণের মতই সমীচীন বোধ হয়। তাঁহার মত অনুসারে লক্ষ্মণসেন দেবের অভিষেক কাল হইতে লক্ষ্মণাব্দ গণিত হইয়াছে।*

(1) Indian Antiquary, Vol XIX. P. I

(2) The Era of Lachman Sen—H. Beveridge. J. A.S.B. 1888, Pt, I. Page 2.

(3) Indian Antiquary vol. XIX. P. I.

(4) শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তৎ প্রণীত "গৌড়রাজমালা" গ্রন্থে ৬৪-৬৫ পৃষ্ঠায় লক্ষ্মণাব্দ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। 'বিক্রমপুরের ইতিহাস'—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত ৪৩-৪৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। পরিশিষ্টে এ বিষয়ে আলোচনা করা হইল। "ফরিদপুরের ইতিহাস" প্রণেতা আনন্দনাথ রায় মহাশয় ও একই সময়ে পরগণাতি সন সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

পরগণাতি সন সংযুক্ত একখানি প্রাচীন দলিল

লক্ষ্মণ সংবতের সূচনা ও প্রচলন সম্পর্কে নানারূপ মতামত চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু লক্ষ্মণসংবতের আরব্ধ কাল সম্বন্ধে পূর্ব্বে মতভেদ থাকিলেও মিঃ বিভারিজ ও ডাক্তার কিলহর্ণ প্রভৃতি মনীষীগণ 'আকবর নামার' উল্লিখিত একখানি ফারমানের তারিখ হইতে স্থির করিয়াছেন যে, লক্ষ্মণ সংবৎ ১১১৯ খৃষ্টাব্দে লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভকাল হইতেই গণিত।

আবার কেহ কেহ বলেন বল্লালসেনের মিথিলা আক্রমণ কালে তাঁহার পুত্র লক্ষ্মণসেন জন্মগ্রহণ করেন। পুত্রের জন্ম এবং বিজয় এই উভয় ঘটনা স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত তিনি পুত্রের নামে লক্ষ্মণ সম্বৎ নামে একটি অব্দ প্রচলন করেন। কাহারও কাহার ওমত এই যে মিথিলা বিজয় কালে চতুর্দ্দিকে বল্লালের মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইয়া গিয়াছিল এবং সে নিমিত্ত নবজাত লক্ষ্মণসেন সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ও হইয়াছিলেন এজন্যই উক্ত অব্দ বল্লালের নামে প্রচলিত না হইয়া তদীয় পুত্রের নামে প্রচলিত হয়। "লঘুভারতকার" বলেন :—

> প্রবাদঃ শ্রূয়তে চাত্র পারম্পরীণ বার্ত্তয়া।
> মিথিলে যুদ্ধ যাত্রায়াং বল্লালে হ তৃম্মৃতধ্বনিঃ।
> তদানীং বিক্রমপুরে লক্ষ্মণো জাতবানসৌ। লঘুভারত ২য় খণ্ড ১৪০ পৃঃ।

লক্ষ্মণাব্দ যেরূপেই উদ্ভাবিত হইয়া থাকুক না কেন তৎসম্বন্ধে পণ্ডিতগণ যেরূপ বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহার পর আর আমাদের পক্ষে ঐ বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা নিষ্প্রয়োজন, কৌতূহলী পাঠকগণ আমাদের পাদটিকায় লিখিত গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলেই নিজ নিজ মতামত সংগঠন করিতে পারিবেন। আমরা যে মত গ্রহণযোগ্য মনে করিয়াছি তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

"লক্ষ্মণাব্দ," "লক্ষ্মণ সংবৎ" "ল সং "নামে পরিচিত। মুসলমান-বিজয়ের পরেও ঐ অব্দ বহুকাল পর্য্যন্ত মিথিলায় ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং বর্ত্তমান সময়েও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কাজেই এই অব্দ সম্বন্ধে বিশেষভাবে গবেষণা করা আবশ্যক।

"লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক"

লক্ষ্মণসেন পরাক্রমশালী ছিলেন এবং নানা যুদ্ধে বিজয়ী হইয়াছিলেন, আমরা তাম্র-শাসনের খোদিত লিপি হইতে তাহাই জানিতে পারিতেছি। আমরা তাম্রশাসনে তাঁহাকে 'বিক্রম-বশীকৃত-কামরূপ' রূপে বর্ণিত হইতে দেখিতে পাইতেছি, আবার তাঁহাকে 'কাশিরাজ বিজেতা' রূপেও দেখিতে পাইতেছি। "লক্ষ্মণসেন যখন গৌড়ের অধিপতি, তখন কান্যকুব্জের সিংহাসনে গাহড়-বাল-রাজ-জয়চ্চন্দ্র এবং কলিঙ্গের সিংহাসনে দ্বিতীয় রাজরাজ, এবং তৎপরে দ্বিতীয় অনঙ্গভীম, সমাসীন ছিলেন। ইঁহারা কেহই গৌড়াধিপের

তুল্য পরাক্রমশালী ছিলেন না। সুতরাং ইঁহাদিগের সহিত যুদ্ধে গৌড়াধিপের জয়লাভ অসম্ভব নহে। কিন্তু লক্ষ্মণসেন গৌড়রাষ্ট্রের বহিঃশত্রু দমনে সমর্থ হইয়া থাকিলেও, প্রজাপুঞ্জের সহযোগিতার অভাবে, আভ্যন্তরীণ ঐক্য-সাধনে, এবং বিভিন্ন অংশের রক্ষার সুব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন না। সেই জন্যই মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার অবাধে মগধ ও বরেন্দ্র অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন।'*

আমরা বাল্যকাল হইতে শুনিয়া আসিতেছি লক্ষ্মণসেন মুসমলনান আক্রমণে ভীত হইয়া পলায়ন করেন। বাল্যকালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে পড়িবার সময় আমরা নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটি মুখস্থ করিয়াছি :

"তুমি কেহে নবদ্বীপ অন্তঃপুর দ্বারে,
রমণী অঞ্চল ধরি কম্প থরে থরে
কালামুখ ভীরু বৃদ্ধরাজ কুলাঙ্গার
চঞ্চল হৃদয় তার বাক্‌শক্তিহীন
গাঢ় অমা—অন্ধকারে বদন মলিন
নিশ্বাসে প্রবল বায়ু নয়নে আসার।
কে তুমি গঙ্গার এই গভীর উরসে
তরি যোগে পলাইছ ঘন ঊর্দ্ধশ্বাসে
চাহিয়া পশ্চাৎ পানে তিলে শতবার
একি ঘোর কোলাহল তোরণ দুয়ারে
গরজে কি কাল মেঘ প্রলয় সঞ্চারে ?

*　　*　　*

দাঁড়াও দাঁড়াও বৃদ্ধ ভয় অকারণ
এ কলঙ্ক ধৌত তব না হবে কখন
করি সর্ব্বনাশ বঙ্গে জীবনের আশ
অশীতি বৎসরে পুনঃ বাঁচিতে প্রত্যাশ।
ভীমবল বল্লালের তুমি কুলধর
বারেক * * সহ করহ সমর।
একি মন্ত্রী পশুপতি তোমার উচিত
নায়কি বিশ্বাসঘাতী জেনিছি নিশ্চিত।
ডাকি আনি দস্যুগণে নিজ গৃহ দ্বার
খুলে দেয় শুনি নাই জানিলাম তবে,

* গৌড় রাজমালা ৬৭-৬৮ পৃষ্ঠা।

এখনি সে প্রতিফল পদে পদে হবে
ইতিহাসে এ কলঙ্ক ঘুষিবে তোমার।
হলায়ুধ পণ্ডিতের মিথ্যা অভিমান,
ভীরুতার পরিচয় করি শাস্ত্র জ্ঞান,
একি উপদেশ হায়, স্বাধীনতা নাশে
*. * হস্তগত বঙ্গ ভূমি হবে?
রাজ অন্ন খেয়ে একি ব্যবহার তবে?
হিন্দু লক্ষ্মী ছেড়ে দিলে কোন্ সুখ আশে?
চিরদিন তরে বঙ্গ সুখ রবি গত,
উদিবে কি; রাহুগ্রাসে হইলে পতিত।
অধীনতা তমোজাল ক্রমেতে ঢাকিল
হায়রে বঙ্গের লক্ষ্মী······করে
সপ্তদশ জন মাত্র স্বাধীনতা হরে
ধন্যমানি বক্তিয়ার তব ইন্দ্রজাল।*

ইহা হইতেই আমরা বুঝিতে পারি যে লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্কের কথা কি ভাবে জন সমাজের কাছে প্রচারিত হইয়া আসিয়াছিল।

লক্ষ্মণসেন যখন নিশ্চিন্ত মনে পণ্ডিতগণ পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছিলেন সেই সময়ে মুসলমানেরা ধীরে ধীরে আপনাদের প্রভাব বিস্তার করিয়া রাজ্যের পর রাজ্য জয় করিতেছিলেন।

১১৯৩ খৃঃ অব্দে মুইজ্ উদ্দীন ঘুরী দ্বিতীয়বার বহু সৈন্য লইয়া ভারতবর্ষে আগমন করেন। তরাইন নামক স্থানে ঘুরীর সহিত পৃথ্বীরাজের যুদ্ধ হইল, সেই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজ বন্দী হইলেন।

পৃথ্বীরাজের মৃত্যুর পর ঘুরী আজমীর অধিকার করিলেন। একজন হিন্দু, করদ নৃপতিরূপে আজমীরের শাসনকার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। ঘুরী এই বিজয়ের পর গজনীতে ফিরিয়া গেলেন। তাঁহার তুরস্ক ক্রীতদাস কুত্‌বুদ্দীন আইবেককে ভারতবর্ষ শাসন করিবার জন্য রাখিয়া গেলেন।

কুত্‌বুদ্দীন স্বীয় রণনৈপুণ্য প্রভাবে শীঘ্রই দিল্লী এবং অন্যান্য অনেক স্থান জয়

* প্রিয়পাঠ, শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী প্রণীত। কলিকাতা সেণ্ট্রাল টেক্সট বুক কমিটির অনুমোদিত। অষ্টম সংস্করণ। Printed by Jadunath Seal, Hare Press 23 1, Bechu Chatterjee Street. Published by the Students Library. Dacca 1889. অর্দ্ধশতাব্দীরও পুর্ব্বের ছাত্রগণ লক্ষ্মণসেনের এই পলায়ন কলঙ্কের কথা কণ্ঠস্থ করিয়াছে। আমার আজও এই কবিতাটি স্মরণ আছে।

করিলেন (১১৯৩ খৃষ্টাব্দ)। এই বৎসরই কুত্‌বুদ্দীন, কনৌজের রাজা জয়চন্দ্রকে চন্দাবারের যুদ্ধে পরাজিত ও নিহত করেন। এইরূপে ইস্‌লামের বিজয়-গৌরব বারাণসী পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইল। এই বিজয়ের অত্যল্পকাল পরেই, কুত্‌বুদ্দীনের জনৈক কর্ম্মচারী বক্তিয়ারের পুত্র মুহম্মদ বঙ্গ ও বিহার জয় করেন। এই সময়ে বিহারের পাল বংশের একজন রাজা রাজত্ব করিতেন এবং বঙ্গদেশে সেন বংশীয় নৃপতি লক্ষ্মণসেন (আঃ ১১৮৫-১২০৬ খৃষ্টাব্দে) রাজত্ব করিতেছিলেন। লক্ষ্মণসেন বক্তিয়ার কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ইহাই জনপ্রবাদ।*

লক্ষ্মণসেন ও বক্তিয়ার

মহম্মদ-ই বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক যে ভাবে বঙ্গ-বিজয়-কাহিনী লিখিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিলে বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না মাত্র সপ্তদশ জন অশ্বারোহী বঙ্গ-বিজয় করিয়াছিল! ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ মাসের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—"সপ্তদশ অশ্বারোহী-লইয়া-বক্তিয়ার খিলিজী বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন, একথা যে বাঙ্গালী বিশ্বাস করে, সে কুলাঙ্গার!"

এতদিন পর্য্যন্ত ঐতিহাসিকগণ মুসলমান ঐতিহাসিক মিন্‌হাজ-ই-সিরাজ কর্ত্তৃক লিখিত "তবকাৎ-ই"—নাসেরী নামক ঐতিহাসিক গ্রন্থকে প্রামাণিকরূপে গ্রহণ করিয়া বীর্য্যবান লক্ষ্মণসেনকে পলায়ন-কলঙ্কে কলঙ্কিত করিয়া আসিতেছিলেন। স্বনামখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় স্বীয় অতুল্য গবেষণা দ্বারা সে কলঙ্ক

* In 1192 Muhammad Ibn Sam had avenged Prithiviraja's defeat of the Muslims in the previous year, and had crushed the Chahumana opposition to his advance. In 1193 Delhi had fallen, and in 1194 Kanauj, and in the same year Muhammad ibn Bakhtiyar, one of Kutb-ud-din Aibak's generals, advanced rapidly, conquered Bihar, took Nadiya and overthrew Lakshmanasena who escaped with his life. *If the Muhammadan historians are to be believed,* the invaders met with no organised opposition, and the conquest was extraordinarily easy. The Gahadavalas seem to have withdrawn and left open the way through Magadha. In Bihar itself three were no armed men, and the capital, Nadiya (afterwards Lakhnauti), was taken by only eighteen horsemen Lakshmanasena escaped across the river into Eastern Bengal, where early in the thirteenth century his sons succeeded him. Literature seems to have flourished at his court, the most notable names being those of Jayadeva, author of the Gitagovindo, Halayudha, and Dhoyi, author of the Pavanduta, an imitation of the celebrated Meghaduta. Inscriptions surviving from the reigns of his sens, Visvarupasena and Kesavasena, tell us only that these kings granted certain lands in the Vanga region and ruled for about fourteen and three years respectively. But, although the progress of the Muhammadans was slower in eastern than in western Bengal, by the middle of the thirteenth century all trace of Hindu rule had disappeared THE CAMBRIDGE SHORTER HISTORY OF INDIA. Edited by H. H. DODWELL. Pages 148 & 149.

অপনোদন করিয়াছেন। মৈত্রেয় মহাশয়ের পরে রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় তৎপ্রণীত "গৌড় রাজমালা" নামক গ্রন্থে, স্বর্গত ঐতিহাসিক বন্ধুবর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তৎপ্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাস" প্রথম ভাগে, এবং আমি মৎ প্রণীত "বিক্রমপুরের ইতিহাসে"ও লক্ষ্মণসেনের এই পলায়ন-কলঙ্ক সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং "ঢাকার ইতিহাসে"ও যতীন্দ্র বাবু এই বিষয় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। আমরা এই স্থানে এই বিষয়ে তাঁহাদের মতামত উদ্ধৃত করিলাম। দীর্ঘ হইলেও এ বিষয়টি সম্বন্ধে জানা একান্ত আবশ্যক।

স্বর্গত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় লক্ষ্মণসেনের পলায়ন কলঙ্ক সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গগমনের ষষ্টিবর্ষ পরে' সুবিখ্যাত মুসলমান ইতিহাস লেখক "মিনহাজ-ই সিরাজ" এদেশে উপনীত হইয়াছিলেন, তিনি 'তবকাৎ-ই-নাসেরী' নামক দিল্লী সাম্রাজ্যের যে ইতিহাস রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বিংশ পরিচ্ছেদে প্রসঙ্গক্রমে বঙ্গভূমির কিছু কিছু সংক্ষিপ্ত কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে। তাহাতে লিখিত আছে বক্তিয়ার সপ্তদশ অশ্বারোহী লইয়া "নওদিয়া" নামক রাজধানীতে উপনীত হইবা মাত্র, রায় লছমানিয়া' নামক হিন্দু নরপতি পলায়ন করিয়াছিলেন। * * ইহার মূল প্রমাণ, মিনহাজের গ্রন্থে, তাহার একমাত্র প্রমাণ বৃদ্ধ সৈনিকের পুরাতন আখ্যায়িকা! বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গগমনের ষষ্টিবর্ষ পরে এদেশে আসিয়া, মিনহাজ যে বৃদ্ধ সৈনিকের নিকট এই অলৌকিক কাহিনী শ্রবণ করিয়াছেন বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, তিনি তখন অশীতিপর বৃদ্ধ, তাঁহার সত্যনিষ্ঠা বা আত্মগৌরব ঘোষণার প্রবল প্রলোভন কতদূর প্রবল ছিল, এতকাল পরে তাহার মীমাংসা করিবার সম্ভাবনা নাই। মুসলমানগণের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী যুগে যাঁহারা এদেশের রাজসিংহাসন অলঙ্কৃত করিতেন, সেই সকল সুগৃহীতনামা নরপালগণের নানা শাসন লিপি আবিষ্কৃত হইয়া আমাদিগের নিকটে যে সকল পুরাতত্ত্বের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিয়াছে, তাহা সপ্তদশ অশ্বারোহীর অলৌকিক দিগ্বিজয় কাহিনীর সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারে না।

* * * বক্তিয়ার খিলিজির বঙ্গাগমন সময়ে এদেশ রাঢ়, মিথিলা, বারেন্দ্র, বঙ্গ এবং বাগড়ী নামক ভাগ পঞ্চকে বিভক্ত থাকিবার কথা আমরা মুসলমান লেখকদিগের গ্রন্থেই দেখিতে পাই তৎকাল এই পঞ্চবিভাগ গৌড়ীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ও এক রাজার অধীন ছিল। বিক্রমপুর, লক্ষ্মণাবতী এবং লক্ষৌর নামে তিন স্থানে তিনটী রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বর্ণনায় "নওদিয়া" নামক স্থানে কোনও রাজধানী সংস্থাপিত থাকিবার উল্লেখ নাই। "নওদিয়া" কোথায় ছিল, তাহা রাজধানী হইলে, তৎপ্রদেশে মুসলমান জায়গীর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা—রায় লছমনিয়াই বা কাহার নাম—এ সকল প্রশ্নের কোন সদুত্তর প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। লক্ষ্মণসেনের পশ্চিমে কাশী এবং পূর্ব্বে কামরূপ পর্য্যন্ত বিজয় লাভ করিয়া, বীর-কীর্ত্তির জন্য বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন। মুসলমান ইতিহাস-লেখকগণ বলেন—এই নরপতির নামানুসারেই পুরাতন গৌড়নগরের নাম "লক্ষ্মণাবতী" বলিয়া পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। অনেক দিন পর্য্যন্ত এদেশের মুসলমান রাজ্য দিল্লীর ইতিহাস লেখকদিগের গ্রন্থে "লক্ষ্মণাবতীরাজ্য" বলিয়াই উল্লিখিত আছে। লক্ষ্মণসেনের বীরপুত্র বিশ্বরূপ সেনের শাসন লিপিতে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি বাহুবলে আত্মরক্ষা করিয়া গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালরুদ্র নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। মিনহাজ যখন এদেশে পদার্পণ করেন, তখনও (বক্তিয়ার খিলিজীর বঙ্গে গমনের ষষ্ঠবর্ষ পরেও) পূর্ব্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনের পুত্রগণের অক্ষুণ্ণ অধিকার বর্ত্তমান

ছিল; তদ্দেশে তখনও পর্য্যন্ত মুসলমান শাসন বিস্তৃত হইতে পারে নাই। শাসনলিপির ও মুসলমান লেখকের এই সকল উক্তির সমালোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায়, বক্তিয়ার সহজে এদেশে অধিকার বিস্তার করিতে পারেন নাই,—তিনি কোন্ স্থানে অধিকার বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা লক্ষ্মণাবতীর নিকটবর্ত্তী কয়েকটি পরগণা মাত্র, এবং সেখানেই মুসলমানদিগের সর্ব্বপ্রথম জায়গীর লাভের প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অধ্যাপক ব্লকমান লিখিয়া গিয়াছেন "দিনাজপুরের অন্তর্গত দেবকোট নামক স্থানে একটী সেনানিবাস সংস্থাপিত করিয়া, বক্তিয়ার যুদ্ধ-কলহে লিপ্ত ছিলেন, এবং সেই সেনানিবাসই তাঁহার বিজয় রাজ্যের পূর্ব্বোত্তর সীমা বলিয়া পরিচিত ছিল।"

মুসলমান ইতিহাস লেখকগণ লক্ষ্মণসেনকে পলায়ন কলঙ্কে কলঙ্কিত করেন নাই; তদীয় রাজ্যাদের অশীতিবর্ষে দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন; আমরাই অর্থ নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া অনুমান বলে "রায়লখ্-মণিয়াকে" লক্ষ্মণসেন বলিয়া ধরিয়া লইয়া, অযথা কলঙ্কে স্বদেশের ইতিহাস মলিন করিয়া তুলিতেছি।"

'গৌড়রাজমালা' প্রণেতা এই প্রসঙ্গে অর্থাৎ 'নোদিয়া বিজয়ের' কথা আলোচনা করিতে যাইয়া লিখিয়াছেন—"লক্ষ্মণসেনের কাপুরুষতায় বাঙ্গালা তুরুস্কের পদানত হইল, ইদানীং অনেকেই এ কথা বলিয়া থাকেন। কিন্তু মিন্‌হাজুদ্দীন যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার প্রতি অক্ষরও যদি সত্য হয়, তাহা হইলে লখমনিয়াকে বা লক্ষ্মণসেনকে "কাপুরুষ" না বলিয়া বীরাগ্রগণ্য বলাই সঙ্গত। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া, সকলে নোদিয়া ছাড়িয়া সুদূর কামরূপে ও বঙ্গে পলায়ন করিলেন, কিন্তু বৃদ্ধ বীর লখ্‌মনিয়া নোদিয়া ছাড়িয়া এক পদও নড়িলেন না, একটী জনশূন্য রক্ষিশূন্য রাজধানীতে একটী বৎসর শত্রুর প্রতীক্ষায় রহিলেন। যখন শত্রু আসিল, তখন যে অপাত্রের হস্তে নগর দ্বার রক্ষার ভার অর্পিত হইয়াছিল, তাহারা তুরুস্ক সওয়ারগণকে ঘোড়ার সওদাগর ভ্রমে বাধা দিল না। সতত শত্রুর প্রতীক্ষাকারী নগরদ্বার রক্ষকগণ সশস্ত্র অশ্বারোহীদিগকে ঘোড়ার সওদাগর ভ্রমে নগরে প্রবেশ করিতে দেয়, মিন্‌হাজুদ্দীন ভিন্ন আর কোন ঐতিহাসিক এরূপ অদ্ভুত ঘটনা বর্ণনার অবসর পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। যখন রাজভবনে প্রবেশ করিয়া, মহম্মদ-ই-বখতিয়ার হত্যাকাণ্ড আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন খবর পাইয়া, যদি রক্ষকহীন অশীতিবর্ষের বৃদ্ধ রাজা সরিয়া যাওয়া সঙ্গত মনে করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে কাপুরুষ বলা যায় না।"

"লক্ষ্মণসেনের "নোদিয়া" হইতে পলায়ন-কাহিনী প্রকৃত ঘটনা বলিয়া স্বীকার করা যায় না—তাহা অজ্ঞ লোকের পরিকল্পিত উপকথা মাত্র। বিশ্বরূপ এবং কেশব নামক লক্ষ্মণসেনের অন্যূন দুইটি পুত্র ছিল; তিনি যাঁহাকে বাল্যে রাজপণ্ডিত পদ, যৌবনে প্রধান মন্ত্রিপদ, এবং যৌবনান্তে যৌবনশেষ যোগ্য ধর্ম্মাধিকারীর পদ প্রদান করিয়াছিলেন, হলায়ুধের ন্যায় এরূপ হাতে গড়া অমাত্য ছিল; এবং তিনি যাঁহাদিগকে লইয়া কাশী হইতে কামরূপ পর্য্যন্ত যুদ্ধ যাত্রা করিয়াছিলেন, এরূপ সৈন্য সামন্তও ছিল। মিন্‌হাজ লখ্‌মনিয়াকে যেরূপ প্রজারঞ্জনকারী এবং দানশীল রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন তাহাতে মনে হয়, তিনি অনেকের ভক্তি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। সুতরাং এরূপ নৃপতিকে বার্দ্ধক্যে সকলে দল বাঁধিয়া শত্রুর দ্বারা পদদলিত হইবার জন্য "নোদিয়ায়" ফেলিয়া আসিবে, এবং এক বৎসর

পর্য্যন্ত তাঁহার কোন খোজখবর লইবে না; ইহা বিশ্বাসযোগ্য নহে। অনুমান হয়—যখন "ব্রাহ্মণগণ" এবং ব্যবসায়িগণ নোদিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন "নোদিয়ার" অধীশ্বরও তখনই রাজধানী ত্যাগ করিয়া বঙ্গে আশ্রয় লইয়াছিলেন। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক এরূপ নির্ব্বিবাদে পশ্চিম বরেন্দ্র অধিকারের প্রকৃত কারণ এই যে,—যখন মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক মগধ আক্রমণের সংবাদ বিজয়পুরে পঁহুছিয়াছিল, তখনই হয়ত ভয়াতুর মন্ত্রিবর্গের উপদেশে লক্ষ্মণসেন (পূর্ব্ব) বঙ্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এবং তাহার অনতিকাল পরে [তুরুস্ক নায়কের "দোয়ম সালে," নোদিয়া আক্রমণের পূর্ব্বে] পরলোক গমন করিয়া থাকিবেন। লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণের যে দুইখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার একখানিতে লক্ষ্মণসেন পাদানুধ্যাত বিশ্বরূপসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে, এবং আর একখানিতে অপর একটি নাম বিলুপ্ত করিয়া, লক্ষ্মণসেন—পাদানুধ্যাত কেশবসেনের নাম উৎকীর্ণ রহিয়াছে। ইহাতে মনে হয়,—লক্ষ্মণসেনের অভাবে, সিংহাসন লইয়া পুত্রগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল। লক্ষ্মণসেনের পরলোকগমনের অব্যবহিত পরে, এই ভ্রাতৃবিরোধ-বহ্নি প্রধূমিত হইবার সময়ে,—মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার পশ্চিম বরেন্দ্র অধিকার করিবার অবসর পাইয়া থাকিবেন।"

পণ্ডিত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন: "মগধজয়ের পরে মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের যশঃ, বঙ্গ ও কামরূপ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তিনি দিল্লীর সুলতান কুতবউদ্দীন কর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। "দিল্লী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার সেনা সংগ্রহ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি অষ্টাদশ অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে নোদিয়া নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। নগরবাসিগণ প্রথমে তাঁহাকে অশ্ববিক্রেতা বণিক্ মনে করিয়াছিল। তিনি প্রাসাদ আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রায় লখ্‌মনিয়া আহার করিতেছিলেন। তিনি মুসলমানগণের আগমন শ্রবণ করিয়া পুরমহিলাগণ, ধন-রত্ন-সম্পদ, দাস-দাসী পরিত্যাগ করিয়া অন্তঃপুরের দ্বার দিয়া বঙ্গে পলায়ন করিয়াছিলেন।" ইহাই ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ-উস্-সিরাজের বিবরণ। মিন্‌হাজ গৌড় বিজয়ের চত্বারিংশ বর্ষ পরে নিজামউদ্দিন এবং সমসামউদ্দিন নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের নিকটে বখ্‌তিয়ারের বিজয়-কাহিনী শ্রবণ করিয়াছিলেন। মিন্‌হাজ ৬৪১ হিজিরাব্দে (১২৪৩-৪৪ খৃষ্টাব্দে) লক্ষ্মণাবতী নগরে অর্থাৎ গৌড়ে সমসামউদ্দিনের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কর্ত্তৃক গৌড়ে ও রাঢ়ে সেনরাজগণের অধিকার লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা নিশ্চয়, কিন্তু যে ভাবে বিজয়-কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তাহা পাঠ করিয়া বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না। প্রথম কথা, নোদিয়া কোথায়? নোদিয়া যদি নবদ্বীপ হয়, তাহা হইলে বোধ হয়, যে' মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার লুণ্ঠনোদ্দেশে আসিয়া সেনরাজের জনৈক সামন্তকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কারণ নবদ্বীপে যে সেন বংশের রাজধানী ছিল, ইহার কোন প্রমাণই অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই। দ্বিতীয় কথা আগমনের পথ কান্যকুব্জের নিকট হইতে মগধ লুণ্ঠন যত সহজ মগধ হইতে সেনা লইয়া গৌড় বা রাঢ় তত সহজ নহে। মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ার কোন্ পথে নোদিয়া আক্রমণ করিতে আসিয়াছিলেন, তাহা জানিতে পারা যায় নাই তিনি যদি রাজমহলের

নিকট দিয়া গঙ্গার দক্ষিণ কূল অবলম্বন করিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি কখনও অল্প সেনা লইয়া আসিতে পারেন নাই এবং রাজধানী গৌড় বা লক্ষ্মণাবতী অধিকার না করিয়া আসেন নাই। তখন ঝাড়খণ্ডের বনময় পর্ব্বতসঙ্কুল পথ সামান্য সেনার পক্ষে অগম্য ছিল। এই সকল কারণে অষ্টাদশ অশ্বারোহী লইয়া মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের গৌড়-বিজয়-কাহিনী বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। গৌড় জয়ের প্রকৃত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে। তাহা নূতন আবিষ্কারের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া না উঠিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। তৃতীয় কথা, লক্ষ্মণসেন তখন জীবিত ছিলেন না। লক্ষ্মণসেনের পুত্রত্রয়ের মধ্যে তখন কে গৌড় রাজ্যের অধিকারী, তাহা অদ্যাপি নির্ণীত হয় নাই। সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃগণের মধ্যে বিরোধ হইয়াছিল কিনা, তাহাও অদ্যাপি স্থির হয় নাই। এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ ই-বখ্‌তিয়ারের নদীয়া বিজয়-কাহিনী অলীক। ইহা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, নোদিয়া পুনর্ব্বার হিন্দুরাজগণ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল; কারণ, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের অর্দ্ধ শতাব্দী পরে বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান মুগীসউদ্দীন যুজবক নোদিয়া বিজয় করিয়া বিজয় কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন।"

ত্রয়োদশ শতাব্দীর ইতিহাসে বিজয়-কাহিনী স্মরণার্থ নূতন মুদ্রার মুদ্রাঙ্কনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে, কাণ্যকুব্জ বিজয়ের পরে সুলতান শমসুদ্দিন আলতামস এইরূপ মুদ্রা মুদ্রাঙ্কিত করাইয়াছিলেন। এবং বাঙ্গালার স্বাধীন সুলতান সিকন্দর শাহ কামরূপ বিজয়ের পরে স্মরণার্থ মুদ্রায় বিজয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন। এই তমসাচ্ছন্ন যুগে গৌড়ে সেন বংশের অধিকার লোপ হইয়াছিল, কোন্ সময়ে কিরূপে গৌড় দেশ মুসলমান বিজেতার হস্তগত হইয়াছিল, তাহা অদ্যাবধি নির্ণীত হয় নাই। গৌড়রাজ্য বিজয়ের পরে লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ যে বঙ্গদেশে স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, ইতিহাসবেত্তা মিনহাজ-উস্-সিরাজ স্বয়ং সে কথা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।"*

লক্ষ্মণসেন ও কেশবসেনের বিক্রমপুরে পলায়ন

এ প্রসঙ্গে "গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন,—মগধ অধিকার পূর্ব্বক মুসলমানগণ গৌড়রাজ্যে দেখা দিল। লক্ষ্মণসেনের তৃতীয় পুত্র বিশ্বরূপসেন গৌড়ে অবস্থান করিয়া "গর্গ যবনান্বয়"দিগকে বারংবার পরাজিত করেন। অবশেষে হিন্দু সেনাগণ পরাস্ত হইয়া যায়। মুসলমানেরা গৌড় অধিকার করে। কেশবসেন বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। মুসলমান সেনা নবদ্বীপাভিমুখে ধাবিত হয়। গদাপানি মুহম্মদ বিন্ বক্তিয়ার খিলিজি নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে অধিকাংশ সেনা লুক্কায়িত রাখিয়া অত্যল্প সেনাসহ নগরে প্রবেশ করিলেন। রাজপুরী আক্রান্ত হইলে নগর মধ্যে গোলযোগ

* স্বর্গত দুর্গাচরণ সান্যাল তৎ প্রণীত "বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাসে" লিখিয়াছেন :—"রাজা লক্ষ্মণসেন বিনা যুদ্ধে পলায়ন করায় মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেস্তা তাঁহাকে তুচ্ছ করিয়া 'লছমনিয়া' বলিয়া লিখিয়াছেন। তাহা হইতেই ইংরেজী ইতিহাসে এবং তদনুরূপ বাঙ্গলা ইতিহাসে লাক্ষ্মণসেন বা দ্বিতীয় লক্ষ্মণসেন রাজা এবং নবদ্বীপ তাঁহার রাজধানী কল্পিত হইয়াছে। তাহা সমস্তই ভুল। নবদ্বীপ কখনও রাজধানী ছিল না এবং লাক্ষ্মণ্যসেন নামে কোন রাজা ছিল না। ৪১ পৃষ্ঠা।

উপস্থিত হয়। রাজা রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়া বিক্রমপুরে পলায়ন করেন। কেহ কেহ বলেন রাজবংশীয়েরা 'নীলাচল' গমন করেন। মেল মালা নামক গ্রন্থে আছে :—

"যে কালে লক্ষ্মণসেন নীলাচলে চলে।
হিন্দু রাজ্য শেষ হইল যবনের বলে।"

'তব কৎ-ই-আকবরীর' মতে রাজা জগন্নাথক্ষেত্রে পলায়ন করেন! ইহা কল্পিত কাহিনী মাত্র।

এ সম্বন্ধে রিয়াজ-উস্-সলতিন, 'তবকৎ-ই-নাসিরি' এবং 'তবকৎ-ই-আকবরি' ভিন্ন ভিন্ন রূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন। কেহ বলেন,—"রাজা যখন আহার করিতে বসিয়াছিলেন, এমন সময় বক্তিয়ার কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া লক্ষ্মণসেন ধন রত্নাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনাবৃত পদে গুপ্তপথে পলায়ন করেন।" ঐতিহাসিক ভিনসেণ্ট স্মিথ বলেন :—

Probably in A. D. 1199 not long after his facile conquest of Bihar, Muhammad the son of Bakhtyar equipped an army for the subjugation of Bengal. Riding in advance of the main body of his troops, he suddenly appeared before Nudiah with a slender following of eighteen horsemen, and boldly entered the city, the people supposing him to be a horse dealer. But when he reached the gate of the Rai's palace, he drew his sword and attacked the unsuspecting house-hold. The Rai who was at dinner, was completely taken by surprise. Rai Lakhmaniya as the author calls him, fled to Bikrampur in the Dacca district where he died, and the conqueror presently destroyed the city of Nudiah, establishing the seat of his government at the ancient Hindu city of Lakhnauti, or Gour." Early History of India Page 405.

বলাবাহুল্য যে ইংরাজ লেখকগণও সেই একই সূত্র অবলম্বন করিয়া বিনানুসন্ধানে এবিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। কেহই লক্ষ্মণসেনের নাম করেন নাই। এবং Rai Lakhmaniya as the author calls him! বলিয়াছেন।

সে যাহাই হউক না কেন—লক্ষ্মণসেনের নামে যে পলায়ন-কলঙ্ক বিঘোষিত হইয়া আসিতেছে, কবি যাহা লইয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, চিত্রকর যে পলায়ন-কলঙ্কের চিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন তাহা যে কতখানি সত্য তাহা পাঠক মাত্রেই উল্লিখিত বিবরণী সমূহ পাঠ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছেন এবং বুঝিতে পারিয়াছেন যে ইহা সম্পূর্ণভাবে অলীক কাহিনী মাত্র!

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমার মহাশয়ের মতে বক্তিয়ারের 'নদীয়া' আক্রমণ কালে লক্ষ্মণসেন জীবিত ছিলেন না। আমরা রাখালবাবুর এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ কুমারের

মত সমর্থন করি এবং উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করি যে—"গৌড়জয়ের প্রকৃত ঘটনা এখনও অন্ধকারাচ্ছন্ন আছে। তাহা নূতন আবিষ্কারের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া না উঠিলে আমরা তাহা বুঝিতে পারিব না। তৃতীয় কথা লক্ষ্মণসেন তখন জীবিত ছিলেন না। এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, মহম্মদ-ই-বখ্‌তিয়ারের নদীয়া-বিজয় কাহিনী সম্ভবতঃ অলীক।"

আমরা ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা ইহা নিঃসন্দিগ্ধ ভাবে গ্রহণ করিতে পারি যে লক্ষ্মণসেনের নগ্নপদে পলায়ন ইত্যাদি কাহিনী মাত্র। ঐতিহাসিক সত্য নহে। এইরূপ কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া আমরা অন্যায় ভাবে একজন স্বাধীন বীর নৃপতির ললাটে কলঙ্ক কালিমা লেপন করিয়া আসিয়াছি। ভবিষ্যতবংশীয় বাঙ্গালী ও ভারতীয়গণ এই মিথ্যাকে আর গ্রহণ করিবেন না বলিয়া বিশ্বাস করি।

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বিশেষ রূপে আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন —"৫১ লক্ষ্মণাব্দের পূর্ব্ব কোনও সময়ে লক্ষ্মণসেন দেবের দেহান্তর সংঘটিত হয়। **মুসলমান ইতিহাস লেখক লক্ষ্মণসেনকে পলায়ন-কলঙ্কে কলঙ্কিত করেন নাই। তদীয় রাজ্যাব্দের অশীতি বর্ষে দিগ্বিজয়ের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। আমরাই তথ্য নির্ণয়ে অগ্রসর না হইয়া অনুমান বলে "রায় লছমনীয়াকে" লক্ষ্মণসেন ধরিয়া লইয়া অযথা কলঙ্কে স্বদেশের ইতিহাস মলিন করিয়া তুলিয়াছি।**

লক্ষ্মণসেনের ভাওয়াল তাম্রলিপি:—ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ১৯২৭ খ্রীঃ অঃ Indian Historical Quarterly Vol. III Page 88-96 "Lost Bhowal Copper-plate of Laksman-Sena Deva of Bengal" নামে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত প্রবন্ধ হইতে জানা গিয়াছিল যে তিনি ঐ তাম্রলেখের সহিত লক্ষ্মণসেন দেবের মাধাইনগরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনের সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিলেন। সম্প্রতি "The Indian Historical Quarterly Vol. XV. No. 2. June, 1939 সংখ্যায় Mr. H. N. Randle "The Lost Bhowal Copper plate of Laksman Sen" নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন:—১৯৩০ খৃষ্টাব্দে India office লাইব্রেরীর কার্য্যে যোগদান করিবার পরে আমি একটি আলমিরা হইতে ২৪ খানা তাম্রশাসনের সন্ধান পাই। অনুসন্ধানে দেখিলাম যে তাহার মধ্যে ৪ খানা ছাড়া আর সব কয়খানির সম্বন্ধেই প্রবন্ধ ইত্যাদি প্রকাশিত হইয়াছে। [I found that three of them at least had never been noticed so far as I have been able to ascertain]

তাহার একখানি লক্ষ্মণসেনের তাম্রশাসন। [a complete inscription on a single copperplate] মাধাইনগর তাম্রশাসনের-সহিত ইহার প্রায় হুবহু মিল দেখা যায়। রাজ্যাঙ্ক ২৭...কা দিনে ৬। প্রথম ২৪ পংক্তি পদ্যে লিখিত প্রশস্তি। ঠিক মাধাইনগর লিপির অনুরূপ। ২৫-২৮ পংক্তিতে লক্ষ্মণসেনের নাম এবং উপাধি রহিয়াছে এবং **পরম নারসিংহ** এবং বল্লালসেন দেবপাদানুধ্যাত [Lines 26-29 give Laksman Sena's name and titles—the latter including Parama-Narasinha—and describe him "meditating on the feet of Vallalsena-deva"] **পরম বৈষ্ণব** কথাটিও খোদিত আছে। ২৯-৩৩ পংক্তিতে অন্যান্য তাম্রশাসনের ন্যায় রাজকর্মচারীদের পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ৩০-৪৪ পংক্তিতে দানোক্ত গ্রামের নাম, সীমা ইত্যাদি। ৪৫-৪৭ পংক্তিতে দানগ্রহীতার পরিচয় আছে তাহা এইরূপ :—"সামবেদকৌথুমশাখার ঔর্ব, চ্যবন্ ভার্গব এবং জামদগ্ন্য [অন্য শব্দ অস্পষ্ট] প্রবর [গোত্র-অস্পষ্ট-সম্ভবত: মৌদ্গল্য বুদ্ধদেব শর্ম্মার প্রপৌত্র জয়দেব শর্ম্মার পৌত্র, মহাদেব শর্ম্মার পুত্র পদ্মনাভদেব শর্ম্মন। এই দান [৪৮ পংক্তি] দুইজন মহাদেবী একজনের নাম কল্যাণদেবী। ৫০-৫৭ পংক্তিতে এই দান সম্বন্ধে কেহ যাহাতে কোনরূপ স্বত্ব বিলোপ না করেন তৎ সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে যেমন অন্যান্য তাম্রশাসনে আছে। (৫৮-৫৯ পংক্তিতেও ঐ সমুদয় উক্তিতেই পূর্ণ) ৫৮ পংক্তিতে লক্ষ্মণসেন অরি-রাজ-মদন-শঙ্কর-নরপতি এবং গৌড়-মহা-সান্ধি-বিগ্রহিক শঙ্করধর-দূত রূপে পরিচিত আছেন। ৫৯ পংক্তিতে রাজ-পরিচয়, দূত' কথা এবং তারিখ আছে।

এই তাম্রশাসন খানির আকার ও অন্যান্য তাম্রশাসনেরই অনুরূপ। দশভুজ-সমন্বিত সদাশিব মূর্ত্তি শীর্ষদেশে সংযোজিত আছে। এই তাম্রলেখখানির অপর পৃষ্ঠার অক্ষর ইত্যাদিও বেশ সুস্পষ্টই রহিয়াছে। স্থানে স্থানে ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ায় কোথাও কোথাও অক্ষর পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায় না। উপরের দিকে ও নীচের দিকে ততটা না হইলেও মাঝামাঝি একটু বেশী ক্ষয় পাইয়াছে কিন্তু ইহার পাঠোদ্ধার এবং সম্পাদন সম্পর্কে কোনরূপ অসুবিধা হইবে বলিয়া মনে হয় না। যে সকল গ্রামের নাম ও সীমা ইত্যাদি রহিয়াছে তৎ সম্বন্ধে Mr. Randle বলেন : "Unknown place—names, however must remain dubious : and so far I cannot feel certain of my tentative readings of any of the place-names with the exception of Paundravardhana". তাঁহার মতে এই তাম্রশাসনখানই ডাক্তার ভট্টশালী লিখিত "Lost Bhowal plate"—আমরা লক্ষ্মণসেনের এই হারানো তাম্রশাসনখানা সম্বন্ধে যতদূর জানিতে পারিয়াছি এখানে তাহার উল্লেখ করিলাম। ভবিষ্যতে এই তাম্রশাসনখানার পাঠোদ্ধার হইলে এবং উহার বিবরণ প্রকাশিত হইলে সেনরাজাদের সম্বন্ধে হয়ত আরও কিছু না কিছু নূতন কথা জানিতে পারিব।

লক্ষ্মণসেন অতি মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। একথা মুসলমান ঐতিহাসিকেরাও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহারা লক্ষ্মণসেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—"এই নৃপতি ব্যক্তিগত হিসাবে নানা সদ্গুণে ভূষিত ছিলেন। হিন্দুস্থানের প্রসিদ্ধ নৃপতি, ভূম্যধিকারী ও প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই সেনবংশীয় নরপতিকে বিশেষ সম্মান করিতেন। তিনি খলিফাদের ন্যায় ধর্ম্মজগতের নেতা ছিলেন। ঐতিহাসিকেরা বলেন—লক্ষ্মণসেনের নিকট কেহ নির্য্যাতিত কিংবা বিচারে কেহ কোনও অবিচার লাভ করেন নাই। তাঁহার দানশীলতা জনপ্রবাদের মত প্রচলিত ছিল। *

লক্ষ্মণসেনের চরিত্র

লক্ষ্মণসেন পিতৃপ্রবর্ত্তিত কুলবিধির উৎসাহদাতা ছিলেন বলিয়া কুলপঞ্জীতে লিখিত আছে। সেনরাজ বংশের কোন তাম্রশাসনে কৌলিন্য প্রথার কথা নাই। তিনি প্রথম বয়সে শৈব ও শেষ বয়সে বৈষ্ণবধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। তপনদীঘি, সুন্দরবন, আনুলিয়া, মাধাইনগর, শক্তিপুর, এবং গোবিন্দপুরের ও ভাওয়ালের তাম্রশাসনে তিনি **"পরমবৈষ্ণব"** ও **"পরম নারসিংহ"** বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন, তবে আশ্চর্য্যের কথা এই যে তাঁহার প্রত্যেক তাম্রশাসনের প্রারম্ভেই আমরা মহাদেবের বন্দনা দেখিতে পাই। **পরম-নারসিংহ** শব্দ দ্বারা তিনি নরসিংহ বা নৃসিংহ দেবের উপাসক ছিলেন বলিয়া ও অনুমান করা অসঙ্গত হইবেনা, কেননা বিক্রমপুরের নানা গ্রামে অনেক নৃসিংহ-মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে।

মাধাইনগরের তাম্রশাসনখানির প্রারম্ভে লিখিত আছে "ওঁ নমো নারায়ণায়" আর প্রথম শ্লোকটি রহিয়াছে :—

যস্যাঙ্কে শরদম্বুদোরসি তড়িল্লেখেব গৌরীপ্রিয়া
দেহার্দ্ধেন হরিং সমাশ্রিতমভূদ্যস্যাতি চিত্রংবপুঃ।
দীপ্তার্কদ্যুতিলোচনত্রয়রুচা ঘোরং দধানোমুখং
দেবত্রাসনিরস্ত দানবগজঃ পুষ্ণাতু পঞ্চাননঃ॥

এই তাম্রশাসনেরও প্রথম দিক্ দিয়া মহাদেবেরই বর্ণনা রহিয়াছে। কাজেই লক্ষ্মণসেন পৈত্রিক শৈব ধর্ম্মকেও কোথাও অশ্রদ্ধা করেন নাই। তাঁহার তাম্রশাসনগুলিতে প্রথমে মহাদেবের বর্ণনা দৃষ্ট হইয়া থাকে। লক্ষ্মণসেনের বিদ্যানুরাগের বিষয় পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

* The ruler of Eastern Bengal in those days was Lakshmansena, described by the Muhammadan writer as an aged man and reputed. though erro-neously, to have occupied the throne for eighty years. The portents which were said to have attended his birth had been justified by the monarch's exceptional personal qualities. His family we are told, was respected by all the Rais or chiefs of Hindusthan, and he was considered to hold the rank of hereditary Khalif (Caliph) or spiritual head of the country. Trustworthy persons affirmed that no one, great or small, ever suffered injustice at his hands, and his generosity was proverbial. V. A. Smiths' Early History of India. Page 405.

লক্ষ্মণসেনের অনুরোধে [অনেক পণ্ডিতের মতে] বিক্রমপুরের অধিবাসী "ব্রাহ্মণসর্ব্বস্ব"-প্রণেতা বৈদিক ব্রাহ্মণ হলায়ুধ তান্ত্রিকতায় আচ্ছন্ন গৌড়বঙ্গের সমাজ-সংস্কারের নিমিত্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রের সার সংগ্রহ পূর্ব্বক "মৎস্যসূক্ত" নামক গ্রন্থ প্রচার করিয়া তৎকালীন কদাচারাচ্ছন্ন হিন্দুসমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

'কুলপঞ্জীর' মতে লক্ষ্মণসেন বিক্রমপুরে আসিয়া ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজের সমীকরণ করেন। লক্ষ্মণসেন সম্ভবতঃ ১২০৪ খৃষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন।

লক্ষ্মণসেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র **মাধবসেন** রাজা হন। মাধবসেন সম্বন্ধে প্রামাণিক কোনও বিবরণ অবগত হওয়া যায় না। কাজেই এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ ভাবে কিছু বলা অসম্ভব। "গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা মাধবসেন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—

মাধবসেন

"লক্ষ্মণসেনের পরলোকের পর মাধবসেন রাজা হন। মুসলমানদের হস্ত হইতে অবশিষ্ট রাজ্যের রক্ষার জন্য তাঁহাকে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকিতে হইত। হরিমিশ্রের কারিকা পাঠ করিলে জানা যায়, মাধবসেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণদের চারিবার সমীকরণ করেন। মাধবসেন ভ্রাতা কেশবসেনকে রাজ্য দিয়া হিমালয় প্রদেশে গমন করেন। কুমায়ুনের আলমোড়ার নিকটবর্ত্তী যোগেশ্বর মন্দিরের গাত্রে শিলালিপিতে মাধবসেনের কীর্ত্তি ঘোষিত হইয়াছে। মাধবসেনের সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণও তীর্থ-ভ্রমণে যান। কেদারভূমির বাণেশ্বর মন্দির মধ্যস্থ তাম্রশাসনে ভট্টনারায়ণের বংশীয় রুদ্রশর্ম্মার নাম দৃষ্ট হয়। "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে মাধবসেনের রচিত কবিতা পাওয়া যায়। মাধবসেন দশ বৎসর রাজত্ব করেন এইরূপ শুনা যায়।"

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তৎ প্রণীত "বাঙ্গালার ইতিহাসের" পরিশিষ্ট [ঘ] ভাগে সেনরাজবংশের একটি বংশলতা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহাতেও মাধবসেনের নাম রহিয়াছে।

সেনরাজ বংশ ঃ—
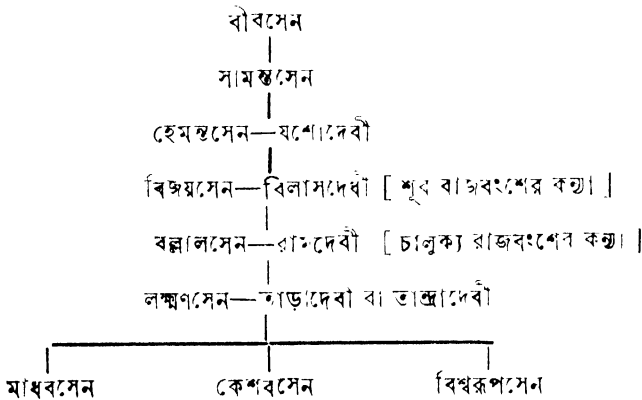
রাখালবাবু বলেন,—১১৭০ খৃষ্টাব্দের পরে ১২০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে লক্ষ্মণসেনের পুত্রত্রয় গৌড় সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। ইঁহাদিগের প্রত্যেকের এক একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু বলিয়াছেন "কুমায়ুনে মাধবসেনের একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে।"—রাখালবাবু বলেন 'Atkinson রচিত N. W. P. Gazetteer, Vol XII Himalayan Districts. ৫১৬ পৃষ্ঠায় ঐরূপ তাম্রশাসনের কোন উল্লেখ নাই।

মাধবসেনের রচিত কয়েকটি কবিতা "সদুক্তিকর্ণামৃত" গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। মাধব সেন এবং মাধব এই দুই নামই উহাতে রহিয়াছে। কাজেই মাধবসেন একই ব্যক্তি কিনা তাহা বিচারসহ।

বিশ্বরূপসেন লক্ষ্মণসেনের দ্বিতীয় পুত্র। ইনি রাজ্ঞী বসুদেবীর গর্ভজাত। তাম্রশাসন হইতেই তাঁহার এইরূপ পরিচয় পাওয়া যায়। ফরিদপুর জেলায় মদনপাড় গ্রামে বিশ্বরূপ সেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। আমরা এই তাম্রশাসন খানি হইতে অবগত হই যে—তিনি "শিবপুরাণোক্ত" ভূমিদান ফলপ্রাপ্ত কামনায় বৎস-গোত্রীয়, ভার্গবচ্যবন-আপ্নুবৎ ঔর্ব্বজামদগ্ন্য প্রবর পরাশর দেবশর্ম্মার প্রপৌত্র, গর্ভেশ্বর দেবশর্ম্মার পৌত্র, বনমালি দেবশর্ম্মার পুত্র, শ্রুতিপাঠক বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মাকে শিবপুরাণোক্ত ভূমিদান ফল কামনায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্ত্যন্তঃপাতি **বঙ্গে বিক্রমপুরভাগে** পূর্ব্বে অঠপাগ গ্রাম জঙ্গালভূঃসীমা, দক্ষিণে বারয়ীপাড়া গ্রামভূঃসীমা পশ্চিমে উঞ্চোকাপ্তী গ্রামভূঃসীমা উত্তরে বীরকাপ্তী জঙ্গালাসীমা এই চতুঃসীমাবচ্ছিন্নঃ পোঞ্জীকাপ্তী গ্রামমধ্যাৎ কন্দর্পা শঙ্করাস ভূমি ও নারাত্তর্প গ্রামে স্থিত ভূমি প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ৬০০ ও ৫৪৬ বা ৫৪৭ এই তাম্রশাসনে গৌড় মহাসান্ধিবিগ্রহিকের নাম রহিয়াছে শ্রীকোপিবিষ্ণু।*

বিশ্বরূপসেন

বিশ্বরূপের মদনপাড় তাম্রশাসন

এই তাম্রশাসনে বিশ্বরূপ সেনের বিশেষণ অতি চমৎকার। * * সত্যব্রত-গাঙ্গেয়-শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমেশ্বর-পরমভট্টারক পরম-সৌর-মহারাজাধিরাজ অরিরাজ-মদনশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণ সেনদেবপাদানুধ্যাত-অশ্বপতি-গজপতি রাজ্য-ত্রয়াধিপতি-সেনকুলকমলবিকাশভাস্করসোমবংশ-প্রদীপ-প্রতিপন্ন কর্ণসত্যব্রত-গাঙ্গেয়-শরণাগত-বজ্রপঞ্জর-পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক পরমসৌর মহারাজাধিরাজ-অরিরাজবৃষভাঙ্কশঙ্কর-গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্‌বিশ্বরূপসেনপাদাবিজয়িনঃ। ইত্যাদি।

তাম্রশাসনে বিশ্বরূপ সেনের বিশেষণ

* Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1896, Part I. P. P. 9-15.

বিশ্বরূপ সেনের সহিত তুরস্কগণের-যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিয়াছিল তাহা কেশবসেন প্রদত্ত ইদিলপুর তাম্রশাসন হইতে ও অবগত হওয়া যায়, তাম্রশাসনে বিশ্বরূপসেন "গর্গ যবনান্বয়ঃ প্রলয়কাল রুদ্রো নৃপঃ" বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন। কেশবসেনের ইদিলপুর তাম্রশাসন ও বিশ্বরূপসেনের মদনপুরের তাম্রশাসন হইতে ইহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয় যে বিশ্বরূপ সেন কেশব সেনের অগ্রবর্ত্তী ছিলেন। [The Edilpur grant contains several additional verses, consequently it might be stated that Visvarupaasena was Kesavsenas Predecessor] মদনপুর তাম্রলেখ বিশ্বরূপের ১৪শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। ইহার দ্বারা অনুমান করা যাইতে পারে যে বিশ্বরূপ সেন কিছু বেশী দিনই রাজত্ব করিয়াছিলেন। *

বিশ্বরূপসেনের মদনপাড় তাম্রশাসন

বিশ্বরূপ সেনের দুইখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। একখানি মদনপাড় নামক গ্রামে। স্বর্গত ঐতিহাসিক নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের [Pt 1. page 6-15] Journal of the Asiatic society of Bengal এ উহার পাঠ প্রকাশিত করেন। তাহাতে তিনি এই তাম্রশাসন খানার প্রাপ্তির ইতিহাস সম্বন্ধে লিখিয়াছেন : "কোটালিপাড় পরগণার অন্তর্গত মদনপাড় হইতে আবিষ্কৃত বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনখানি ঈশ্বর দেবশর্ম্মার ভ্রাতা বিশ্বরূপ দেবশর্ম্মাকে প্রদত্ত হইয়াছে। প্রদত্ত ভূমির পরিমাণ ৬০০ ও ৫৪৭। ইহা দ্বারা এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে দুইখানি ভূমি প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রদত্ত গ্রামের নাম পিঞ্জকাঠি। মদনপাড় তাম্রলেখ বিশ্বরূপের ১৪ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। পিঞ্জকাঠি গ্রামের বর্ত্তমান নাম পিঞ্জরী। ইহা ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত।"

এই তাম্রশাসন খানির প্রাপ্তির ইতিহাস সম্বন্ধে নগেন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন:—
"In the village MADANPADA Post office pinjuri, Parganah Kotalipada of the Faridpur district a peasant whilst digging his field found a copper plate and made it over to the land-holder who kept it in his house. This plate was made over to me by Pandita Lakshmi Chandra Sankhyatirtha in 1892. এই তাম্রশাসন খানির কোন সন্ধান এখন মিলে না।

* J. A. S- B. March 1914. Edilpur Grant of Kesavsena by R, D. Banerji M. A. "ঢাকার ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ড ৪১৩ পৃষ্ঠা। "গৌড়ের ইতিহাস" প্রথম খণ্ড।

এই ফলকখানির আকার ১২½"×১০" ইঞ্চি। শীর্ষ দেশে সদাশিব মুদ্রা সংযোজিত। ইহাতে ৬০ পংক্তি খোদিতলিপি আছে। একদিকে ৩০ পংক্তি এবং বিপরীত দিকে ৩০ পংক্তি। লিপির ভাষা সংস্কৃত। "ওঁ ওঁ নমো নারায়ণায়" প্রারম্ভ-ভাগে লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রশস্তি শ্লোকগুলি কেশব সেনের তাম্রশাসনের অনুরূপ।

এই তাম্রশাসনে সান্ধিবিগ্রহিকের নাম হইতেছে কোপিবিষ্ণু। ইনি কেশব সেনেরও মহাসান্ধিবিগ্রহিক। ইহার পূর্ব্ব পুরুষের নাম লোমপাদ বিষ্ণু। বিশ্বরূপের রাজত্বের সং ১৪।১ আশ্বিন দিনে এই তাম্রশাসন প্রদত্ত হয়। শুনা যায় বিশ্বরূপ সেন অত্যন্ত দানশীল ছিলেন। তিনি প্রায় বার শত খানি গ্রাম ব্রাহ্মণদিগকে প্রদান করিয়াছিলেন।

তাম্রশাসনের প্রমাণ হইতে জানা যায় যে বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের রাজধানী ছিল—বঙ্গে [পূর্ব্ববঙ্গে] **শ্রীবিক্রমপুরে**। আর যে ভূমি দান করিয়াছেন তাহাও (পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতি বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে। [The village was situated in the VIKRAMPUR division (ভাগ) of Vanga which lay within the Paundravardhan-bhukti.]

এই প্রসঙ্গে স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় বলিয়াছেন:—Of the localities mentioned in the inscription Mr. Vasu' identifies Pinjokshthi with Pinjari a postal village in the Parganah Kotalipada, near the village of Madanpada, where the grant was found. *In view of this identification it is impossible to agree with those who regard ViKrampur of the copper plates as different from the modern ViKrampura in Eastern Bengal and propose to locate it elsewhere.* ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের এই কথা যে কতদূর যুক্তিসঙ্গত ঐতিহাসিক সত্য তাহা যে কোনও সুধীপাঠক সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।

১৯২৫ খৃষ্টাব্দে বিক্রমপুর মধ্যপাড়া গ্রাম হইতে বিশ্বরূপ সেনের আর একখানি তাম্রশাসন পাওয়া যায়। উহা সুসঙ্গ রাজপরিবারের হস্তগত হয় এবং তাঁহারা উক্ত তাম্রশাসনখানি সাহিত্য-পরিষদ-চিত্রশালায় দান করিয়াছেন। বর্ত্তমানে এই শাসনখানি "সাহিত্য-পরিষদ চিত্রশালায়" সংরক্ষিত আছে। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় Indian Historical Quarterly, vol 11. No 1. (March 1926) p p. 77—86. এ এই শাসনখানির পাঠ প্রকাশ করেন। তৎপরে স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহোদয় Inscriptions of Bengal vol III. p. 147. প্রকাশ করিয়াছেন। এই তাম্রশাসন

বিশ্বরূপসেনের মধ্যপাড়া তাম্রশাসন

খানির আকার ১০´´×১২½´´ ইঞ্চি। উভয় দিকেই খোদিতলিপি সংযুক্ত। মোট ৬০ পংক্তি লিপি আছে। ভাষা সংস্কৃত। অক্ষর বল্লালসেনও লক্ষ্মণসেনের তাম্রলিপির অক্ষর অপেক্ষা অধিকতর বঙ্গাক্ষর সাদৃশ। প্রারম্ভ ভাগে "ওঁ ওঁ নমো নারায়ণায়" লিখিত।

সদাশিব মুদ্রা যে শীর্ষ দেশে সংযোজিত ছিল তাহা বেশ সুস্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু [The seal of Sadasiva, which was affixed to it is missing] উহা বিলুপ্ত হইয়াছে।*

মদনপাড় তাম্রশাসন ও মধ্যপাড়া শাসনে বন্ধুপণ্ডর পরমেশ্বর-পরম-ভট্টারক **পরমসৌর** মহারাজাধিরাজ অরিরাজ বৃষভশঙ্কর গৌড়েশ্বর শ্রীমদ্ বিশ্বরূপসেন পাদ বিজয়িনঃ রহিয়াছে। ইহার দ্বারা-সুস্পষ্ট ভাবে বুঝিতে পারা যায় যে সেনরাজগণ পরবর্ত্তী কালে পরম সৌর—সূর্য্যের পরম উপাসক [the devout worshipper of the sun" নামে বিঘোষিত হইয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বিক্রমপুর বঙ্গে [পূর্ব্ববঙ্গে] বৌদ্ধধর্ম্ম বিশেষ ভাবে আপনার প্রাধান্ত বিস্তার করিয়াছিল। এজন্যই বিক্রমপুরের সর্ব্বত্র বিবিধ বৌদ্ধ-মূর্ত্তির প্রাচুর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন,—বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট সংগৃহীত একখানি প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি হইতে জানা যায় যে, "পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ **পরমসৌগত মধুসেন** ১১৯৪ শকে এবং ১২৭২ খৃষ্টাব্দে বঙ্গে আধিপত্য করিয়াছিলেন। এই মধুসেনের পরিচয় হইতে বুঝিতেছি যে সেনবংশ বৌদ্ধ সমাচ্ছন্ন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া কিছুকাল পরে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেনবংশ প্রথমে **পরম মাহেশ্বর** বা গোঁড়া শৈব ছিলেন। লক্ষ্মণসেন মধ্যে বৈষ্ণব হইয়া পড়িয়াছিলেন কিন্তু ইদিলপুর ও মদনপাড় হইতে আবিষ্কৃত তৎ পুত্রের তাম্রশাসন খানি হইতে জানিতে পারি যে, নদীয়া পরিত্যাগের পর পূর্ব্ববঙ্গে গিয়া লক্ষ্মণসেন "পরম সৌর" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। যথা:—পরমসৌর-মহারাজাধিরাজ-অরিরাজ-মদনশঙ্কর-গৌড়েশ্বর শ্রীমল্লক্ষ্মণসেন ইত্যাদি। বলা বাহুল্য মাধব, কেশব ও বিশ্বরূপ এই তিনজনেই শ্রুতিপাঠককে ভূমিদান করিলেও স্ব স্ব তাম্রশাসনে 'পরম সৌর' বলিয়াই অভিহিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ এ সময় তাঁহার

* ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই তাম্রশাসন খানির প্রাপ্তিস্থানে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ননীবাবু তাঁহার গ্রন্থের ১৯৪ পৃষ্ঠায় উহা উদ্ধৃত করিয়াছেন:—So far as Mr. Nalinikanta Bhattasali of Dacca has been able to ascertain, this plate was found in the year 1925, in the village of Madhyapada, in Vikrampur pargana, about 14 miles direct south of Dacca town. It passed through Dacca town to Susang, in Mymensing District and was acquired there by Maharaja Bhupendra Chandra Singh who presented it to the Sahitya parishrt at Calcutta. Before this a strip had been cut away from the bottom of the plate. Inscriptions of Bengal page 194.

কোন প্রকার রাজনীতিক কারণে পালরাজ সম্মানিত সৌর ব্রাহ্মণগণের নিকট দীক্ষিত হইয়া থাকিবেন।" পালবংশ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছি যে, সৌর ব্রাহ্মণগণ কেবল মন্ত্রিত্ব বা সেনাপতিত্ব বলিয়া নহে, বৌদ্ধ-পাল নৃপতিগণের পৌরোহিত্য ও করিতেন! সম্ভবতঃ পালবংশ ধ্বংসের পর ঐ সকল ব্রাহ্মণ পূর্ব্ববঙ্গে আসিয়া পূর্ব্ববৎ কেহ কেহ সম্ভ্রান্ত বৌদ্ধগণের পৌরোহিত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল সৌর ও সৌগত সংস্রবে থাকিয়া ঐরূপ বৌদ্ধ পুরোহিত ও বৌদ্ধ-প্রজা সাধারণের প্রভাবে অবশেষে সেনবংশও 'সৌগত' বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। মনে হয় পূর্ব্ববঙ্গের বৌদ্ধ সমাজের আনুকূল্যে সেনবংশ প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী মুসলমানগণের সহিত বিরোধ করিয়াও বঙ্গাধিপত্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।" এই অনুমান একেবারে অসঙ্গত বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

তবে বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রাম হইতে যে সমুদয় বিরাটাকার বৃহৎ এবং সুন্দর ক্ষুদ্র ও অপূর্ব্ব কারুকার্য্য-সমন্বিত সূর্য্য মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহা হইতে এবং বিক্রমপুর বঙ্গে [পূর্ব্ববঙ্গে] সর্ব্বত্র যেরূপ সূর্য্যব্রত এবং সৌর প্রভাব পরিলক্ষিত হয় তাহা হইতে মনে হয় যে রাজাদের প্রভাব ব্যতীত কখনই সৌর প্রভাব ঐরূপ ভাবে পরিব্যাপ্ত হইতে পারে না। 'মাঘমণ্ডলের' ব্রত ও তাহার ছড়াগুলি এখনও বিক্রমপুরের সৌর প্রভাব যে জনসাধারণের মধ্যে যে কত দূর অন্তর্প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহা সপ্রমাণ করিতেছে। এজন্যই পরমসৌর উপাধি গ্রহণে মনে হয় যে নগেন্দ্রবাবুর অভিমত কতকাংশে প্রণিধানযোগ্য।

বিক্রমপুরের এমন গ্রাম অতি বিরল বিশেষতঃ শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী-[বর্ত্তমান রামপাল] র সমীপবর্ত্তী স্থান সমূহে অনেক সূর্য্য মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

এই প্রসঙ্গে ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় লিখিয়াছেন :—"Most of the sena kings called themselves great devotees of the sun-god (Parama-saura) and Siva (Param-Saiva) but Laksmana Sena was particularly a worshipper of Vishun."

পরবর্ত্তীকালে পরম সৌর সেন নৃপতিগণের উৎসাহেই যে সূর্য্যদেবতা তাঁহার পূজার আসন খানি বিক্রমপুর-বঙ্গের গ্রামে গ্রামে এবং গৃহে গৃহে প্রতিষ্ঠাপিত করিতে পারিয়াছিলেন তৎ সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই।

আমরা বিশ্বরূপ সেনের মদনপাড় ও মধ্যপাড়া তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারি যে বিশ্বরূপ সেন ও কেশবসেন "শ্রীবিক্রমপুর জয়স্কন্ধাবারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া [মুসলমান-অভিযানের প্রথম প্রকোপ প্রতিহত করিয়া] পূর্ব্ববঙ্গের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

আমরা বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের তাম্রশাসন হইতে ইহাও জানিতে পারিতেছি যে, "বিশ্বরূপ সেন ও কেশব সেনের রাজধানী ছিল পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে এবং উভয়েই "গর্গযবনান্বয়—প্রলয় কালরুদ্র' এবং "গৌড়েশ্বর" বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—"কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে অবগত হওয়া যায় যে, তাঁহারা উভয়ে মুসলমানগণের [গর্গযবন] সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হইয়াছিলেন। কান্যকুব্জ রাজ্যের অধঃপতনের পরে দলবদ্ধ মুসলমান সেনা যখন মগধ, অঙ্গ ও গৌড়ে লুণ্ঠন করিয়া বেড়াইত তখন তাহাদিগেরই একদল বোধ হয়, সেনবংশীয় গৌড়রাজা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিল।"

বিশ্বরূপসেন আনুমানিক চৌদ্দ বৎসর কাল রাজত্ব করেন। [১২০৬-১২২০] এবং তাহার পর কেশবসেন* প্রায় তিন বৎসব কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন।—বিশ্বরূপসেন যখন

বিশ্বরূপসেনের রাজত্বকাল

শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী হইতে রাজ্য শাসন করিতেছিলেন সে সময়ে 'লক্ষ্মণাবতীর তুর্কী মালিক ছিলেন গিয়াসউদ্দীন ইউয়জ্। ইনি হিজরা ৬০৮-৬২৪ এবং খৃঃ ১২১১-১২২৬ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি বঙ্গের [পূর্ব্ববঙ্গের নৃপতি] বিশ্বরূপসেনের এবং কেশবসেনের সমসাময়িক ছিলেন।

"তবকাৎ-ই-নাসিরি" পাঠে জানিতে পারা যায় যে গিয়াসুদ্দীনের রাজত্ব কালে লক্ষ্মণাবতীর চতুর্দ্দিকস্থ রাজ্য সমূহের অধিপতিগণ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন এবং সমস্ত গৌড়মণ্ডল তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। জাজনগর (উড়িষ্যা), বঙ্গ পূর্ব্ববঙ্গ অর্থাৎ বিক্রমপুর-সুবর্ণগ্রাম] কামরূপ এবং তিরহুতের [তীরভুক্তি বা মিথিলার] রাজগণ তাঁহাকে কব প্রদান করিতেন।"

কেহ কেহ বলেন—"মিন্‌হাজের এ উক্তি যদি সত্য হয়, তবে অনুমান করিতে হয় যে, লক্ষ্মণাবতীর গিয়াসউদ্দীনের সহিত বিক্রমপুরের বিশ্বরূপ সেনের সংগ্রাম হইয়াছিল। অনুমান যদি ঐতিহাসিক সত্য ঘটনা হয়, তবে বিশ্বরূপসেনের "গর্গযবনান্বয় প্রলয় কালরুদ্র" এই বিশেষণের প্রকৃত ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। এই বিশেষণ হইতে মনে হয়, বিশ্বরূপসেন

সুলতান গিয়াস-উদ্দীন

স্বীয় রাজত্বের চতুর্দ্দশ বছরেও [আনুমানিক ১২২০ খৃঃ] তুর্কীর সহিত যুদ্ধে নিজেকে জয়ী বলিয়া দাবী করিতেছেন। পক্ষান্তরে, মিন্‌হাজের উক্তিতে গিয়াসউদ্দীনকেই জয়ী বলিয়া দাবী করা হইতেছে! এই দুই বিরোধী উক্তি হইতে মনে হয় যে, কোনো পক্ষেই নিশ্চিত রূপে জয় লাভ ঘটে নাই।

* বাঙ্গালার ইতিহাস ৩২৩ পৃষ্ঠা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

২। পঞ্চপুষ্প—অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন লিখিত বাংলার ইতিহাসে হিন্দুরাজত্বের শেষ যুগ প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ১৬২-১৭৫ পৃষ্ঠা।

বিশ্বরূপ যদি সত্যই পরাজিত হইতেন তাহা হইলে বোধ করি নিরর্থক ভাবে অত বড় বিশেষণ ব্যবহার করিতে ভরসা পাইতেন না। আবার পক্ষান্তরে গিয়াসউদ্দীন যদি সত্যই বঙ্গরাজ্যের উপর স্থায়ী ভাবে জয়ী হইয়া থাকেন তবে কয়েক বছর পরেই আবার বঙ্গ রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে হইত না; কারণ মিনহাজ অন্য স্থানে আবার বলিতেছেন যে, গিয়াসউদ্দীন স্বীয় রাজত্বের শেষ বছর [৬২৪ হিঃ ১২২৬ খৃঃ] বঙ্গরাজ্যের অভিমুখে সৈন্য চালনা করিয়াছিলেন। কিন্তু বঙ্গরাজ্যের সহিত গিয়াসউদ্দীনের কোনো সংঘর্ষ হইয়াছে কিনা তা স্পষ্ট বোঝা যায় না। তবে তবকাৎ হইতে এই ধারণা হয় যে, এই দ্বিতীয় অভিযানে বঙ্গরাজ্যের সংঘর্ষ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই গিয়াসউদ্দীনের লক্ষণাবতীর দিকে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইয়াছিল, কারণ ঠিক এই সময়েই দিল্লীর সুলতান আল্‌তামাসের [ইলতুৎমিস] জ্যেষ্ঠপুত্র নাসিরউদ্দীন মহমুদ গিয়াসউদ্দীনের অনুপস্থিতির সময়েই লক্ষণাবতী দখল করিয়া বসিয়াছিলেন। নাসিরউদ্দীনের সহিত যুদ্ধে গিয়াসউদ্দীন পরাজিত ও অবশেষে নিহত হইয়াছিলেন [১২২৬ খঃ] * * * যাহা হোক্, গিয়াস-উদ্দীনের দ্বিতীয় অভিযানের সময় বঙ্গ-দেশে কে রাজা ছিলেন তাহা ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের বিষয়। আমাদের মনে হয় যে ঐ দ্বিতীয় অভিযানের সময় ১২২৬ খৃঃ] লক্ষণসেনের পুত্র **কেশবসেনই বিক্রমপুরের** সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যদিও সে সময় পর্য্যন্ত বিশ্বরূপ সেনের পক্ষেও বাঁচিয়া থাকা অসম্ভব নয়। মনে রাখিতে হইবে বিশ্বরূপের ন্যায় কেশবসেনের ও "গর্গযবনান্বয়" ইত্যাদি বিশেষণ আছে এবং এই বিশেষণ নিতান্ত অর্থহীন নয় বলিয়াই মনে হয়।"

কেশবসেন

কেশবসেন সম্ভবতঃ বিশ্বরূপসেনের পরে শ্রীবিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কেশবসেনের একখানি তাম্রশাসন পাওয়া গিয়াছে। এই শাসন খানি বাকরগঞ্জ জেলার কানাই লাল ঠাকুরের জমিদারি ইদিলপুর পরগণায় এক কৃষক মৃত্তিকা খননের সময় প্রাপ্ত হয়। কানাইলাল ঠাকুর উহা আনিয়া প্রিন্সেপ সাহেবকে দেন, পণ্ডিত গোবিন্দরাম উহার পাঠোদ্ধার করেন। সে যাহা হউক ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক জেমস্ প্রিন্সেপ্ সাহেব [James Prinsep] ইহার প্রশস্তির পাঠ এবং পণ্ডিত সারদাপ্রসাদ কৃত অনুবাদ প্রকাশ করেন। কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে যে 'গর্গযবনান্বয়

কেশবসেনের ইদিলপুরের তাম্রশাসন

* J. A. S. B Vol VII P. P. 43-46, 47-51.

কেশবসেন ও বিশ্বরূপসেনের তাম্রশাসনে যে 'গর্গযবনান্বয় প্রলয়কালরুদ্র' বলিয়া তাঁহাদিগকে বলা হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিতে যাইয়া স্বর্গত মিঃ জয়শোয়াল বলিয়াছেন—কেশবসেন গরঝা (Garjha) নামক ঘার্জ্জিস্থানের একটা জাতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহার তাম্রশাসনে "গর্গ যবনান্বয় প্রলয়কালরুদ্র' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। [Mr Jayswal equates garga with Garjha. Gharjisthan and is of opinion that this verse records a victory of Kesavsena over a party of raiders led by Muhammad Ghori. But there is nothing else in support of the statement.] স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের এ মন্তব্য গ্রহণযোগ্য। প্রকৃত পক্ষেই জয়সোয়ালের এই যুক্তি প্রমা-সহ নহে।

অনেকে বলেন—"কেশবসেন গৌড় রক্ষা করিতে না পারিয়া পূর্ব্ববঙ্গে প্রস্থান করেন। কেশবসেনের সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ গৌড় প্রদেশ ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরে গমন করেন। তাঁহার সভাসদ এড়ুমিশ্রের গ্রন্থে আছে, মুসলমানেরা গৌড় ও নদীয়া অধিকার করিলে, কেশবসেন পিতামহ প্রতিষ্ঠিত কুলীনগণকে সঙ্গে লইয়া **বিক্রমপুরে** এক সেন-রাজার সভায় পলায়ন করেন। এড়ুমিশ্র সেই রাজা কর্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া বল্লালী কুল-নিয়ম প্রণয়ন করেন কিন্তু সেই রাজার নাম কি—তাহা এ পর্য্যন্ত স্থিরীকৃত হয় নাই।

বিক্রমপুরে কুলীন ব্রাহ্মণদের সংখ্যা বেশী কেন?

কেশবসেন কোন্ রাজার সময়ে বিক্রমপুরে আসিয়াছিলেন, এসম্বন্ধে আমরা "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" প্রথম সংস্করণে লিখিয়াছিলাম:—বিশ্বরূপসেন উদার চরিত্র, দানশীল এবং ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন। * * কেশবসেন বিক্রমপুরে বিশ্বরূপের সভায় উপস্থিত হইলে মহারাজ বিশ্বরূপ জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত গ্রহণ করেন। ইত্যাদি। "যশোহর-খুলনার ইতিহাস" প্রণেতা সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন:—"এড়ুমিশ্রের কারিকা হইতে জানিতে পারি যে, কেশবসেন সৈন্যসামন্তসহ পূর্ব্ববঙ্গে এক রাজার নিকট আশ্রয় লন। সে রাজার নাম পাওয়া যায় নাই। কেহ বলেন তিনি বিশ্বরূপ সেন। কিন্তু তাহা হইতে পারে না। কারণ এই রাজা, কেশবের নিকট বল্লালী কৌলিন্য সম্বন্ধে তথ্য জানিতে চাহিয়াছিলেন। বিশ্বরূপের সে তথ্য অবিদিত থাকিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন, লক্ষ্মণসেনের সময়ে জ্যোতিবর্ম্মা সেনবাজগণের সামন্তস্বরূপ, চন্দ্রদ্বীপ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র হরিবর্ম্মদেব। এই হরিবর্ম্মার মন্ত্রী ছিলেন ভবদেব-বালবল্লভীভুজঙ্গ। সম্ভবতঃ কেশবসেন এই হরিবর্ম্মার রাজধানীতে আসিয়াছিলেন।"

৩১৩

আমাদের নিকট এই সিদ্ধান্ত একেবারেই গ্রহণযোগ্য নহে বলিয়া মনে হয়, কেননা বিজয়সেনের বঙ্গাধিকারের বহু পূর্ব্বেই হরিবর্ম্মদেব পরলোক গমন করিয়াছিলেন।

তাম্রশাসনে লিখিত ভূমি

কেশবসেনের তাম্রশাসনে লিখিত ভূমি পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্ত্যন্তঃপাতী বঙ্গে বিক্রমপুর ভাগে ছিল। আমরা পালরাজাদের তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি, তীরভুক্তি ও শ্রীনগরভুক্তি এই তিনটির নাম পাই। সেনরাজগণের তাম্রশাসনে পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি ও বর্দ্ধমানভুক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। * এবং কঙ্কগ্রামভুক্তি, নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান হয় সেনরাজগণের রাজ্য ও পালরাজগণের ন্যায় তিনটি ভুক্তিতে বিভক্ত ছিল। এ বিষয়ে সেনরাজগণের আবিষ্কৃত বিভিন্ন তাম্রশাসনগুলির আলোচনা করিলেই তাহা বুঝিতে পারি। এবং সেনরাজগণ প্রভাব ও প্রতিপত্তিতে স্বীয় বংশের গৌরব বিশেষ ভাবে যে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তাহারও বহু নিদর্শন রহিয়াছে। কেশবসেনের ইদিলপুরে প্রাপ্ত তাম্রশাসনে

সেনরাজগণের রাজ্য সীমা

* ডক্টর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রচন্দ্র গাঙ্গুলী এম, এ, পি, এইচ, ডি বলেন—From the records of the early Sena Kings, we know of only two Bhuktis in Bengal. Viz Paundra-Vardhana and Vardhamana,—গুপ্ত ও পালরাজাদের সময় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি কেবলমাত্র বর্ত্তমান রাজসাহী জেলা লইয়া গঠিত ছিল। কিন্তু সেনরাজাদের সময় উহার সীমা পরিবর্দ্ধিত হইয়া অন্য কয়েকটি প্রদেশেও সীমাভুক্ত হইয়াছিল। বঙ্গ [approximately the Dacca Division] ও তাহার অন্তর্ভুক্ত হয়। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সী বিভাগের কতকাংশ অর্থাৎ ভাগীরথীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী কতকাংশও বঙ্গের সীমান্তবর্ত্তী ছিল। বর্দ্ধমানভুক্তি গঠিত হইয়াছিল মুর্শিদাবাদ জেলা [ভাগীরথীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থান] এবং বীরভূম, বর্দ্ধমান, বাঁকুড়া, হুগলী এবং হাওড়া জেলা ও বর্দ্ধমানভুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল : বল্লালসেনের সীতাহাটিতে প্রাপ্ত তাম্রশাসন হইতে অনুমান করা যায় যে [আনুমানিক ১১৭১ খৃ:] উত্তর রাঢ়া বর্দ্ধমানভুক্তির মধ্যবর্ত্তী একটি মণ্ডল ছিল। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের শক্তিপুর শাসন হইতে জানা যায় যে। ১১৮৩ খৃ: অ:] উত্তর রাঢ়া কঙ্কগ্রামভুক্তির অন্তর্গত ছিল ইহার দ্বারা এইরূপ অনুমান করা যায় লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে তাঁহার বিভিন্ন প্রদেশ জয় করিবার ফলে বর্দ্ধমানভুক্তির বিভাগ আবশ্যকীয় হইয়াছিল [* * It is probable that the conquests of Lakshmanasena in the direction of Bihar must have made this an administrative necessity. It seems to have taken over the Northern Radha tract from Vardhamana-bhukti, although we know from the Govindpur grant, that the latter *bhukti* was in existene in the 2nd year of Lakshman Sena. The Ajaya which was the boundarybetween northern and southern Radha must then have been the boundary between the two *bhuktis*. The Kankagrama-*bhukti* appears to have extended into the Santal parganas and Bhagalpur on the north-west of Uttara-Radha. On the north-cost it could have extended very little beyond the river Ganges.

Epigraphia Indica, vol. XXI. No 37. Saktipur copper-plate of Lakshman-Sena Page 213-2 by Dhirendra Chandra Ganguli, MA. PHD. Benares.

গৌড়ের ইতিহাস—২১৪ পৃষ্ঠা।

তিনি গর্গযবনান্বয়প্রলয়কালো রুদ্রো নৃপঃ” নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে তাঁহার সহিত ও তুর্কীদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল।

অনেকে অনুমান করেন যে কেশবসেনের সময় কেবল বিক্রমপুর প্রদেশ সেনরাজগণের অধিকারভুক্ত ছিল ; অন্য অংশ মুসলমানেরা করায়ত্ত করিয়া লইয়াছিল। ইহাও সত্য নহে।

হরিমিশ্রের কারিকায় আছে—কেশবসেন সর্ব্বদা তুর্কীদের ভয়ে ভীত থাকিতেন। তজ্জন্য তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের কুলবিধির কোন উন্নতি করিতে পারেন নাই। আমাদের নিকট কুলবিধির এই উক্তি গ্রহণ-যোগ্য বলিয়া মনে হয় না। যদি তিনি তুর্কীদের ভয়ে ভীত হইতেন তাহা হইলে কখনই ‘গর্গ যবনান্বয়’ ইত্যাদি বিশেষণে বিশেষিত হইতেন না। নানারূপ কিংবদন্তীর সহিত কুলপঞ্জিকার কাহিনী এমন ওতপ্রোত-ভাবে মিলিত হইয়া গিয়াছে যে উহা হইতে প্রকৃত সত্য বাহির করা অনেক সময় অসম্ভব হইয়া উঠে।

কেশবসেনের কবিত্ব

কেশবসেন সুকবি ছিলেন। “সদুক্তিকর্ণামৃত” গ্রন্থে তাঁহার কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে। আমরা এখানে তাঁহার রচিত দুইটি কবিতা উদ্ধৃত করিলাম।

(১) “কৈলাসো নিহ্নুতশ্রীঃ পরিমিলিতবপুঃ পার্ব্বণঃ শ্বেতভানুঃ
শেষঃ প্রচ্ছন্ন বেশঃ কলয়তি ন রুচিং জাহ্নবী বারি বেণিঃ।
পীতঃ ক্ষীরাম্বু রাশি প্রসভমপহৃতঃ কুঞ্জরো দেবভর্ত্তু-
র্যং কীর্ত্তিনাং বিবর্ত্তে রজনি স ভগবানেকদন্তোহপ্যদস্তঃ।

২) লীলা সদ্ম প্রদীপ স্ত্রিপুরবিজয়িনঃ স্বর্ণদী কেলিহংসঃ
কন্দর্পোল্লাস বীজং রতিরসকলহ ক্লেশ বিচ্ছেদ চক্রম্।
কহ্লারা দৈত্যবন্ধুস্তিমির জল নিধেরুচ্ছিখো বাড়বাগ্নি
র্লক্ষ্মাঃ ক্রীড়ারবিন্দং জয়তি ভুজভুবাংবংশ কন্দঃ সুধাংশু।

অষ্টম অধ্যায়

সেনরাজত্বের শেষযুগ—মুসলমান-বিজয়

কেশবসেনের পরে শ্রীবিক্রমপুরের সিংহাসনে কে বসিলেন তাহা পরিষ্কার ভাবে জানা যায় না। কেশবসেনের পুত্রের নাম কোনও তাম্রশাসন হইতে জানিতে পারা যায় না। বৈদ্যকুল-গ্রন্থে কেশব সেনের পুত্র লক্ষ্মণ নারায়ণের নাম রহিয়াছে। বিশ্বরূপ সেনের কুমার **সূর্য্যসেন ও কুমার পুরুষোত্তম** সেন নামে দুইটী পুত্রের নাম পাওয়া যায়। ইহারা কখনও রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন কিনা সে বিষয়ে কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

আইন-ই-আকবরীতে কেজুসেনের [কেশবসেনের] পর সুরসেন বা সদাসেন নামে একজন রাজার নাম দেখিতে পাই। আইন-ই-আকবরির মত কতটা বিচারসহ তাহা বলা কঠিন। আইন-ই-আকবরির মতে সেনবংশীয় সাতজন রাজা একশত নয়·বৎসর রাজত্ব করেন। সুখসেন ৩ বৎসর, বল্লালসেন ৫০ বৎসর, লক্ষ্মণসেন ৭ বৎসর, মাধবসেন ১০ বৎসর, কাবসুসেন ১৫ বৎসর, সদাসেন ১৪ বৎসর, নওজে ১০ বৎসর রাজত্ব করেন। নওজে বা দনৌজাকে অনেকে সেনবংশীয়দের শেষ রাজা বলিয়া থাকেন। কথিত আছে দনৌজ-মাধবের সভায় পঞ্চমহাবংশ সম্ভূত ছাপ্পান্ন গ্রামীণ ৫০৮ জন ব্রাহ্মণ উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে গুণানুসারে কুলীন, সিদ্ধশ্রোত্রিয়, সুসিদ্ধ শ্রোত্রিয়, ও কষ্ট শ্রোত্রিয় এই কয়ভাগে বিভক্ত করেন।

কেশব সেনের পরেও যে বঙ্গরাজ্যে শ্রীবিক্রমপুরে পূর্ব্ব বঙ্গে সেন রাজগণের স্বাধীনতা অক্ষুন্ন ছিল এইবার সেই কথা বলিব। ব্লকম্যান সাহেব যথার্থ ই লিখিয়াছেন :—

"The Bengal territory conquered in 1203-4 by the Mahamedans did not comprise the Eastern District. The Bangadesh was still under Ballal's descendents till the end of the 13th century when Sonarganw was occupied by the second son of the Emperor Bulbon. [Blochman's History and Geography of Bengal.]

'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা বলেন,—"বিশ্বরূপের সময়ে তদীয় কনিষ্ঠ তনয় সুন্দর সেন সুবর্ণগ্রামের শাসন ভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। সুন্দরসেন কুমারসুন্দর নামে অভিহিত হইতেন। কেহ কেহ অনুমান করেন, এই রাজনন্দনের নামানুসারে সুবর্ণগ্রামের রাজধানী প্রথমতঃ কুমার সুন্দর এবং পরে কোণ্ডরসুন্দর বা কয়ার সুন্দর নামে অভিহিত হয়। এই অনুমান কতদূর সত্য তাহা বলা যায় না। বিশ্বরূপ-তনয় কোনও সময়ে সুবর্ণগ্রামের সিংহাসনে

সুন্দর সেন
সুবর্ণগ্রাম

প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কি না এবং তাঁহার নাম সুন্দর সেন ছিল কি না, তাহার বিশেষ কোনও প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া
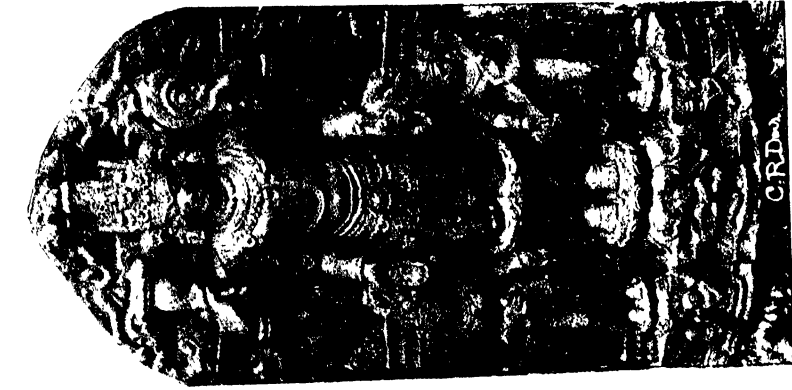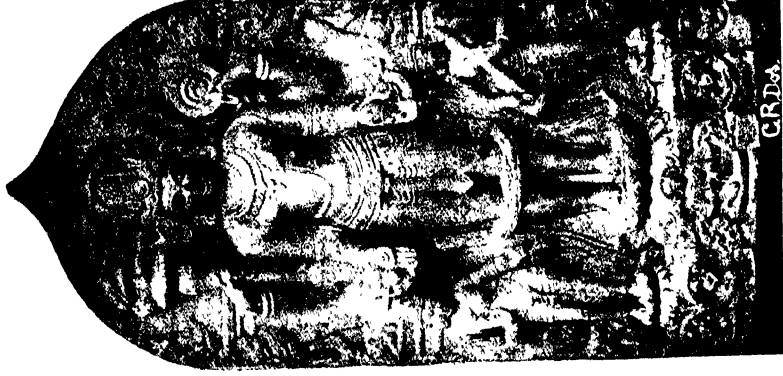
বিষ্ণু মূর্ত্তি—পাঁচগাঁ

বিষ্ণু মূর্ত্তি—ভরাকর

বিষ্ণু মূর্ত্তি—টঙ্গিবাড়ী

যায় না। তবে শাসন কার্য্যের সুবিধার জন্য সুবর্ণগ্রাম অঞ্চলে স্বতন্ত্র শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিয়া তথায় সেন-বংশীয় কোনও রাজপুত্রকে প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠাপিত করা অসম্ভব নহে।*

এই অনুমান কত দূর সত্য তাহা বলা কঠিন।

বিশ্বরূপ সেনের পরে লক্ষ্মণনারায়ণের নাম পাওয়া যায়। লক্ষ্মণনারায়ণ নাম যেমন বৈদ্যকুল-পঞ্জীতে পাওয়া যায় তেমনি "আইন-ই-আকবরীর" কোন কোন সংস্করণেও লক্ষ্মণ নারায়ণের নাম আছে। স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন,—"কোন কোন লেখক এই লক্ষ্মণনারায়ণকেই লক্ষ্মণের নামে পরিচিত করিয়াছেন এবং ইঁহারই সময় নদীয়া মুসলমান-কবলিত হইয়াছিল বলিয়া মনে করেন। তাঁহাদের এই ধারণা সমীচীন নহে। আইন-ই-আকবরী মতে লক্ষ্মণনারায়ণ ১০ বর্ষ রাজত্ব করেন।

লক্ষ্মণ নারায়ণ

স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন :—ইঁহার [লক্ষ্মণ নারায়ণের] সম্বন্ধে অপর কোন প্রমাণ অদ্যাবধি আবিষ্কৃত হয় নাই।

লক্ষ্মণনারায়ণের পরে **মধুসেন** নামক আর একজন রাজার পরিচয় পাওয়া যায়। স্বর্গত মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সি, আই, ই 'পঞ্চরক্ষা' নামক একখানি সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ আবিষ্কার করিয়াছেন, উহার পাদটিকায় লিখিত আছে :—"মহারক্ষা মহামন্ত্রানুসারিণী মহাবিদ্যা সমাপ্তা যে ধর্ম্মা হেতু প্রভবা হেতুং তেষাং তথাগতো হ্যবদৎ তেষাং চ যো নিরোধো এবম্বাদী মহাশ্রমণঃ। দেয় ধর্ম্মোহয়ং প্রবর-মহাযানযায়িনঃ পরমোপ [।] সক সাধু বীয়োকস্য যদত্র পুণ্যন্তদ্ভবত্বাচার্য্যোপাধ্যায় মাতা-পিতৃ-পূর্ব্বঙ্গমং কৃত্ব [।।] সকল :—

মধুসেন

পরমেশ্বর **পরমসৌগত** পরমমহারাজাধিরাজ-শ্রীমদ্ গৌড়েশ্বরমধুসেন-দেবকানাং প্রবর্দ্ধমানবিজয়রাজ্যে যত্রাঙ্কেনাপি শকনরপতেঃ শকাব্দাঃ ১২১১ ভাদ্র দি ৩।।"

"ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে **মধুসেন** নামক নরপতি ১২৮৯ খৃঃ অঃ জীবিত ছিলেন। 'আইন-ই-আকবরীতে' ইঁহার নাম নাই, কারণ উক্ত গ্রন্থে কেশবসেনের পূর্ব্বে মধুসেন নাম দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি সম্ভবতঃ মাধবসেন; কিন্তু কেশবসেনের পরে সদাসেন বা সুরসেন এবং নৌজা ব্যতীত অন্য কোন রাজার নাম নাই।

৬৮২ হিজরায় সুলতান গিয়াসউদ্দীন বল্বন, বাঙ্গালার বিদ্রোহী শাসনকর্ত্তা, মুগীশ-উদ্দীন তোগলকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। সেই সময়ে রাজা দনুজ রায় সুবর্ণ-গ্রামের স্বাধীন নৃপতি ছিলেন,—এই দনৌজমাধব যে সময় সম্রাটের সহিত সন্ধি করেন সে সময়ে সোনার গাঁ পৈনাম নামে অভিহিত হইত। দনৌজ মাধব অত্যন্ত ক্ষমতাশালী নৃপতি ছিলেন। ইঁহার দ্বারা ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ সমাজে কৌলিন্য মর্য্যাদা এবং নূতন নূতন কুলনিয়মাদি প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে।

রাজা দনুজ রায়

* ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড ৪১৭ পৃষ্ঠা।

এই দনুজ রায়ও মধু সেন ব্যতীত সুবর্ণগ্রাম বা পূর্ব্ব বঙ্গের আর কোনও হিন্দুরাজার অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই। এখন কথা হইতেছে এই দনুজ রায় কে ? *

আমরা জিয়াউদ্দীন বরণীর "তারিখ-ই ফিরোজ-শাহীতে" পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরাজাদের বিষয় জানিতে পারিতেছি। এই পুস্তক হইতে আমরা জানিতে পারি যে, লক্ষ্মণাবতীর শাসনকর্ত্তা মুগীস্‌উদ্দীন তোগ্রল খাঁ দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বল্‌বনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া স্বাধীনতা অবলম্বন করিলে সুলতান বলবন তোগ্রলের বিদ্রোহ দমন করিবার অভিপ্রায়ে সসৈন্যে বাঙ্গালাদেশে উপস্থিত হন, এবং কিছু কালের মধ্যেই পূর্ব্ববঙ্গে উপস্থিত হইয়া সুবর্ণগ্রামের রাজা দনুজ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন। সুলতান বল্‌বন ও দনুজ রায়ের মধ্যে এই ব্যবস্থা হইল যে, বিদ্রোহী তোগ্রল খাঁ নদী-পথে পলায়ন করিতে উদ্যত হইলে দনুজ রায় তাঁহাকে আটকাইবেন। সুলতান বল্‌বনের সহিত দনুজ রায়ের এই সাক্ষাৎকারের তারিখ ৬৮১ হিঃ অর্থাৎ ১২৮৩ খৃঃ অব্দ। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ১২৮৩ খৃঃ অব্দেও পূর্ব্ববঙ্গ লক্ষ্মণাবতীর মুসলমান শাসকদের অধীন হয় নাই।*

এই দনুজরায় কে ছিলেন তাহা এতদিন পর্য্যন্ত একটা অমীমাংসিত তথ্য ছিল, এজন্যই সম্প্রতি কয়েক বৎসর হইল একখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হওয়ায় পূর্ব্ববর্ত্তী লেখকগণের সিদ্ধান্ত ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। প্রায় সকলেই সেনবংশীয় নৃপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু নবাবিষ্কৃত তাম্রশাসন হইতে জানা যাইতেছে যে দনুজরায় সেনবংশীয় নৃপতি ছিলেন না।

* (১) পঞ্জাবের উত্তর পূর্ব্ব সীমায়, হিমাচলের ক্রোড়দেশে অবস্থিত কতকগুলি পার্ব্বত্য রাজ্যের অধীশ্বর এখনও সেনরাজবংশসম্ভূত বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। মণ্ডী ও সুকেত রাজ্যের কুলপঞ্জিকা অনুসারে লক্ষ্মণসেনের বংশধর, সুরসেন ১২৫৯ বিক্রম সম্বৎসরে মুসলমান কর্তৃক গৌড়দেশ হইতে তাড়িত হইয়া, প্রয়াগে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুরসেনের পুত্র, রূপসেন, পিতার মৃত্যুর পরে, প্রয়াগ পরিত্যাগ করিয়া পঞ্জাবে রূপর নামক স্থানে, একটি নূতন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। রূপসেন বাঙ্গালার সেনরাজবংশ-সম্ভূত কিনা এবং মুসলমান বিজিত গৌড়দেশ হইতে পলায়ন করিয়া, সুলতান কুতব্‌উদ্দীন ইবকের রাজ্যভুক্ত, প্রয়াগে, গৌড়রাজের আশ্রয় গ্রহণ সম্ভব কি না তাহা বিবেচ্য, কিন্তু এই সকল তথ্যের সত্যানুসন্ধান এখনও সম্ভব নহে, কারণ এবিষয় সম্বন্ধে প্রমাণাভাব। পঞ্জাব গেজিটিয়র ও শ্রীমতী সরলা দেবী সঙ্কলিত বিবরণ অনুসারে, কাশ্মীর, পুঞ্চ, সুকেত, মণ্ডীও জুব্বার বর্ত্তমান অধীশ্বরগণ গৌড়রাজ রূপসেনের বংশজাত। বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড। ২০-২১ পৃষ্ঠা। ঢাকার ইতিহাস—২য় খণ্ড ৪২৬-২৭ পৃষ্ঠা। নব্যভারত ১২৯৯ অগ্রহায়ণ, ৪০৬, ৪০৭ পৃষ্ঠা।

১। বাঙ্গালার ইতিহাসে হিন্দুরাজত্বের শেষ যুগ। পঞ্চপুষ্প [অগ্রহায়ণ ১৩৩৭ দ্রষ্টব্য।

২। রেভার্টিকৃত তবকাৎ-ই-নাসিরীর ইংরাজী অনুবাদ ৫৫৮ পৃষ্ঠা। ৩। তারিখ-ই-ফিরোজশাহী Elliot's History of India, Vol III P. 116.

"অরিরাজ-দনুজ-মাধব শ্রীমদ্দশরথ দেবের তাম্রশাসন"

এই তাম্রশাসন খানি আমাদের বাসগ্রাম মূলচরের পার্শ্ববর্ত্তী আদাবাড়ী গ্রামে পাওয়া গিয়াছে। ডাক্তার শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এই তাম্রশাসনখানার সংবাদ পাইবা মাত্রই আদাবাড়ী গ্রামে যাইয়া ঢাকা চিত্রশালার জন্য উহা সংগ্রহ করিয়া আনেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এই তাম্রশাসন খানি প্রাপ্তির পর উহা ১৯২৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মুন্সীগঞ্জে যে সাহিত্যসম্মেলনের অধিবেশন হয়, সেই অধিবেশনে ভট্টশালী মহাশয় উহা পাঠ করেন। পরে এই তাম্রশাসন সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ ১৩৩২ সালের "ভারতবর্ষ" ১৩শ বর্ষ ২য় খণ্ড ১ম সংখ্যা পৌষ মাসে প্রকাশিত হয়।

আদাবাড়ী তাম্রশাসন

এই তাম্রশাসন খানির আকার ১১$\frac{3}{4}$"×৮$\frac{3}{4}$" ইঞ্চি। "তাম্রশাসনের উপরে রাজকীয় মুদ্রা সংযুক্ত থাকে, ইহা সকলেই জানেন। পূর্ব্ববঙ্গে এপর্য্যন্ত চারিটি বংশের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, তাঁহাদের প্রত্যেকেরই লাঞ্ছন ভিন্ন ভিন্ন। কান্তিদেবের বংশের লাঞ্ছন সর্পবেষ্টিত **নরসিংহ মূর্ত্তি**, চন্দ্রদের লাঞ্ছন **ধর্ম্মচক্র**, দুই দিকে দুই মৃগ। অর্থাৎ মৃগদাব বিহারে বুদ্ধদেবের ধর্ম্মচক্র প্রবর্ত্তন। বর্ম্মদের লাঞ্ছন **বিষ্ণুচক্র**। সেনদের লাঞ্ছন দ্বাদশ-হস্ত-বিশিষ্ট **সদাশিব মূর্ত্তি**। আদাবাড়ীতে প্রাপ্ত শাসন খানির লাঞ্ছন—চারিহস্ত বিশিষ্ট-যোগাসনস্থ **শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী নারায়ণ মূর্ত্তি**।

তাম্রশাসন-পরিচয়

এই শাসনখানি ৫৫ পংক্তিতে খোদিত। প্রথম দিকে ২৬ পংক্তি এবং বিপরীত দিকে ২৯ পংক্তি। এই শাসনখানি **শ্রীবিক্রমপুর** রাজধানী হইতে প্রদত্ত হইয়াছে।

ইহ-খলু বিক্রমপুর সমাবাসিত শ্রীমত্ বিজয় স্কন্ধাবারাত্ **শ্রীমল্লারায়ণ** চরণকৃপা-প্রসাদমাসাদিত গৌড় রাজ্য অশ্বপতি গজপতি নরপতি রাজত্র............... ....
.........য়াধিপতি দেবান্বয় কমলবিকাশভাস্কর-সোমবংশ প্রদী [প] প্রতিপন্ন কর্ন সত্যব্রত গাঙ্গেয় শরণাগত বজ্রপঞ্জর পরমে............

...শ্বর পরম ভট্টারক মহারাজাধিরাজ **অরিরাজ** দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথদেব পাদা-বিজয়িনঃ

তাম্রশাসন গুলির বিষয়ে আমরা পূর্ব্বে বিশদ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। তাম্র-শাসনের প্রথম ভাগে দাতা রাজার বংশ-গৌরব কীর্ত্তন, পরে থাকে রাজধানীর নাম, যেখানে রাজা বাস করেন এবং সাময়িক ভাবে থাকেন তাহার নাম, পরে যাঁহাকে ভূমি প্রদত্ত হয় সেই দানগ্রহীতার নাম ও বংশ-পরিচয়।

এই তাম্রশাসন খানি হইতে আমরা জানিতে পারিলাম যে নৃপতি দশরথ দেববংশ-সম্ভূত—দেবান্বয় কমলবিকাশভাস্কর। তারপর আমরা জানিতে পারিলাম যে রাজধানী বিক্রমপুর হইতে এই শাসন প্রদত্ত হইয়াছে।

বিক্রমপুরের সেনরাজ বংশ

এই রাজার রাজত্বের তৃতীয় বৎসর কার্ত্তিক মাসের ২১শে তারিখে প্রদত্ত রাজা অশ্বপতি,-গজপতি-নরপতি-রাজত্রয়াধিপতি ইত্যাদি বিশেষণ, কেশবসেন ও বিশ্বরূপ সেনের তাম্রশাসনেও প্রযুক্ত হইয়াছে।

ডাক্তার নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলেন :—"প্রদত্ত ভূমির সঠিক্ বিবরণ এখনও বুঝিতে পারি নাই, তবে উহা অন্তর্ব্বাটী বান্দিখাণ্ডা নবসংখহ বীয়রি পাড়া ইত্যাদি গ্রামে বোধ হয় অবস্থিত ছিল।" ভট্টশালী মহাশয় অনুমান করেন, "বান্দিখাণ্ডা পরিষ্কারেই বর্ত্তমান বাইন্খাড়া। বর্ত্তমানে বাইনখাড়া প্রকাণ্ড মৌজা, আদাবাড়ী উহারই অন্তর্গত নাতি বৃহৎ পাড়া।

প্রদত্ত ভূমির চারিদিকের গ্রামগুলির নাম চৌহদ্দি নির্ণয়কালে উল্লিখিত হইয়াছে। উত্তরে নয়নাব ও মূলদাব,—বর্ত্তমান নয়না ও মালদা। দক্ষিণে বড়াইলা ও ভার্গনিয়া, আজিও ঐ নামেই পরিচিত। বড়াইলা শব্দের উৎপত্তি বড়হাবেলি বা বাটি হইতে হইয়াছে বলিয়া অনেকে বলিয়া থাকেন। গণাগ্রাব বর্ত্তমানে গণাইসার বলিয়া পরিচিত। মাস্তহটা বর্ত্তমানে কোন্ গ্রামের নাম তাহা ভট্টশালী মহাশয় স্থির করিতে পারেন নাই, আমার মনে হয় উহা বর্ত্তমান মিতারা গ্রাম। একটা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে প্রদত্ত ভূমির গ্রামগুলি পরস্পর সন্নিহিত। **মাস্তহটা** মিতারা হওয়াই আমি নানাদিক দিয়া যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে করি।

"প্রদত্ত ভূমির আয় বোধ হয় প্রতি বৎসর পঞ্চশত পুরাণ, বর্ত্তমানের প্রায় আড়াই শত টাকার সমান। এই আয়ের ভূমি অনেকগুলি ব্রাহ্মণকে গাঞী উল্লেখ করিয়া ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। সন্ধ্যাকর ৭৫, ভরদ্বাজ গোত্রীয় দিণ্ডী গাঞীশ্রী মাক্রী ৪৫, ·· শ্রীশক্র ৮৫, পালী গাঞী শ্রীসুগন্ধ ২৭, সেউ গাঞী শ্রীসোম ৩০, পালি গাঞী শ্রীবাস্ত ৩০, মাসচটক শ্রীপণ্ডিত ৫০, মূল শ্রীমাণ্ডী ৫০, দিণ্ডী শ্রীরাম ২০, সেহণ্ডায়ী শ্রীলেভু ২৫, পুতি শ্রীদক্ষ ৭, সেউ শ্রীভট্ট ২৪, মহান্তিয়াড়া শ্রীবালি ২৫, করঞ্জ গ্রামী শ্রীবাসুদেব ৫, মাসচড়ক শ্রীমিকো ৫ মাসচটক এবং মাস চড়ক এই দুই বানানই দুই স্থানে আছে।

ভূমির আয়

তাম্রশাসন খানা শ্রীমন্নারায়ণ-মুদ্রা দ্বারা মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইল, ইহার উল্লেখ রহিয়াছে।

ডাক্তার ভট্টশালী ও ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় উভয়েই একবাক্যে এই শাসন

খানার সহিত দেশের ইতিহাস এবং রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের সাময়িক ইতিহাসে ইহার গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন [* * copper plate makes us acquainted with some of the 56 ganis of the Radhiyja Brahmanas wich is of considerable interest to the social history of this period] *

এই তাম্রশাসনে একটি বিষয় বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিবার আছে। রাজা দশরথদেব হইতেছে তাঁহার প্রকৃত নাম। দনুজমাধব বিরুধ বা বিরুদ মাত্র।

'দশরথ দেবের সময় নির্দ্ধারণ করা বিশেষ কঠিন নহে। তিনি বিশ্বরূপ ও কেশব সেনের তাম্রশাসনের পাঠ হুবহু নকল করিয়াছেন, তাম্রশাসন প্রচারের যেন অচিরকাল পূর্ব্বে নারায়ণের প্রসাদে গৌড়রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন, এইরূপ বুঝা যাইতেছে। সহজেই বুঝা যায়, তিনি সেনদেব পতনের পরে বিক্রমপুরে অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। 'তবকৎই-নাসিরির' মতে ১২৫৯ খৃষ্টাব্দেও পূর্ব্ববঙ্গে লক্ষ্মণসেনের বংশধরগণ রাজত্ব করিয়াছিলেন। কাজেই আপাততঃ ধরিয়া লওয়া যায়, দশরথ দেব ১২৬০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে নারায়ণ-চরণ-কৃপা-প্রসাদে **বিক্রমপুরের** রাজা হইয়াছিলেন। ইহার পরেই কুলগ্রন্থে যখন প্রাচীন কুলাচার্য্য হরিমিশ্রের উক্তি দেখি—

দশরথ-বিরুধ দনুজ রায়

প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদনন্তরম্।
দনৌজামাধবঃ সর্ব্ব ভূপৈঃ সেব্য পদাম্বুজম্॥
[বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ১৫৬ পৃষ্ঠা]

তখন সন্দেহ মাত্র থাকেনা যে, অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথ দেবের প্রসঙ্গই হইতেছে। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় এই দনুজ মাধবকে সেন-বংশজ বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু "সেনবংশাদন্তরম্" কথাটিতে "সেন বংশ লুপ্ত হইলে তাহার পরে এই অর্থও বুঝাইতে পারে। তাম্রশাসনের প্রচারে দেখা যাইতেছে, তিনি স্পষ্টই দেব বংশজ, সেনবংশের নহেন।"

দেব বংশীয় নৃপতি

এখানে একটি প্রশ্ন মনে আসে, কি করিয়া কেমন করিয়া দনুজমাধব দশরথদেব সেনবংশের স্থানে আসিয়া দেববংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন? এ বিষয়ে কোনরূপ মীমাংসায় পৌছা সহজ সাধ্য নহে যতদিন পর্য্যন্ত না অন্য প্রামাণিক উপকরণ হস্তগত না হয়। তবে একথা সত্য যে: the identity of Danujmadhava Dasaratha with Danuja-madhava who, according to a dynastic account by Harimisra

Inscriptions of Bengal, Vol III by N. G. Majumdar- M.A. P 182.

flourished after the sena rule, and with Danuj Rai the Raja of Sonergaon in Eastern Bengal, who according to Ziau-d-din Barni, entered into an agreement with Ghiasuddin Bulban that he would guard against the escape of the rebellious Tughril Khan by water. (1283 A. D.) * আমরা এবিষয়ে পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি।

"কানিংহাম বলেন—*Sunargaon* the, Capital of Eastern Bengal under the Muhammadans, is traditionally said to have been the residence of one of the twelve *Bhumihar* chiefs. Its name of *Suvarna-gram* or "Gold Town" proves that it must have been a Hindu City, alhough there are only a few fragments of Hindu work now left to attest the fact. The earliest notice of the place that I have been able to find is during the reign of the Emperor Balban, when the rebel Governor of Bengal, Mughisu-d-din Tughral, retreated beyond Sunargaon, near with he was overtaken and killed, The district was then ruled by a Hindu Chief named Danuj Rai, with whom the Emperor made an arrangement to prevent the escape of Tughral by water. This *Danuj Rai is said to have been one of the Bhumihar* chiefs. After the death of Balban, Sunargaon formed part of the Kingdom of Bengal which then became an independent State under Bughra Khan and his descendents. *

এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন :—"আইন-ই-আকবরীতে আছে তিনি [দনুজমাধব দশরথদেব] মাত্র তিন বছর রাজত্ব কবিয়াছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নাই ; কারণ তাঁব তাম্রশাসনটিই রাজত্বের তৃতীয় বছরে উৎকীর্ণ হইয়াছিল।" * *

"চন্দ্রবংশেব রাজা শ্রীচন্দ্রের সময হইতে কেশবসেনের সময় পর্য্যন্ত বিক্রমপুরই পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। দশরথ দেবের তাম্রশাসনে দেখিতে পাই সে সময়ও (আনুমানিক ১২৮৩ খৃ: অ:) বিক্রমপুরই পূর্ব্ববঙ্গের রাজধানী ছিল। কিন্তু জিয়াউদ্দীন বরনী তাঁকে সোনারগাঁ বা সুবর্ণগ্রামের সর্ব্বপ্রথম রাজা বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাই বোধ হয় ইতিহাসে সুবর্ণগ্রামের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ এবং এই সময় হইতে বহুকাল পর্য্যন্ত সুবর্ণগ্রাম ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে। কোন্ সময় হইতে কিরূপে বিক্রমপুরের প্রাধান্য বিলুপ্ত হইল তা জানা যায় না।"

ডক্টর ভট্টশালী মহাশয়ের মতে শ্রীমদ্দশরথদেব ১২৬০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বিক্রমপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।" বারণী দনুজরায়কে পূর্ব্ববঙ্গের স্বাধীন নৃপতি বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সম্রাট্ বল্‌বন্ যখন সুবর্ণগ্রামে যান—"সুবর্ণগ্রামের

* Archælogical Survey of India, Vol XV Page 135-136. J. R. A. S. B. Page 83. Notes on Sonargaon, Eastern Bengal by Dr. J. Wise.

রাজা তখনও স্বাধীন, দূত প্রেরণ করিলে তিনি আদেশ গ্রাহ্য না করিতে পারেন, ইহা ভাবিয়া বল্‌বন্‌ সসৈন্যে সুবর্ণগ্রামে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুবর্ণগ্রামের অধীশ্বর দনুজরায় জলপথে তোগ্রলের পলায়ন নিবারণ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। *

"আদাবাড়ি তাম্রশাসন ও জিয়াউদ্দীনের উক্তির বলে আমরা জানি যে, ১২৮৩ খৃঃ অব্দে রাজা দনুজমাধব বিক্রমপুর এবং সুবর্ণগ্রামে রাজত্ব করিতেছিলেন। দুইজনের মধ্যে মাত্র ছয় বৎসরের তফাৎ দেখিতেছি। খুব সম্ভবতঃ দনুজমাধব খৃঃ ১২৮৩ অব্দের পরেও জীবিত ছিলেন এবং মধুসেনও ১২৮৯ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব হইতেই রাজত্ব করিতেছিলেন। অতএব এই দুই জনকেই সমসাময়িক এবং পূর্ব্ববঙ্গের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা বলিয়াই বোধ হইতেছে। একজন সেনবংশীয় রাজা গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত; আর একজন দেববংশীয় রাজা, নারায়ণের কৃপায় অল্পকাল হইল গৌড়রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই দুইটি তথ্য হইতে মনে হয় যে, ১২৮০ খৃঃ অব্দের কাছাকাছি কোন সময় গৌড় রাজ্যের (এই সময় বোধ হয় গৌড় রাজ্য পূর্ব্ববঙ্গেই সীমাবদ্ধ ছিল) আধিপত্য লইয়া সেনবংশ ও দেববংশের মধ্যে বিরোধ ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল। এই সংঘর্ষের ফলে সেনবংশীয় রাজাকে পরাজিত করিয়া দশরথ-দেব গৌড় রাজ্যের আধিপত্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই মনে হয়। হরিমিশ্রের কারিকার "প্রাদুরভবৎ ধর্ম্মাত্মা সেনবংশাদ্ অনন্তরম্ দনৌজমাধবঃ" এই কথায়ও পূর্ব্বোক্ত অনুমান সত্য বলিয়া মনে হয়। দশরথদেব কর্ত্তৃক পরাভূত সেন-রাজা কে ঠিক বলা যায় না,—তিনি মধুসেন নিজেও হইতে পারেন অথবা মধুসেনের পূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কেহ হইতে পারেন, কিন্তু এ কথা সত্য বলিয়া মনে হয় যে দশরথ দেব কর্ত্তৃক গৌড়-সিংহাসন অধিকারের কিছুকাল পরেই (১২৮৩ খৃঃ অব্দের পরে) মধুসেন, সেন-বংশের পক্ষ হইতে দশরথের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করেন এবং পরিশেষে ১২৮৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কোন সময়ে দনুজমাধব দশরথদেবকে পরাভূত করিয়া গৌড় রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন; কারণ, ১২৮৯ খৃঃ অব্দে দেববংশীয় কোন রাজার পরিবর্ত্তে মধুসেনকেই গৌড়ের অধীশ্বররূপে প্রতিষ্ঠিত দেখিতে পাই। ১২৮৩ খৃঃ অব্দে রাজা দনুজ যখন গিয়াসউদ্দীন বল্‌বনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিদ্রোহী তোগ্রল খাঁর নদীপথে পলায়নের পথ রোধ করিতে প্রতিশ্রুত হন, তখন ঐ চুক্তি বা সন্ধিবন্ধনের (agreement এর) মধ্যে সেন-বংশের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষকে দৃঢ় করার উদ্দেশ্য থাকাও বিচিত্র নয়। কিন্তু অনুমান আর

আদাবাড়ী তাম্রশাসন রাজা দনুজমাধব ও মধুসেন

* বাঙ্গলার ইতিহাস দ্বিতীয়খণ্ড ৭০ পৃষ্ঠা।

ঐতিহাসিক তথ্য এক কথা নয়। অথচ প্রকৃত ঐতিহাসিক উপাদানের অভাবে আমাদের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধারের চেষ্টায় স্থানে স্থানে অনুমানের আশ্রয় লওয়া ছাড়া আর উপায় নাই।"

"দনুজ রাজার আর এক উল্লেখ পাই বাঙ্‌লার বাল্মীকি কৃত্তিবাসের আত্ম-পরিচয়ে। কৃত্তিবাস বলিতেছেন—

> "পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
> তাঁহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা।
> বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
> বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর।"

এই বিবরণে উল্লিখিত "বেদানুজ" মহারাজাটী কে? কেহ কেহ 'বেদানুজ' স্থলে 'বেদনুজ' পাঠ করিয়া তাঁকে দনুজমাধব দশরথদেবের সহিত অভিন্ন বলিয়া অনুমান করিয়াছেন। রামগতি ন্যায়রত্ন প্রণীত "বাঙ্গালা ভাষাও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে কিন্তু দেখিতে পাই, বেদানুজ স্থানে লেখা রহিয়াছে শ্রীদনুজ এবং শ্রীদনুজই প্রকৃত পাঠ বলিয়া মনে হয়; কারণ বেদানুজ কথার কোন মানে হয় না। যাহা হোক্, এই দনুজ মহারাজা বঙ্গদেশে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেন এবং কবি কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা তাঁরই পাত্র ছিলেন। বঙ্গদেশ বলিতে যে তবকাৎ-ই নাসিরী বা তারিখ-ই-ফিরোজ শাহীর বঙ্‌ বা পূর্ব্ববঙ্গ বুঝাইতেছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ এই বঙ্গদেশ যে গঙ্গাতীর হইতে দূরবর্ত্তী কোন দেশকে বুঝাইতেছে তা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণেও গৌড়-রাজ্যকে বঙ্গদেশ হইতে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে। কৃত্তিবাসকে খৃষ্টিয় পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদের লোক বলিয়া মনে করিবার হেতু আছে। নরসিংহ ওঝা কৃত্তিবাস হইতে পঞ্চম পুরুষ। সুতরাং নরসিংহ ওঝাকে খৃষ্টিয় ত্রয়োদশ শেষ পাদের লোক বলিয়া মনে করিলে অসঙ্গত হয়না। আমরা আগেই দেখিয়াছি যে, ত্রয়োদশ শতকের শেষ পাদে (১২৮৬ খৃঃ) দনুজমাধব দশরথদেব পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতে-ছিলেন। অতএব নরসিংহ ওঝার সমকালীন শ্রীদনুজ মহারাজা এবং আদাবাড়ি তাম্রশাসন, তারিখ-ই-ফিরোজশাহী ও আইন-ই-আকবরীর দনুজমাধব দশরথদেব, দনুজরায় বা রাজা নৌজাকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে করা সমীচীন বলিয়াই বোধ হয়।"

"এখন প্রশ্ন হইতেছে, বঙ্গদেশে কি প্রমাদ হওয়ার দরুন নরসিংহ ওঝা বঙ্গদেশ ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে চলিয়া আসিলেন। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, লক্ষ্মণাবতীর মুসলমান রাজার দ্বারা পূর্ব্ববঙ্গের দনুজমাধবের রাজ্য অধিকারই ঐ প্রমাদ; যার ফলে সকল অস্থির হইয়াছিল। মুসলমান কর্ত্তৃক পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়ের কথা একটু পরেই আলোচিত হইবে। এই

স্থানে শুধু এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট যে খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশকের আগে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু রাজত্ব অবাসন হওয়ার কোন প্রমাণই নাই। ত্রয়োদশ শতকের শেষ দশক ও চতুর্দ্দশ শতকের প্রথম দশকে পূর্ব্ব বাঙ্লা বিজিত হইয়াছিল। সুতরাং মুসলমান কর্ত্তৃক দনুজমাধবের রাজ্য জয়ের ফলেই বঙ্গদেশে প্রমাদ হইয়াছিল, এরূপ মনে করার যথার্থ হেতু নাই, কারণ, ১২৮৩ খৃঃ অব্দে দনুজমাধব পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিতেছিলেন বটে, কিন্তু ১২৮৯ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বেই তাঁব রাজত্বের অবসান হয় এবং গৌড়েশ্বর মধুসেনের রাজত্বের আরম্ভ হয়—এ রকম মনে কবার হেতু আছে, ইহা আমরা দেখিয়াছি। যদি দনুজমাধবেব সময়ে মুসলমানের আক্রমণে পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দু রাজত্বের অবসান হওয়ার কথা সত্য না হয়, তবে দনুজমাধবেব সময়ে বঙ্গদেশে কি প্রমাদ হইল তার সন্ধান অন্যত্র করিতে হইবে। আমবা পূর্ব্বেই দেখিয়াছি যে, আনুমানিক ১২৮০ হইতে ১২৮৯ খৃঃ অব্দেব পূর্ব্বে কয়েক বৎসর ব্যাপিয়া দেববংশের দনুজমাধব এবং সেনবংশের মধ্যে গৌড় রাজ্যের (অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গেব) আধিপত্য লইয়া বেশ বিরোধ চলিয়াছিল এ রকম মনে করার যথেষ্ট হেতু আছে। ১২৮৩ খৃঃ অব্দের পূর্ব্বে কোন সময় দনুজমাধব সেনবংশীয় কোন রাজার মধুসেন কিংবা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্য কারও হাত হইতে রাজ্যাধিকার কাড়িয়া লইয়াছিলেন; কিন্তু ঐ সময়ের পরেই মধুসেন (কিংবা অন্য কেহ) আবার সেনরাজ্য পুনরাধিকার করিয়াছিলেন এবং ১২১১ শকে (১২৮৯ খৃঃ অব্দে) মধুসেনই গৌড়েশ্বব রূপে রাজত্ব করিতেছিলেন। এই সমস্ত কথা বিবেচনা করিলে মনে হয় যে, সেনবংশ ও দেববংশের মধ্যে কয়েক বৎসর ব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহের ফলে দেশে যে বিপ্লব উপস্থিত হইয়াছিল তাহাকেই কৃত্তিবাস বঙ্গদেশের প্রমাদ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যদি এই অনুমান সত্য হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, ১২৮৩ খৃঃঅব্দের পর কোন সময় মধুসেন কিংবা অন্য কোন সেনরাজা কর্ত্তৃক দনুজমাধবের পরাজয় ও রাজ্যচ্যুতিব পর নরসিংহ ওঝা বঙ্গদেশ ছাড়িয়া গঙ্গাতীরে আসিয়াছিলেন।"

বঙ্গদেশে অশান্তি

এখানে প্রসঙ্গক্রমে একটি বিষয়ের উল্লেখ করিতেছি। দশরথদেব দনুজমাধবের সহিত অনেকে এতদিন পর্য্যন্ত চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন দেবকে এক ব্যক্তি মনে করিয়াছেন। দনুজমর্দ্দন গৌড় প্রদেশ হইতে কায়স্থগণকে আনাইয়া স্বীয় রাজধানী

প্রবাসী শ্রাবণ, ১৩১৯ দনুজমর্দ্দনদেব—সতীশচন্দ্র মিত্র—৩৮০—৩৮৪ পৃষ্ঠা। দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদব—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। ঐ—৩৮৫—৩৮৯ পৃষ্ঠা। যশোহর-খুলনার ইতিহাস—প্রথম খণ্ড—২৭৩—২৮১ পৃষ্ঠা।

চন্দ্রদ্বীপে স্থাপন করেন। দ্বিজবাচস্পতির "বঙ্গজ-কুলজীসার-সংগ্রহে" আছে,

"দনুজ মাধব (মর্দ্দন) রাজা চন্দ্রদ্বীপপতি।
সেই হৈল বঙ্গজ কায়স্থ গোষ্ঠীপতি।
সেন-পদ্ধতিতে তার মহিমা অপার।
সমাজ করিতে রাজা হৈল চিন্তাপর।
গৌড় হইতে আনাইলা কায়স্থ কুলপতি।"
কুলাচার্য্য আনাইয়া করাইল স্থিতি।

নামের সাদৃশ্য ব্যতীত দনৌজমাধব ও দনুজমর্দ্দনের এক ব্যক্তি হওয়ার কোন বলবৎ কারণ নাই।" বলবৎ কারণ যে নাই তাহা 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় ও স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীদনুজমর্দ্দনদেবের প্রবন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। রাখাল বাবুর মতে "সেনরাজবংশীয় দনুজমাধব দিল্লীর সম্রাট গিয়াসুদ্দিন বলবনের সমসাময়িক, সুতরাং তিনি ১২৬৫ খৃষ্টাব্দ হইতে ১২৮৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কোন সময় জীবিত ছিলেন, সুতরাং তাঁহার সহিত ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রদ্বীপের হিন্দু রাজ্য স্থাপনকারী দনুজমর্দ্দন দেবের সহিত অভিন্নত্ব ধরিয়া লওয়া অসম্ভব। চন্দ্রদ্বীপের রাজবংশের সহিত সেনরাজবংশের কোনও সম্পর্ক প্রমাণ করান যায় না, প্রমাণ করিতে হইলে নূতন কুলগ্রন্থ আবিষ্কার করিতে হইবে। সুতরাং সেনরাজগণ যে দাক্ষিণাত্যবাসী চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় এবং চন্দ্রদ্বীপের কায়স্থ রাজবংশের সহিত তাঁহাদিগের কোন সম্পর্ক ছিল না ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে। ইহাও বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে সম্রাট বলবনের সময়ে দনুজরায় নামক এক ব্যক্তি বর্ত্তমান ছিলেন, ইহা জিয়াউদ্দিন বার্ণী প্রণীত "তারিখ-ই-ফিরোজ-সাহী" নামক গ্রন্থ হইতে প্রমাণ করা যাইতে পারে, কিন্তু তিনি সেনবংশীয় ছিলেন কিনা বা তাঁহার নাম দনুজমাধব ছিল কিনা তাহার প্রমাণ অদ্যাপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কুলগ্রন্থের "প্রমাণ ঐতিহাসিক প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করা যাইতে পারে না। বঙ্গদেশে কৌলীন্য প্রথার সৃষ্টির পর ব্যক্তি বিশেষের আবশ্যক মত বহু কুলগ্রন্থ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া অনুমান হয়।" আমরা সম্রাট বলবনের সমসাময়িক দনুজরায় সম্বন্ধে বিস্তারিত রূপে আলোচনা করিয়াছি। —এই দনুজমর্দ্দন সম্পর্কে সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয় বলেন :—"বিক্রমপুরের দনুজমাধব ও চন্দ্রদ্বীপের দনুজমর্দ্দন অভিন্ন ব্যক্তি নহেন। বিক্রমপুরের সেনবংশীয়দিগের সহিত চন্দ্রদ্বীপের বঙ্গজ কায়স্থ কুলোদ্ভব দেববংশীয় দনুজ-মর্দ্দনের কোন প্রকার সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং যাঁহারা এই দুইজনকে একই ব্যক্তি ধরিয়া লইয়া সেনবংশীয়দিগকে কায়স্থ প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াসী হইবে,

তাহারা মত পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইবে।" বলা বাহুল্য যে পূর্ব্বে ঐতিহাসিকগণ দনুজমর্দ্দন সম্বন্ধে যে তর্ক দ্বারা সাহিত্যে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের এমত ব্যর্থ হইবে। কেননা এখন অরিরাজ-দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথ দেবের তাম্রশাসন হইতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে দনুজমাধব সেনবংশীয় ছিলেন না। তিনি ছিলেন দেব বংশীয়।

"যাহা হোক্, আমরা দেখিলাম যে, দনুজমাধবের সময় মুসলমান কর্ত্তৃক পূর্ব্ব-বঙ্গের হিন্দু রাজ্য নষ্ট হইয়াছিল, এ রকম মনে করার বিশেষ হেতু নাই। দনুজ-মাধবের পর মধুসেন অন্ততঃ ১২৮৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত পূর্ব্ব বাঙ্‌লায় রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং মধুসেন কিংবা তৎপরবর্ত্তী কোন সেন রাজার আমলেই মুসলমানের হাতে বাঙ্‌লার শেষ হিন্দু রাজত্বের অবসান হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।"

"দিল্লীর সুলতান গিয়াসউদ্দীন বল্‌বনের পৌত্র রুকন্‌উদ্দীন কৈকাউস্ ১২৯১ হইতে ১৩০১ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁরই একটি মুদ্রায় সর্ব্বপ্রথমে বঙ্গ নামের উল্লেখ দেখা যায়। সুতরাং তাঁরই আমলে ১২৯১ হইতে ১৩০১ খৃঃ অব্দের মধ্যে কোন সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরাজ্য মুসলমানের হস্তগত হয় এমন মনে করা যাইতে পারে। কৈকাউসের পরে তাঁর ভাই শমস্‌উদ্দীন ফিরোজ ১৩০১ হইতে ১৩২২ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁরই আমলে ১৩০৩ খৃঃ অব্দে শ্রীহট্ট জেলা বিজিত হয় এবং ১৩০৫ খৃঃ অব্দে সুবর্ণগ্রামে মুদ্রিত শম্‌স-উদ্দীন ফিরোজ শাহের একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ইহা হইতেও এই অনুমান দৃঢ় হয় যে, রুকন্-উদ্দীন কৈকাউসের (১২৯১—১৩০১ খৃঃ) সময়েই পূর্ব্ব বাঙ্‌লা হইতে হিন্দু-স্বাধীনতা চিরকালের জন্য অস্তমিত হইয়া যায়।"

"রুকন্-উদ্দীন কৈকাউস কিরূপে কার হাত হইতে পূর্ব্ব বাঙ্‌লা অধিকার করেন তা বলার উপায় নাই। তবে মধুসেন যখন ১২৮৯ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত গৌড়েশ্বর বলিয়া পরিচিত তখন মধুসেনের সময়েই সেনরাজ্য পরহস্তগত হওয়া বিচিত্র নয়, অথবা মধুসেনের পরবর্ত্তী অন্য কোন সেনরাজার সময়েও পূর্ব্ববাঙলা পরাধীন হইয়া থাকিতে পারে। যা হোক্, আমাদের জানা বাঙ্‌লার হিন্দু রাজাদের মধ্যে মধুসেনই শেষ রাজা এবং তাঁর রাজত্বের সময় কিংবা তার কিছু পরেই পূর্ব্ববাঙ্‌লা বিজেতার পদানত হয়, সে-বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। সম্ভবতঃ সেনবংশ ও দেববংশের মধ্যে যে দীর্ঘকালব্যাপী আত্মঘাতী কলহ উপস্থিত হইয়াছিল তার ফলে পূর্ব্ব বাঙ্‌লার রাজশক্তি যখন অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তখনই সুযোগ বুঝিয়া লক্ষ্মণাবতীর সুলতান রুকন্-উদ্দীন কৈকাউস মর্ম্মান্তিক আঘাত করিয়া বাঙ্‌লার স্বাধীনতার শেষ রশ্মিটুকুকে

চিরকালের জন্য মুছিয়া ফেলিলেন। লক্ষ্মণাবতীর মালীক গিয়াসউদ্দীন ইবজ্ যে-দিন (১২২৬ খৃঃ) প্রথম পূর্ব্ববাঙ্‌লার বিরুদ্ধে অভিযান করেন, সেইদিন হইতে ত্রয়োদশ শতকের শেষ পর্য্যন্ত লক্ষ্মণাবতীর মুসলমান অধিপতিরা সুযোগ পাইলেই পূর্ব্ববঙ্গের হিন্দুরাজ্যকে আক্রমণ করিতে ত্রুটী করিতেন না। **প্রায় এক শতাব্দী ব্যাপিয়া বিক্রমপুরের সেন রাজবংশ হিন্দু স্বাধীনতাকে বিজেতার কবল হইতে বাঁচাইয়া রাখিয়াছিলেন।** অবশেষে শত্রুর চিরন্তন সুযোগ প্রতীক্ষার কথা ভুলিয়া গিয়া যখন দারুণ আত্মকলহে পূর্ব্ববঙ্গের রাজশক্তি দুর্ব্বল হইয়া পড়িল, তখনই কৈকাউস রুকনউদ্দীন লক্ষ্মণাবতীর মালিকগণের প্রায় শতাব্দী ব্যাপী আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়াসকে সফল করিয়া তুলিবার সুযোগ পাইলেন।"

"মধুসেনই বাঙ্‌লার শেষ স্বাধীন হিন্দুরাজা; তাঁর পর হইতে বাঙ্‌লার হিন্দু-স্বাধীনতা চিরকালের মত অন্ধকারে ডুবিয়া গেল। তবে পঞ্চদশ শতকের প্রথম পাদে রাজা দনুজমর্দ্দনদেব ও মহেন্দ্রদেব আবার কিছুকালের জন্য বাঙ্‌লায় হিন্দু-স্বাধীনতাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাও আবার ক্ষণিক-বিদ্যুৎ প্রকাশের মত বাঙ্‌লার আকাশকে চমকাইয়া দিয়া চকিতের মধ্যেই অধীনতার অন্ধকারকে গাঢ়তর করিয়া দিয়া গেল। সে ক্ষণপ্রভার বিষয় আমাদের এস্থানে আলোচ্যও নয়।"

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ের এই মতামত আমরা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে করি। প্রকৃত ভাবে বিচার করিতে গেলে মাধবসেন, বিশ্বরূপসেন ও কেশবসেনের পর সেনবংশীয় কোন নৃপতির পরিচয় তেমন ভাবে পাওয়া যায় নাই, কিংবা তাহাদের কোনও তাম্রশাসনও আবিষ্কৃত হয় নাই। পরবর্ত্তী সেনবংশীয় রাজাদের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের জীবন শান্তিতে অতিবাহিত হয় নাই। সে সময়ে মুসলমানেরা নব বিক্রমে নিকটবর্ত্তী হিন্দু রাজাদের রাজত্ব আক্রমণ করিতেন।

পরবর্ত্তী সেন-রাজবংশ

মুসলমান রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে যে সকল হিন্দুরাজ্য অবস্থিত ছিল, সে সমুদয় রাজ্য ঘন ঘন মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার ফলে নিরীহ অধিবাসীগণ নানাদিকে পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করিত। লক্ষ্মণাবতীর পরাক্রান্ত মুসলমান নৃপতিরা পূর্ব্ববঙ্গের সেন রাজাদের আক্রমণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন:—"লক্ষ্মণাবতীর মুসলমান শাসনকর্ত্তৃগণ ও বাঙ্গালার স্বাধীন মুসলমানরাজগণ ধীরে ধীরে, পূর্ব্ববঙ্গের সেনরাজগণকে হীনবল করিয়া, অবশেষে সুবর্ণগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। আরাকানের মগ-জলদস্যুগণ, সমুদ্রপথে আসিয়া, নদী-তীরবর্ত্তী গ্রাম ও নগর সমূহ লুণ্ঠন ও ধ্বংস করিত,

ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের অত্যাচারে দক্ষিণ বঙ্গ ভীষণ অরণ্যে পরিণত হইয়াছিল। উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া **বিক্রমপুর** ও **সুবর্ণগ্রামের** স্বাধীনতা লুপ্ত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গের সেনবংশীয় রাজাদিগের, কোন দিক্ হইতে, সাহায্য প্রাপ্তির ভরসা ছিলনা; আর্য্যাবর্ত্ত তখন মুসলমানের কবলকবলিত, আর্য্যাবর্ত্তের যে সমস্ত হিন্দুরাজা তখন পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিলেন, তাঁহাদিগের অধিকার বহু দূরে অবস্থিত ছিল। চেদী, চান্দোল ও পরমার রাজগণের পক্ষে, পূর্ব্ববঙ্গের সেনরাজকে সহায়তা করা অসম্ভব ছিল, কারণ মুসলমান অধিকার অতিক্রম না করিলে তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গে আসিতে পারিতেন না। কলিঙ্গের গাঙ্গবংশীয় রাজগণের সহিত সেন রাজবংশের বন্ধুত্ব ছিল না। সেন রাজগণ হীনবল হইয়া পড়িলে কলিঙ্গরাজগণ দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাংশ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন। উত্তরে কামরূপ রাজ্যের সীমা, পূর্ব্ববঙ্গের উত্তর সীমার সংলগ্ন ছিল, কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে হিন্দুর অধিকার লুপ্ত হইবার বহু পূর্ব্বে—প্রাচীন কামরূপ রাজ্য বিনষ্ট হইয়াছিল। ১২৩৭ ও ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে, পূর্ব্ববঙ্গরাজ, আরাকানের মগগণকে কর প্রদান করিয়া স্বাধিকার রক্ষা করিয়াছিলেন।"*

মধুসেনের পরবর্ত্তী সেন রাজগণের প্রকৃত পরিচয় জানিবার কোনও উপায় নাই একথা পূর্ব্বেও উল্লেখ করিয়াছি। তবে তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারনাথ—পরবর্ত্তী সেন-বংশীয় নরপতিগণের মধ্যে (১) লবসেন, (২) বুদ্ধসেন, (৩) হারীতসেন, (৪) প্রতীতসেন প্রভৃতি কয়েকজনের নাম করিয়াছেন। ইঁহারা তুরুস্ক নৃপতিদের অধীনে করদ রাজা ছিলেন। পাগ্-সাম্-জোন্-জঙ্গেও কয়েকজন সেন রাজার নাম আছে, তাঁহাদের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না।

১৩৩০ খৃষ্টাব্দে মুহম্মদ তুঘলক্ পূর্ব্ববঙ্গ মুসলমান রাজ্যভুক্ত করিতে সমর্থ হন; এবং সমস্ত বঙ্গদেশকে লক্ষ্মণাবতী, সাতগাঁও এবং ঢাকা সহ সোণার গাঁ বা সুবর্ণগ্রাম এই তিন ভাগে বিভক্ত করেন।‡ পূর্ব্ববঙ্গ বিজয়ের পর হইতেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গদেশের হিন্দুস্বাধীনতাসূর্য্য চিরদিনের জন্য অস্তমিত হইল।

* বাঙ্গালার ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড—১২—১৪ পৃষ্ঠা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। গৌড়ের ইতিহাস দ্বিতীয় খণ্ড, পৃঃ ২০, ৩৫। ভারতবর্ষ—১৩৩২ পৌষ।

‡ In 1330, Muhammad Tughluk conquered Eastern Bengal also, and divided into three Provinces—Lakhnwati, Santgaon and Sonargaon including Dacca. (Hunters' Statistical Account of Bengal. P. 119.)

নবম অধ্যায়

রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর—রামপাল

শ্রীবিক্রমপুর জয়াস্কন্ধাবার [রাজধানী] কোথায় বিক্রমপুরের কোন্ স্থানে তাহা অবস্থিত ছিল এইবার সেই কথা বলিতেছি।

শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী কোন্ সময়ে কোন্ কোন্ নৃপতি কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হইয়াছিল সেই অতি সুদূর অতীত হইতে আরম্ভ করিয়া সেনরাজ বংশের রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর সম্পর্কে সে সমুদয় কথা আমরা সবিস্তারে বর্ণনা করিতেছি।

আমরা বিবিধ তাম্রলেখ এবং প্রামাণিক গ্রন্থ ইত্যাদি হইতে দেখাইয়াছি যে চন্দ্র, বর্ম্ম সেন সকল রাজাদের রাজধানীই ছিল শ্রীবিক্রমপুর। বিক্রমপুরে গুপ্তরাজাদের প্রভাব ও বিদ্যমান ছিল, তবে কত দিন কত কাল কি ভাবে তাহা ছিল, জনপ্রবাদ ব্যতীত তাহা তেমন ভাবে গ্রহণ করিবার মত প্রমাণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই *

শ্রীবিক্রমপুর বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজধানী। বর্ত্তমানে তাহা রামপাল নামে পরিচিত। চন্দ্রবংশীয় নৃপতিগণ দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্য্যন্ত এই রাজধানী হইতেই বঙ্গরাজ্য শাসন করিতেন। বর্ম্মনৃপতিগণ এই শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী হইতেই শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। বিজয়সেনের বারাকপুরের তাম্রশাসন হইতে আমরা জানিতে পারিয়াছি যে মহারাজ বিজয়সেনের সময়েই প্রথম বিক্রমপুর সেনরাজাদের হস্তগত হইয়াছিল। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন, বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন, লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেন, কেশবসেন প্রভৃতির সময়েও বিক্রমপুরেই রাজধানী ছিল। আমরা সমুদয় তাম্রলেখেই দেখিতে পাইয়াছি যে প্রত্যেক বিভিন্ন বংশের নৃপতিরাই শ্রীবিক্রমপুরবাসিত-জয়স্কন্ধাবার হইতে তাম্রশাসন প্রদান করিয়াছেন কাজেই বিভিন্ন রাজবংশের রাজধানী যে শ্রীবিক্রমপুর ছিল, তদ্বিষয়ে কোনরূপ বিতর্ক উপস্থিত হইতে পারে না।

* শ্রীযুক্ত সুশীলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় তৎ প্রণীত "মানস সরোবর ও কৈলাস" নামক ভ্রমণ কাহিনীতে লিখিয়াছেন :—আস্‌কোট নামক স্থানের রাজওয়ারা সাহেবের পরিচয় সম্বন্ধে অল্পবিস্তর জানিয়াছিলাম। ইহারা রাজা গজেন্দ্রসিংহ পাল বাহাদুরের বংশধর "কুতুর" রাজবংশ বলিয়া ইহাদের খ্যাতি চলিয়া আসিতেছে। আবার কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, ঢাকা বিক্রমপুরের পালবংশীয়ের রাজাগণ…………বখ্‌তিয়ার খিলিজির আমলে বিতাড়িত হইয়া এখানে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। এই রাজওয়ারা সাহেব এক্ষনে তাঁহাদেরই বংশধর"। বলা বাহুল্য যে ইহা কিংবদন্তী মাত্র। ইহার মধ্যে কোনও ঐতিহাসিক সত্য আছে কি না বলা কঠিন।
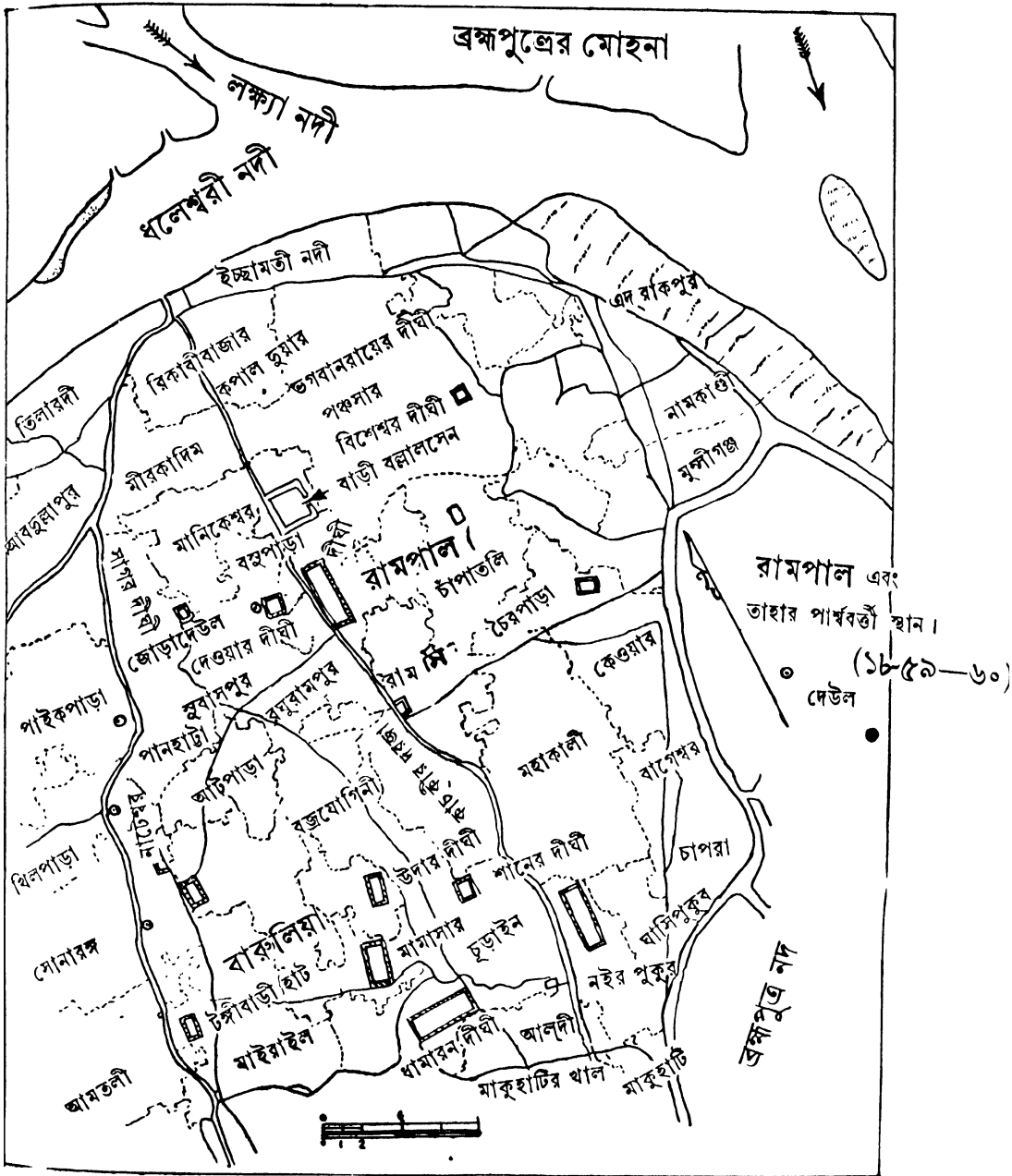
প্রাচীন বঙ্গের রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর—রামপাল

সে প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৩২৩-২৪ সালে শ্রীবিক্রমপুর রাজধানী কোথায় অবস্থিত তাহা লইয়া নানারূপ ঐতিহাসিক যুদ্ধ হইয়াছিল। বর্ত্তমান সময়ের তরুণ-সম্প্রদায়ের নিকট তাহা একরূপ অজ্ঞাত বলিয়াই মনে হয়। অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশন বর্দ্ধমানে হয়। সে সময়ে স্বর্গত প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় দেবগ্রামের "দমদমের ভিটাকেই" বল্লালসেনের সীতাহাটি তাম্রশাসন বর্ণিত বিক্রমপুরের ধ্বংসাবশেষ বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে "বর্দ্ধমানের ইতিকথা" এবং 'বর্দ্ধমানের পুরাকথা' ইত্যাদি প্রবন্ধও প্রকাশ করিয়াছিলেন। সে সময়ে ঐ সম্বন্ধে নানারূপ বাদ-প্রতিবাদ হইতে থাকে। 'ঢাকার ইতিহাস' প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় ঐ সম্পর্কে 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা' 'প্রতিভা' প্রভৃতিতে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। সে সময়ে যে ঐতিহাসিক বিতর্ক চলিয়াছিল বর্ত্তমান সময়ে সে বিষয়ে কেহই কোন তর্ক উপস্থিত করিতে অক্ষম, কেননা শ্রীবিক্রমপুর রাজধানীর সমীপবর্ত্তী নানাস্থান হইতে বিবিধ শ্রীমূর্ত্তি সমূহ এবং তাম্রশাসন ইত্যাদি আবিষ্কার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঐরূপ অলীক তর্কের শেষ হইয়াছে।* 'ঢাকার ইতিহাসের' সমালোচনা করিতে যাইয়া স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন :—

শ্রীবিক্রমপুর কোথায় ?

"গ্রন্থের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে গ্রন্থকার বিক্রমপুরের অবস্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। নদীয়া জেলার বিক্রমপুর যে কোন কালে রাঢ় দেশে অবস্থিত ছিল না এবং উহা যে চন্দ্র, বর্ম্ম ও সেন বংশীয় রাজগণের তাম্রশাসনসমূহে উল্লিখিত বিক্রমপুর হইতে পারে না তাহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে। রাঢ় অনুসন্ধান সমিতি ভূমিষ্ট হইয়া তনুত্যাগ করিয়াছে; অতএব ঢাকা জেলার বিক্রমপুর আলাদিনের দৈত্যের সাহায্যে এক রাত্রিতে নদীয়া জেলায় উঠাইয়া আনার প্রয়োজন ও অন্তর্হিত হইয়াছে। (প্রবাসী ১৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা।)

বিক্রমপুরের প্রাচীনত্বের নিদর্শন স্বরূপ যাহা কিছু দেখিবার আছে তৎসমুদয়ই রামপাল ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী গ্রাম সমূহে অবস্থিত। বিক্রমপুরের ক্ষমতাশালী রাজাদের রাজধানী হইবার মত স্থান হইতেছে রামপাল। শ্রীবিক্রমপুরের নাম রামপাল কিরূপে হইল সে সম্বন্ধে অনেক কিছু প্রচলিত কাহিনী চলিয়া আসিতেছে।

রামপালের নামোৎপত্তি

আমরা এখানে তাহার দুই একটি উদ্ধৃত করিতেছি। কাহারও কাহারও মতে পালবংশীয় নরপতি রামপালের নামানুসারে এস্থানের নাম 'রামপাল' হইয়াছে। এ সম্বন্ধে আমরা ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৩৫ পৃষ্ঠায়ও উল্লেখ করিয়াছি। সন্ধ্যাকর-

* ঢাকার ইতিহাস দ্বিতীয় ভাগ, ৫১৪—৫২০ পৃষ্ঠা। বিক্রমপুর মাসিক পত্রিকা—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, নবাবিষ্কৃত (বিক্রমপুরের ?) ঐতিহাসিক তত্ত্ব সম্বন্ধে দুই একটী কথা—শ্রীকামিনীকুমার ঘটক—৩য় বর্ষ, ৩য় সংখ্যা ১২৫-১৩৯ পৃষ্ঠা। সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা—দ্বাবিংশ ভাগ।

নন্দী বিরচিত 'রামচরিত' গ্রন্থে লিখিত আছে; "পূর্ব্ব দিকের অধিপতি বর্ম্মরাজা নিজের পরিত্রাণের জন্য উৎকৃষ্ট হস্তী ও স্বীয় রথ প্রদান করিয়াছিলেন।" বেলাব তাম্রশাসনের প্রতিপাদয়িতা ভোজবর্ম্মাকেই এই প্রাগদেশীয় বর্ম্মরাজা বলিয়া ঐতিহাসিকগণ স্বীকার করিয়াছেন। স্বর্গত নগেন্দ্র বাবুর মতে—"সামলবর্ম্মার পিতা জাতবর্ম্মা দিব্য নামক কৈবর্ত্ত-নায়কের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হয়ত কৈবর্ত্তপতি রাবণরূপী ভীমের পক্ষীয় যোদ্ধৃবর্গের অনুসরণ করিয়া রামপাল কিছুদিনের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে আগমন করিয়াছিলেন, আর সামলবর্ম্মা তৎকালে ভীমপক্ষকে ধ্বংস করিয়া উৎপাত নিবারণ করিয়াছিলেন, রাজকবি যেন তাহারই আভাস দিয়াছেন। **যেখানে সামলবর্ম্মা গৌড়াধিপ রামপালকে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন, সেই স্থানই বোধ হয় এক্ষণে বিক্রমপুরের মধ্যে "রামপাল" নামে পরিচিত রহিয়াছে।"***

এ অনুমান একেবারে অযৌক্তিক বলিয়া মনে হয় না। আশুতোষ গুপ্ত মহাশয় তাঁহার লিখিত 'রামপাল' নামক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"I am of opinion that the prince who gave his name to this city and lake of Rampal was a king of the Pal dynasty."

গোবিন্দকান্ত বিদ্যাভূষণ মহাশয় তৎপ্রণীত "লঘুভারত" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

"রাম নাম্নৈকা বৈদ্যরাজ মহাধনী
তৎপালিতা সানগরী রামপালেতি সংজ্ঞিতা।"

বিখ্যাত সাহিত্য-সংস্কারক কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর বলেন—"বল্লাল প্রতিষ্ঠিত রাজবাড়ীর মুদীর নাম ছিল রামানন্দ পাল, লোকে তাহাকে সাধারণতঃ রামপাল বলিত। রাজবাড়ী তণ্ডুলাদি যোগাইয়া রামপাল কালে সমৃদ্ধিশালী হইল এবং বল্লালের রাজধানী হইতে খানিকটা দূরে বাড়ী করিয়া দেশীয় বণিক সমাজে সম্মানের আসন লাভ করিল। বল্লাল যখন দীঘি খনন করেন, তখন তাঁহার দীঘি সংবর্দ্ধিত হইয়া রামপালের বাড়ীর নিকট যাইয়া পৌছে এবং রামপালের শুভাদৃষ্ট ক্রমে রামপাল দীঘি নামে পরিচিত হয়। এ সম্পর্কে একটি গ্রাম্য উপকথা আছে, তাহার প্রথম পংক্তি এই,—

"বল্লাল কাটায় দীঘি নামে রামপাল।"

এ সমুদয় কাহিনীর কোনও মূল্য আছে বলিয়া মনে করি না। ইহা অলীক গ্রাম্য প্রবাদ মাত্র। বিক্রমপুরের সর্ব্বত্রই এইরূপ নানা কাহিনী শুনিতে পাওয়া যায়।

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস রাজন্যকাণ্ড ২৯৫-২৯৬ পৃঃ।
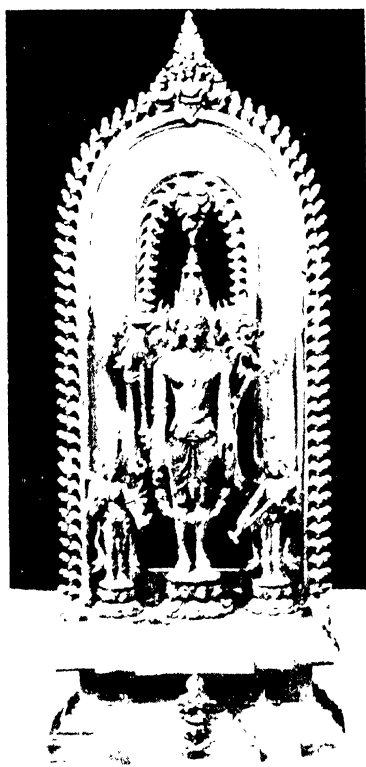
চূড়াইন গ্রামে আবিষ্কৃত বঙ্গনির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি

রামপাল বিক্রমপুরের পূর্ব্বোত্তর প্রান্তে মেঘনাদ (মেঘ্না) নদের পশ্চিম তটে মুন্সীগঞ্জ মহকুমার নিকটবর্ত্তী। মুন্সীগঞ্জ হইতে উহা দুই ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা ২৩' ৩৮" উঃ এবং দ্রাঘি ৯০' ৩২' ১০" পূঃ। বিক্রমপুরের সাধারণ ভূমির উচ্চতা অতি কম। কিন্তু রামপালের চতুর্দ্দিকের ভূমি অনেক উচ্চ। "দিল্লী যেমন ভারতের রাজবংশগুলির মহাশ্মশান, রামপাল সেইরূপ বিক্রমপুরের রাজবংশগুলির মহাশ্মশান। প্রায় পঁচিশ বর্গ মাইল ব্যাপী স্থানের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন বংশের রাজধানী ছিল।"

রামপালের অবস্থান

রামপাল ও তাহার চারিদিকের বহু পল্লী লইয়া রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর গড়িয়া উঠিয়াছিল। এখানে তাহাদের কয়েকটির নাম করিলাম। রামপালের মানচিত্রের সহিত পাঠকবর্গ গ্রামের নাম মিলাইয়া দেখিবেন। রামপাল, সুবাসপুর, [সুখবাসপুর] বজ্রযোগিনী, আটপাড়া, সুয়াপাড়া, নাহাপাড়া, রঘুরামপুর, শঙ্করবান্দ, জোড়াদেউল, মানিকেশ্বর, মীরকাদিম, কাজিকস্‌বা, পানাম, পঞ্চসার, চাঁপাতলী, চূড়াইন, মহাকালী, কেওয়ার, নগরকস্‌বা, কাগজিপাড়া, শাঁখারিবাজার, সিপাহীপাড়া, কামারনগর, দেওসার, সোণারঙ্গ, টঙ্গিবাড়ী, পুরাপাড়া, ঘাসীর পুকুর পাড়, মাকুহাটি প্রভৃতি গ্রাম লইয়া প্রাচীন শ্রীবিক্রমপুর-রামপাল নগরী সুবিস্তৃত ছিল।

ঢাকা নগরীতে ও বর্ত্তমান সময়ে শাঁখারিবাজার, কামারনগর প্রভৃতি নামীয় পল্লী বর্ত্তমান রহিয়াছে। এইরূপ নাম সাদৃশ্যের মধ্যে যে একটা ঐতিহাসিক সত্য নিহিত আছে তাহা প্রাচীন রামপাল গ্রাম পর্য্যবেক্ষণ করিলে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। অনেকে এইরূপ অনুমান করেন যে প্রাচীন রামপাল নগরী ভগ্ন হতশ্রী এবং ভস্মীভূত হইলে ঐ সমুদয় ব্যবসায়ীগণ নব প্রতিষ্ঠাপিত ঢাকা নগরীতে যাইয়া বাস করেন।

"রামপালে মৃত্তিকার উপরিভাগে দালানাদি প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। কিন্তু অনেকানেক ইষ্টকালয় ও ঘাটলা ইত্যাদি যে মৃত্তিকাসাৎ হইয়াছে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। এক্ষণে রামপাল হইতে সুবচনী খালের পূর্ব্বপার পর্য্যন্ত যে সকল গ্রাম অবস্থিত আছে, তাহার প্রায় প্রত্যেক স্থানেই মৃত্তিকার নিম্নদেশে বহুল পরিমাণে ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। উপরি দেশেও অনেক ইষ্টকাদি দৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্বারা স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে পূর্ব্বে এ সকল স্থানে অনেক আঢ্য লোকেরা বাস করিতেন। যাহা হউক বর্ত্তমান সময়ে রামপাল ও এতৎসমীপবর্ত্তী কতিপয় গ্রামে ভূমি খনন করিয়া অনেকে অনেক স্বর্ণপাত ও রৌপ্যপাত্র ও ইষ্টকাদি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ইংরেজ রাজত্বকালে রামপালের সন্নিহিত জোয়ার দেউল গ্রামে এক ব্যক্তি মাটীর নীচে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ প্রাপ্ত

রামপালে ধন প্রাপ্তি

হওয়াতে সে "সোনাকপালিয়া" নামে খ্যাত আছে। অনেক দিন বিগত হইল বজ্র-যোগিনীর অন্তর্গত সুয়াপাড়া নামক স্থানে বারৈ জাতীয় এক ব্যক্তি ভূমি চাষ করিতে করিতে একখানি পাথর প্রাপ্ত হইয়াছিল। জনৈক কর্ম্মকার উহা দেখিতে পাইয়া ইহা যে মূল্যবান পদার্থ ইহা জানিতে পারিল এবং আপন কোন কর্ম্ম সাধনের ভান করিয়া কিঞ্চিৎ মূল্য প্রদান পূর্ব্বক গ্রহণ করতঃ স্থানান্তরে বিক্রয় করিয়া ৮০ হাজার টাকা লাভ করে। কথিত বারৈ ইহা অবগত হইয়া ঐ প্রস্তর প্রাপ্ত হইবার জন্য কর্ম্মকারের নামে দেওয়ানী আদালতে অভিযোগ করে, সেখানে সে পরাজিত হইয়া সদরে আপিল করে, সেখানে সে পরাজিত হইয়া উহা হইতে নিবৃত্ত হয়।"

এই হীরক প্রাপ্তির সম্বন্ধেই টেলার সাহেব লিখিয়া গিয়াছেন--"A few years ago a ryott while ploughing a field in this place and found a diamond of the value of Rs 70,000 (£7,000) it afterwards gave rise to a law suit before the provincial court of Appeal." এই হীরকখণ্ড রামপালের রাজবাড়ীর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। একজন মুসলমান একবার স্বর্ণ নির্ম্মিত একটি তলোয়ারের খাপ ও কয়েকটি স্বর্ণ গোলক পাইয়াছিল, এ সমুদয় স্বর্ণের ওজন প্রায় সাত সের ছিল। বিগত ১৩১০ সালে রাম-পালের নিকটবর্ত্তী রতনপুর নামক স্থানের একজন মুসলমান প্রাচীন কালের কতকগুলি স্বর্ণমুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিল। কতকগুলি ধূর্ত্ত লোক তাঁহাকে নানারূপ ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহার অধিকাংশ আত্মসাৎ করে। বক্রী যাহা ছিল তাহা মুন্সীগঞ্জের ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর গভর্ণমেণ্টের সম্পত্তি বলিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। জনরবে প্রকাশ যে তাহার সংখ্যাও নাকি শতাধিক হইবে।

ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় এতদ্ সম্পর্কে বলেন:— "I personally know of several cases of the find of Treasure. A book of 24 thick golden leaves bound together by a copper wire was found from Dhamdaha tank and melted down. A copper vessel full of treasure was found in the Deul at Soner-ang. The finder went to calcutta to dispose of his find secre-tly, fell into the clutches of swindlers and lost everything, and was brought home, a raving lunatic. Fifteen solid bricks of gold were found in Panchasar and secretly disposed of. The silver image of Vishnu come from the Deul at Churain, from

which also hails the splendid pedestal of the image Nataraja. অর্থাৎ আমি নিজেও রামপালের নানাস্থান হইতে নানারূপ ধনরত্ন প্রাপ্তির কথা জানি। ধামদার দীঘির ভিতর হইতে ২৪খানি সোনার পাতাওয়ালা তার দিয়া বাঁধা একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছিল—কিন্তু উহা গলাইয়া ফেলায় আর কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। একবার সোনারঙ্গের দেউল হইতে এক ব্যক্তি একটি ঘটিভরা মুদ্রা পাইয়াছিল। সে কলিকাতা গিয়া উহা গোপন হস্তান্তরিত করিতে গিয়াছিল, কিন্তু জুয়াচোরদের পাল্লায় পড়িয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়া বাড়ী ফিরে। আর একবার পঞ্চসার গ্রামের এক ব্যক্তি ২৪খানা সোনার ইট বা ফালি পায় সে গোপনে উহা বিক্রয় করিয়া ফেলে। রজতনির্ম্মিত বিষ্ণু মূর্ত্তিখানিও চূড়াইন গ্রামেই পাওয়া যায়—নটরাজ মূর্ত্তির প্রস্তর নির্ম্মিত পাদপীঠ ও চূড়াইন গ্রাম হইতে পাওয়া গিয়াছিল।

ইংরাজী ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে এবং বাঙ্গলা ১৩১৬ সালে চূড়াইন গ্রামের মৃত্তিকাভ্যন্তর-হইতে রজত নির্ম্মিত একটী বিষ্ণুমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। সে গ্রামের বারুজীবিদের মধ্যে কেহ কেহ একটী বোরোজ [বিক্রমপুরে বোরো শব্দ ব্যবহৃত] নির্ম্মাণের জন্য নিকটবর্ত্তী একটী শুষ্ক পুষ্করিণী খনন করিতে যাইয়া উহা প্রাপ্ত হয়। দীর্ঘকাল মৃত্তিকাভ্যন্তরে থাকায় মূর্ত্তিটি এতদূর বিবর্ণ হইয়া গিয়াছিল যে ইহা কোন্ ধাতু নির্ম্মিত তাহাই প্রথমে কেহ ঠিক্ করিতে পারেন নাই, পরে ঢাকা নগরীতে নীত হইলে সেখানকার কর্ম্মকারগণ উহার মলিনত্ব দূর করিতে সমর্থ হয়। তখন প্রকাশ পায় উহা রজত-নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি।

রজত নির্ম্মিত বিষ্ণুমূর্ত্তি

'চূড়াইন' বা চূড়ামণি গ্রাম বিক্রমপুরের সুপ্রসিদ্ধ সেনরাজগণের রাজধানী রামপালের অন্তর্ভূত। এই গ্রামস্থ 'দেউল বাড়ী' [দেবালয়] নামক স্থানে অদ্যাপি বহু ইষ্টক স্তূপ—এবং ভগ্ন দেবমন্দিরাদির কঙ্কাল-চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রামের মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতেই আর একটি প্রাচীন অট্টালিকার একটি অভগ্ন কক্ষও প্রকাশিত হইয়াছে। এই রজত নির্ম্মিত মূর্ত্তির সম্বন্ধে ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন— [A silver image of Vishnu, discovered in 1909 from a ditch by the District Board road, a little to the South of the Deul at Churain. Now in the Indian museum. calcutta. Exquisite-workmanship.) আমি এই বিষ্ণু মূর্ত্তির সম্বন্ধে ১৩১৬ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'প্রবাসী' পত্রে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম।

এই বিষ্ণু মূর্ত্তিখানি চালীসমেত উচ্চতায় ১১ ইঞ্চি, ওজনে ১১৬ তোলা। পাদপীঠের নীচে গরুড় করযোড়ে উপবিষ্ট। বেদীর উপরে শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী

চতুর্ভুজ বাসুদেব দণ্ডায়মান। বাসুদেব বিকশিত শতদলোপরি দণ্ডায়মান, সৌম্য-হাস্যময় বদনমণ্ডল অপূর্ব্ব প্রভায় বিভাসিত। দুই পার্শ্বে লক্ষ্মী ও সরস্বতী। এই মূর্ত্তিখানি কলিকাতা যাদুঘরের ললিতকলাবিভাগে [Arts section] রক্ষিত আছে। এই ক্ষুদ্র বিষ্ণুমূর্ত্তিখানির শিল্প-নৈপুণ্য দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। মূর্ত্তিখানির মাথার কিরীট, কর্ণভূষা প্রভৃতি শিল্প নৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট নিদর্শন।

শতবর্ষ পূর্ব্বের প্রত্যক্ষদর্শী বলেন: 'রামপাল ও এতৎ নিকটবর্ত্তী কতিপয় স্থানে মৃত্তিকার নিম্ন দেশে এত ইষ্টক দৃষ্ট হয় যে তাহা শ্রবণ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। এমন কি তন্নিমিত্ত সহজে গমনাগমন করা দুঃসাধ্য। প্রায় দশ বৎসর বিগত হইল [সে অর্থে বর্ত্তমান কাল হইতে প্রায় শত বৎসর পূর্ব্বের কথা] পূর্ব্বোক্ত রাজবাটির সন্নিহিত বহু ভদ্রলোক-সমাকীর্ণ বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে, ভগবান রায় নামক জনৈক সৎকুলোদ্ভব মহাশয় স্বীয় বাটির এক স্থানে একটি পুষ্করিণী ও একটী গর্ত্ত খনন করিয়া তাহাতে এত ইষ্টক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন যে ঐ ব্যক্তি আপন বাটীতে একতালা দুতালা ৫।৬ খানা দালান ও ঘাটলা ইত্যাদি নির্ম্মাণ করিতে আর বড় ইট্ ক্রয় ও নির্ম্মাণ করেন নাই। তিনি প্রায় আট লক্ষ ইট্ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার প্রাপ্ত সকলের দৈর্ঘ্য ন্যূনাধিক দেড় হাত ও বিস্তার প্রায় আঠার অঙ্গুলি হইবে। এইরূপে অনেকেই মাটীর নীচে অসংখ্য ইষ্টকাদি প্রাপ্ত হইতেছেন। সকলেই প্রায় ১—১৷৷, ২—২৷৷, ৩—৩৷৷, ৪—৪৷৷ ৫ হাত মাটির তলে পাইয়া থাকে। অনেকে আবার তন্মধ্যে প্রস্তর এবং ধাতুও যৌগিক পদার্থ নির্ম্মিত অদ্ভুত মূর্ত্তি সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ উহার নামাদি নিরূপণে সক্ষম নহে। ……রামপালের যে সকল ইষ্টকালয় ছিল তদ্দারা ঢাকা নগরীর অনেকানেক ইষ্টকালয় নির্ম্মিত হইয়াছে। রামপাল একটি বৃহৎ স্থান। উহার এক অংশের নাম শাঁখারীবাজার। পূর্ব্বে তথায় অনেক শাঁখারী জাতি বাস করিত। পরে যখন ঢাকা নগরীর পত্তন হয় তখন তাহারা [শাঁখারীরা] তথা হইতে ঢাকায় যাইয়া বাস এবং ব্যবসায় করিতে আরম্ভ করে। রামপালের পশ্চিমাংশের নাম রঘুরামপুর।

রঘুরামপুর

রঘুরামপুরের একটি পুরাতন পুষ্করিণী খননে কতকগুলি দেবদেবীর মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। এই পুষ্করিণীটি পঞ্চসার গ্রাম নিবাসী শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মহলানিবাস জ্যোতি-র্বিনোদ মহাশয়ের গণনানুযায়ী খনিত হয়। আমরা এই খনন ব্যাপার প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছিলাম। জ্যোতিষী মহাশয় আমাকে এ খনন কার্য্যের আনুপূর্ব্বিক ইতিহাস যেরূপ লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন কৌতুহলি পাঠকগণের জ্ঞাতার্থ এখানে তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

অজ্ঞাত মূর্তির মুখ—রঘুরামপুর

ধ্যানী বুদ্ধ, জম্ভল এবং অন্যান্য মূর্তি
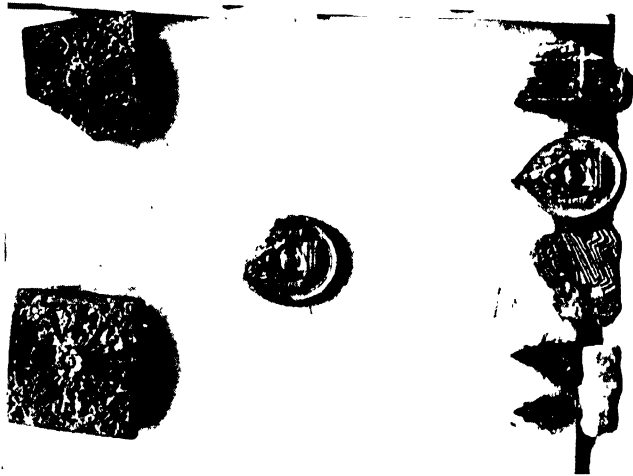
"আমি গণনা করিয়া জানিতে পারি যে প্রাচীন হিন্দু রাজধানী রামপাল অঞ্চলে রঘুরামপুর নামক পল্লীতে একটী পুরাতন বুজা দীঘির গর্ভে বহু মাটীর নীচে লোক চক্ষুর অন্তরালে পাকা বাঁধান স্থান [brick structure] আছে এবং তাহাতে অনেক ধাতব পদার্থ [Metalic goods] নিহিত রহিয়াছে। জ্যোতিষিক গণনায় ধাতু বলিতে সোণা, রূপা, লোহা, তামা, পিত্তল, কাঁসা, রাঙ্গ, সীস, টিন ইত্যাদিই বুঝায়, অধিকন্ত মণি, মাণিক্য এবং সাধারণ প্রস্তর ও বুঝাইয়া থাকে। আমি ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেটকে জানাইয়া সরকারি খরচে আমার গণনার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করিয়াছিলাম। তিনি আমার গণনায় বিশ্বাস স্থাপন করিতে না পারায় আমি বিভাগীয় কমিশনর মহাশয়কে গণনায় অব্যর্থ ফল দেখিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত আহ্বান করিয়াছিলাম এবং এ কার্য্যে যে ব্যয় লাগে, তাহা সম্পূর্ণ নিজে দিতে স্বীকার করায়, এবিষয়ের প্রতি মহামান্য গভর্ণার বাহাদুরের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলাম পরে ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুর নিজে স্থানটি পরীক্ষা করেন। তাহার পর সরকার বাহাদুর আমাকে নিজ ব্যয়ে ভূমি খনন করিয়া গণনার ফল পরীক্ষা করিবার জন্য অনুমতি দেন। এই অনুমতির বলে আমি গত ১৯১২ সনের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯১৩ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত বহু লোক লাগাইয়া খনন করাইয়াছি। খননকালে চারি মাস পর্য্যন্ত পুলিশের পাহারা বর্ত্তমান ছিল। ১৪।১৫ হাত মাটির নিম্ন হইতে যথার্থই পাকা বাঁধান স্থান এবং তাহার উপরে ধাতু-নির্ম্মিত বহুসংখ্যক দেবমূর্ত্তি এবং ত্রিশূল, খড়্গ, থাল, সরা, ঘট, শঙ্খ, হরিতকী ইত্যাদি বিবিধ পূজোপকরণ বাহির হইয়া পড়িয়াছে। গভর্ণমেণ্ট ঢাকাতে মিউজিয়ম প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঐ সকল পুরাদ্রব্য পরম যত্নে রক্ষা করিতেছেন। ভূমি খননকালে বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা-সচিব মাননীয় সার উইলিয়ম ডিউক, কে, সি, আই, আই, সি, এস, মহোদয় ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরকে সঙ্গে করিয়া মুন্সীগঞ্জ থানায় আসিয়া আবিষ্কৃত জিনিষগুলির অনেকগুলি দর্শন করিয়া গিয়াছেন, এবং তাহা লাট বাহাদুরের অভিপ্রায়ানুসারে তাড়াতাড়ি ঢাকায় নেওয়াইয়াছিলেন। গত ১৬ই জুলাই, ১৯১৩ তারিখে স্বয়ং বঙ্গেশ্বর লর্ড কারমাইকেল বাহাদুর মুন্সীগঞ্জ পদার্পণ করিয়া লোকেলবোর্ডের অভিনন্দনের উত্তর প্রদান প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন :—

প্রাচীনত্বের নিদর্শন রঘুরামপুরের পুষ্করিণী খননের বিবরণ ১৯১২ ডিসেম্বর ১৯১৩ সনের মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত

"As you may have heard I was much interested in the valuable archaeological finds lately made with the assistance of Pandit

Paraeshnath Mahalanabis of Panchashar and in February last, I went with my friend Khan Bahadur Aulad Husain to inspect them in the Dacca cuthery. ইহাই রঘুরামপুরের দীঘি খননের আদ্যোপান্ত ইতিহাস।

এখন রঘুরামপুরের প্রাচীন ঐতিহাসিক তথ্যের আলোচনা করিব। **রঘুরামপুর** রামপালের অন্তর্গত একটি অতি প্রাচীন স্থান। স্থানটি প্রাচীন হইলেও নামটি খুব প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। রঘুরামপুর এ নামটি সাড়ে তিনশত বৎসরের অধিক প্রাচীন নহে।

রঘুরামপুর নাম কেন হইল ?

এ স্থানের এইরূপ নানা পরিবর্ত্তনের পূর্ব্বে ইহা কি নামে অভিহিত হইত তাহা খুব ভালরূপে সপ্রমাণ করা এতকাল পরে সম্ভবপর না হইলেও কতকটা অনুমান করা যাইতে পারে এই মাত্র। রঘুরামপুরের নামোৎপত্তির ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা যাহা জানিতে পারি সত্য রূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে তাহাতে কোনও বাধার কারণ নাই। বারভূঁইয়ার শ্রেষ্ঠ বীর চাঁদরায় কেদাররায়ের পতনের পর তাঁহাদের মন্ত্রী রঘুরামরায় বিশেষ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠেন। ইনি রাজ্য বা জমিদারী প্রাপ্তির পর প্রাচীন রাজধানী রামপালের নিকটবর্ত্তী স্থানে স্বীয় রাজধানী নির্ম্মাণ করিয়া উহার নাম **রঘুরামপুর** রাখেন। 'ঢাকৈর' নামক কুলগ্রন্থে তাঁহার সম্বন্ধে লিখিত আছে :

"ভরদ্বাজ গোত্রে দাস আদি সাধ্য হয়।
ক্রিয়াগুণে দোষে ভাবাভাব পরিচয়॥
ভরদ্বাজ রবি রাজা রঘুরাম রায়।
সমস্ত বিক্রম যার রাজস্ব যোগায়॥
হিন্দু মুসলমান যুবা বালক স্থবির।
যার পদাতির ভয়ে কম্পিত শরীর॥
দ্বারে দ্বারে থানাদার বিস্তর লস্কর।
শত শত ছিল যার চাকর নফর॥
লভিল ক্রমশঃ কালে বিপুল সম্মান।
বিক্রমে সমাজপতি রঘুরাম ছিলা।
বহু ক্রিয়াগুণে বহু সম্মান পাইলা॥"

রঘুরামরায় মোগলের অনুগ্রহে একরূপ স্বাধীন ভাবেই রাজত্ব করিতেন। তাঁহাকে রাজস্ব ব্যতীত মোগলের নিকট আর কোনও বশ্যতা স্বীকার করিতে হইত না। এই রঘুরাম রায় বৈদ্যবংশসম্ভূত ভরদ্বাজ গোত্রিয় ছিলেন। রঘুরামের সহিত মোগলের দুই একবার যে সংঘর্ষ না ঘটিয়াছিল তাহা নহে। তিনি সে সকলের প্রত্যেকটিতে

জয় লাভ করেন। রঘুরামরায়ের অধস্তন পুরুষেরা পরবর্ত্তীকালে নপাড়া গ্রামে বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়া পরিশেষে নপাড়ার চৌধুরী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। বজ্রযোগিনী গ্রামে অদ্যাবধি ইঁহাদের পুরোহিতবংশধরগণ বাস করিতেছেন। রঘুরাম রায়ের কীর্ত্তিসম্পর্কে বহু কথা প্রচলিত আছে, এখানে তাহা আলোচনার স্থান নহে। রঘুরামরায়ের অভ্যুদয়কাল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ বা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ ; কাজেই "রঘুরামপুরের" নামোৎপত্তি ৩০০।৩০০ তিন শত সাড়ে তিন শত বৎসরের অধিক নহে।

শ্রীযুক্ত পরেশনাথ মহলানবীশ জ্যোতির্বিনোদ মহাশয়ের গণনানুসারে যে পুষ্করিণীটি খনিত হইয়াছে, ঐ দীঘির জল সেচন করিয়া প্রায় ১৫।১৬ হাত নীচে ইষ্টক-নির্ম্মিত খিলানের অংশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। যে ইষ্টক নির্ম্মিত অংশ বাহির হইয়াছে তাহার চতুর্দ্দিক খনন করিয়া উহা কি তাহা আবিষ্কৃত হইবার সুযোগ ঘটে নাই। বাঁধান অংশটি প্রস্থে আট ফুট, কিন্তু দৈর্ঘ্য অর্থাৎ মৃত্তিকাভ্যন্তরে ইহা কত দূর পর্য্যন্ত প্রোথিত রহিয়াছে তাহা এখনও অজ্ঞাত। কেহ কেহ উহা ঘাটলার উপরকার ছাত বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। খনন কার্য্য যদি আর কিছু দূর অগ্রসর হইত তাহা হইলে প্রকৃত সত্য প্রকাশিত হইত। কিন্তু তাহা আর হয় নাই।

এই খননের ফলে যে সকল শ্রীমূর্ত্তি ও প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কিত দ্রব্যাদি পাওয়া গিয়াছে আমরা এখানে তাহার বিবরণ প্রদান করিলাম।

খননে প্রাপ্ত শ্রীমূর্ত্তি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি

১। **লোকনাথ মূর্ত্তি** ৩″×২″ বোধ হয় এই মূর্ত্তিটি স্বর্ণখচিত ছিল। অদ্যাপি স্থানে স্থানে তাহার চিহ্ন দেখা যায়। অতি সুন্দর মূর্ত্তি এই লোকনাথদেবের—ললিতাসনে উপবিষ্ট। দক্ষিণ পদ আসনোপরি বিন্যস্ত। বাম পদ পাদপীঠের নিম্ন দিকে শতদলাসনের নিম্নভাগে প্রলম্বিত। বাম হস্ত দ্বারা দীর্ঘ মৃণাল সংযুক্ত বিকশিত শতদল ধৃত। দক্ষিণ হস্তে অভয় বা বরদ মুদ্রা। ডক্টর ভট্টশালীর মতে "It is very beautiful miniature. দ্বিভুজ লোকনাথের ধ্যান এইরূপ :

"পূর্ব্ববৎ কর্ম্মযোগেন লোকনাথম্ শশিপ্রভম্।
হ্রীকারক্ষরসম্ভূতম্ জটামুকুটমণ্ডিতম্।
বজ্রধর্ম্ম জটান্তহস্তম্ অশেষ রোগনাশনম্।
বরদম্ দক্ষিণে হস্তে বামে পদ্মধরম্ তথা।
ললিতাক্ষেপমন্তস্ত মহাসৌম্যম্ প্রভাস্বরম্।
বরদেৎপালকা সৌম্যা তারা দক্ষিণংতং স্থিতা।
বন্দনাদণ্ডহস্তস্ত হয়গ্রীবোথ বামতং।
রক্তবর্ণোং মহারৌদ্র ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বর প্রিয়ং। সাধনমালা।

২। মৃত্তিকাফলকে খোদিত বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। ৫"×৩" ইঞ্চি। ভূমিস্পর্শ মুদ্রা। শিখর সংযুক্ত। বজ্রাসন বিহারের [বুদ্ধগয়া] অভ্যন্তরে উপবিষ্ট আছেন এই মূর্ত্তি-তে তাহাই প্রকাশ করা হইয়াছে। বুদ্ধদেবের দুই পার্শ্বে দুইটি স্তূপ। আর দক্ষিণেও বামে আরও ছয়টি ক্ষুদ্র স্তূপ বিক্ষিপ্ত ভাবে বিদ্যমান। নিম্নে খোদিত-লিপি "যে ধর্ম্ম হেতু প্রভব" ইত্যাদি। এই মৃত্তিকা-ফলক-খোদিত মূর্ত্তি একাদশ শতাব্দী-কালের বলিয়া অনুমিত হয়।

৩। **জম্ভল**—২½×"১½" ইঞ্চি আকারের একটি অতি ক্ষুদ্র মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। জম্ভল মূর্ত্তি অতি প্রাচীন মূর্ত্তি। "সাধনমালা" হইতে জানা যায় যে জম্ভল মূর্ত্তির শীর্ষদেশে "রত্নসম্ভব, অক্ষোভ্য" প্রভৃতি পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধ বা বজ্রসত্ব মূর্ত্তি অবস্থিত থাকেন। জম্ভল মূর্ত্তি গান্ধার, মথুরা, সারনাথ, মগধ, নেপাল এবং বঙ্গদেশে পাওয়া গিয়াছে। আমরা বিক্রমপুরেও জম্ভল মূর্ত্তি পাইতেছি। জম্ভল বৌদ্ধদের ধন-দেবতা—যেমন হিন্দুদের কুবের। সাধনানুযায়ী—জম্ভল হইবেন স্বর্ণাভ, লম্বোদর, বিল্বফল এবং বামে স্ত্রী নকুল বমন করিতেছে এইরূপ। জম্ভল মূর্ত্তি ত্রিমুখও হইয়া থাকেন। পাইকপাড়া দেউলের পূর্ব্বদিকস্থ চৌগাড়া হইতে একটি জম্ভলের মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ঐ মূর্ত্তিটীর পিছনে "ওঁ জম্ভল জলেশায় স্বাহা।" এইরূপ খোদিত লিপি আছে।

৪। **প্রজ্ঞাপারমিতা**—হাল্কা বালু-পাথরের একটি প্রজ্ঞাপারমিতা মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি নষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৫। বিষ্ণুমূর্ত্তি ৫" ইঞ্চি পরিমিত।

৬। **বিষ্ণুপট্ট**—চারিখানি বিষ্ণুপট্ট পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা যাদুঘরে উহা রক্ষিত আছে। একটীর আকার ৫½"×৫½"×½' উহাতে নয়টি প্রকোষ্ঠ রহিয়াছে। এক দিকে বিষ্ণু মূর্ত্তি উপবিষ্ট রহিয়াছেন ঐ ভাবে খোদিত, অপর দিকে পরশুরামের পরিবর্ত্তে ত্রিবিক্রম মূর্ত্তি খোদিত। বামন মূর্ত্তি আকাশের দিকে পা তুলিয়া রহিয়াছেন। এই পট্টটি কালো কাদার মত প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত। ৭। **কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত একটি ফলক**—আকার ৪½"×৪½"×½"। একটি শিখর মধ্যে দেবী মূর্ত্তি, উর্দ্ধাংশ ভগ্ন। দশটি দল বিশিষ্ট শতদল মধ্যে—১। মৎস্য। ২। কূর্ম্ম। ৩। বরাহ। ৪। নৃসিংহ। ৫। বামন। বামনের—এক পা উর্দ্ধদিকে সমুত্থিত। ৬। পরশুরাম—হস্তে কুঠারের পরিবর্ত্তে গদার মত অস্ত্র। ৭। রাম। ৮। বলরাম। ৯। বুদ্ধ। ১০। কল্কি। এই ফলকখানির অনেকটা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। রঘুরামপুর খননে যে বিষ্ণুপট্ট এবং খোদিত প্রস্তর নির্ম্মিত ফলক আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার

*Buddhist Iconography Page 39. বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য এম, এ,
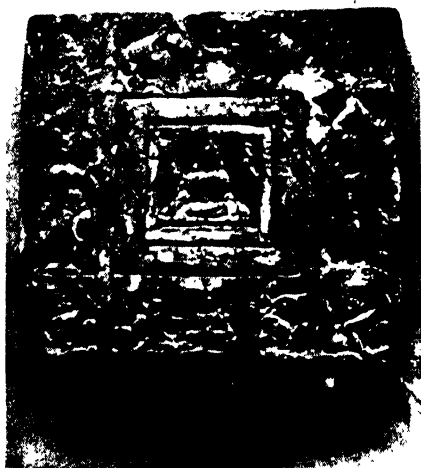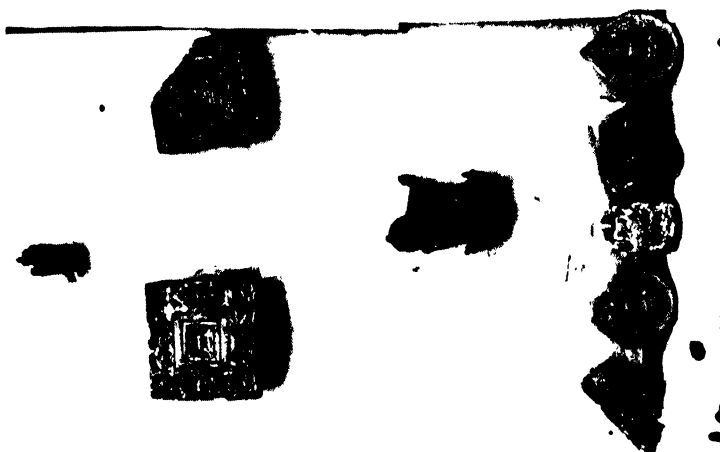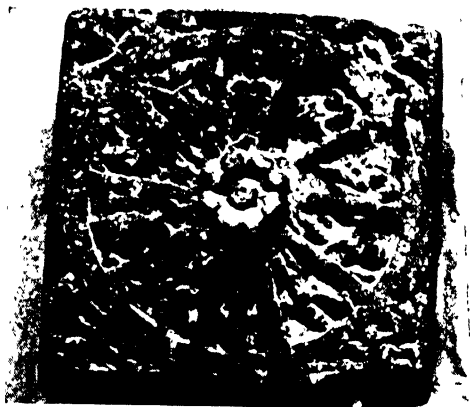
রঘুরামপুর পুষ্করিণী খনন প্রাপ্ত বিষ্ণুপট্ট ও অন্যান্য দ্রব্যাদি

একখানিও অক্ষত নহে। ৮। গরুড় মূর্ত্তি—রঘুরামপুরের এই খনন দ্বারা কাষ্ঠ নির্ম্মিত যে গরুড় মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাকে অতুলনীয় শিল্প-বৈভব বলিতে পারা যায়। গরুড়ের যুগ্ম হস্ত দুইখানি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত থাকিয়াও এই কাষ্ঠ নির্ম্মিত গরুড় মূর্ত্তিটি যেরূপ রহিয়াছে তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য বলিতে হয়। গরুড়ের দৃষ্টি, গরুড়ের উপবেশন-ভঙ্গী, গরুড়ের মস্তকোপরি-বিক্ষিপ্ত কুঞ্চিত কুন্তলরাজি শিল্পীর গঠন-নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে। গরুড়ের মুখমণ্ডল হাস্যময় অপূর্ব্ব দীপ্তিযুক্ত।

পঞ্চসার গ্রাম নিবাসী শীতলচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীতেও একটি প্রস্তর নির্ম্মিত গরুড়.মূর্ত্তি আছে। উহার আকার ২০"। ৯। বটুকভৈরব—পোড়া মাটীর তৈয়ারী একটী বটুকভৈরব মূর্ত্তিও এখানে পাওয়া গিয়াছে। দেবতার উদরটি বেশ স্ফীত, দীর্ঘ নরকপালমালা কণ্ঠে দোলায়মান। চক্ষু দুইটি গোলাকার। ওষ্ঠাধর বিভক্ত এবং বীভৎস হাস্যযুক্ত। চতুর্ভুজ। দক্ষিণ দিকের এক হস্তে তরবারি, অপর হস্ত ভগ্ন। বামদিকের উর্দ্ধ হস্তে ধৃত দণ্ড। উহার উপরের দিক্‌টা ভগ্ন বলিয়া উহা ত্রিশূল কি দণ্ড তাহা নির্ণয় করা যাইতেছে না। বাম দিকের নিম্ন হস্তে নরকপাল-পাত্র ধৃত। এই মূর্ত্তি উলঙ্গ নহে—বস্ত্রপরিহিত—কুকুরও নাই। পায়ে কাষ্ঠ-পাদুকাও নাই। মূর্ত্তিটি ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয় ধ্যান নির্দ্দিষ্ট কোন কোন অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে। [The figure not naked and does not wear wooden sandals like the Indian Museum Image. The dog is also absent. The smallness of the image is perhaps responsible for some of these omissions].

১০। (ক) গণেশ—২" ইঞ্চি মাত্র উচ্চ। মহারাজ রাজলীলাসনে উপবিষ্ট। মূর্ত্তিখানি ভালই আছে। ইন্দুরটি গণদেবের পদতলে বসিয়া আছে।

(খ) গণেশ—এইক্ষুদ্র মূর্ত্তিটিও ২"—রঘুরামপুরের মৃত্তিকা খননেই পাওয়া গিয়াছে। মূর্ত্তিটি বিশেষ ভাবে ক্ষয় পাইয়াছে। নিম্নস্থ দক্ষিণ হস্তে একটী মোদক—অন্যান্য হস্তে কি আছে তাহা বুঝিতে পারা যায় না।

বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে আরও অনেক গণেশ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে মুন্সীগঞ্জের হেরম্বগণেশ মূর্ত্তিটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গত সতীশচন্দ্র মিত্র বলেন :—"সেন রাজগণের পূর্ব্বে এতদঞ্চলে মূর্ত্তিদ্বারা গণেশ পূজা ছিল না। ভারতবর্ষের অন্যত্র আবহমান কাল এই গণেশ মূর্ত্তির পূজা প্রচলিত আছে। কিন্তু বঙ্গদেশে সেন রাজগণের আমলেই উহা প্রচলিত হয়। আবার সে রাজত্বের শেষেই উহার বিলোপ হইয়াছিল।" ইহা সত্য কিনা বলা যায় না। আমরা এই মূর্ত্তির বিষয়

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ ঘোষ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত "সঙ্কল্পের" ১ম বর্ষ, ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যায় (১৩২১ সাল ২২৪ পৃষ্ঠা) "বিক্রমপুরে প্রাপ্ত কয়েকটি প্রাচীন শ্রীমূর্ত্তি-পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম। এই অপূর্ব্ব মূর্ত্তিটি রামপালের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে পাওয়া গিয়াছিল। পরে উহা মুন্সীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী বৈষ্ণবদের একটী আখড়ায় সুরক্ষিত আছে। এই মূর্ত্তির পাঁচটী মুখ। ইহার ধ্যান এইরূপ :—

"মুক্তাকাঞ্চননীলকুন্দঘুসৃণচ্ছায়ৈস্ত্রিনেত্রান্বিতৈ
র্নাগাস্যৈর্হরিবাহনং শশিধরং হেরম্বমর্কপ্রভং।
দৃপ্তংদানমভীতিমোদকরদান্ টঙ্কং শিরোক্ষাত্মিকাং
পাশং মুদ্গরমঙ্কুশং বিশিখকং দোর্ভির্দধানং ভজে॥

আমরা এই মূর্ত্তিটিকে **হেরম্ব গণেশ** নামে অভিহিত করিয়াছিলাম। সর্ব্ববিঘ্ননাশন গণপতি নানা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। যেমন, গণেশ, মহাগণেশ, হরিদ্রাগণেশ, বিঘ্নরাজ, লক্ষ্মী, গণপতি, শক্তি, গণেশ, ক্ষিতি, প্রসাধন গণেশ, বক্রতুণ্ড, হেরম্ব গণেশ, মহাগণপতি, বিঘ্ন গণপতি, উচ্ছিষ্ট গণপতি ইত্যাদি। এই হেরম্ব গণেশ মূর্ত্তিটির আকার ৩½×২½ ফিট। উর্দ্ধে কীর্ত্তিমুখ। কীর্ত্তিমুখের নিম্নভাগে ছয়টি এক শুণ্ড বিশিষ্ট দ্বিভুজ গণেশ মূর্ত্তি পদ্মোপরি উপবিষ্টরূপে খোদিত। চালির দুই পার্শ্বে পার্শ্বখোদিত গণেশ মূর্ত্তি দুইটির নীচে মাল্য হস্তে বিদ্যাধর ও বিদ্যাধরী উপবিষ্ট। এই গণেশ মূর্ত্তির পঞ্চমুখ পঞ্চ শুণ্ডযুক্ত। প্রত্যেক বদনে তিনটি নয়ন। হস্তে ধ্যানানুমোদিত দ্রব্যাদি সংরক্ষিত। ইঁহার দক্ষিণ দিকের প্রথম হস্তে মুদ্রা, দ্বিতীয় হস্তে অঙ্কুশ, তৃতীয় হস্তে অক্ষ-মালা, চতুর্থ হস্তে অভয় (মুদ্রা); বাম দিকের প্রথম হস্তে দন্ত, দ্বিতীয় হস্তে টঙ্ক, তৃতীয় হস্তে ত্রিশূল এবং চতুর্থ হস্তে মোদক। ইনি ত্রিনয়ন, সিংহের উপর ললিতাসনে আসীন। সারদা-তিলক তন্ত্রের সহিত এই মূর্ত্তির ধ্যান হুবহু মিলিয়া যায়। প্রত্যেক গজেন্দ্র বদনে এক একটি দন্ত। 'মৎস্যপুরাণ,' 'অগ্নি পুরাণ' হেমাদ্রি এবং সারদা-তিলক গ্রন্থে গণেশের ধ্যান ও বর্ণনা অতি বিস্তৃত ভাবে আছে। বিক্রমপুরে বহু গণেশ মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। নটরাজ গণেশ মূর্ত্তিও বিক্রমপুরে কয়েকটি আছে। ইহা হইতেও মনে হয় যে বিক্রমপুরের সেন রাজগণের প্রভাব বিশেষ ভাবে এ অঞ্চলে প্রচলিত ছিল।

রামপালের অনতিদূরবর্ত্তী গ্রাম রাণীহাটি হইতে যে সকল মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যেও একটি নটরাজ গণেশ মূর্ত্তি আছে—সে বহু বৎসর পূর্ব্বের কথা। এই গণেশ মূর্ত্তিটি আউটসাহী গ্রামনিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ গুপ্তের বাড়ীতে আছে। তাহারও

কতকটা ভগ্ন। আকার ২ ফিট ৮" × ১ ফিট ৭"। উর্দ্ধে কীর্ত্তিমুখের পরিবর্ত্তে পঞ্চ আম্র ফল ও পঞ্চ আম্রপত্র। *

১১। **লিঙ্গ**—লিঙ্গ এবং গৌরীপট্ট—সেই অতি আদি যুগ হইতেই ঐ লিঙ্গ পূজা চলিয়া আসিতেছে। রঘুরামপুর হইতে—লিঙ্গ ও গৌরীপট্ট সংযুক্ত দুইটি লিঙ্গ পাওয়া গিয়াছে। (ক) লিঙ্গের নিম্নভাগ কৃষ্ণ বর্ণের প্রস্তরে খোদিত। ৩"। (খ) লিঙ্গের নিম্নভাগ ১"। দ্বিপাড়া গ্রামের অতি প্রাচীন পঞ্চমুখ শিবলিঙ্গটিও বেজগাঁ গ্রামের শিবলিঙ্গটি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

১২। **সূর্য্য মূর্ত্তি**—একটি অতি সুন্দর সূর্য্য মূর্ত্তি ও রঘুরামপুর হইতে পাওয়া গিয়াছে। ৪' ২" × ১' ১১"। এই মূর্ত্তির উপরে কীর্ত্তিমুখ আছে। অরুণ মূর্ত্তির নীচে নাগনাথ।

১৩। **চামুণ্ডা**—কৃষ্ণপ্রস্তর নির্ম্মিত এই চামুণ্ডা মূর্ত্তিটির আকার—বর্ত্তমানে যেরূপ আছে, তাহা ৩" × ৪"। দাড়িওয়ালা এক শবোপরি দেবী চামুণ্ডা উপবিষ্টা। সম্ভবতঃ দেবীর চারিখানি হাত ছিল। উপবিস্থিত দুইখানি হাত মাত্র আছে। দক্ষিণ হস্তে একখানি ছুরি, বাম হস্তখানি হাঁটুর উপর ন্যস্ত। একটা শৃগাল শবের দক্ষিণ ভাগ দংশন করিতেছে।

১৪। **মনসা**—এক সময়ে মনসা পূজা বিশেষ ভাবে বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত ছিল। বাঙ্গালা দেশের প্রায় সর্ব্বত্রই বহু মনসাদেবীর মূর্ত্তি, মনসার ঘট ইত্যাদি পাওয়া গিয়াছে। বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে কৃষ্ণ-প্রস্তর-নির্ম্মিত মনসামূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ডক্টর ভট্টশালী মহাশয়ের মতে—"The large number of Stone images of Manasa of the 10th—12th century, that have been found throughout Bengal-testify to the established character of her cult during the period." রঘুরামপুরের এই খনন হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। মনসার ঘট, বিভিন্ন কলস ও ঘটের গায়ে সর্পাঙ্কিত এইরূপ অনেক কিছু পাওয়া গিয়াছে। আমার সংগৃহীত কোরহাটির মনসা মূর্ত্তির চিত্র 'ঢাকার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে মুদ্রিত হইয়াছে। এই মূর্ত্তিটি এখন ফরিদপুর জেলার কোনও গ্রামে উহার মালিকের সহিত স্থানান্তরিত হইয়াছে।

* আউটসাহী গ্রামের অনতিদূরে একরূপ সংলগ্ন একটি ক্ষুদ্র গ্রামের নাম বলুই। বলুইয়ের পূর্ব্ব নাম "রাণী হাটি।" রাণীহাটি কোন্ রাণীর নাম—স্মৃতি বহন করিতেছে এত কাল পরে সে কথা কে বলিবে? রাণীহাটি গ্রামের সর্ব্বত্র বিক্ষিপ্ত ইষ্টক সমূহ প্রাচীনের কীর্ত্তি বিভূষিত জনবহুল নাগরিক সমৃদ্ধির পরিচয় দেয়। এই গ্রামের একটি পুষ্করণী খনন করিতে বহু দেব দেবী মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছিল। সে সকলের অধিকাংশই লুপ্ত, যে কয়েকটি মূর্ত্তি সংগৃহীত হইয়া সযত্নে রক্ষিত আছে তন্মধ্যে গণেশ, বরাহবতার, নটরাজ, পরশুরাম, বিষ্ণু মূর্ত্তি ইত্যাদি। আমি বলুই গ্রাম হইতে একটি বিষ্ণুমূর্ত্তির সন্ধান পাইয়া উহার উদ্ধারের ব্যবস্থা করিয়াছিলাম। এই মূর্ত্তিটি আউটসাহী বালাশ্রমে আছে। বিক্রমপুরের প্রাচীন ভাস্কর্য্য-কীর্ত্তি, শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত ও লিখিত—বিক্রমপুর [১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা কার্ত্তিক ১৩৩০]

রঘুরামপুরের খননে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির মধ্যে পিত্তলের নির্ম্মিত একটি প্রদীপাধার ও উল্লেখযোগ্য। চারিটি মাটির কলস, ইহাদের গাত্রে অঙ্কিত চিত্রের রঙ এখনও অবিকৃত রহিয়াছে। একটি মৃত্তিকা নির্ম্মিত ও অপর একটি প্রস্তর নির্ম্মিত সম্পুটক। প্রস্তর-নির্ম্মিত সম্পুটকটির আকার ৪"×৩"। লৌহ-নির্ম্মিত ক্ষেপনী, ২' ৮"। হস্তীদন্ত-নির্ম্মিত পাশার গুটি। ঐ গুটির উপর যে চিহ্ন রহিয়াছে তাহা বর্ত্তমান কালের মত নহে। লোহার চিম্‌টা ৪" কাঁসের থালা। উহার বেড় ১' ৩"।

রঘুরামপুরের খননের কথা বলিলাম। এইবার রামপালের অন্তর্গত স্থান সমূহে আরও যে সমুদয় প্রত্ন-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে সে সকলের কথা বলিতেছি।

দেউলবাড়ী বলিতে যে দেবালয় বুঝায় তাহা আমরা বহু স্থানে উল্লেখ করিয়াছি।

রামপালের নিকটবর্ত্তী দেউলবাড়ী

রামপালের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহ ঘিরিয়াই দেউলবাড়ীগুলি বিদ্যমান। দেউলবাড়ীগুলির সংখ্যাও নিতান্ত কম নহে।

টঙ্গিবাড়ী থানার অন্তর্গত ধীপুর গ্রাম। ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মাটী তুলিতে যাইবার সময় সমান্তরাল ভাবে দুইটি প্রাচীরের চিহ্ন আবিষ্কৃত হওয়ায় ইতিহাসানুরাগী অবসর প্রাপ্ত সাবজজ শ্রীযুক্ত জগন্মোহন সরকার মহাশয় ঢাকা মিউজিয়মের কর্ত্তৃপক্ষকে উহা খনন করিবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দেন। ঢাকা যাদুঘরের কর্ত্তৃপক্ষ খনন কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন এবং খনন কার্য্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুসম্পন্ন করিবার ভার ঢাকা যাদুঘরের কৃতি অধ্যক্ষ প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ডক্টর ভট্টশালী মহোদয়ের উপর সমর্পিত হয়। তিনি ধীপুর দেউলের

ধীপুরের দেউল খনন ১৯১৬ খৃষ্টাব্দ

খনন কার্য্য ১৯১৬ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আরম্ভ করিয়া ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্য্যন্ত পরিচালনা করিয়াছিলেন। তাঁহার এই খননে তিনটি চতুষ্কোণ অট্টালিকার চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়। অট্টালিকা তিনটী পাশাপাশি ভাবে সন্নিবেশিত ছিল এবং দীর্ঘ প্রাচীরও দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল।

অর্থাভাবে উক্ত খনন কার্য্য কিছুদূর অগ্রসর হইবার পরই বন্ধ করিয়া দিতে হয়। ঐ দালানের একটীর মধ্যে একটী নরকঙ্কাল পাওয়া গিয়াছিল। কঙ্কালটি উত্তর-দক্ষিণ দিকে লম্বমান ভাবে শায়িত ছিল। আর একটী দালানের মধ্য হইতে দুইটি 'জালা', মৃত্তিকা নির্ম্মিত সুবৃহৎপাত্র পাওয়া যায়। জালা দুইটী খালি ছিল। দেউলের নিকটবর্ত্তী পুষ্করিণী হইতে—প্রস্তর মূর্ত্তির পাদপীঠ, খোদিত কাষ্ঠ ও কতকগুলি কড়ি পাওয়া যায়। এ সমুদয় দ্রব্যাদি বর্ত্তমানে ঢাকা যাদুঘরে সযত্নে রক্ষিত আছে।

রামপালের নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের দেউলবাড়ী, খালের পাড়, প্রাচীন পুষ্করিণী, ডোবা, গড়, খাদ ইত্যাদি খনন করিয়াই বিবিধ দেবমূর্ত্তি পাওয়া যাইতেছে। আমি

দ্বাদশভুজ অবলোকিতেশ্বর বা লোকনাথ মূর্ত্তি

[সোণারঙ্গ গ্রামে প্রাপ্ত ও লেখক কর্ত্তৃক সংগৃহীত]

এ বিষয়ে বহু পূর্ব্বে নানা প্রবন্ধেও আলোচনা করিয়াছি যে শ্রীবিক্রমপুর ও রামপাল অঞ্চলের চারি দিকটা যদি খনিত হইত তাহা হইলে প্রাচীনের অনেক কীর্ত্তি গৌরব-মণ্ডিত প্রত্ন-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইত। কে রামপালের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের খনন কার্য্য করিবে? কোন দেউলবাড়ীই আজ পর্য্যন্ত যথোপযুক্ত ভাবে খনিত হয় নাই।

১। **সোণারঙ্গের দেউল**—রামপালের অদূরেই সোণারঙ্গের দেউল অবস্থিত। এই দেউলের নিকটে একটী বৃহদাকার সূর্য্য মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং উহা উক্ত গ্রামের মুন্সীবাড়ীর দীঘির পাড়ের মন্দির-প্রাচীরের সহিত গ্রথিত আছে। এই মঠ দুইটি দেউলবাড়ীর অল্প পশ্চিমেই অবস্থিত। দেউলবাড়ীর উত্তর ভাগের দীঘির মধ্য হইতে গ্র্যানাইট প্রস্তর গঠিত একটি প্রস্তর-স্তম্ভ পাওয়া গিয়াছিল উহার আকার ১৭"—৪½" উচ্চ। উহার নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতেও অনেক কিছু পাওয়া গিয়াছে। একটি গণমূর্ত্তি সম্বলিত প্রস্তর খণ্ডও উল্লেখযোগ্য। সোণারঙ্গ গ্রামে দুইটি দেউলবাড়ী আছে। একটি গ্রামের পূর্ব্বদিকে অপরটি গ্রামের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। সোণারঙ্গের পূর্ব্বদিকস্থ দেউল-বাড়ী হইতে ও বহুদিন পূর্ব্বে একখানি বৃহৎ প্রস্তর পাওয়া গিয়াছিল।

সোণারঙ্গ গ্রামের দেউলে দ্বাদশ ভুজ অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিটি পাওয়া গিয়াছিল। ঐ মূর্ত্তিটি আমি সোণারঙ্গ গোঁসাইবাড়ী হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। এই মূর্ত্তিটির বিস্তৃত পরিচয় 'প্রবাসী' পত্রিকার কার্ত্তিক, ১৩১৬, ৯ম ভাগ ৭ম সংখ্যায় "বিক্রমপুরে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছিলাম এবং "বিক্রমপুরের ইতিহাস" প্রথম সংস্করণে ও এই মূর্ত্তির উল্লেখ করিয়াছি এবং পরিশিষ্টেও তাহার সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছিল।

দ্বাদশ ভুজ অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তি

অবলোকিতেশ্বর লোকনাথ মূর্ত্তিগুলি দুই হাত, চারি হাত, ছয় হাত, দশ হাত, বারো হাত এমনকি সময় সময় সহস্র হস্ত সমন্বিত দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন অবলোকিতেশ্বর তিন বা একাদশ শীর্ষ বিশিষ্ট। অবলোকিতেশ্বর সাধারণতঃ বিষ্ণুর ন্যায় মানবের শোক-দুঃখ মোচনার্থ বোধিসত্ত্বের অবতাররূপে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। যুয়নচয়ঙের ভ্রমণ-কাহিনী পাঠে জ্ঞাত হই যে তিনি অবলোকিতেশ্বর দেবকে পুষ্প গুচ্ছ অর্পণ করিয়াছিলেন। অবলোকিতেশ্বরের মূল মন্ত্র "ওঁ মণিপদ্মে হুঁ" এবং বীজমন্ত্র হ্রী, ইহা হৃদয় শব্দেরই রূপান্তর মাত্র। অবলোকিতেশ্বর সাধারণতঃ "মহাকরুণা" এবং 'পদ্মপাণি' নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। মূর্ত্তির অর্চ্চনা ও অভ্যুদয় কোন্ সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম্মে প্রথম প্রবেশ লাভ করে, সে সময়ের নির্ণয় এখন পর্য্যন্ত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্ম প্লাবিত বিক্রমপুরে অবলোকিতেশ্বর মূর্ত্তিটি পাওয়ায় তেমন বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

২। **নাটেশ্বরের দেউল**—এই দেউলবাড়ী হইতেও অনেক মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।

এই দেউলবাড়ীটি আমরা পূর্ব্বে উচ্চ স্তূপ রূপে দেখিতে পাইয়াছি। ৩। **জোরা দেউল** ৪। **পাইক্‌পাড়ার দেউল**। ৫। **খিলপাড়ার দেউল**। ৬। **সোণারঙ্গের দেউল** ৭। **ধীপুরের দেউল** প্রভৃতির খনন কার্য্য সুসম্পন্ন হইলে অনেক কিছু প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইতে পারে। ১৩১৮ সালের বৈশাখ মাসে জোরার দেউলের সংলগ্ন একটি রাস্তার পার্শ্বের মাটি খুঁড়িয়া একখানা প্রকাণ্ড প্রস্তর পাওয়া গিয়াছিল। উহা দৈর্ঘ্যে ১১ ফুট প্রস্থে ২"—৮" দুই ফুট আধ ইঞ্চি পুরু। দেখিলে মনে হয় যে এই বৃহৎ প্রস্তর খানিকে বাঁটালির সাহায্যে চাঁচিয়া পাত্‌লা করা হইয়াছে। বাঁটালির দাগগুলি এখনও স্পষ্ট রহিয়াছে।

রামপাল বা শ্রীবিক্রমপুর ডক্টর ভট্টশালী মহাশয়ের মতে ৭০০ বৎসরের প্রাচীন নগরী, [Rampal, or Sri Vikrampur was a city about 700 years ago] আমরা তাঁহার এই মত গ্রহণ করিতে পারিলাম না। শ্রীবিক্রমপুর নগরীর মৃত্তিকা পরীক্ষায় এবং শ্রীচন্দ্রদেবের তাম্রশাসন যদি দশম শতাব্দীর বলিয়া ধরা যায়, [পণ্ডিতগণের মতানুযায়ী] তাহা হইলে শ্রীবিক্রমপুরের বয়স প্রায় ১০০০ বৎসর হইবে। আমাদের মনে হয় সাভার ও শ্রীবিক্রমপুর এবং তৎ সংলগ্ন স্থান সমূহ একই সময়ে সমৃদ্ধিশালী ছিল। শ্রীবিক্রমপুরের মৃত্তিকাভ্যন্তরে এখনও কত কি প্রাচীন কীর্ত্তি গুপ্ত অবস্থায় পড়িয়া আছে, তাহার কতটুকুই বা আবিষ্কৃত হইয়াছে! *

শ্রীবিক্রমপুর ও রামপালের প্রাচীনত্ব

রামপাল ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে যে সকল দ্রব্যাদি আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া হইল।

রামপাল হইতে কারুকার্য্য-শোভিত কাষ্ঠ-নির্ম্মিত দুইটি স্তম্ভ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রামপালের বিখ্যাত দীঘির দক্ষিণ ভাগ হইতে এই কাষ্ঠ স্তম্ভ দুইটি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই স্তম্ভ দুইটি সেখ আবদুল গণি এবং আবদুল রহমান্ প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা যাদুঘরে উপহার দিয়াছেন। এই স্তম্ভ দুইটি ৯' ৫" × ১১" × ১১" পরিমিত। এই স্তম্ভ দুইটির গাত্রে বিবিধ মূর্ত্তি খোদিত আছে। একটি স্তম্ভে দেখা যাইতেছে এক দেবী মূর্ত্তি। দেবী তরবারির দ্বারা একজন দৈত্যকে বধ করিতেছেন। অপর স্তম্ভে—একটি বৃক্ষের নীচে বিষণ্ণ বদনে সম্ভবতঃ একজন রাজপুত্র বসিয়া আছেন, তাঁহার তীর-ধনু মাটীতে পড়িয়া আছে। একটি উট, একজন ঋষি ও মৃগীর যৌন-মিলন-দৃশ্য ইত্যাদি খোদিত। রাজপুত্র সম্ভবতঃ মহাভারতের নৃপতি পাণ্ডু। *

কাষ্ঠ-নির্ম্মিত স্তম্ভ

* Iconography of Buddhist and Brahmanical sculptors in the Dacca Museum—P. 273-74.

গণদেব মূর্ত্তি নিম্নভাগে খোদিত রহিয়াছে। দ্বিতীয় স্তম্ভটির গায়ে খোদিত—কীর্ত্তিমুখ, নৃত্যপরায়ণা নারী মূর্ত্তি, দুইটি নারীমূর্ত্তি পাখীর দিকে লক্ষ্য করিয়া তীর ছুঁড়িতেছেন।

নাটেশ্বর দেউল বাড়ীর সংলগ্ন একটি প্রাচীন পুষ্করিণীর কাদামাটীর নিম্নভাগ হইতে কাঠের চৌকাঠ আবিষ্কৃত হইয়াছে। ১০"১০" × ৮" × ৯"। উর্দ্ধাংশের দিকটা চওড়া হইবে ৮'৭"। কারুকার্য্যের মধ্যে তেমন কোনও বিশেষত্ব নাই। রামপাল ও তাহার উপকণ্ঠ সম্পর্কে, সত্য সত্যই—"কত রত্ন বিলুন্ঠিত চরণ তলে" বলা যাইতে পারে।

নাটেশ্বর দেউলের কাঠের চৌকাঠ

আমি যখন প্রথম রামপাল দেখিয়াছিলাম আমার বয়স ছিল মাত্র নয় বৎসর। আমার মাতামহীর মুখে রামপাল সম্পর্কে অপূর্ব্ব রোমাঞ্চকর কথা শুনিয়াই সেই বাল্যকালে আমাকে রামপাল দেখিবার জন্য প্রলুব্ধ করিয়াছিল। আমার মনে পড়িতেছে আমার বাল্যবন্ধু সিমুলিয়া নিবাসী শ্রীকামাখ্যামোহন গুপ্ত আমাকে রামপাল দেখাইতে সঙ্গে করিয়া লইয়াছিলেন। তখন সে প্রায় চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে যে জঙ্গলাকীর্ণ, স্তূপীকৃত ইষ্টকরাজি বিক্ষিপ্ত বিরল বসতি—রামপাল দেখিয়াছিলাম সে রামপাল কি এখনও তেমনি থাকিতে পারে? তখন বাবা আদমের মসজিদটি ছিল জঙ্গলের মধ্যে আর তাহার ছিল ভগ্ন জীর্ণ অবস্থা। এমনি ভাবে বল্লাল-বাড়ী, অগ্নিকুণ্ড, মিঠাপুকুর ইত্যাদি নানা দর্শনীয় স্থান দেখিতে যেরূপ ভয়ের সহিত অগ্রসর হইতে হইয়াছিল—এখনকার জনবহুল রামপালেরসহিত তাহার তুলনা হইতে পারে না এবং বর্ত্তমানের তরুণ বিক্রমপুরবাসীদের কাছে তাহা স্বপ্ন বলিয়াই মনে হইবে। কানিংহাম বলেন,—

বল্লাল-বাড়ী

"Bikrampur was the residence of the early Sena Rajas before the aggrandisement of the family by the conquest of Barendra and Rarh. The site of the old capital is still pointed out near the great lake of Rampal Dighi, to the north of which is the Ballal-bari, or place of Ballal Sen. To this place the Hindu Raja retired on the invasion of the muhammadans and the consequent capture of his chief cities of Gaur and Nadiya. The people of the country know only the one name of Ballal Sen, who they say was the opponent of the Musalman invaders. According to Taranath this King was named Lava Sema, while the Muhammadan historians call him Lakhmaniya. But his true name was most probably the same as that of his grand-father Lakhmana Sena, and as this is frequently pronounced Lakhan Sen, I believe that it is really the

same name as the Lava Sen of Taranath. Ballal Sen was the great aggrandiser of the family, to whom several places are attributed, as well as the foundation of the famous city of Gour. The place of Ballal-Bari at Bikrampur was quite sufficient to preserve the name of Ballal, while the name of Lakshmana, having been forgotten, all the events of consequence on the history of the Senas would naturally be referred to the family."

বল্লাল-বাড়ী—এই কথাটি হইতেই সুস্পষ্ট বুঝিতে পারা যায় যে এখানে নৃপতি বল্লালসেনের বাড়ী ছিল। অদ্যাপি ইহার প্রাচীন চিহ্ন বিদ্যমান আছে। যদিও কোন অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ উপরে নাই, তথাপি ইহার চারিদিকের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিলে চতুঃপার্শ্বস্থ প্রায় ২০০ শত ফিট প্রশস্ত পরিখা ইত্যাদি দেখিলে বিশাল রাজবাড়ীর গৌরব উপলব্ধি হইয়া থাকে। রাজবাড়ীর পরিমাণ ৭৫০' × ৭৫০' ফিট। এই স্থানের চতুর্দ্দিক বেড়িয়া ২০০ শত ফিট প্রশস্ত পরিখার চিহ্ন আজিও বর্ত্তমান আছে।

প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বের রামপালের বর্ণনা

১২৭৪ সাল, ইংরাজী ১৮৬৭ সালে—সে প্রায় আশীবৎসর বা অনায়াসে শতবর্ষ পূর্ব্বে বল্লাল-বাড়ী কিরূপ ছিল তৎসম্বন্ধে প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা উদ্ধৃত করিলাম:—"বল্লালসেন রামপালে বাস করিবার নিমিত্ত বৃহৎ এক অন্তঃপুরিকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। উহা ন্যূনাধিক ছয় হাজার হস্ত দীর্ঘ ও ৮ শত হস্ত বিস্তৃত বৃহৎ এক পরিখায় পরিবেষ্টিত রহিয়াছে। ঐ স্থান বল্লাল-বাড়ী নামে খ্যাত। ঐ স্থানেই মহারাজের আবাস বাটী ছিল। অধুনা তথায় ইষ্টকালয়ের চিহ্ন মাত্র নাই। মৃত্তিকার নীচে ইষ্টকাদি থাকিবার সম্ভব। বল্লাল-বাড়ীর পূর্ব্বদিকে যে বৃহৎ এক খিড়কির দ্বার ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়, অধুনা তথায় কতিপয় মুসলমান বসতি করে। উহা রাজধানী বলিয়া গভর্ণমেণ্ট তাহার কর গ্রহণ করেন না।"

খিড়কির দ্বার

"উপরে যে পরিখার কথা উল্লেখ করা হইল উহা এক্ষণে প্রায় শুষ্কাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। উহার মধ্যস্থলে এক হাত কি অর্দ্ধ হস্ত স্থানে কিঞ্চিৎ জল দেখিতে পাওয়া যায়, কৃষকেরা তাহাতে বোরোধান রোপণ করিয়া থাকে।"

পরিখার অবস্থা

"বল্লাল-বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ এক স্থান বিদ্যমান আছে, উহা বল্লালসেনের বহির্ব্বাটী বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উল্লিখিত বাহির বাড়ীর দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে বৃহৎ একটী গজারি বৃক্ষ অবস্থিত আছে, লোকে তাহাকে বল্লালের হস্তি-বন্ধনের স্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে।"

বল্লাল-বাড়ীর বহির্ব্বাটী

রঘুরামপুরের পুষ্করিণী খননে প্রাপ্ত দ্রব্যাদি
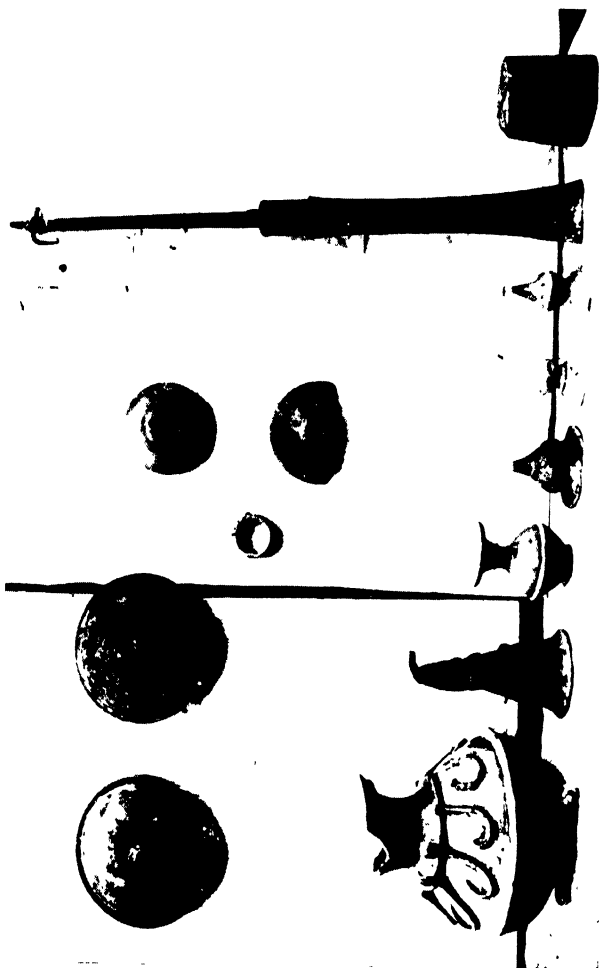
"এরূপ কিংবদন্তী, যে উক্ত গজারি গাছটি পূর্ব্বে মৃতাবস্থায় ছিল, ঋষিগণ অমর বর দেওয়াতে উহা সঞ্জীবিত হইয়াছে। এ বিষয়ে অনেক কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।"*

বল্লাল বাড়ীর দক্ষিণ দিকের দক্ষিণ ভাগের পরিখার নিকটবর্ত্তী ছোট একটি পুকুর হইতে একখানি অতি সুন্দর নটরাজ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেনরাজারা শৈব ছিলেন তৎ সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বিশেষ ভাবে আলোচনা করিয়াছি। কাজেই হয়ত রাজধানীর অন্তর্গত কোনও দেব মন্দিরে এক সময়ে এই নটরাজ দেবের মূর্ত্তিখানি প্রতিষ্ঠাপিত ছিল এবং সেনরাজারা ভক্তিভরে তাঁহার অর্চ্চনা করিতেন।+

নটরাজ মূর্ত্তি

বিক্রমপুরের নানা গ্রাম হইতে অনেক নটরাজ শিব পাওয়া গিয়াছে। আমি নট-রাজ শিব সম্বন্ধে 'ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন,' 'ভারতবর্ষ' 'সঙ্কল্প এবং' অন্যান্য বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। ‡

মিরকাদিমের খালের পূর্ব্বদিকে **নাটেশ্বরের** প্রকাণ্ড দেউল বিদ্যমান রহিয়াছে। আমি যখন উহা প্রথম দেখিয়াছিলাম, তখন উহা ইষ্টক পরিপূর্ণ একটি বিরাট স্তুপের

* পল্লী-বিজ্ঞান—প্রথম ভাগ ৫ম সংখ্যা। জ্যৈষ্ঠ—১৮৬৭ জুন।

† "The place where the Hindu Princes resided is still pointed out at Rampal a little to the west of Firinghibazar. The site of the palace of King Ballalsen consists of quadrangular mound of earth, covering an area of about three thousand square feet wide. There are no traces of buildings within this enclosed space, but in its vicinity and in the country for many miles around mounds of bricks and wall foundations at a great depth below the surface are met with, and were formerly used as building materials for the construction of house in the city. Near the site of Ballalsen's palace there is a deep excavation called Agni Kundu, where it is said that the Hindu Prince of Vikrampur, and his family burned themselves to the approach of the Musalman : [Hunter's Statistical Account of Bengal (Dacca Division) Page 70]

‡ বিক্রমপুরের প্রাপ্ত শ্রীমূর্ত্তি পরিচয় স্বতন্ত্র ভাবে "বিক্রমপুরের ইতিহাস" দ্বিতীয় খণ্ডে চিত্র সহ আলোচিত হইবে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিতেছি মাত্র। সেজন্যই মূর্ত্তি সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইল না।

+ মুন্সীগঞ্জ মহকুমার ভারপ্রাপ্ত রাজকর্ম্মচারীগণ (Subdivisional Officer) অনেকেই রামপাল সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন কিংবা গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের সে সমুদয় গ্রন্থ ও প্রবন্ধ যে সমুদয়ই প্রামাণিক এমন কথা বলা চলে না। আমরা এখানে তাঁহাদের কয়েকজনের ও অন্যান্য লেখকগণের নাম করিলাম।

(১) Ruins and Antiquities of Rampal—by Asutosh Gupta Esq C. S. J. R. A. S. B. & I 1889. (২) Arch. Survey of India Reports Vol XX Bihar & Bengal. শ্রীশচন্দ্র ঘোষ রামপালের বিবরণ ইত্যাদি।

মত দেখিয়াছিলাম। এখন উহার সে অবস্থা নাই। 'নাটেশ্বর' নাম হইতেই এইরূপ অনুমিত হয় যে এই দেউল বা দেবালয়টিতে খুব সম্ভব নটরাজ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাপিত ছিলেন। কিন্তু উহার ভিতর হইতে আজ পর্য্যন্ত ও কোনও নটরাজ বা নটেশ মূর্ত্তি আবিষ্কৃত হয় নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন—"এই দেউলটি বৈষ্ণব বর্ম্মরাজগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হয় এবং সেনবাজগণ কর্ত্তৃক শৈব দেউলে পরিণত হয়। এই দেউলের অল্প দূরেই **সোগারঙ্গের দেউল** বিদ্যমান। দেউলটি বেশ বড়। ঐ দেউলের পূর্ব্বভাগ এখনও সিংহদরজা নামে পরিচিত। ঐ সিংহ দরজার সম্মুখেই মেদিনীমণ্ডলের দীঘি। এই দীঘিটি বেশ বৃহদাকার। এই দীঘি ও সিংহদরজার মধ্যবর্ত্তী স্থানটুকুকে লোকে এখনও লুড়াইতলি বলে। বাস্তা দিয়া যাইবাব সময় প্রত্যেক পথিক খড়কুঠা দিয়া একটা লুড়া বানাইয়া সময় সময় অগ্নি দিয়া এবং অনেক সময় তাহা অগ্নি সংযুক্ত না করিয়াই দেউলের উদ্দেশে লুড়া বানাইয়া এক অশ্বত্থ বৃক্ষেব তলে নিক্ষেপ কবিয়া যায় এই প্রথাটী এখনও বিদ্যমান আছে। ইহা সূর্য্য পূজাব স্মৃতি বলিয়া মনে হয়।" বিক্রমপুরেব বহু গ্রামেই লুড়াইতলি আছে। এ-বিষয়ে মৎ সম্পাদিত 'বিক্রমপুর' পত্রে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছিল।

আমরা পূর্ব্বেই একথা বলিয়াছি যে চন্দ্র-বর্ম্ম-সেন প্রভৃতি বিভিন্ন রাজাদের রাজধানী রামপালের চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী স্থান ব্যাপিয়া বিদ্যমান ছিল। আমরা প্রথম বল্লালবাড়ী যেমন দেখিয়াছিলাম এবং শতবর্ষ পূর্ব্বে উহা যেমন ছিল, এখন যদি কেহ ঠিক্ তেমনি ভাবে দেখিতে পাইবেন বলিয়া মনে করেন তবে তাহা সম্পূর্ণ ভুল হইবে। পূর্ব্বে দিল্লী যেমন দেখিয়াছি নূতন দিল্লীর পর তাহার কত কি রূপান্তরিত হইয়াছে। প্রায় শতবর্ষ পূর্ব্বেব বল্লালবাড়ীতে চৌগাড়ার অন্ত ছিল না। "তত্রস্থ সুগভীর চৌগাড়া সকল সন্দর্শন করিলে ভয়ে হৃৎকম্প উপস্থিত হয়।" অধুনা ইহার অনেকানেক স্থান মৃত্তিকায় ভরাট হইয়াছে। কৃষকেরা তাহাতে নানা প্রকার শস্য বোপণ করিয়া থাকে। রামপাল অতি উচ্চ ও উর্ব্বরা ভূমি। সেখানে নানাবিধ শস্য উৎপাদিত হইয়া থাকে। * * * এখানে তেঁতুল ও শিমুল তুলা অনেক পরিমাণে জন্মিয়া থাকে।"

বল্লাল বাড়ী ও রামপালের দীঘীর পশ্চিম পাড হইতে যে সুপ্রশস্ত রাজপথ উত্তরে ধলেশ্বরী নদীর তীর হইতে দক্ষিণে পদ্মা বা কীর্ত্তিনাশা নদী পর্য্যন্ত গিয়াছে উহার নাম কাচ্‌কীর দরোজা।" রামপালের দীঘির পশ্চিম পাড় দিয়া উত্তরে ধলেশ্বরী নদীর খাড়ি (রিকাবিবাজারের খাড়ির সম্মুখস্থ গুদারাঘাট) হইতে প্রায় সরলভাবে দক্ষিণাভিমুখে রাজাবাড়ী থানা পর্য্যন্ত বৃহৎ একটি রাজপথ সোজা দেখিতে পাওয়া যায়। উহাব নাম **রামপালের দরজা**। উক্ত

রামপালের বা
কাচকীর দরজা

দরজার পরিসর অন্যূন ৪০ হাত হইবে।" আমরা শতবর্ষ পূর্ব্বে রামপাল ও তাহার এই পথের অবস্থা কিরূপ ছিল সে বিষয়ে ৩১ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করিয়াছি বলিয়া আর এখানে উল্লেখ করিলাম না।

এই রামপালের দরজা আমরা দক্ষিণ দিকে ২০০২৫০ হাত প্রশস্ত ও দেখিয়াছি, কৃষকেরা উহা জমির চাষ-আবাদের সঙ্গে সঙ্গে আত্মসাৎ করিয়া উহাকে খর্ব্বাকার করিয়া তুলিয়াছে। কিছুদিন পরে উহার চিহ্ন একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যাওয়াও অসম্ভব নহে। এই রামপালের দরজা হইতে আরও অনেক রাস্তা চারিদিকে বাহির হইয়া গিয়াছিল। এখন ঐ সমুদয় রাজপথ ডিষ্ট্রীক্টবোর্ড ও লোক্যালবোর্ড, ইউনিয়ান বোর্ড প্রভৃতির রাস্তার সহিত মিলিয়া গিয়াছে। ১৮৫৯ খৃঃ অঃ Main Circuit Map এ উত্তর দিকের পথের দিকটা 'কপাল দুয়ার' নামে পরিচিত ছিল। [In the Main Circuit Map of 1859, a place on its northern end is designated *Kapal Duar* and this may have been also the name by which the northern end of the road was known.]

বল্লালবাড়ীর ঠিক্ মধ্যস্থলে **মিঠাপুকুরটি** অবস্থিত। মিঠাপুকুরের পার্শ্বেই **অগ্নিকুণ্ড**। বল্লালসেন বাবা আদম নামক ফকিরের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন এইরূপ সংবাদ জ্ঞাত হইয়া বল্লালসেনের শুদ্ধান্তঃপুরবাসিনীগণ অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করেন সেই জন্য ইহার নাম অগ্নিকুণ্ড। অগ্নিকুণ্ড একটি সুগভীর গর্ত্ত বিশেষ। এখানে এক সময় প্রায় বারোমাস জল থাকিত। আমি প্রথম যেবার রামপাল দেখিতে যাই তখন আমাদের পথ-প্রদর্শক কৃষক একটী কোদালী দ্বারা খনন করিয়া উহা হইতে প্রচুর পরিমাণে কয়লা বাহির করিয়াছিল, আমি সে সময়ে তাহার কিছু সংগ্রহও করিয়াছিলাম। আমরা সেস্থানে বেশীক্ষণ দাঁড়াইতে পারি নাই, কেননা সেখান হইতে এত অধিক পরিমাণে "জুঁইয়া" নামক এক প্রকার বিষাক্ত কৃষ্ণবর্ণের পিপীলিকা নির্গত হইয়াছিল যে তথায় দাঁড়াইয়া থাকাই ক্লেশকর হইয়াছিল। কাজেই অই স্থানে এক সময়ে কোনও রূপ একটা বড রকমের শোকাবহ ঘটনা ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

মিঠাপুকুর

এবিষয়ে যে কিংবদন্তী বা কাহিনীটি প্রচলিত তাহা "বল্লালচরিতম্" নামক গ্রন্থে আছে। "বল্লালচরিতম্" নামে দুইখানি সংস্কৃত পদ্য গ্রন্থ আছে। উহার একখানি আনন্দভট্ট কর্তৃক খৃষ্টিয় ষোড়শ শতকের প্রথম ভাগে বিরচিত হইয়াছিল। ঐ গ্রন্থে বল্লালসেনের রাজধানী গৌড়, বিক্রমপুর ও স্বর্ণগ্রাম বলিয়া লিখিত আছে। আর একখানি "বল্লালচরিতম্" গ্রন্থ উহা গোপালভট্ট কর্তৃক বিরচিত এবং তাঁহার

বংশধর আনন্দভট্ট লিখিত পরিশিষ্ট সংবলিত এইরূপ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। বল্লালচরিতে এইরূপ উপাখ্যান আছে যে দ্বিতীয় বল্লালসেন বাবা আদমের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইবার সময় সঙ্গে একটী সংবাদবাহী পারাবত লইয়া গিয়াছিলেন এবং বলিয়া গিয়াছিলেন যে, যদি পারাবতটি প্রত্যাবর্ত্তন করে তাহা হইলে পুরবাসিনীগণ বুঝিবেন যে তিনি যুদ্ধে নিহত হইয়াছেন সুতরাং তাঁহারাও যেন অগ্নিকুণ্ডে আত্মবিসর্জ্জন করিয়া নিজ সম্ভ্রম ও মান রক্ষা করেন। দৈবের বিচিত্র লীলা। বল্লাল রণে জয়ী হইয়া শোণিত-সিক্ত কলেবর ধৌত করিবার জন্য যেমন নদী-জলে অবতরণ করিয়াছেন, অমনি পারাবতটি উড়িয়া আসিয়া রাজবাড়ীতে পৌছে, রাণী ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকাগণ আত্মবিসর্জ্জন করিলেন।

এ বিষয়ে সুধী শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহার সহিত আমরা এক মত :—

"এ দেশে বেদব্যাসের আমল হইতে সাধারণতঃ যে ভাবে ইতিহাস রচিত হইয়া আসিয়াছে বল্লাল-চরিত দুখানাতেও তাহার বিশেষ ব্যতিক্রম ঘটে নাই। উপরন্তু আমরা এখানে কয়েকটি তারিখ পাইতেছি যাহার কোনটির সহিত কোনটির মিল নাই। আনন্দভট্ট কৃত বল্লাল-চরিতের মতে বল্লালসেন ১০২৮ শকে প্রাণত্যাগ করেন, কিন্তু অন্য বল্লাল-চরিতের মতে স্বয়ং বল্লালের আদেশে তাঁহার গৃহশিক্ষক গোপালভট্ট ১৩০০ শকে তাঁহার বিবরণ লিখিয়া গিয়াছেন এবং আনন্দভট্ট ১৫০০ শকে তাঁহার পরিশিষ্ট যোগ করিয়া দিয়াছেন। আনন্দ ভট্টের নিজের বল্লাল-চরিত কিন্তু ১৪৩২ শকে লিখিত। ঐতিহাসিক গবেষণায় বল্লালসেনের রাজত্বের যে কাল নির্ণীত হইয়াছে তাহা ১১০৬ খ্রীষ্টাব্দের বহু পরে এবং ১৩৭৮ খ্রীষ্টাব্দের বহু পূর্ব্বে।

"আবার বারাদুম্ব বা বাবা আদমের সমাধি ও তাঁহার স্মরণার্থ মস্‌জিদ এখনও সশরীরে রামপাল হইতে কিছু দূরে বর্ত্তমান। এই মস্‌জিদের উপর উৎকীর্ণ লিপিতে দেখা যায়, ইহা খ্রীষ্টিয় পঞ্চদশ শতকের শেষ ভাগে নির্ম্মিত।"

"নহ্য মূলা জনশ্রুতি :—এইরূপ একটা কথা আছে। জনশ্রুতি এক মূল সাধিতে পারে, কিন্তু সেই মূলকে বিকৃত আকারে বিপথে লইয়া যাওয়াও জনশ্রুতির একটি কার্য্য।"

"প্রবল প্রতাপশালী মহারাজ বল্লালসেন যে এই ভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই তাহা সুনিশ্চিত। ১১০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয় নাই এবং তাঁহার সময়ে বঙ্গদেশে মুসলমানগণ এতটা বিক্রান্ত হয় নাই যে হঠাৎ রামপাল রাজধানীতে আসিয়া বঙ্গেশ্বরের সহিত সম্মুখ যুদ্ধে অগ্রসর হইতে পারে। যে দেশে রাজার সমকালে ইতিহাস রচিত হয় না সেখানে পরবর্ত্তীকালে নানা কাহিনী ও কিংবদন্তী স্তূপীকৃত হইয়া ঘটনাগুলিকে বিকৃত আকারে উপস্থিত করে। বিজয়সেনের পুত্র বল্লালসেন সম্বন্ধে এইরূপ ঘটনা অসম্ভব বলিয়া এবং কিংবদন্তী খুব প্রবল বলিয়া কোন কোন লেখক পরবর্ত্তীকালের দ্বিতীয় বল্লালসেন নামক এক রাজার উপর এই অগ্নিকাণ্ড ঘটিত ব্যাপার চাপাইয়া দিয়াছেন। কিন্তু যেখানে ইতিহাস এত বিকৃত, সেখানে এরূপ কিছু করিয়া থাকিলে, রাজার নামটাই যে বিকৃত হয় নাই এ কথা কে বলিতে পারে? বল্লালসেন বড় রাজা ছিলেন বলিয়া অনেক ক্ষুদ্র রাজার ক্ষুদ্র কার্য্য তাঁহার উপর আরোপিত হওয়া খুবই সম্ভব। লক্ষ্মণসেনের

রামপাল দীঘির উত্তর পাড়ে অবস্থিত বিক্রমপুরের সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থানের
সুপ্রাচীন তেঁতুলগাছ

পরও পূর্ব্ববঙ্গ অনেক কাল পর্য্যন্ত স্বাধীন ছিল। হয় ত কোন পরবর্ত্তী রাজার সাহায্যে রাজপুতানার সুপরিচিত জহরব্রত বিক্রমপুরে ক্ষুদ্র আকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সমসাময়িক ইতিহাস সে সম্বন্ধে নীরব থাকায় পরবর্ত্তী কালে বল্লালসেনের উপর সমগ্র ঘটনাটি চাপাইয়া দেওয়া কিছু অসম্ভব নহে।'

কপোতের পলায়ন ও তদ্দৃষ্টে পুরমহিলাগণের অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন এদেশে এত অধিক স্থানে রাজাদিগের প্রাণত্যাগের কাহিনীর সহিত জড়িত যে ঐতিহাসিক এই সব কাহিনী গ্রহণ করিতে একটু অতিরিক্ত সাবধান হইলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। আমরা দশরথ দনুজমাধবের বিষয় পূর্ব্বে বলিয়াছি। বিশ্বেশর বাবু বলেন—"ইনিই মুসলমান ঐতিহাসিকের দনৌজা বা মুজ্যা। বিক্রমপুরে যদি মুসলমানের ভয়ে জহরব্রত অনুষ্ঠিত হইয়া থ'কে তাহা হইলে সম্ভবতঃ উহা তাহারও পরে।" গিয়াসউদ্দীন বল্‌বন্ [১২৬৬-৮৭ খৃঃ অঃ] যখন দিল্লীর সম্রাট তখন ১২৭৯ খৃষ্টাব্দে বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তা তুগ্রিল খাঁ বিদ্রোহী হন। সে সময়ে দশরথ দনুজমাধব বিক্রমপুরে রাজত্ব করিতেন। বলবন তাঁহার সহিত ১২৮০ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করেন, বাবা আদমের স্মৃতি রক্ষা মসজিদ দনুজমাধবের বহু পরবর্ত্ত। *

অগ্নিকুণ্ডের সন্নিকটে মিঠাপুকুর অবস্থিত। এই পুকুরটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ১৫০ হস্ত ও প্রস্থে ১০০ হাত হইবে। এই পুষ্করিণীর মধ্যেই অগ্নিকুণ্ড হইতে চিতাভস্ম সমূহ ফেলা হইয়াছিল বলিয়া জন-প্রবাদ প্রচলিত। মিঠাপুকুরে এখনো বারমাস জল থাকে। এস্থানে বহু কৃষকের বাড়ী অবস্থিত। ডাক্তার টেলার সাহেব মিঠাপুকুর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"In the eentre of Balla-baree, there is a tank called "Meetha Pukhur" in which the remains of the Rajaa and his famliy are said to have been deposited. It is regarded as a place of great sanctity by the Hindoo in the neighbourhood, who carefully abstain from using its water, or removing the soil from its banks."* এখন আর সেদিন নাই। এই পুষ্করিণীর তীরে যে সকল মুসলমান কৃষকগণের বাড়ী অবস্থিত, তাহারাই এক্ষণে ইহার জল ইত্যাদি ব্যবহার করিয়া থাকে।

মিঠাপুকুর

বল্লালবাড়ী হইতে প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে বাবা আদমের মস্‌জিদটি অবস্থিত। এই স্থান রামপালের সীমান্তর্ভুক্ত। রামপালের এই অংশের নাম দুর্গাবাড়ী। মস্‌জিদটি এক্ষণে ভগ্নাবস্থায় পতিত হইয়াছে। মস্‌জিদের গাত্রস্থিত প্রস্তর ফলক হইতে জানিতে পারা যায় এইটী ৮৮৮ হিজরীতে অর্থাৎ ১৪৮৩ খৃঃ অঃ নির্ম্মিত হইয়াছিল। ইহার

* বিক্রমপুর-শ্রীবিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য-প্রবাসী ১৩৪২।

নির্ম্মাতা মালিক কাফুর। সুলতান জালালউদ্দীন ফতে শাহার সময় ইহা নির্ম্মিত হয়।

বাবা আদমের মসজিদ

ব্লকম্যান, ৺হরিনাথ দে প্রভৃতি মনীষিগণ নিম্নলিখিতরূপ ইহার পাঠোদ্ধার করিয়াছেন "God Almighty says" ; The mosque belong to God. Do not associate any one with God. The prophet, may God bless him, says ; He who builds a mosque will have a castle built for him by God in paradise. This Jami masjid was built by the great Malik, Malik Kafur, in the time of the king, the son of the king Jalal-ud-diny wauddin Fateh shaha, the king son of Mahammad sahah, the king, in the middle of the month of Rajab 888 Hijri 1483 A. D. বাবা আদমের সম্বন্ধে নানারূপ উপাখ্যান ও কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কথিত আছে যে স্থানে বাবা আদম নমাজ পড়িতেন—ঠিক সেই স্থান নির্ব্বাচিত হইয়াই মসজিদটি নির্ম্মিত হইয়াছে। মসজিদটির ইষ্টক মসৃণ ও পাতলা এবং কারুকার্য্য-খচিত। পূর্ব্বে ছয়টি গুম্বজ ইহার পুরোভাগের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিত। বর্ত্তমানে মাত্র তিনটি গুম্বজ আছে বক্রী তিনটি ভূমিকম্পে ছাত সহ ধ্বংসের পথে গমন করিয়াছে। মসজিদ মধ্যস্থিত দুইটি প্রস্তর-স্তম্ভ বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। মসজিদে প্রবেশ করিলেই দ্বারের দুই পার্শ্বে এই স্তম্ভ দুইটি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার উচ্চতা ৭ হাত এবং পরিধি ৩॥ হাত। স্তম্ভদ্বয় ধূসরবর্ণ। কথিত আছে মসজিদের গাত্রে মূল্যবান মণিরত্ন সংযোজিত ছিল মগেরা লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছে। এক সময়ে ফৈজুদ্দিন খন্দকার, মফিজুদ্দিন দেওয়ান এবং আইনদ্দিন খন্দকার প্রভৃতি এই মসজিদের খাদেম ছিলেন। এই মসজিদটি মেরামত হওয়ায় ইহার প্রাচীন রূপ আর নাই।

মসজিদটির সন্নিকটে বাবা আদমের সমাধি বিরাজিত। সমাধিটি মধ্যযুগে একেবারে জীর্ণাবস্থায় নিপতিত হইয়াছিল—কয়েক বৎসর হইল মেরামত হওয়ায় ইহার কতকটা নবজীবন লাভ হইয়াছে। এই সমাধিটিও প্রাচীন। বাবা আদমের মসজিদ ও সমাধিই পূর্ব্বাঞ্চলে মুসলমান প্রাধান্যের প্রথমাবস্থার সূচনা করিতেছে। সে হিসাবে দেখিতে গেলে পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে ধীরে ধীরে মুসলমান প্রাধান্য বিস্তৃত হইতে থাকে। বাবা আদমের মসজিদের অনতিদূরে কাজিকসবা, রিকাবিবাজার প্রভৃতি গ্রামেও কয়েকটি প্রাচীন মসজিদ অবস্থিত আছে। সে :সকলগুলির আলোচনার স্থান এখানে নহে, আমরা বিক্রমপুরের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে তাহার আলোচনা করিব। বাবা আদমের মসজিদ

বাবা আদমের সমাধি

হইতে বরাবর দক্ষিণাভিমুখে যে পথ গিয়াছে, সে পথ দিয়া কিয়দ্দুর অগ্রসর হইলে দক্ষিণ দিকে একটী দীঘী দেখিতে পাওয়া যায়। উহার নাম কোদালধোয়ার দীঘী। কিংবদন্তী এই যে, যে সমস্ত মজুর রামপালের দীঘী-খননকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহারা প্রতি দিনই কার্য্য শেষে একস্থান হইতে এক কোদাল মাটি কাটিয়া কোদাল ধুইয়া ফেলিত, এইরূপে একস্থান হইতে মাটি কাটিতে কাটিতে ঐ স্থানেও একটি বিশাল দীর্ঘিকা খনিত হইয়া গেল, উহারি নাম কোদালধোয়ার দীঘী। বাঙ্গালাদেশের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ কোদালধোয়া দীঘীর উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ কেহ বলেন বল্লালরাজের কোতোয়ালের বাড়ী এই দীঘীর তীরে ছিল। সেজন্যই কোতোয়াল দহ হইতে এই দীঘীর নাম হইয়া গিয়াছে কোদাল ধোয়া। এই সকল জন-প্রবাদের সুমীমাংসা হওয়া এখন অসম্ভব। এই দীঘিও দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ১০০০×৫০০ হাত হইবে।

কোদালধোয়ার দীঘী

বাবা আদমের মস্‌জিদটি রামপালের অদূরবর্ত্তী কাজীকস্‌বা নামক স্থানে অবস্থিত। কস্‌বা পার্শী শব্দ নগর বুঝাইয়া থাকে। রামপালের একটি ভাগের নাম **নগরকস্‌বা**। নগর বলিতে সহর বুঝায় এবং কস্‌বা শব্দের অর্থ হইতেছে নগর। অতএব এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে পরবর্ত্তী কালে মুসলমান প্রভাব বিস্তৃত হইলে পর প্রাচীন শ্রীবিক্রমপুর নগরের বিভিন্ন পল্লীর নামও পরিবর্ত্তিত হইতে থাকে—যেমন নগরকস্‌বা, কাজি-কস্‌বা, আবদুল্লাপুর প্রভৃতি।

রামপাল দীঘী—বা বল্লাল দীঘী। রামপালের দীঘি এক সময়ে বিক্রমপুরের একটি প্রধান দর্শনীয় জিনিষ ছিল; শ্রীবিক্রমপুর রাজধানীর চারিদিকে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম সমূহে অনেক বৃহদাকার দীঘী দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমুদয় দীঘী খননের প্রধান কারণ দীঘীর ভিতর হইতে মাটি তুলিয়া ভূমি উচ্চ করিয়া বাড়ী নির্ম্মাণ করা। রাজধানীর উপযুক্ত নিরাপদ উচ্চস্থানের জন্যই এইরূপ বিশালকায় দীঘী খনন এবং পানীয় জলের জন্যও দীঘী খনন সেকালে একটি আবশ্যকীয় পুণ্য কর্ম্ম বলিয়া বিবেচিত হইত। রামপালের চতুর্দ্দিকস্থ ভূমির ন্যায় উচ্চ ভূমি বিক্রমপুরে আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। সুবিখ্যাত ভৌগোলিক এবং সেকালের ঢাকা বিভাগের স্কুল-ইন্‌স্পেক্টার সি, বি, ক্লার্ক (C. B. Clarke) রামপালের দীঘীর তীর এবং পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহ দেখিয়া বলিয়াছিলেন যে "যদি বর্ষাকালে কোন দিন এ স্থানে জল উঠে, তাহা হইলে সমস্ত ঢাকা জেলা একেবারে জলে ভাসিয়া যাইবে। 'রামপালের দীঘীর পূর্ব্বতীরে তিন্তিড়ী বৃক্ষের নিম্নস্থ মৃত্তিকার স্বাদ লবণাক্ত. জনপ্রবাদ এখানে এক সওদাগরের সুবৃহৎ লবণ বোঝাই তরণী নিমজ্জিত হইযাছিল। এই দীঘী রামপালের দীঘী এবং বল্লাল দীঘী এই নামেই পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

রামপালের তেঁতুল গাছ

এই দীঘীর দৈর্ঘ্য ২২০০ ফিট এবং প্রস্থ ৮৪০ ফিট। মহারাজা বল্লালসেন এই দীঘীটি খনন করিয়াছিলেন বলিয়াই কিংবদন্তী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। Main Cricuit map এর নির্দ্দেশ অনুসারে এই রামপাল দীঘী ২২০০×৮৪০ ফিট। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জেনারেল কানিংহাম এই দীঘীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন:—Half a mile to the south of Ballal-bari there is one of the largest and finest sheets of water that I have seen. It is called Rampal Dighi, and is about 1,800 feet in length from north to south by 800 ft in breadth. The water is deep and clear and the banks are covered with large old trees. The Royal Elephants are said to have been kept at the northern end. The land at the south end is still held by the descendants of the old Rajas. অর্থাৎ বল্লালবাড়ীর আধ মাইল দক্ষিণে আমি বিখ্যাত রামপালের দীঘী দেখিয়াছিলাম। এই দীঘী উত্তর ও দক্ষিণে দৈর্ঘ্য ১,৮০০ ফিট ৮০০ ফিট প্রস্থ। দীঘীর জল নির্ম্মল ও গভীর। দীঘীর তীরে বড় বড় সব পুরাণো গাছ রহিয়াছে। রামপাল দীঘীর উত্তর পাড়ে ছিল রাজাদের হাতীশালা। দক্ষিণ দিকের ভূমি এখনও প্রাচীন রাজাদের বংশধরগণের অধিকারে রহিয়াছে। এই খানে কানিংহাম কোন্ রাজার বংশধরগণের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন তাহা বুঝিতে পারা গেল না।

১৮৬৭ খৃ: অ: জুন মাসে "রামপালের বিবরণে" তদানীন্তন ঢাকা কলেজের ছাত্র প্রসন্নচন্দ্র গুহ রামপাল দীঘীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন :—"বল্লাল বাড়ীর বহির্ব্বাটির দক্ষিণাংশে ন্যূনাধিক দুই সহস্র হস্ত দীর্ঘ ও নয় শত হস্ত পরিসর বিশিষ্ট প্রায় শুষ্ক ভাবাপন্ন বৃহৎ একটী দীর্ঘীকা বর্ত্তমান আছে। উহা রামপালের দীঘী বলিয়া প্রসিদ্ধ। কথিত আছে মহারাজা বল্লালসেন এরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে তাঁহার জননী একাদিক্রমে যতদূর পদব্রজে যাইতে পারিবেন রাজা বল্লাল ততদূর দীর্ঘ এক দীঘীকা খনন করাইয়া দিবেন। তদনুসারে তাঁহার মাতা এক দিবস বৈকালে বাহির-বাটীর দক্ষিণ হইতে ক্রমাগত দক্ষিণাভিমুখে চলিয়া যাইতে লাগিলেন। তিনি অধিকদূর গমন করিলে পর বল্লালসেনের মনে এই ভাবনা উপস্থিত হইল যে তাঁহার মাতা অনেক দূর অতিক্রম করিয়াছেন, আরো গমন করিলে তিনি অত বড় দীর্ঘীকা অত্যল্প সময়ের মধ্যে খনন করিতে পারিবেন না। রাজার ইঙ্গিতানুসারে একজন অনুচর তাঁহার জননীর চরণে অলক্ত-চিহ্নিত করিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি! আপনার চরণে শোণিত চিহ্ন দেখিতে পাইতেছি, এ শোণিত চিহ্ন কিসের? একথা শুনিয়া

রামপাল দীঘির বর্ত্তমান দৃশ্য
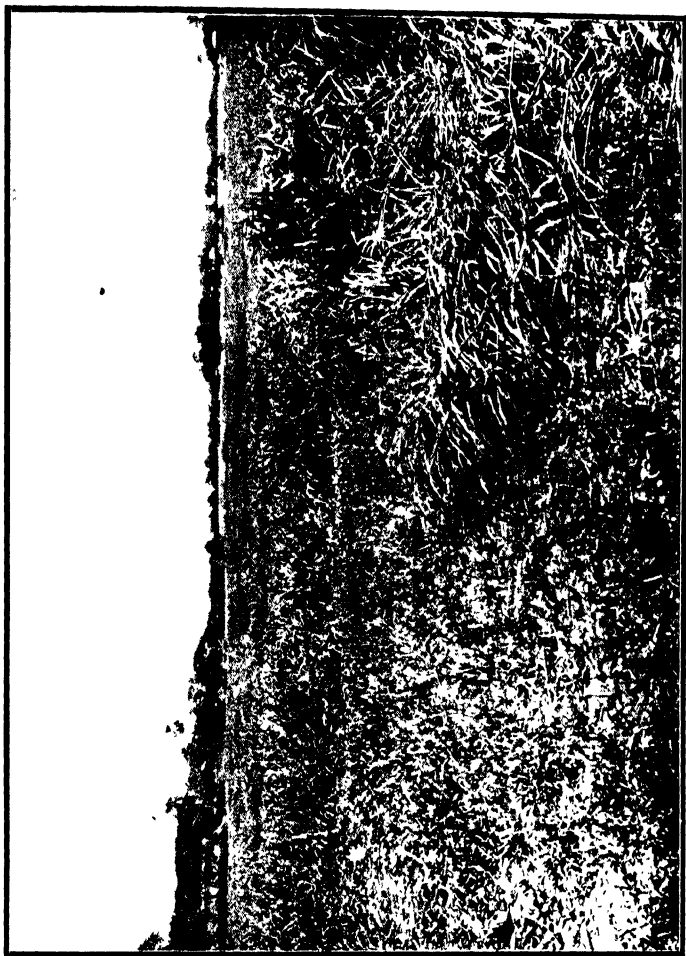
বল্লালজননী চমকিত ভাবে ফিরিয়া চাওয়া মাত্রই, সেই স্থানে এক খোটা গাড়িয়া চিহ্নিত করতঃ দীঘী খনন কার্য্য আরম্ভ হইল।"

এই দীঘীর নাম রামপালের দীঘী কেন হইল তৎসম্বন্ধেও বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন 'অনেক দিন পর্য্যন্ত দীঘীতে জল উঠিয়াছিল না, রাজা বল্লালের পরম স্নেহাস্পদ ভৃত্য রামপাল স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সে দীঘীতে প্রবেশ করে এবং প্রবেশকালীন উহার চতুষ্পার্শ্বে লোক রাখিয়া বলে ইহা জলে পরিপূরিত হইলে তোমরা সকলে উহাকে রামপালের দীঘী বলিয়া আখ্যাত করিও। এতদ্বচন প্রয়োগান্তে, রামপাল প্রোক্ত দীঘীতে প্রবেশ করিবামাত্র উহা কল কল স্বরে জলপূর্ণ হইতে লাগিল এবং রামপাল তখন সকলের নয়ন পথাতীত হইয়া কোথায় গেল, কেহই নিশ্চয় করিতে পারিলেন না। আর সেই সময়ে সকলের মুখ হইতে 'রামপাল! রামপাল' এই শব্দ বিনির্গত হইতে লাগিল। তদবধি উহা রামপালের দীঘী বলিয়া খ্যাত হইয়াছে। *'

"এই দীঘী এমন সুবৃহৎ হইয়াছিল যে, উহার এক পারে দণ্ডায়মান হইয়া অপর পারের প্রতি ভালরূপে দৃষ্টি সঞ্চালন হইত না। আধুনা উক্ত দীঘীর অনেক স্থান ভরাট হওয়াতে উহা পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক সংকীর্ণ হইয়াছে, এই ক্ষণে কৃষকেরা উহার স্থানে স্থানে বোরো ধান রোপণ করিয়া তদুৎপন্ন যথা পরিপালিত ধান্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

"মধ্য যোগে রামপালের দীঘীতে মৎস্যের বড় আড়ম্বর ছিল। তাহা শ্রবণ করিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। সময়ে সময়ে লোকেরা রামপালের দীঘীতে মাছ ধরিবার নিমিত্ত স্ব স্ব অস্ত্র সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইত। সকলে দীঘীতে না নামিয়া তাহার পারে দণ্ডায়মান থাকিত। এবং আপন আপন অস্ত্র গুলি ঊর্দ্ধমুখে ধরিয়া কোলাহল করিত। তাহাতে প্রকাণ্ড মৎস্য সকল লম্ফ প্রদান করিয়া পতিত হইত। উল্লম্ফিত মৎস্যাঘাতে অনেকানেক লোক আহত হইত।"

বর্ত্তমান সময়ে রামপাল দীঘীর তীরে সেই—"প্রাচীনকালীয় বৃহৎ বৃহৎ অশ্বত্থ, পাকুর, তেঁতুল, সিমূল ও খর্জ্জুর প্রভৃতি বৃক্ষ রাজিতে পূর্ণ অবস্থা আর নাই।" এখন এই দীঘীর মধ্যে স্থানে স্থানে জল থাকে, আর অন্যান্য স্থানে কৃষিকার্য্য হইতেছে। ক্রমশঃ চারিদিক ভরাট হইয়া আসিতেছে বলিয়া বোধ হয়

* J. A. S. B 1889

পূর্ব্বের সেই দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের পরিমাপ ও হ্রাস পাইতেছে। অনেকে বল্লালসেনের দীঘী নৃপতি বল্লালসেন খনন করিয়াছিলেন কিনা তদ্বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া থাকেন। স্বর্গত আশুতোষ গুপ্ত বলেন,—"বল্লাল সেনের রাজধানী এবং তাঁহার খনিত দীঘীর নাম রামপাল হইবে কেন? ইহা কি আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় না? আমার মনে হয় বল্লালসেনের পর পাল বংশীয় কোন নৃপতি রামপাল রাজধানীতে বাস করিবার সময় এই দীঘী খনন করেন এবং পরে উহা বল্লালসেনের নামের সহিত জড়িত হইয়াছে। কেননা বুড়ীগঙ্গার উত্তরাংশে যে এক সময়ে পালরাজারা রাজত্ব করিতেন এবং তাঁহারা সেনরাজাদের পূর্ব্বেও পরে ও পূর্ব্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পাল-রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন বলিয়া হিন্দু জনগণ তাঁহাদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে ও যেন দ্বিধা বোধ করিতেন, তাহারই ফলে ব্রাহ্মণদের প্রতি কৃপাবান্ হইয়া বৌদ্ধ-নৃপতিদের কীর্ত্তি ও সেনরাজাদের উপর অর্পিত হইয়াছে। কেননা দীঘী খনন করা পালরাজাদের একটা বিশেষত্ব ছিল। দিনাজপুরের মহীপাল দীঘী আজও বিদ্যমান থাকিয়া আমাদের কথার সমর্থন করিতেছে। বোধ হয় বাঙ্গলাদেশে মহীপাল দীঘীই বৃহত্তর দীঘী। এজন্য আমি মনে করি পালরাজাদেরই কোন নৃপতি এই সহরের নাম ও দীঘীর নাম রামপাল রাখিয়াছেন।"

রামপালের দীঘী কে খনন করিল?

আমরা গুপ্ত মহাশয়ের এই ভ্রান্ত মত গ্রহণ করিতে অক্ষম। দীঘী খনন করা কেবল যে পাল রাজাদেরই একটা বিশেষত্ব ছিল তাহা নহে সেকালের হিন্দু নৃপতি মাত্রেই দীঘী খনন একটা পুণ্য কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। বল্লালসেন-খনিত গৌড়ের "সাগরদীঘী" যিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনিই জানেন যে মহীপাল দীঘী এবং সাগর দীঘী আয়তনে প্রায় একই প্রকার। আমি নিজে বল্লালসেনের খনিত বিশাল সাগর-দীঘী দেখিয়াছি। ঐ দীঘীর চারি তীরে ছয়টি ঘাট ছিল। এখনও তাহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।—"গৌড়ের ইতিহাস" প্রণেতা বলেন:—"সম্ভবতঃ বল্লালসেনই একডালা দুর্গ নির্ম্মাণ করেন। দুর্গ নির্ম্মাণার্থ যে প্রভূত মৃত্তিকার প্রয়োজন হইয়াছিল, বোধ হয় তাহা সাগরদীঘী খননের দ্বারা পাওয়া গিয়াছিল। বল্লালসেন বাগবাড়ীর মধ্যে দুটী পুষ্করিণী খনন করান। তাহার নাম টাম্না দীঘী ও ভাতশালা দীঘী। টাম্না দীঘী অতি বৃহৎ। উহাতে চারিটি ঘাট ছিল। উত্তরে একটি ও দক্ষিণে একটি পশ্চিম দিকে দুটী। ঘাটের ইট লোকে ভাঙ্গিয়া লইয়া গিয়াছে। ঐ ঘাটগুলি রঙ্গিন ইটে বাঁধান হইয়াছিল। মুসলমানদের আগমনের পূর্ব্বেও যে হিন্দুরা রঙ্গিন ইটের ব্যবহার করিতেন, তাহা জানা যাইতেছে।" গৌড়ের বড় সাগর দীঘী একটি

প্রকাণ্ড হ্রদ, ইহা ১,৬০০ × ৮০০ গজ দীর্ঘ ও প্রশস্ত। নবদ্বীপের উত্তরে বল্লালদীঘী নামে একটি দীঘী আছে। প্রবাদ যে উহা বল্লালসেন খনন করাইয়াছিলেন। আবার কাহারও কাহারও মতে উহা লক্ষ্মণসেনের কীর্ত্তি। তিনি পিতৃনাম স্মরণীয় করিবার জন্য উহা খনন করাইয়াছিলেন। দীঘী খনন করাইবার হেতু সম্বন্ধেও অনেকে এইরূপ বলেন যে বৃদ্ধ বয়সে গঙ্গাবাসের জন্য নবদ্বীপের উত্তরে একটি রাজবাড়ী করেন যথা—

মুক্তি হেতু বল্লাল আসিল গঙ্গাস্নান,
জহ্নুনগরোত্তরে করে সে বাসস্থান।"

কাজেই বল্লালসেন বা সেনরাজারা দীঘী খনন করিতেন তৎসম্বন্ধে সন্দেহ করিবার মত কোন কারণই বিদ্যমান নাই—অতএব একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে এই দীঘী সম্ভবতঃ বল্লালসেনই খনন করিয়াছিলেন। এস্থানের নাম রামপাল কেন হইল, সে বিষয়ে আমরা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। আমি বিশেষভাবে রামপাল পর্য্যবেক্ষণ করিয়া যেরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছি তাহাতে আমারও বিশ্বাস "সেনবংশের সময় শ্রীবিক্রমপুর নগরের সকলের চেয়ে বেশী বিস্তৃতি হইয়াছিল তাহা দৈর্ঘ্যে পাঁচ মাইল ও প্রস্থে পাঁচ মাইল এই বিপুল আয়তন ধারণ করিয়াছিল।" এইজন্যই আমরা সম্পূর্ণ ভাবে বিশ্বাস করি যে এই দীঘী বল্লালসেনেরই খনিত নতুবা 'বল্লাল কাটায় দীঘী' এই জনপ্রবাদ এতদিন বাঁচিয়া থাকিতে পারিত না।*

রামপাল দীঘীর ন্যায় বৃহৎ না হইলেও তাহার তুল্য বা তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্রাকারের আরও কয়েকটি বিক্রমপুরের দীঘির পরিচয় আমরা এখানে দিতেছি। এই সব দীঘী কে বা কাহারা খনন করিলেন তাহারও অনুসন্ধান আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তবে আমাদের বিশ্বাস যে বিক্রমপুরের বিভিন্ন রাজবংশীয়েরাই এই সব দীঘী খনন করাইয়াছিলেন।

রামপাল দীঘী—২২০০ ফিট × ৮৪০ ফিট।

ধামারণ দীঘী—২২০০ ফিট × ৮০০ ফিট।

[ধামারণ—ধর্ম্মারণ্য শব্দের অপভ্রংশ। ধামারণের দীঘীর আয়তন ঠিক রামপাল

* J. R. A. S. B. 1889 The Antiquities of Rampal, by A. T. Gupta. গৌড়ের ইতিহাস ১০২ পৃষ্ঠা। শ্রীবিক্রমপুর ও তাহার উপকণ্ঠ-শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী। প্রবাসী আষাঢ়, ১৩২২ ১৫শ ভাগ, ১ম ভাগ ৩য় সংখ্যা।

দীঘীর মত—প্রস্থে মাত্র ৪০ ফিট কম। এই দীঘীর তীরে শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণের বসতি রহিয়াছে।

নৈয়ের পুকুর—২০০০ ফিট × ৭০০ ফিট।
মামাসার দীঘী—১৪০০ ফিট × ৬০০ ফিট।
ধামাদা দীঘী—১১০০ ফিট × ৫০০ ফিট।
সুখবাসপুর—৯০০ ফিট × ৫০০ ফিট।
শানের দীঘী—৭০০ ফিট × ৭০০ ফিট।
দেওর-চুড়াইন দীঘী [রামপাল দীঘীর ঠিক্ পশ্চিমে] ৮০০ ফিট × ৮০০ ফিট।
সুয়াপাড়া দীঘী—৭০০ ফিট × ৫০০ ফিট।
টঙ্গীবাড়ী দীঘী—৭০০ ফিট × ৫০০ ফিট।
মগা দীঘী [চারপাড়া] ৭০০ ফিট × ৭০০ ফিট।

রামপালের উপকণ্ঠে এবং আশেপাশেই এইরূপ কয়েকটি বৃহৎ দীঘী অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক ছোট বড় দীঘী আছে সে সমুদয়ের উল্লেখ করা অনাবশ্যক।

রামপালের পশ্চিম ভাগের একটি দীঘী হরিশ্চন্দ্রের দীঘী বলিয়া প্রসিদ্ধ।

হরিশপালের দীঘী

রঘুরামপুরের অদূরেই হরিশ্চন্দ্রের ভিটার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। ঐ ভিটার দক্ষিণ পার্শ্বে প্রায় দুই শত হস্ত দীর্ঘ এবং ৮০।৯০ হস্ত প্রশস্ত দীঘীটী বিরাজিত আছে। "উহা তারা ও বড় বড জঙ্গল সংকুত ভীটাবলীতে পরিপূর্ণ। উক্ত দীঘীব ১০।১২ হস্ত পরিমিত স্থানের ভীট সকল মাঘি পূর্ণিমা দিবস জলমগ্ন হইয়া পড়ে। ক্রমে ভাসিতে থাকে। এই আশ্চর্য্য অনেকে স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন কিন্তু কেহই উহার কারণ উদ্ভাবিত করিতে পারেন নাই।"

এই দীঘীর সম্পর্কিত আশ্চর্য্য ব্যাপার আমি স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। উহার উপর দিয়া মানুষ এবং গোরু বাছুর অবলীলাক্রমে দৌড়াদৌড়ি করিয়াছে দেখিয়াছি, কিন্তু নির্দ্ধারিত সময়ে ধীরে ধীরে ভিট ইত্যাদি কি জানি কোন্ নৈসর্গিক কারণে নিম্নে নাবিয়া গিয়াছে এবং জল বৃদ্ধি পাইয়াছে। আমি এবিষয়ে বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশ-চন্দ্র বসুকে ইহার কারণ কি তৎ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছিলাম, তদুত্তরে তিনি বলিয়াছিলেন যে সম্ভবতঃ এই দীঘীর তলভাগের সহিত কোনও উৎসের যোগ আছে, তাই বিশেষ কোন সময়ে এইরূপ হইয়া থাকে। আশ্চর্য্যের কথা এই যে আজ পর্য্যন্তও এ বিষয়ে কেহ কোনও কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারেন নাই।

রাজা হরিশ্চন্দ্রের দীঘি—রঘুরামপুর

[মাঘী পূর্ণিমায় সমস্ত ডুবিয়া যায় পরে ক্রমে ক্রমে ভাসিয়া উঠে—বৎসরের মধ্যে কেবল ঐ দিন ঐরূপ ভাবে ডুবিয়া যায়।]

এই দীঘি সম্বন্ধে নানারূপ জনপ্রবাদ প্রচলিত। এই রাজা হরিশ্চন্দ্র কে ছিলেন? 'সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস' প্রণেতা স্বর্গত স্বরূপচন্দ্র রায় মহাশয়ের এবং এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় রামপাল শীর্ষক প্রবন্ধ-লেখক স্বর্গত আশুতোষ গুপ্তের মতে এই হরিশ্চন্দ্র—বৌদ্ধ নৃপতি হরিশ পাল। এই প্রসঙ্গে ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় বলেন:—"বর্ম্মবংশের বিষয়ে আমরা প্রধান এই একটি বিষয় অবগত আছি যে তাঁহারা বৈষ্ণব ছিলেন। হরিবর্ম্মদেব স্বীয় রাজধানী হইতে মাতার পদব্রজে কাশী যাইবার জন্য এক রাস্তা প্রস্তুত করিয়াছিলেন। * * পাইকপাড়া আবদুল্লাপুরের সীমায় অবস্থিত বৃহৎ ইষ্টক-নির্ম্মিত পোলটির উপর দিয়া যে দীর্ঘ রাস্তা সোজা পশ্চিম দিকে চলিয়া গিয়াছে তাহাই হরিবর্ম্মের নির্ম্মিত রাস্তা।"

এখন দেখা আবশ্যক যে রামপাল ও তাহার উপকণ্ঠের কোন্ স্থান হইতে বৈষ্ণব-কীর্ত্তি-চিহ্ন বাহির হইয়াছে, হরি বর্ম্মের রাস্তা কোন্ স্থান হইতে বহির্গত হইয়াছে, এবং বর্ম্মবংশের স্মৃতি-বিজড়িত আর অন্য কোন কীর্ত্তি রামপালের কোন অংশে আছে কিনা।

সুয়াসপুর বা সুখবাসপুর

"রামপালের দক্ষিণে সুখবাসপুর গ্রামের আশে পাশে বহু বৈষ্ণব-কীর্ত্তি-চিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে। সুখবাসপুর গ্রামে বহুকাল হইতে জনশ্রুতি চলিয়া আসিতেছে যে এখানে রাজার বাটি অবস্থিত ছিল। সুখবাসপুর মনসাবাড়ীতে সুখবাসপুরের প্রকাণ্ড দীঘি হইতে উত্থিত এক বিপুলায়তন বিষ্ণুমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। আর একখানা প্রায় ছয় ফুট উচ্চ অতি সুন্দর কারুকার্য্য খচিত বামন অবতারের মূর্ত্তি এই গ্রাম হইতে আবদুল্লাপুরের বৈষ্ণবদের আখড়ায় লইয়া গিয়া রাখা হইয়াছে। তাহার নীচে প্রাচীন বঙ্গাক্ষরে "নমো বা—" পর্য্যন্ত লিখিত আছে। লিপিটি বোধ হয় 'নমো বামনায়' বলিয়া আরব্ধ করা হইয়াছিল—কিন্তু কোন অজ্ঞাত কারণে তাহা সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই।* এই দুইটি

* (১) Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Musenm, x.

(২) There is a comparatively small tank in the south-west part of Rampal, which deserves a passing notice. It is called Raja Haris Chanda'rs dighi. It is overgrown with trees and shrubs which are flooded over with water for a week once a year of the time of the full moon in the month of Magh. Before and after this period the tank is dry. * * * the tank is said to have been excavated by Raja Haris Chandra, probably one of the Kings of the Pal dynasty. P. 22, J. A. S. B., 1889. সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস-৪১ পৃষ্ঠা। 'বিক্রমপুর' পত্রিকা শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, ১৩২০ সাল, প্রথম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা। মিরকাদিমের খাল—৭৭—৮৯ পৃষ্ঠা। শ্রীনলিনীকান্ত ভট্টশালী।

প্রকাণ্ড মূর্ত্তি দেখিয়াই মনে হয় যে এরূপ বিপুলায়তন মূর্ত্তি কোন প্রতাপশালী রাজা ভিন্ন অন্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হওয়া অসম্ভব।

"সকলের চেয়ে বড় প্রমাণ, সুখবাসপুর গ্রামের পশ্চিমপ্রান্তস্থিত হরিশ্চন্দ্রের দীঘি। আমার মনে হয় এই হরিশ্চন্দ্র হরিবর্ম্ম ব্যতীত আর কেহই নহেন। নামসাদৃশ্য ভিন্ন অবশ্য অন্য কোন বিশেষ প্রমাণ নাই। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত হরিবর্ম্মের রাস্তাও যে হরিশ্চন্দ্রের দীঘির উত্তর পাড় ঘেষিয়া চলিয়া গিয়াছে তাহাতে মনে হয় যে সুখবাসপুরেই বর্ম্মবংশের রাজধানী ছিল। সুখবাসপুরের উত্তর প্রান্তে দেবসার গ্রামে এক প্রকাণ্ড দীঘি এবং তাহার পাড়ে এক উচ্চ দেউল আছে। দেবসার গ্রাম রামপালের বিখ্যাত দীঘির পশ্চিম পাড়ে অবস্থিত। আমার মনে হয় এই দেবসার দেউলে বর্ম্মরাজাদের অনেক কীর্ত্তি লুকাইয়া আছে। সুখবাসপুরের পূর্ব্বে একটি প্রকাণ্ড মাঠ আছে—তাহার নামটি বিশেষ প্রণিধান-যোগ্য। তাহার নাম সরস্বতীর মাঠ। বিষ্ণুপত্নী সরস্বতী দেবীর সম্মানে কোন্ অতীত কালে বর্ম্মরাজাদের সময় হয়ত এখানে সারস্বত-সম্মিলনের ব্যবস্থা ছিল, সেই প্রাচীন গৌরবযুক্ত নামটি এখনও রহিয়া গিয়াছে। সরস্বতীর মাঠের পূর্ব্বপ্রান্তে কেওয়ার গ্রাম। কেওয়ার গ্রাম বর্ম্মদের সময়ে বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। কেওয়ার দেউল হইতে একখানা বিষ্ণুমূর্ত্তি বাহির হইয়াছে—তাহার পাদপীঠে চারি লাইন লিপি আছে। তাহার যতদূর পাঠ উদ্ধার করিতে পারিয়াছি তাহা নিম্নে দিলাম।

হরিবর্ম্ম হরিশ্চন্দ্র কি?

লিপি-পরিচয়

১। অয়মাসুষমেয়েন সযোগাঙ্গভুবা বিভুঃ [।]

২। বঙ্গোকেন কৃতোবিষ্ণু-বির্ষ্ণুসালোক্য-কাম্যয়া [॥]

৩। বরেন্দ্রীতটকীয়েন শাণ্ডিল্যকুলজন্মনা পিতাম- [।]

৪। হস্য পৌত্রেণ প্রণপ্ত্রা শৌরিশর্ম্মণঃ॥

লিপিটির ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত বলিয়া বোধ হয়। নীচের দুই লাইনের শেষ অত্যন্ত ক্ষয় পাইয়া গিয়াছে বলিয়া নিঃসংশয় পাঠ দিতে পারিলাম না। প্রথম দুই লাইন বেশ পরিষ্কার ভাবে খোদিত থাকিলেও তাহারও তিন চারিটি অক্ষরের পাঠ অশুদ্ধি হেতু সংশয়যুক্ত। লিপিটির অর্থ এই দাঁড়ায় যে গৌরীশর্ম্মার পুতি, পিতামহশর্ম্মার নাতি, কুলশর্ম্মার ছেলে শাণ্ডিল্য গোত্রজ বরেন্দ্রীহট্ট নিবাসী বঙ্গোকশর্ম্মা ৯১০ শকে **কহোরি** অর্থাৎ বর্ত্তমান কেওয়ার গ্রামে সালোক্য কামনায় বিষ্ণু প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। শকাব্দের ৯১০ খৃষ্টাব্দের ৯৮৮র সমান। সময়টি ঠিক বর্ম্মবংশের অভ্যুত্থানের সময়।"

ভোজবর্ম্মের বেলার লিপি ব্যতীত হরিবর্ম্মদেবেরও একখানি তাম্র শাসনের কথা মূল গ্রন্থে ২৩৯ পৃষ্ঠায় আলোচনা করিয়াছি। এই শাসনলিপিখানা বিক্রমপুরের রাজধানী হইতেই প্রদত্ত হইয়াছিল। এই শাসনের একখানি অস্পষ্ট চিত্র নগেন্দ্রনাথ বসু প্রণীত বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের মুখপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে এবং তিনি এই হরিবর্ম্মদেবের তাম্রশাসনের ব্যাখ্যা দিয়াছেন বঙ্গের জাতীয় ইতিহাসের ২১৫—২১৭ পৃষ্ঠায়। কেহ কেহ অনুমান করেন যে এই হরিবর্ম্মদেব মূল বর্ম্মবংশেরই কোন শাখা বা স্বগোত্র-সম্ভূত হইতে পারেন। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় [Palas of Bengal P.P.97-98] নামক গ্রন্থের ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায়ও এই তাম্রশাসনখানির বিষয় উল্লিখিত আছে। তাহাতে এই তাম্রশাসনখানির অতি অল্প অংশ মাত্র উদ্ধৃত হইয়াছে। "এই তাম্রশাসনখানির ২৭শ পঙ্‌ক্তি·········ইহ খলু **বিক্রমপুর-সমাবাসিত** শ্রীমজ্জয়স্কন্ধাবারাৎ মহারাজাধিরাজ জ্যোতিবর্ম্মপাদানুধ্যাত পরমবৈষ্ণব পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ শ্রীহরি বর্ম্মদেবঃ কুশলী।

হরি বর্ম্মের তাম্র শাসন

বর্ত্তমান সময়ে এই তাম্রশাসনখানির সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় তাঁহার Inscriptions of Bengal Vol IIIএর Appendices ও তে এই শাসনখানির উল্লেখ করিতে যাইয়া মন্তব্য করিয়াছেন: "I am afraid is too conjectural to be utilized for historical purposes".

এই হরিবর্ম্মের সম্বন্ধেও অনুসন্ধান সাপেক্ষ। নগেন্দ্রবাবুর মতে "শাসনখানি খৃষ্টিয় ১১শ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে উৎকীর্ণ। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫২ অঙ্গুলি ও প্রস্থে ১৩১ অঙ্গুলি ছিল। তাম্রশাসনের উর্দ্ধভাগে রাজা হরিবর্ম্মদেবের লাঞ্ছন (emblem) ছিল।"

ডক্টর ভট্টশালী মহাশয়ের এই অনুমান কতদূর সত্য তাহা এখনও প্রকৃতভাবে বলা কঠিন। হরিশ্চন্দ্র ও হরিবর্ম্মা একই ব্যক্তি কিনা তাহা নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা যাইতে পারে না। এবিষয়টি নূতন আবিষ্কার-সাপেক্ষ। আবার জনপ্রবাদকে একেবারে অগ্রাহ্য করাও যাইতে পারে না। আমরা যতদিন পর্য্যন্ত সঠিক ভাবে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে না পারিব, ততদিন পর্য্যন্ত এসমুদয় কিংবদন্তী ও অনুমানকে একেবারে উপেক্ষা করিতে কিংবা গ্রহণ করিতে পারি না।

গজারী বৃক্ষ—রামপালের গজারী বৃক্ষটি এক সময়ে ঐস্থানের একটি প্রধান বিশেষত্ব ছিল। দুঃখের বিষয় ঐ গাছটি মরিয়া গিয়াছে। আমরা প্রায় চল্লিশ বৎসর আগে যখন ঐ গাছটিকে দেখিয়াছিলাম, তখন উহার উচ্চতা প্রায় ষাট হাত ছিল। দেখিলেই বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হইত। বৃক্ষটির বিশাল দেহ ছিল না। ইহার গোড়ার বেড় ছিল ৪।৪॥ হাত মাত্র। প্রায় ৪।৫ হাত উর্দ্ধে গাছটি

গজারী বৃক্ষ

দুইটি মূল শাখায় বিভক্ত ছিল। ঢাকা জেলায় এক তাওয়ালের গজারি বন ব্যতীত আর কোথাও শাল বা গজারী গাছ দেখা যায় না। এই একটি মাত্র গজারী গাছ কি ভাবে কেমন করিয়া এই স্থানে জন্মিয়াছিল তাহা আলোচ্য বটে। এক সময়ে নানাবিধ শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত ও হরিৎপত্ররাজি সুশোভিত হইয়া ইহা অতি সুন্দর দেখাইত। নিকটবর্ত্তী স্ত্রী ও পুরুষগণ বিশেষ মৃতবৎসা স্ত্রীগণ ইহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলে উষ্ণতা অনুভব করিতেন বলিয়া কথিত হইত।

আমি যে সময়ে গাছটিকে প্রথম দেখি তখন উহার তলদেশে স্তূপীকৃত ইষ্টকরাশি দেখিয়াছিলাম। বংশপরম্পরা-বিশ্রুত জনপ্রবাদ হইতে ইহার প্রাচীনত্ব প্রমাণিত হইয়া আসিতেছে। 'পল্লীবিজ্ঞানে' লিখিত আছে, "বল্লাল বাড়ীর দক্ষিণ পার্শ্বে বৃহৎ এক স্থান বিদ্যমান আছে উহা বল্লাল সেনের বহির্ব্বাটি বলিয়া অনেকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। উল্লিখিত বাহির বাড়ীর দক্ষিণ পশ্চিমাংশে বৃহৎ একটি গজারি তরু অবস্থিত আছে, লোকে তাহা বল্লালের হস্তি-বন্ধনের স্তম্ভ বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে। * * * অধুনা কতিপয় বৎসর হইতে চৈত্রমাসে অষ্টমী দিবস প্রাগ্ বর্ণিত দীর্ঘিকার উত্তর পাড় সুপ্রসিদ্ধ গজারি বৃক্ষতলে একটি ক্ষুদ্রতর মেলা মিলিয়া থাকে। ঐ দিবস মুন্সীরগঞ্জের পূর্ব্বদিকস্থ যোগিনীঘাটে অষ্টমী স্নান করণার্থ অসংখ্য যাত্রী সমাগত হয়। স্নান ও তৎসঙ্গে আপন আপন ধর্ম্ম কর্ম্ম সমাপনান্তে অনেক যাত্রিক বল্লাল রাজার কীর্ত্তিকদম্ব সন্দর্শন জন্য রামপালে উপস্থিত হয়। সে উপলক্ষ্যে তথায় নানাবিধ দ্রব্যাদি বিক্রীত হইয়া থাকে।"

গজারী বৃক্ষতলের মেলা

এই গজারী বৃক্ষের সম্বন্ধে বিক্রমপুরে বিবিধ কিংবদন্তী প্রচলিত হইয়া আসিতেছে। এই মৃত তরু ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদবারি-সিঞ্চনে সঞ্জীবিত হইয়াছিল বলিয়া জনপ্রবাদ প্রচলিত। এবং তাহার সহিত আদিশূর নামক একজন নৃপতির নাম বিজড়িত রহিয়াছে। আমরা প্রয়োজন বোধে এখানে সংক্ষেপে সে সমুদয় উপাখ্যান সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিব।

গজারী বৃক্ষ সম্বন্ধে বিবিধ কিংবদন্তী

বিক্রমপুরে এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত যে আদিশূর নামে এক নৃপতি ছিলেন, তিনি অতি সৎলোক, সদ্বিচারক, তত্ত্ববেত্তা ও মহাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রতাপে সমুদয় শত্রুকুল নির্ম্মূল প্রায় হইয়াছিল। তিনি স্বয়ং বৌদ্ধদিগকে গৌড়-রাজ্য হইতে দূরীকৃত করেন। এই মহাত্মা আদিশূরই বিক্রমপুরান্তর্গত রামপাল নগরীতে বৃহৎ যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করেন। তাঁহাদের চরণে চর্ম্ম পাদুকা ও সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত ছিল। তাঁহারা এইরূপ বেশে তাম্বুল চর্ব্বণ করিতে করিতে রাজবাড়ীর দ্বারদেশে উপনীত হইয়া দ্বারবানকে রাজার নিকট তাঁহাদের আগমন-

আদিশূর

রামপালের গজারী বৃক্ষ জীবিতাবস্থায়—পঁয়ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে

[লেখক কর্তৃক গৃহীত চিত্র হইতে]

বার্ত্তা বলিবার জন্য বলিলেন। ব্রাহ্মণগণ মনে ভাবিয়াছিলেন যে, রাজা তাঁহাদের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া শীঘ্রই তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিবেন। এই নিমিত্ত তাঁহারা সকলেই মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য জল গণ্ডুষ হস্তে দণ্ডায়মান ছিলেন। কিন্তু মহারাজ আদিশূর, এই সকল বিপ্রেরা যোদ্ধবেশে আগমন করায় বিরক্ত হইয়া তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন না। বিপ্রগণ বুঝিতে পারিলেন হয়ত রাজা তাঁহাদের বেশ ভূষার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই বিরক্ত হইয়াছেন, অতএব তাঁহাকে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব দেখাইবার জন্য করস্থিত আশীর্ব্বাদ বারি নিকটবর্ত্তী মল্লকাষ্ঠে স্থাপিত করিলেন। চির-শুষ্ক মল্লকাষ্ঠ দেখিতে দেখিতে পুনরুজ্জীবিত হইয়া পল্লবিত হইয়া উঠিল।" এই অমর গজারী বৃক্ষ এক সময় বিক্রমপুরবাসী নরনারীর শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিত। ইহার তীরে মেলা বসিত, গাছটির গা মহিলারা সিন্দুর দ্বারা সুরঞ্জিত করিয়া দিতেন।

কয়েক বৎসর হইল গজারি গাছটির মৃত্যু হইয়াছে। আমি "বিক্রমপুরের ইতিহাসের" প্রথম সংস্করণে আমার নিজের হাতে তোলা উহার আলোকচিত্র প্রকাশ করিয়াছিলাম। আমার পূর্ব্বে কেহ গজারী বৃক্ষের কোন চিত্র প্রকাশ করেন নাই।

আদিশূর রাজা কে ছিলেন ?

এই স্থানে প্রসঙ্গক্রমে আদিশূর রাজা সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিতেছি। 'আদিশূর' নামে কোন রাজা ছিলেন কিনা, এবং কোথায় কোন্ সময়ে তিনি রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, এই প্রসঙ্গ লইয়া আমাদের দেশের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকগণ অনেকে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। আদিশূর নৃপতি সম্বন্ধে বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করিতে গেলে একখানি স্বতন্ত্র গ্রন্থ লিখিতে হয়। তবে বর্ত্তমান ঐতিহাসিকেরা সকলে একবাক্যে এই কথা স্বীকার করেন যে পশ্চিম বঙ্গের শূর রাজ্য বা দক্ষিণ বাংলায় শূরবংশ স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন। শূর বংশের বিখ্যাত রাজা আদিশূর সম্বন্ধে যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত আছে, তাহার ভিতর হইতে ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কার করা বড় কঠিন। বিখ্যাত ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী ও ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ সেন বলেন—"পশ্চিম বঙ্গের শূর রাজ্য এবং পূর্ব্ববঙ্গের চন্দ্রবংশ শাসিত রাজ্যের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

---

* ভারতবর্ষের ইতিহাস—ডক্টর শ্রীসুরেন্দ্রনাথ সেন ও ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী, ৯৩ পৃষ্ঠা, আদিশূর সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃত ভাবে জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা নিম্নলিখিত গ্রন্থাবলি আলোচনা করিবেন—ঢাকার ইতিহাস ২য় খণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, শূরবংশ, ৯১—১৩৮ পৃষ্ঠা। বাঙ্গালার ইতিহাস—রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথমখণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ১০৩—১১৭। গৌড়ের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড, পঞ্চম অধ্যায়, ৬৯—৮৪ পৃষ্ঠা। গৌড়রাজমালা, আদিশূর, ৫৬—৫৯ পৃষ্ঠা। গৌড়ে ব্রাহ্মণ, মহিমাচন্দ্র মজুমদার প্রণীত, ১৭—৮০ পৃষ্ঠা ও বিবিধ পুস্তকাবলী।

কিন্তু শূর-বংশের সুপ্রসিদ্ধ রাজা আদিশূর সম্পর্কে যে সকল কাহিনী প্রচলিত আছে, সমসাময়িক কোনও লেখায় তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। তবে একথা নিঃসন্দেহ-রূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে শূরবংশ নামে একটি প্রতাপশালী স্বাধীন রাজবংশ দক্ষিণ পশ্চিম বাংলায় রাজত্ব করিতেন। এই শূর বংশের কন্যা বিলাসদেবী বল্লাল সেনের জননী ছিলেন। কিন্তু তিনি শূর বংশীয় কোন্ নৃপতির কন্যা ছিলেন, সে বিষয়ে আমরা সীতা-হাটিতে প্রাপ্ত বল্লালসেনের তাম্রশাসন হইতে কিছুই জানিতে পারি না। আদি—প্রথম এই দিক্ দিয়াও হয়ত অজ্ঞাতনামা শূর নৃপতিকে "আদিশূর" নামে অভিহিত করিয়া থাকিবেন।

শূরবংশ

'গৌড়ের ইতিহাস' প্রণেতা বলেন "শূর বংশীয়দের সময় হইতে গৌড়রাজ্যের বিশ্বাসযোগ্য কিছু কিছু ঐতিহাসিকতথ্য অবগত হওয়া যায়। ধ্রবানন্দ মিশ্রের গ্রন্থে লিখিত আছে, শূরবংশীয়গণ কাশ্মীরের নিকটবর্ত্তী দরদ দেশ (বর্ত্তমান দর্দিস্থান) হইতে গৌড়ে আগমন করেন: যথা

শূরবংশীয়েরা কোথা হইতে আসিলেন?

আগমৎ ভারতং বর্ষং দারদাৎ স রবিপ্রভঃ।
জিত্বা চ বৌদ্ধরাজানং তথা গৌড়াধিপং বলান্।"

আদিশূর এই বংশীয় সর্ব্বপ্রধান নরপতি। কাশ্মীর রাজ অবন্তীবর্ম্মার শূর নামক মন্ত্রী ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ শূর-বংশের স্থাপনকর্ত্তা। * * আইন-ই-আকবরীতে আদিত্য শূরবংশীয় রাজগণের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। আবুলফজল আদিশূরকেই আদিত্যশূর বলিয়াছেন কি না বলা যায় না। কেহ কেহ বলেন—আদিত্যশূর কর্ণসুবর্ণের নিকটস্থ সিংহেশ্বরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। * * কুলজী গ্রন্থে লিখিত আছে, ব্রাহ্মণগণ সুরসরিদ্-বিধৌত গৌড়নগরে আগমন করেন ;—কিন্তু তাহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। পাণ্ডুয়ার হোমদীঘিও ধূমদীঘির তীরে তাঁহারা যজ্ঞ করিয়াছিলেন, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। ঘটক-কারিকা মতে পঞ্চ ব্রাহ্মণ বিক্রমপুরে আসিয়াছিলেন। আদিশূর পৌণ্ড্রনগরে রাজত্ব করিতেন। বিক্রমপুরের কোন স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল না। যে সময়ে সেনরাজগণ গৌড় হইতে তাড়িত হইয়া বিক্রমপুরে গমন করেন, সেই সময়ের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন ঘটক-কারিকা নাই। পরবর্ত্তী কুলাচার্য্যগণ সেন রাজগণের বিক্রমপুরের রাজধানীকে বাড়াইবার জন্য তথায় সেনরাজগণের রাজধানী কল্পনা করিয়া, পঞ্চ ব্রাহ্মণকে সেই স্থানে আনিয়া প্রথম উপস্থিত করিয়াছেন ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য এ সব বিষয়ে বিতর্ক একান্ত নিষ্প্রয়োজন। কেননা আদিশূরের অস্তিত্ব

---

* গৌড়ের ইতিহাস, ৬৯-৭০ পৃষ্ঠা।

সম্বন্ধেই যখন আমরা সন্দিহান, তিনি ঐতিহাসিক ব্যক্তি কি না তাহাই যখন নিরাকরণ হয় নাই, তখন কিংবদন্তী লইয়া বিতর্ক চলিতে পারে না।

ঐতিহাসিক ভিন্‌সেণ্ট স্মিথ লিখিয়াছেন—হর্ষ তাঁহার প্রাধান্যকালে সমুদয় বঙ্গদেশ, এমন কি কামরূপ বা আসাম, এবং সম্ভবতঃ পশ্চিম বঙ্গ ও মধ্য বঙ্গের উপর ও তাঁহার প্রভুত্ব বিদ্যমান ছিল। হর্ষের মৃত্যুর পর স্থানীয় নৃপতিরা যে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছিলেন এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ করিবার কারণ দেখা যায় না। বাঙ্গালা দেশে বংশপরম্পরাগত এইরূপ জনপ্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে বাঙ্গালা দেশের বিখ্যাত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থবংশীয়দের পূর্ব্ব পুরুষেরা আদিশূর নামক একজন নৃপতি কর্ত্তৃক হিন্দু ধর্ম্মের ও সমাজের সংস্কারের জন্য আনীত হন। কেননা সে সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবে বাঙ্গালাদেশে হিন্দুধর্ম্মের প্রাধান্য বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল। কিন্তু এই নৃপতি আদিশূর সম্পর্কে কোন ও প্রামাণিক বিবরণ আবিষ্কৃত হয় নাই। তবে মনে হয় যে যে আদিশূর নামে একজন নৃপতি সম্ভবতঃ গৌড় ও তাহার কাছাকাছি স্থানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ৭০০ খৃষ্টাব্দে কিংবা তাহারও কিছু পূর্ব্বে রাজত্ব করেন। * * হরিমিশ্র এবং এড়ুমিশ্রের কারিকা অনুযায়ী এইরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে—আদিশূর সম্ভবতঃ পালরাজাদের অব্যবহিত পূর্ব্বে রাজত্ব করিতেন। পঞ্চ ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ পঞ্চকের আগমনের অল্প পরেই গৌড় পালরাজাদের করতলগত হয়। কাজেই আদিশূরকে পালরাজগণের পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়।*

'গৌড়রাজ মালায়' রমাপ্রসাদ চন্দ মহাশয় বলেন :—"কুলপঞ্জিকা বা ঐ শ্রেণীর গ্রন্থ ভিন্ন, আর কোথায়ও আদিশূরের পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন যে সকল কুলপঞ্জিকা

কুলপঞ্জিকা ও আদিশূর

দেখা যায়, তাহা আদিশূরের আনুমানিক আবির্ভাবের কালের অনেক পরে রচিত। পরবর্ত্তীকালের রচনা হইতে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহ করিতে হইলে, বিশেষ সাবধানতা আবশ্যক। যে পরবর্ত্তীকালের গ্রন্থে তুল্যকালীন

---

* Up to date no authentic account of Adisura has been obtained. The oldest writers on Brahmanical genealogy whose writings have come down to us—I refer particularly to Hari Misra and Eru Misra—place Adisura shortly before the Palas : and they state that shortly after the arrival of the five Brahmans from Kanuj, the kingdom of Gaur became subject to the Palas (U. C. Batavyal, in J. A. S. B. Part. I Vol. lviii (1894, p. 41).

Ranasura of Souhern Radha (the Burdwan Division) seems to have belonged to Sura dynasty of Bengal who are said to have brought the five Brahmanas from Kanauj. That they were disposed of the greater part of their dominions by the Palas is also asserted by the Bengal genealogists. *Ranasura* was one of the chiefs who helped Mahipal to repel the invasion of Rajendra Chola, king of Kanchi, about A. D. 1023. (H. P. Sastri, Mem. A. S. B. Vol. iii (1910, P. 10). The site of the palace of Adisura is pointed out at the northern end of the ruins of Gaur. (E. India, Vol. III., 72).

গ্রন্থোক্ত প্রমাণ উদ্ধৃত থাকে, তাহাই কেবল ইতিহাসের উপাদান ভাণ্ডাররূপে গৃহীত হইতে পারে। কুলগ্রন্থ নিচয়ে আদিশূর রাজার বিবরণ যে সেরূপ প্রমাণ অবলম্বনে সঙ্কলিত, তাহা এযাবত কেহই প্রতিপাদন করিতে পারেন নাই। কারণ, আদিশূরের সময়ের কোন চিহ্নই এখনও পাওয়া যায় নাই। অনেকে বলিতে পারেন, কুলপঞ্জিকার আদিশূর রাজার বিবরণ প্রত্যক্ষ প্রমাণমূলক না হইলেও, জনশ্রুতিমূলক, এবং জনশ্রুতির যদি ইতিহাসে স্থান লাভ করিবার অধিকার থাকে, তবে আদিশূর রাজার বিবরণ ইতিহাসে স্থান পাইবে না কেন? জনশ্রুতিমাত্রই যে প্রামাণ্য এবং ঐতিহাসিকের নিকট আদরণীয় এমন নহে। যে জনশ্রুতি প্রবল এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণের অবিরোধী, তাহাই ঐতিহাসিকের বিবেচ্য, এবং যে প্রবল জনশ্রুতি প্রত্যক্ষ প্রমাণের অনুকূল, তাহাই ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য।"

"এখন আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতির পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক, উহার ঐতিহাসিকতা কতদূর। রাঢ়ীয় কুলজ্ঞগণের মধ্যে প্রচলিত আদিশূর সম্বন্ধীয় জনশ্রুতি নিম্নোক্ত শ্লোকটিতে বিধিবদ্ধ আছে—

"আসীৎ পুরা মহারাজ আদিশূর প্রতাপবান্।
আনীতবান্ দ্বিজান্ পঞ্চ পঞ্চগোত্রসমুদ্ভবান্॥"

এখানে পাওয়া গেল,—আদিশূর ছিলেন (আসীৎ)। বারেন্দ্রকুলজ্ঞগণের গ্রন্থে আরও কিছু বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহারা আদিশূরের এবং বল্লালসেনের সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন। যথা—

"জাতো বল্লালসেনো গুণি-গণিত শুস্ত দৌহিত্র-বংশে।"

"আদিশূর রাজা পঞ্চগোত্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিলেন [পঞ্চ ব্রাহ্মণের পরিচয়] এহি পঞ্চগোত্রে পঞ্চব্রাহ্মণ সংস্থাপন করিয়া আদিশূর রাজার সর্গারোহণ॥ তদন্তে কিছু কালানন্তর তত দহিত্রকুলেত উদ্ভব হইলেন বল্লাল সেন [বল্লাল সেন কর্ত্তৃক কুল মর্য্যাদা স্থাপন এবং রাঢ়ী ও বারেন্দ্র বিভাগ] ইত্যবকাশে অন্যান্য দেশীয় রাজা সকল ব্রাহ্মণহীন দেশ বিবেচনা করিয়া বল্লাল সেনের নিকট ব্রাহ্মণ যাচিঞা করিয়া কহিলেন সুনহে বল্লাল সেন তোমার মাতামহ কুলোদ্ভব আদিসুর পঞ্চগোত্রে পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়া গৌড়মণ্ডল পবিত্র করিয়াছেন। আমরা যবনাক্রান্ত দেশে বাস করি আমারদিগের দেশে কিঞ্চিৎ ব্রাহ্মণ প্রেরণ করিয়া আমারদিগের দেশ পবিত্র করি।"

"আদিশূর সম্বন্ধে যে সকল জনশ্রুতি প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে এইটাই সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। কুলজ্ঞগণের মুখ্য উদ্দেশ্য ইতিহাস-সঙ্কলন নহে, বংশাবলী রক্ষা। বংশাবলী অনুসারে হিসাব করিলে, আদিশূরের যে সময় নির্দ্ধারিত হয়, তাহার সহিত এই জনশ্রুতির

খোদিত লিপিসংযুক্ত বিষ্ণুমূর্ত্তি—কেওয়ার

সামঞ্জস্য করা যাইতে পারে। "গৌড়ে-ব্রাহ্মণ" কার বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণগণ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, —"শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বর্ত্তমান ব্যক্তির পুরুষ সংখ্যা ভট্টনারায়ণ হইতে ৩৬।৩৭ এবং ৩৮ পুরুষ কাশ্যপগোত্রে ৩১।৩২।৩৩।৩৪ পুরুষ, ভরদ্বাজগোত্রে ৩৫ হইতে ৩৯ পুরুষ, কিন্তু বাৎস্যগোত্রে ২৫ হইতে ২৮ পুরুষ দৃষ্ট হয়।" রাঢ়ীয় সমাজে ৩৫ হইতে উর্দ্ধতন সমাজের লোক বিরল। বাৎস্যগোত্র ছাড়িয়া দিলে, বর্ত্তমান কালকে আদিশূর-আনীত ব্রাহ্মণগণের কাল হইতে গড়পড়তায় ৩৪।৩৫ পুরুষের কাল বলা যাইতে পারে। প্রতি পুরুষে ২৫ বৎসর ধরিয়া লইলে, আদিশূর ৮৫০ বৎসর পূর্ব্বে [১০৬০ খৃষ্টাব্দে] বর্ত্তমান ছিলেন, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই অনুমান, "বেদবাণাঙ্ক-শাকেতু গৌড়ে বিপ্রাঃ সমাগতাঃ" [৯৫৪ শাকে বা ১০৩২ খৃষ্টাব্দে গৌড়ে ব্রাহ্মণগণ আগমন করিয়াছিলেন] এই কিংবদন্তীর বিরোধী নহে, এবং তৃতীয় বিগ্রহপালের রাজত্বকালে কর্ণাট-রাজকুমার বিক্রমাদিত্যের সহিত বল্লালসেনের পূর্ব্বপুরুষের গৌড়ে আগমন কালের সহিত ঠিকঠাক মিলিয়া যায়। প্রথম রাজেন্দ্রচোলের তিরুমলয়লিপিতে দক্ষিণ-রাঢ়ের অধিপতি রণশূরের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। আদিশূরকে রণশূরের পুত্র বা পৌত্র ধরিয়া লইলে, কোন গোলই থাকে না।" *

সম্প্রতি শ্রদ্ধাস্পদ ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় "বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রের মূল্য শীর্ষক" একটি প্রবন্ধ 'ভারতবর্ষ' পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন সম্ভবতঃ আরও করিবেন। [২৭ বর্ষ ১ম খণ্ড ৫ম সংখ্যা' কার্ত্তিক—১৩৪৬]

মূলতঃ উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বের সঙ্কলিত কুলপঞ্জিকা লইয়া এই প্রবন্ধ লিখিত। তাঁহার মতে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে ব্যাপক ও বিধিবদ্ধভাবে এবং কোন বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য সমর্থনের জন্য কুলগ্রন্থ জাল করা হইয়াছে, এরূপ কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং যে সমুদয় প্রাচীন কুলগ্রন্থের বহুল প্রচলন ছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে যাহার পুঁথি আবিষ্কৃত ও পরিচিত হইবার বিশিষ্ট প্রমাণ বিদ্যমান আছে—প্রধানতঃ তিনি সেই সমুদয় গ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিকতা বিচারে অগ্রসর হইয়াছেন। আমরা ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী কাল কুলজী শাস্ত্রের প্রধান যুগ বলিয়া মনে করি। ডক্টর শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট ত্রয়োদশ হইতে ষোড়শ শতাব্দীর কয়েকখানি হস্তলিখিত কুলপঞ্জির পুঁথি আছে এবং গীতাচার্য্য শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেন মহাশয়ের নিকটও কতকগুলি পুঁথির সন্ধান মিলিবে। অন্যত্র প্রাচীন পুঁথি খুঁজিলে আরও হয়ত পাওয়া যাইতে পারে। বিশেষতঃ যে যে কুলপঞ্জীতে কুলীনগণের বংশ পরিচয়

* গৌড়রাজমালা ৫৬—৫৮ পৃষ্ঠা।

আছে তাহার সন্ধান বঙ্গদেশের নানাস্থানেই মিলে, তাহার মধ্যে ভ্রমপ্রমাদ বিশেষ নাই বলিয়াই অনেকে মনে করেন। জানিনা তাহা কতদূর সত্য।

আমাদের মনে হয় ডক্টর মজুমদার মহাশয়ের মত বিচক্ষণ ব্যক্তি বঙ্গীয় কুলশাস্ত্রের ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিতে অগ্রসর হইয়া খুবই ভাল করিয়াছেন। তিনি আদিশূর সম্পর্কে লিখিয়াছেন, "মহেশকৃত নির্দ্দোষ কুলপঞ্জিকা আর একখানি প্রাচীন গ্রন্থ। ধ্রুলো-পঞ্চাননের গোষ্ঠিকথা অনুসারে মহেশ লক্ষ্মণসেনের সমসাময়িক। কিন্তু ইহা সত্য কি না এবং সত্য হইলেও এই দুই মহেশ অভিন্ন কি-না এ সম্বন্ধে বিশিষ্ট কোন প্রমাণ নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার একখানি পুঁথি আছে, কিন্তু তাহা বিশেষ প্রাচীন বলিয়া মনে হয় না। এই গ্রন্থে আদিশূরের কোন উল্লেখ নাই।"

আমরা আদিশূর সম্বন্ধে প্রসঙ্গক্রমে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিলাম। কুলগ্রন্থ এবং প্রচলিত জনপ্রবাদ ব্যতীত যখন কোনও প্রত্যক্ষ প্রমাণ আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন এ বিষয়ে অধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। গজারীগাছ সম্বন্ধে যে জনপ্রবাদ প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, তাহার মূলে কোনও সত্য আছে কিনা কে বলিতে পারে?

ময়নামতীর পুঁথি ও শ্রীবিক্রমপুর

ময়নামতীর পুঁথিতে, ময়নামতীও রাজা গোপীচাঁদের গানে বিক্রমপুরের নাম রহিয়াছে। ময়নামতীর গান আনুমানিক ১১শ—১২শ শতাব্দীর বিরচিত বলিয়া পণ্ডিতেরা অনুমান করেন। ময়নামতীর চারিদেশে চারিটি বাড়ী থাকার বিষয় নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। যথা:—

"অব্রেথা হইলে শিস্যা খ্যেতির উপর।
এক নাম রাখি জাব মেহ্রাকুল সহর॥
আন্ধামাটি আছে কিছু মেহারকুল নগরে।
নিজ মাটী আছে কিছু মেহারকুল নগরে॥
নিজ মাটি আছে কিছু **বিক্রমপুর** সহরে।
আর আছে আন্ধ্যমাটী তরফের দেশ।
ছাটি গ্রাম পুর্ব্বমাটি জানিবা বিশেষ॥

রামপালের পূর্ব্বদিকস্থ গ্রাম পঞ্চসার হইতে পশ্চিমে মীরকাদিমের খাল, উত্তরে ফিরিঙ্গিবাজার, রিকাবিবাজার হইতে দক্ষিণে মাকুহাটির খাল পর্য্যন্ত ২৫ বর্গ মাইল স্থান ব্যাপিয়া শ্রীবিক্রমপুরের প্রাচীন কীর্ত্তি-চিহ্ন কতক বাহিরে কতক মৃত্তিকা-গর্ভে প্রোথিত রহিয়াছে। এ সমুদয় কীর্ত্তি-চিহ্ন হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে শ্রীবিক্রমপুর একদিন সত্য সত্যই বহু সৌধরাজি-সমাকীর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল। ইতিহাসের ক্রমোন্নতির সহিত এইরূপ আশা করা যায় যে নব নব আবিষ্কারের দ্বারা বিক্রমপুরের প্রাচীন ইতিহাস আরও উজ্জ্বলতর হইবে।

পরিশিষ্ট [ক]

প্রথম অধ্যায়

বিক্রমপুর নামোৎপত্তি—"সুপ্রসিদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্যের নামানুসারে এই পরগণার নাম "বিক্রমপুর" হয়। এমত কিম্বদন্তী যে, নৃপবর বজ্রযোগিনী নামক গ্রামে উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ একথা অপ্রামাণিক বোধ হয় না, এখনও বজ্রযোগিনী, রামপাল, প্রভৃতি স্থানে সুরম্য হর্ম্ম্যাবলীর ভগ্নাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। প্রবাদ আছে, যখন নৃপবল্লভ বিক্রমাদিত্য আগমন করেন তখন এস্থান নদীগর্ভস্থ পুলিনবৎ ছিল, পরে ক্রমোন্নতি সহকারে ইহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির সম্পূর্ণতা এবং সৌষ্ঠব বৃদ্ধি হইয়াছে। অধুনা বিক্রমপুরের উত্তর সীমা ধলেশ্বরী স্রোতস্বতী, পূর্ব্ব সীমা মেঘনা নদী, পশ্চিম সীমা ফরিদপুর জেলা ও বড়বাজু পরগণা ও কতিপয় গ্রাম। সোমপ্রকাশ। ৩০শে মাঘ, ১২৭৩। বিক্রমপুরের প্রাচীন ও আধুনিক বিবরণ।

মূল গ্রন্থের ১৫ পৃষ্ঠা ৯ পংক্তি **কীর্ত্তিনাশা**।—কানিংহাম বাঙ্গালা দেশের পূর্ব্বাঞ্চলের ঢাকা বিভাগের কথা বলিতে যাইয়া বলিয়াছেন—"The chief town in this division was *Bikrampur.* This place is now to the north of the Ganges ; but in former days, when the river flowed down the Dhaleswari Channel, *Bikrampur* was on the southern bank. এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে প্রত্যেক নদীর নামের সহিতই একটা না একটা কাহিনী জড়িত আছে। যেমন—করতোয়া, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতির নামোৎপত্তির সহিত এক একটি গল্প আছে। কিন্তু কীর্ত্তিনাশার সম্বন্ধে বলেন—There must also be some story attached to the *Kirtinasa* river or "Fame destroyer" but I failed to learn anything about it. It is said however, that the two cities of *Sripur* and *Koteswar* were destroyed by the *Kirtinasa* river, and if the name is not an old one it may refer to this event. It is the local name of the lower course of the Ganges, just above the junction of *Megna.* Archæological survey of India Reports Vol. XV. Bihar & Bengal. Page 146-147.

(*b*) The river system. P. 4 – 9 দ্রষ্টব্য : *Final Report on the survey and settlement operations in the District of Dacca, 1910-1917.* দ্রষ্টব্য।—মূল গ্রন্থ ১৮-১৯ পৃষ্ঠা। At the time of Major Rennell's survey in the years 1764-66, the *Padma* joined the *Meghna* at a point near *Mehendiganj* in the district of Bakarganj, more than 45 miles in a straight line south of the present junction. In the year 1794 there is definite evidence to show, that it had joined the *Meghua* in close proximity to its present junction under the name of the river *Kirtinasa,* the name by which this part of the river is still known. There is a strong presumption that the change was due to the great floods of the river Tista in 1787, which finally drove the main waters of the *Brahmaputra* down the *Jamuna* channel. The *Padma* has shown a continuous tendency to cut

towards the north and east, as can be seen from a comparison of the new maps with those of Major Rennell, the revenue and the diara survey. * * In the 94 years that elapsed between the work of Major Rennell and that of the Revenue surveyors, the average "cut" of the river was 4 miles, in some places exceeding 10 ; in the 56 years that have elapsed since the revenue survey, the average "cut" has been 2 miles with a maximum of 5. * * At every attack, however, it should be noted that the mouth of the *Padma* moves further north. The action of the Padma is very violent ; and changes in its banks are rapid."

ইছামতী নদী—ইচ্ছামতী বর্ত্তমানে মরা নদী। বিগত ১৫০ দেড়শত বৎসরের মধ্যে ইহার গতির কোনও পরিবর্ত্তন হয় নাই। F. D. Ascoli সাহেবের মতে—

* * "Probably an older course of the Ganges, it's course lies nearly due west and east, and is an indication of what may be the ultimate direction of the Padma. * * Originally the main drainage channel and water-supply of the area through which it flows, it has now bocome a source of danger and disease.

১৬ পৃষ্ঠা তৃতীয় প্যারাগ্রাফ পংক্তি—

মূল গ্রন্থের পৃষ্ঠা	প্যারাগ্রাফ	পংক্তি	শব্দের পর	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৬	৩	৩	দক্ষিণপাইকসা	লেনপুর	ফৈনপুর
২৫	৮	১ 'ঝ' চিহ্নিত		তারপাশা	কারপাশা
২৬	২	১ 'ঠ' „	দক্ষিণপাইকসা	উত্তরসীমানা	দক্ষিণসীমানা

২৪ পৃষ্ঠা— খাল ও কূমের বিবরণ

নদী বা খালের বাঁকে প্রবল স্রোতের আঘাতে প্রকৃতির স্বহস্ত রচিত যে গভীর খাত হয় তাহাকে **'কূম'** বলে। কূপের ন্যায় গভীর হয় বলিয়াই বোধ হয় কূপ হইতে 'কূম' শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

১। হলদিয়ার কূম—গ্রামের উত্তর দিকে খালের বাঁকে একটি গভীর খাত আছে; এটাকে কূমেরঘাট বলে।

২। শ্রীনগরের কূম—শ্রীনগরের খালে, থানার পূর্ব্বদিক হইতে দক্ষিণে প্রায় ৩০০ ফিট স্থান ব্যাপিয়া এই কূম অবস্থিত। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভূমিকম্প হইয়া ঐস্থানে প্রচুর বালুকা উত্থিত হইয়া এই কূমের উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া শুনা যায়। এখানে গভীর জল থাকে এবং প্রচুর মৎস্য থাকে।

২৭ পৃষ্ঠা ১৯ পংক্তি—

বিল—জিয়াস বিল—শ্রীনগর থানার তন্তর ইউনিয়ানের পাড়াগাঁয়ের পশ্চিম হইতে তারাটিয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই বিলের তীরে একটি হিজল গাছ আছে। হিন্দু-মুসলমান জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে তেল, সিন্দুর দেয় এবং মানস করিয়া সিং মৎস্য ও মোরগ ছাড়িয়া দেয়। কয়েক বৎসর যাবত কয়েকটি নূতন বিলের সৃষ্টি হইয়াছে—**কাইলানীর বিল**—মাড়িখালের দক্ষিণ হইতে বাওয়া পর্য্যন্ত অবস্থিত। পদ্মার নিকবর্ত্তী বলিয়া

দারু নির্ম্মিত গরুড
[ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সৌজন্যে]

প্রস্তর নির্ম্মিত গরুড় মূর্ত্তি, পার্শ্ব দৃশ্য

ইহা তাড়াতাড়ি ভরাট হইয়া যাইতেছে। **ঘাটার বিল**—দক্ষিণে আউটসাহী, উত্তরে কান্দাপাড়া, পূর্ব্বে চাঙ্গরী, পশ্চিমে কাইচাইল। **ভাজনীর বিল**—দক্ষিণে মালদা, উত্তরে শ্রীপুর, পূর্ব্বে দশলং, পশ্চিমে সিদ্ধেশ্বরী।

২৯ পৃষ্ঠা

ঢাকা জেলা বা বিক্রমপুর ধান চাষের জন্য বিখ্যাত নহে। বিক্রমপুর রামপালের কলার খ্যাতি সর্ব্বজনবিদিত। এ বিষয়ে ঢাকা জেলায় একটি ছড়া প্রচলিত আছে। তাহা এই :—

ভাওয়ালের তাল, কাঠাল ব্যক্ত বহদূর।
সোণারগ্রামেতে প্রচুর কাফুরি পান মিলে সুমধুর ॥
ইক্ষুগুড় মহেশ্বরদী চাঁদপ্রতাপ মহিষাদধি।
বিখ্যাত পূর্ব্বাবধি কলা বিক্রমপুর ॥

[The number of plantains grown in Dacca is very great, especially in the neighbourhood of *Rampal* in Thana Munshiganj; where the plantain is grown as a field crop, peculiarity of this area. The number of varieties of plantain grown is very great, the most notable being Agniswar, Amritasagar, Kanai Basi, Bhanguli, Nepali, Dudhsagar, Chini Champa, Martaban, Sabri and Kabri. The reddish coloured Agniswar and the thick skinned Amritasagar with its peculiar flavour are the specialities of Rampal, and are sold at prices which occasionally exceed Rs. 4-8 per hundred.] * * By the end of the 18th century the best cotton was grown in Bikrampur. অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিক্রমপুর কার্পাস চাষের জন্য বিখ্যাত ছিল।

তালতলার খাল :—*Taltalakhal* from the Dhaleswari to the Padma are probably partly artificial canal of ancient origin, but neither of them is now navigable throughout the year.

৩৩ পৃষ্ঠা :—বিক্রমপুর পরগণা—The *Parganas* of Hazratpur and Isakabad lying on the route followed by the Mughal armies to Dacca are military grants and colonies, and the series of petty estates and ancient tenures—the same in origin, but only differing in the fortune of development—abounding in *Bikrampur* and the surroundings of Dacca constitute the gifts of the Nawab or the depredations of his courtiers. * * * *Bikrampur pargana* was in existence at the time of Raja Todarmal's settlement in the sixteenth century with a revenue of Rs. 83,376. By 1728 the revenue had increased to Rs. 1,03,001, to decrease again in 1763 to Rs. 24,565. This extraordinary decrease is partly accounted for by the carving out of two new *parganas*, Rajnagar and Baikunthapur,

though it was not until the year 1777 that the latter was recognised as a separate fiscal unit. Pages 54-57. Final Report on the Survey and Settlement operations 1910-1917.

৩৯ পৃঃ ২য় প্যারার শেষ পংক্তিতে 'শ্রীহট্ট জেলার নমঃশূদ্রগণ বেহারার কার্য্য করে' স্থানে ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টের নমঃশূদ্রগণ এখানে বেহারার কার্য্য করিত; এখন আর নমঃশূদ্রগণ আসে না; পশ্চিম দেশীয় বেহারা এখন এদেশে কার্য্য করে।

পথঘাট ও যাতায়াত—Of old roads, however, now unused traces of many still to be found. In Bikrampur there are three running north and south—one from Wari northwards, the other two, the *Mukutpur* and Kachhkikata-Darjas; running east and west in the north of Bikrampur the remnants of a *Badshahi Rasta* are still in places.

৪১ পৃঃ তৃতীয় প্যারার লুপ্ত বন্দরের আলোচনায় অধুনালুপ্ত ভোজগাঁও হাটের নাম উল্লেখযোগ্য; ইহা নৌকা বিক্রয়ের প্রসিদ্ধ হাট ছিল। এখন ইহা পদ্মাগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে। ধানকুন্ডিয়াও একটি প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। মীরকাদিমে একটি ব্যাঙ্ক আছে।

৪৩ পৃষ্ঠা

বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-বন্দরের মধ্যে **বাঘরা** বন্দরের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ভাগ্যকূলের প্রায় দেড় মাইল উত্তরে এবং বিক্রমপুরের শেষ উত্তর সীমা। বাঘরা পদ্মাতীরে অবস্থিত, এখানে কতকগুলি স্থায়ী দোকান আছে। প্রত্যহ বাজার মিলে। এখানে উৎকৃষ্ট খেজুরি গুড় উৎপন্ন হইয়া থাকে।

তেয়টিয়া—পদ্মার ভাঙ্গনে এই গ্রাম এখন পদ্মাতীরে অবস্থিত। মুন্সী উপাধিধারী দত্ত ভূম্যধিকারীগণ এই বাজারের স্থাপয়িতা। এখানে প্রত্যহ বাজার হয় এবং কয়েকখানা স্থায়ী দোকান আছে; তেওটিয়ার মঠ প্রসিদ্ধ।

কাটিয়াপাড়া—ভাগ্যকূলের মাইল খানেক উত্তরে অবস্থিত। প্রত্যহ বাজার মিলে, উৎকৃষ্ট খেজুরে গুড় প্রস্তুত হয়।

কামারগাঁও—কাটিয়াপাড়ার আরো উত্তরে প্রত্যহ বাজার হয়, উৎকৃষ্ট খেজুরে গুড় হয়।

ঝাউটিয়া—নূতন বাজার। বিশ্বাস ভূম্যধিকারিগণ সিদ্ধেশ্বরী নামক পল্লীতে ইহা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রত্যহ বাজার মিলে। ১/৪ মাইল উত্তরে। **দিঘলী**—বর্ত্তমানে বিক্রমপুরের প্রসিদ্ধ বাণিজ্য-কেন্দ্র। এখানে একটি মুদ্রাযন্ত্র আছে। ভাগ্যকূলের রায় পরিবারেরা ইহার মালিক। এতদ্ব্যতীত কনকসার খরিয়া, হলদিয়া, সৈদপুর, বরাম, কুইচামোরা, বয়রাগাদী, কমলাঘাট, দোগাছি, চুরাইন, রুজদি, পুরা, কয়-কীর্ত্তন, বজ্রযোগিনী, ধানের খোলা প্রভৃতি স্থানে রীতিমত বাজার মিলিয়া থাকে এবং বিবিধ দ্রব্যাদি আমদানী ও রপ্তানি হইয়া থাকে। কমলাঘাট—ব্রহ্মদেশ হইতে আগত কাঠের কারবারের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

তৃতীয় অধ্যায়—৬৫-৭১ পৃষ্ঠা

জাতির পরিচয় বিস্তারিত ও ব্যবসায় ইত্যাদি সম্পর্কে 'বিক্রমপুরের ইতিহাসের' দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হইবে। তবে এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে স্বাভাবিকভাবেই মুসলমানের জনসংখ্যা

দিন দিনই বৃদ্ধি পাইতেছে :—"It may be roughly stated that the rate of natural increase of the Muhammadan population is double that of the Hindus. তবে শ্রীনগর ও মুন্সীগঞ্জ থানার হিন্দুর সংখ্যা অধিক।

[Hinduism is strongest in the south of the district, especially in thanas Munshiganj and Srinagar ; in Srinagar only are the two religions found in equal.

হাজার (১০০০) করা জন্ম মৃত্যুর হার এইরূপ :—

থানা	জন্মহার	মৃত্যুহার	হারের তারতম্য
মুন্সীগঞ্জ	৩১	২৪	+ ৭
শ্রীনগর	৩৬	৩৪	+ ২

উত্তর বিক্রমপুরের জনসংখ্যা সম্বন্ধে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীনগর ও মুন্সীগঞ্জ থানায়, বিশেষ শ্রীনগর থানার জনসংখ্যা এত বেশী যে তাহা পৃথিবীর মধ্যে শীর্ষ স্থানীয়। Mr. F. D. Ascoli তাঁহার কৃত Survey and settlement operations in the District of Dacca নামক গ্রন্থের ৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন :—"The density of population varies considerably in different parts of the district (DACCA), from 2,061 per square mile in *thana* Srinagar to 526 in thana Kapasia ; in Srinagar ⅙ of the *thana* is covered by an uninhabited *bil*, and the density of the population in the remaining area of approximately 150 square miles is 2,500 per square mile : in the *asali* portions of thana Munshiganj *the densely populated rural area in the world.* ইহা বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য।

শ্রীনগর থানার জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে উক্ত গ্রন্থের ৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে :—The very heavy increase in thana Srinagar ; *the most densely populated rural tract in India*, is due very largely to the increase of cultivation on the borders of the Arial Bil ; the increase is mainly Muhammadan and affects the *Bhadralok Hindu* classes to a small extent. This accounts for the fact that, while in Srinagar the population increased by 12 per cent, in the decade previous to 1911, the increase in Munshiganj, a kindred area, amounted to only 7 per cent, in the same period.

পরিশিষ্ট [খ]

বিক্রমপুরের পুষ্করিণী ও দীঘি—সার্ভে ও সেটেলমেন্ট রিপোর্ট হইতে জানিতে পারি...
"In the area of Srinagar and Munshiganj *thanas* surveyed in 1911-12, an are-a of approximately 200 square miles, no fewer than 13,629 tanks were recorded covering an area of 8½ square miles ; tanks averaged 608 to the square mile or nearly one to the acre, one twenty-fourth of the whole area being covered by tanks. It may be imagined that this indicates a liberal water-supply, but this is not the case. *The majority* of the tanks are of great antiquity. Many of them no doubt were excavated as acts of charity, but the charitable intentions of the excavator have not been imitated by the successors in interest ; many of them are completely dried up ; a large number are overgrown with grass and noxious weeds ; there is hardly a single one maintained in a clean and sanitary condition. A few of the tanks are very extensive, the famous *dighi* of Rampal covering an area of 35·64 acres, but the majority of the tanks are extremely small, the average size being one-third of an acre. Page 97.

চতুর্থ অধ্যায়

দীপঙ্কর সম্বন্ধে বাঙ্গালার ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই আলোচনা করিয়াছেন। বিশে/. করিয়া স্বর্গত শরৎচন্দ্র দাস, মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, বিক্রমপুরের ইতিহাস' প্রথম সংস্করণ, 'গৌড়রাজমালা' প্রণেতা রায় বাহাদুর রমাপ্রসাদ চন্দ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী প্রভৃতি নিজ নিজ গ্রন্থে দীপঙ্কর সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন বলেন :—"সুপ্রসিদ্ধ অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বজ্রতান্ত্রিকগণের শীর্ষস্থানীয় ; ইঁহার নাম বৌদ্ধজগতে সুপরিচিত। * * শ্রীযুক্ত রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহাশয় তিব্বত হইতে দীপঙ্করের যে জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন তাহাতে লিখিত আছে বজ্রাসনের পূর্ব্বস্থিত বিক্রমপুরে বৌদ্ধগুরু দীপঙ্কর জন্মগ্রহণ করেন। এবং তিনি দ্বাদশবর্ষকাল "বজ্রাসন বিহারে" অধ্যয়ন করেন। * * বুদ্ধগয়ায় যে স্থানে বুদ্ধদেব নির্ব্বাণলাভ করেন তাহাকেও সেকালে বজ্রাসন বলিত, কিন্তু বিক্রমপুর হইতে তাহা এতদূরে অবস্থিত যে "বাজাসনের পূর্ব্বস্থিত বিক্রমপুর" বলিয়া বিক্রমপুরের পরিচয়ে যে বাজাসনের উল্লেখ তাহা যে বুদ্ধগয়ার সন্নিহিত বাজাসন তাহা মনে হয় না। যে বাজাসন হইতে বিক্রমপুর মাত্র ১০।১২ মাইল দূরে অবস্থিত, সেই বাজাসনের অস্তিত্ব না জানিয়াই রায় শরৎচন্দ্র দাস বাহাদুর বুদ্ধগয়ার কল্পনা করিয়াছিলেন। এই ভ্রম স্বীকার করিয়া তিনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

"In my *Indian Pandits in the Land of Snow* I remember to have alluded to a place called Vajrasana lying to the west of the *Vikrampura*, the birth place of Dipankara Srijnana, the famous Atisa of Tibet. Had I then any knowledge of the existence of any locality called *Vajasana*

দারু নির্ম্মিত স্থিরচক্র মঞ্জুশ্রী—রামপাল

[ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালীর সৌজন্যে]

close to Vikrampur, I would hardly have conjectured that *Vajasana* to have been Gaya and not *Bajasana*. Bajasana is evidently a corruption of the name *Vajrasana*. In the mounds of Bajasana, it is said 'their existed ruins of a Buddhist 'Bihar' of old and there *Atisa* must have got his early education."

অর্থাৎ যদি বিক্রমপুরের কয়েক মাইল পশ্চিমস্থিত বাজাসন নামক স্থানের অস্তিত্ব আমি জানিতাম, তবে কখনই আমার ইণ্ডিয়ান পণ্ডিতস্ ইন্ দি ল্যাণ্ড অব্ স্নো নামক পুস্তকে অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান বলিয়া বিক্রমপুরের পশ্চিমস্থিত বাজাসনের উল্লেখ না করিয়া বুদ্ধগয়ার কল্পনা করিতাম না। এখন আমি বুঝিতে পারিতেছি এই বাজাসনের স্তূপেই একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত ছিল এবং দীপঙ্কর তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন।" ঢাকা জেলার কয়েকটি প্রাচীন স্থান। প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩১৯ [১২শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা]।

পঞ্চম অধ্যায়

১৮৬ পৃষ্ঠা। শ্রীচন্দ্রদেবের তিনখানি তাম্রশাসনের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহা ঠিক নহে। চন্দ্রবংশের চারিখানি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হইয়াছে। শ্রীচন্দ্রের ধুল্লা শাসনখানি ১৯২৫ সালে ভট্টশালী মহাশয় ঢাকা মিউজিয়ামের জন্য সংগ্রহ করিয়াছেন। এই তাম্রফলকখানিও বিক্রমপুর রাজধানী হইতে প্রদত্ত হইয়াছিল। রামপাল এবং কেদারপুর শাসনখানির ন্যায় এই খানিও উভয় দিকেই খোদিত লিপি সংযুক্ত। শীর্ষদেশে ধর্ম্মচক্রমুদ্রা রহিয়াছে। লিপিখানিতে মোট ৪৭ পংক্তি খোদিত অক্ষর রহিয়াছে।

সম্মুখ পৃষ্ঠায় ২৩ পংক্তি এবং বিপরীত পৃষ্ঠায় ২৪ পংক্তি। বন্দ্যো জিন স্ম ভগবান্ ইত্যাদি আরম্ভ হইয়াছে। লিপিখানি (৪৬) পংক্তি রাজত্বের ৩৫ বৎসর ২৫শে জ্যৈষ্ঠ তারিখে প্রদত্ত হইয়াছে।

এই শাসন খানি হইতে জানা যায় পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির অন্তর্গত কয়েকখানি গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার এতৎ সম্পর্কে লিখিয়াছেন :—

(1) In the village of Durvvapattra in Vallimundamandala situated in Khediravavalli-Vishaya 4, halas. (2) In Loniyajodaprastara (Prantara ?) —3 halas. (3) In Tivarvilli village—2 halas. (4) In the village of Parkadimunda in Yolamandala in Ikkadasivishaya—2 halas and 6 dronas. (5) In the village of Malahpatpra (?)—7 halas : thus in all (?) halas and 6 dronas (lines 20—23).

This land was granted by king Srichandra in the name of *Buddha-bhattaraka* (line 37) to the *Santivarika Vyasagangasarmman* who belonged to the Varddhakausika *gotra* and the *Pravra* of the three Rishis, and was a student of the *Kanvasakha*. He was a son of Vibhu-ganga, grandson of Nandaganga and great-grandson of Jayganga. The gift was made on account of his having conducted the *Adbhutsanti* ceremony on the occasion of the performance of the Four Homas (lines 33 to 36). The seal *Dharmmachakramudra*, attached to the copper plate, is mentioned in line 38.

"It should be noted that like the Rampal copperplate this one also was granted in favour of *Santivarika*, or 'the priest in charge of propitiatory rites.' The former gift was made on the occasion of Kotihoma ceremony and the latter on performance of a certain propitiatory rite called *Adbhut Santi*, during the *Homachatushtaya* or the Four Homas. That a Buddhist like Srichandrs could take active part in Brahmanical observances of this nature is a fact cf paramount inierest fcr the history of Buddhism in Northern India during the Pala period. Inscriptions of Bengal Appendices 165—166. N. G. Majumdar M.A.

২১৯-২২০ পৃষ্ঠা।

সিংহপুর—সিংহপুরের অবস্থান সম্বন্ধে গ্রন্থ মধ্যে আলোচিত হইয়াছে। সিংহপুরকে ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক সিংহপুর বা সিংহপুরকে [Sihapura] 'মহাবংশে উল্লিখিত রাঢ়ার অন্তর্গত স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ডক্টর দীনেশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ও এই মতাবলম্বী।

আমরা ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান দ্বারা এ কথা সুস্পষ্টভাবে জানিতে পারি যে রাঢ়া এবং বঙ্গ পাল রাজাদের অন্তর্ভূ'ত ছিল কিনা তাহা প্রমাণ সাপেক্ষ। খৃষ্টিয় দশম শতাব্দী হইতে পাল রাজাদের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে। ঐ সময়েই বঙ্গে বিক্রমপুরে এবং পশ্চিম বঙ্গে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের অভ্যুদয় ঘটে। প্রথম মহীপালের সময়ই পাল রাজাদের রাজ্যবিস্তারের প্রচেষ্টা অনুভূত হয়। কৈবর্ত্ত বিদ্রোহের সময়ই সম্ভবতঃ বর্ম্মনৃপতিরা পূর্ব্ববঙ্গে স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তবে পাল নৃপতিরা রাঢ়া ও বঙ্গ রাজ্যের উপর আপনাদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য যে মধ্যে মধ্যে যত্নবান্ হইতেন তৎসম্বন্ধে যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। পাল রাজাদের প্রভুত্ব বিশেষ করিয়া উত্তর বঙ্গে এবং বিহারে প্রতিষ্ঠাপিত ছিল। তাঁহাদের প্রদত্ত প্রায় সমুদয় খোদিত লিপিই মগধ এবং বারেন্দ্র হইতেই পাওয়া গিয়াছে। বর্ম্ম নৃপতিরা, কাম্বোজ নৃপতিরা এবং সেন-নৃপতিরা প্রথমে রাঢ় অঞ্চলেই বসতি স্থাপন করিয়াছিলেন। বঙ্গ এবং রাঢ়ের স্বাধীন নৃপতিরা পাল নৃপতি-দিগকে পর্য্যুদস্ত করিবার জন্য যখনই সুযোগ পাইয়াছেন তখনই প্রয়াসী হইয়াছেন। —The History of North-Eastern India by Dr. R. G. Basak. The Early History of Bengal by Pramode Lal Paul M. A. বাঙ্গালার ইতিহাস—প্রথম ভাগ, 'ঢাকার ইতিহাস', দ্বিতীয় খণ্ড ও গৌড়ের ইতিহাস ও অন্যান্য গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

পরিশিষ্ট [গ]

বিজয়সেন শ্রীবিক্রমপুর—২৪৬-২৫৪ পৃষ্ঠা

বিজয়সেনের দেবপাড়া লিপি

মূল প্রশস্তি ও ইহার বঙ্গানুবাদ

ওঁ নমঃ শিবায়।

বক্ষোংশুকাহরণসাধ্বসকৃষ্টমৌলি—
মাল্যচ্ছটাহতরতালয়দীপভাসঃ।
দেব্যাস্ত্রপামুকুলিতং মুখমিন্দুভাভি—
র্ব্বীক্ষ্যাননানি হসিতানি জয়ন্তি শম্ভোঃ ॥১॥

১। স্বামী বক্ষঃস্থলের বস্ত্র হরণ করিবেন এই ভয়ে মস্তকস্থিত মাল্যগুচ্ছদ্বারা রমণ-ভবনের প্রদীপ-জ্যোতিঃ (যিনি) নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছিলেন, সেই দেবীর (পার্ব্বতীর) লজ্জামুকুলিত মুখ (মস্তকস্থিত) চন্দ্রের আলোকে নিরীক্ষণ করিয়া (পঞ্চমুখ) শম্ভুর সহাস্য বদনাবলী জয়যুক্ত হউক ॥

লক্ষ্মীবল্লভ-শৈলজদয়িতয়োরদ্বৈত-লীলাগৃহং
প্রদ্যুম্নেশ্বর-শব্দলাঞ্ছনমধিষ্ঠানং নমস্কুর্ম্মহে ॥
যত্রালিঙ্গনভঙ্গকাতরতয়া স্থিত্বান্তরে কান্তয়ো—
র্দ্দেবীভ্যাং কথমপ্যভিন্নতনুতাশিল্পেঽন্তরায়ঃ কৃতঃ ॥২॥

২। লক্ষ্মীপতি (হরি) ও পর্ব্বতী-পতি (হরের) অদ্বৈত-লীলার গৃহস্বরূপ 'প্রদ্যুম্নেশ্বর' নামে প্রখ্যাত এই অধিষ্ঠানকে (দেবনিবাস বা দেবমূর্ত্তিকে) নমস্কার করিতেছি, যাহাতে দেবীদ্বয় স্ব-স্ব কান্তের বা স্বামীর আলিঙ্গন ভঙ্গ হইবে এই কাতরতায় তাঁহাদের মধ্যবর্ত্তিনী থাকিয়া কোনও প্রকারে তাঁহাদের এক-শরীরতার নির্ম্মাণবিষয়ে বিঘ্ন বিধান করিতেছেন।

যৎ-সিংহাসনমীশ্বরস্য কনকপ্রায়ং জটামণ্ডলং
গঙ্গাশীকরমঞ্জরীপরিকরৈর্যচ্চামরপ্রক্রিয়া।
শ্বেতোৎফুল্ল-ফণাঞ্চলঃ শিব-শিরঃসন্দানদামোরগ—
শ্ছত্রং যস্য জয়ত্যসাবচরমো রাজা সুধাদীধিতিঃ ॥৩॥

৩। মহাদেবের কনক-প্রায় জটামণ্ডল যে রাজার সিংহাসন, গঙ্গার শীকর-মঞ্জরী-সমূহদ্বারা যাঁহার চামর-ক্রিয়া সম্পাদিত হইয়া থাকে, এবং শ্বেতবর্ণের উৎফুল্ল বা সুবিস্তৃত

ফণাপ্রান্ত-বিশিষ্ট শিবমস্তকের বেষ্টন-মাল্য-রূপী সর্প যাঁহার ছত্র—সেই আদি রাজা অমৃত-কিরণ (চন্দ্রদেব) জয়লাভ করুন।

বংশে তস্যামরস্ত্রী-বিততরতকলাসাক্ষিণো দাক্ষিণাত্য—
ক্ষৌণীন্দ্রৈর্বীরসেনপ্রভৃতিভিরভিতঃ কীর্ত্তিমদ্ভির্বভূবে।
যচ্চারিত্রানুচিন্তাপরিচয়শুচয়ঃ সূক্তিমাধ্বীকধারাঃ
পারাশর্য্যেণ বিশ্বশ্রবণপরিসরপ্রীণনায় প্রণীতাঃ ॥৪॥

৪। দেবস্ত্রীগণের সহিত সম্পাদিত রতিকলার সাক্ষীভূত সেই চন্দ্রদেবের বংশে, চতুর্দ্দিকে কীর্ত্তিমান্ বীরসেন-প্রভৃতি দাক্ষিণাত্যের রাজগণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; পরাশর-তনয় (ব্যাসদেব) বিশ্বজনের কর্ণ পরিসরের প্রীতির জন্য যাঁহাদের চরিত্রকথার সতত স্মরণের পরিচয় হেতু পবিত্র সূক্তিমধুধারা রচনা করিয়াছেন।

তস্মিন্ সেনান্ববায়ে প্রতিসুভটশতোৎসাদন-ব্রহ্মবাদী
স ব্রহ্মক্ষত্রিয়াণামজনি কুলশিরোদাম সামন্তসেনঃ।
উদ্গীয়ন্তে যদীয়াঃ স্খলদুদধিজলোল্লোলশীতেষু সেতোঃ
কচ্ছান্তেষপ্সরোভি র্দ্দশরথতনয়-স্পর্দ্ধয়া যুদ্ধগাথাঃ ॥৫॥

৫। শত শত শ্রেষ্ঠ প্রতিযোদ্ধার উন্মূলন করিয়া পারদর্শী, ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়গণের কুলশেখর, সামন্তসেন নামক ব্যক্তি সেই সেনবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—দশরথ-তনয় রামচন্দ্রের তুলনায় যাঁহার যুদ্ধগাথা, সেতুবন্ধের স্খলদ্জলধিজলের উত্তালতরঙ্গ-সম্পর্কে শীতল কচ্ছপ্রদেশসমূহে, অপ্সরোগণ-কর্ত্তৃক উচ্চৈঃস্বরে গীত হইত।

যস্মিন্ সঙ্গরচত্বরে পটুরটত্তূর্য্যোপহূতদ্বিষ-
দ্বর্গে যেন কৃপাণকালভুজগঃ খেলায়িতঃ পাণিনা।
দ্বৈধীভূতবিপক্ষকুঞ্জরঘটা-বিশ্লিষ্টকুম্ভস্থলী-
মুক্তাস্থূলবরাটিকাপরিকরৈর্ব্যাপ্তং তদদ্যাপ্যভূৎ ॥৬॥

৬। যে যুদ্ধ-চত্বরে পটুনিনাদশীল তূর্য্যের (ধ্বনিতে) শত্রুবর্গকে আহ্বান করিয়া তিনি (সামন্তসেন) নিজ পাণিদ্বারা কৃপাণরূপ কালসর্পকে খেলাইতেন। সেই (যুদ্ধচত্বর) অদ্যাপি দ্বিধাচ্ছিন্ন শত্রু-গজঘটার বিশ্লিষ্ট কুম্ভস্থল হইতে বিনির্গত স্থূল বরাটিকাসদৃশ মুক্তা-সমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত রহিয়াছে।

গৃহাদ্গৃহমুপাগতং ব্রজতি পত্তনং পত্তনা-
দ্বনাদ্বনমুপক্রতং ভ্রমতি পাদপং পাদপাৎ।
গিরের্গিরিমধিশ্রিতস্তরতি তোয়ধিস্তোয়ধে-
র্যদীয়মরিসুন্দরীসরকপৃষ্টলগ্নং যশঃ ॥ ৭ ॥

৭। শক্র বনিতাদিগের সরক-পৃষ্টে (গমনাগমনের অবিচ্ছিন্ন পংক্তিতে) সংলগ্ন হইয়া যদীয় যশঃ গৃহ হইতে গৃহে উপস্থিত হইতে, (পত্তন) নগর হইতে নগরে চলিয়া যাইত, বন হইতে বনে দৌড়াইত, পাদপ হইতে পাদপে ভ্রমণ করিত, গিরি হইতে গিরিতে আশ্রয় লইত এবং সমুদ্র হইতে সমুদ্রান্তর পার হইয়া যাইত।

দুর্ব্বৃত্তানাময়মরিকুলাকীর্ণ-কর্ণাটলক্ষ্মী-
লুণ্টাকানাং কদনমতনোত্তাদৃগেকাঙ্গবীরঃ।
যস্মাদাদ্যাপ্য বিহিতবসামাংসমেদঃসুভিক্ষাং
হৃষ্যৎপৌরস্ত্যজতি ন দিশং দক্ষিণাং প্রেতভর্ত্তা ॥ ৮ ॥

৮। একাঙ্গবীর (অ-চতুরঙ্গবলান্বিত) অর্থাৎ অসহায় বীর (সামন্ত সেন) অরিকুলাকীর্ণ কর্ণাটরাজলক্ষ্মীর লুণ্ঠনকারী দুর্ব্বৃত্তগণের এরূপ বিনাশ সাধন করিয়াছিলেন যে, প্রেত-ভর্ত্তা (কৃতান্ত) হর্ষান্বিত পুরবাসিগণ সহ অদ্য পর্য্যন্ত বসা, মাংস ও মেদঃপিণ্ডের অনিঃশেষিত ভাণ্ডার-যুক্ত দক্ষিণদিক্ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছেন না।

উগদ্গন্ধীন্যাজ্যধূমৈর্ম্মৃগশিশুরসিতাখিন্ন-বৈখানস-স্ত্রী-
স্তন্যক্ষীরাণি কীরপ্রকরপরিচিত-ব্রহ্মপারায়ণানি।
যেনাসেব্যন্ত শেষে বয়সি ভবভয়াস্কন্দিভির্মস্করীন্দ্রৈঃ
পূর্ণোৎসঙ্গানি গঙ্গাপুলিনপরিসরারণ্যপুণ্যাশ্রমাণি॥ ৯ ॥

৯। যে স্থানগুলি আজ্যধূমে সুগন্ধ, যেখানে মৃগশিশুরা অখেদযুক্ত বৈখানস-স্ত্রীগণের স্তন্যদুগ্ধ আস্বাদন করিত, যেখানে কীর (শুক) পক্ষিগণ বেদপারায়ণে অভ্যস্ত থাকিত এবং যেখানে প্রান্তপ্রদেশগুলি ভবভয়তিরস্কারী মস্করীন্দ্রগণদ্বারা (সন্ন্যাসিগণদ্বারা) পরিপূর্ণ থাকিত, গঙ্গার পুলিনপরিসরের অরণ্যে অবস্থিত সেই পুণ্যাশ্রমসমূহ তিনি (সামন্তসেন) শেষ বয়সে আশ্রয় করিয়াছিল।

অচরমপরমাত্মজ্ঞানভীষ্মাদমুষ্মা-
ন্নিজভুজমদমত্তারাতিমারাঙ্কঃ বীরঃ।
অভবদনবসানোদ্ভিন্ননির্ম্মিক্তত্তদ্-
গুণনিবহমহিম্নাং বেশ্ম হেমন্তসেনঃ ॥ ১০ ॥

১০। আদ্য পরমাত্মার জ্ঞানবশতঃ (লোকের) ভয়োৎপাদক সেই (সামন্তসেন) হইতে, নিজবাহুদর্পে মত্ত শত্রুকুলের ধ্বংসসাধনে প্রখ্যাত বীর, নিরন্তরবিকাশী নির্ম্মল সর্ব্ব-প্রকার গুণনিবহের মাহাত্ম্য-গৃহস্বরূপ, হেমন্তসেন-নামক ব্যক্তি জন্ম লাভ করিয়াছেন।

মূর্দ্ধন্যর্দ্ধেন্দু চূড়ামণি-চরণরজঃ সত্যবাক্কণ্ঠভিত্তৌ
শাস্ত্রং শ্রোত্রেরিকেশাঃ পদভুবি ভুজয়োঃ ক্রুরমৌর্ব্বীকিণাঙ্কঃ।

নেপথ্যং যস্য জজ্ঞে সততমিয়দিদং রত্নপুষ্পাণি হারা-
স্তাড়ঙ্কং নূপুরস্রক্কনকবলয়মপ্যস্য ভৃত্যাঙ্গনানাম্॥ ১১॥

১১। অর্দ্ধেন্দুশেখর (মহাদেবের) চরণধূলি যাঁহার মস্তকে, সত্যবাক্য যাঁহার কর্ণভিত্তিতে, শাস্ত্রকথা যাঁহার কর্ণে, (পদানত) শত্রুর কেশগুচ্ছ যাঁহার পদভূমিতে, কর্কশ জ্যাঘাতের কিণ-চিহ্ন যাঁহার ভুজদ্বয়ে—এইগুলিই কেবল সর্ব্বদা যাঁহার ভূষণরূপে পরিগণিত হইত, (হেমন্তসেনের) সেবকজনের রমণীদিগের, কিন্তু, (মস্তকে) রত্নপুষ্পসমূহ, (কর্ণ-ভিত্তিতে) হারাবলী, (কর্ণে) কর্ণপূর, (পদস্থলে) নূপুরমালা এবং (ভুজদ্বয়ে) কনকবলয় (ভূষণরূপে) শোভমান ছিল।

যদ্দোর্ব্বল্লিবিলাস-লব্ধগতিভিঃ শল্যৈর্ব্বিদীর্ণোরসাং
বীরাণাং রণতীর্থবৈভববলাদ্দিব্যং বপুর্ব্বিভ্রতাম্।
সংসক্তামরকামিনীস্তনতটীকাশ্মীর পত্রাঙ্কিতং
বক্ষঃ প্রাণিব মুগ্ধসিদ্ধমিথুনৈঃ সাতঙ্কমালোকিতম্॥১২॥

১২। যাঁহার বাহুবল্লীর বিলাসে উৎক্ষিপ্ত বাণসমূহদ্বারা বিদীর্ণবক্ষাঃ বীরগণ রণতীর্থের মাহাত্ম্যবশতঃ দিব্য শরীর ধারণ করিয়া (স্বর্গে) অনুরাগবতী দেবকামিনীগণের স্তনতটে শোভিত কুঙ্কুমপত্রের রক্তিমায় নিজ নিজ বক্ষঃস্থল অঙ্কিত করিলে পর, মুগ্ধ সিদ্ধমিথুনগণ পূর্ব্বের ন্যায় (রক্তাঙ্কিত মনে করিয়া) ইহার প্রতি আতঙ্কের সহিত দৃষ্টিপাত করিয়া থাকে।

প্রত্যর্থিব্যয়কেলিকর্ম্মণি পুরঃ স্মেরং মুখং বিভ্রতো
রেতস্যৈতদসেশ্চ কৌশলমভূদ্দানে দ্বয়োরদ্ভুতম্।
শত্রোঃ কোপিহ্যদধে-বসাদমপরঃ সখ্যুঃ প্রসাদং ব্যধা
দেকো হারমুপাজহার সুহৃদামন্যঃ প্রহারং দ্বিষাম্॥১৩॥

১৩। সম্মুখে সহাস্য বদন ধারণ করিয়া প্রত্যর্থিবর্গের (রাজপক্ষে প্রার্থয়িতাদের, আর অসিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বীদের) ব্যয়রূপ (রাজপক্ষে অর্থব্যয়রূপ, আর অসিপক্ষে বিনাশরূপ) ক্রীড়া করিবার সময়ে, এই ব্যক্তির (হেমন্ত সেনের) ও তাঁহার অসির (এই উভয় বস্তুর) দান বিষয়ে (একতঃ দান করা কার্য্যে, অন্যতঃ ছেদন কার্য্যে) অদ্ভুত কৌশল লক্ষিত হইত। এক বস্তু (তদীয় অসি) শত্রুর অবসাদ বিধান করিত ও অপর বস্তু (হেমন্তসেন স্বয়ং) মিত্রের প্রসাদ বিধান করিতেন; আবার এক বস্তু (তিনি নিজে) সুহৃদ্বর্গের হার উপহার দিতেন ও অন্য বস্তু (তদীয় আসি) অরাতিকুলের প্রহার উপহার দিত।

মহারাজ্ঞী যস্য স্বপরনিখিলান্তঃপুরবধূ—
শিরোরত্নশ্রেণীকিরণসরণিস্মেরচরণা।

নিধিঃ কান্তেঃ সাধ্বীব্রতবিততনিত্যোজ্জ্বলযশা
যশোদেবী নাম ত্রিভুবনমনোজ্ঞাকৃতিরভূৎ ॥১৪॥

১৪। যাঁহার চরণযুগল নিজের ও পরের সমগ্র অঃন্তপুরস্থিত বধূগণের শিরোরত্ন শ্রেণীর কিরণপুঞ্জে রঞ্জিত হইয়া সহাস্যবৎ প্রতীয়মান হইত, কান্তির আধার যিনি সাধ্বীব্রত দ্বারা নিত্যোজ্জ্বল যশোরাশি বিস্তার করিতেন, ত্রিলোকসুন্দরাকৃতি সেই যশোদেবী নামক দেবী তাঁহার (হেমন্ত সেনের) মহারাজ্ঞী ছিলেন।

ততস্ত্রিজগদীশ্বরাৎ সমজনিষ্ট দেব্যাস্ততো—
প্যরাতিবলশাতনোজ্জ্বল-কুমারকেলিক্রমঃ।
চতুর্জ্জলধিমেখলাবলয়সীমবিশ্বম্ভরা—
বিশিষ্টজয়সান্বয়ো বিজয়সেন-পৃথ্বীপতিঃ ॥১৫॥

১৫। যাঁহার কুমার-কেলি-ক্রিয়া শত্রুবলের উচ্ছেদসাধনে জাজ্জ্বল্যমান থাকিত এবং যিনি চতুঃসমুদ্র-মেখলাবলয়বেষ্টিত পৃথিবীর বিশিষ্ট জয়লাভ করিয়া সার্থকনামা হইয়াছিলেন, সেই বিজয়সেন ভূপতি সেই (ত্রিজগদীশ্বর হেমন্তসেন) ও সেই দেবী (যশোদেবী) হইতে জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

গণয়তু গণশঃ কো ভূপতীংস্তাননেন
প্রতিদিনরণভাজা যে জিতা বা হতা বা।
ইহ জগতি বিষেহে স্বস্য বংশস্য পূর্ব্বঃ
পুরুষ ইতি সুধাংশৌ কেবলং রাজশব্দঃ ॥১৬॥

১৬। প্রতিদিন রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া তিনি কত কত ভূপতিকে পরাজিত বা নিহত করিয়াছিলেন, কে তাহা গণে গণে গণনা করিতে সমর্থ? তিনি এই জগতে তদীয় নিজ বংশের পূর্ব্ব (প্রথম) পুরুষ বলিয়া একমাত্র চন্দ্রেই রাজশব্দের প্রয়োগ সহ্য করিতেন।

সংখ্যাতীতকপীন্দ্রসৈন্যবিভুনা তস্যারিজেতুস্তুলাং
কিং রামেণ বদাম পাণ্ডবচমূনাথেন পার্থেন বা।
হেতোঃ খড়্গলতাবতংসিতভুজামাত্রস্য যেনার্জ্জিতং
সপ্তাম্ভোধিতটীপিনদ্ধবসুধাচক্রৈকরাজ্যং ফলম্ ॥১৭॥

১৭। যিনি একমাত্র অসিলতাবিভূষিত ভুজমাত্রের সাহায্যে সপ্তসমুদ্রতটবেষ্টিত বসুধাচক্রের ঐকরাজ্যরূপ ফল অর্জ্জন করিয়াছিলেন— সেই শত্রুবিজেতা (বিজয়সেনের) তুলনা কি অসংখ্য বানরসেনার অধিনায়ক রামচন্দ্রের সহিত, কিংবা পাণ্ডবসেনাপতি পার্থের (অর্জ্জুনের) সহিত করা যাইতে পারে?

একৈকেন যৈঃ গুণেন যৈঃ পরিণতং তেষাং বিবেকাদৃতে
কশ্চিদ্ধন্ত্যপরশ্চ রক্ষতি সৃজত্যন্যশ্চ কৃৎস্নং জগৎ।
দেবোয়ং তু গুণৈঃ কৃতো বহুতীথৈ ধীমান্ জঘান দ্বিষো
বৃত্তস্থানপুষচ্চকার চ রিপুচ্ছেদেন দিব্যাঃ প্রজাঃ ॥১৮॥

১৮। যে তিন দেবতা (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব) কেবল এক একটি গুণ বশতঃ পরিণাম (স্বস্বকার্য্যে উন্নতি) লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বিনা বিবেচনায়, এক দেবতা (শিব) কেবল সমগ্র জগতের নাশ কার্য্য, এক দেবতা (বিষ্ণু) কেবল ইহার রক্ষাকার্য্য ও অপর দেবতা (ব্রহ্মা) কেবল ইহার সৃষ্টিকার্য্য পরিচালন করিতেছেন। কিন্তু, গুণবাহুল্যে দেবরূপে পরিণত হইয়া এই ব্যক্তি (বিজয়সেন) ধী বা বিবেচনা সহকারে অরাতির বিনাশ, সমাজমর্য্যাদার অনুল্লঙ্ঘনকারীদের পোষণ ও শত্রুচ্ছেদ করিয়া দিব্য (স্বর্গীয়) প্রজার সৃষ্টি, এই তিন কার্য্যই (একসঙ্গে) সম্পন্ন করিতেন।

দত্ত্বা দিব্যভুবঃ প্রতিক্ষিতিভৃতামুর্ব্বীমুরীকুর্ব্বতা
বীরাসৃগ্‌লিপিলাঞ্ছিতোঽসিরমুনা প্রাগেব পত্রীকৃতঃ।
নেত্থং চেৎ কথমন্যথা বসুমতীভোগে বিবাদোন্মুখী
তত্রাকৃষ্টকৃপাণধারিণি গতা ভঙ্গং দ্বিষাং সন্ততিঃ ॥১৯॥

১৯। এই নরপতি ইতিপূর্ব্বেই প্রতিদ্বন্দ্বিরাজগণকে দিব্য ভূমি (স্বর্গ) দান করিয়া (অর্থাৎ তাহাদিগকে যুদ্ধে বিনাশ করিয়া স্বর্গে প্রেরণ করিয়া), (তৎপরিবর্ত্তে) তাঁহাদের ভূমি নিজে অধিকার করিয়া, বীররক্তে (লিখিত) লিপিদ্বারা লাঞ্ছিত বা চিহ্নিত তদীয় অসিকে শাসন বা পত্ররূপে পরিণত করিয়া রাখিয়াছিলেন। যদি তাহাই না হইত, তবে কেন তিনি আকৃষ্ট-কৃপাণ-ধারী হইয়া (অগ্রসর হইলে), বসুমতীর ভোগবিষয়ে বিবাদোন্মুখ শত্রুসন্তানগণ পলায়ণ-পর হইয়া যাইবে?

ত্বং নান্যবীরবিজয়ীতি গিরঃ কবীনাং
শ্রুত্বান্যথামননরূঢ়-নিগূঢ়-রোষঃ।
গৌড়েন্দ্রমদ্রবদপাকৃত কামরূপ—
ভূপং কলিঙ্গমপি যস্তরসা জিগায় ॥২০॥

২০। "তুমি নান্য-বীর-বিজয়ী" (অর্থাৎ নান্য ও বীর নামক রাজদ্বয়ের পরাজয়কারী) কবিগণের এই (স্তুতি) বাক্য শ্রবণ করিয়া ইহার অর্থ অন্যথা ভাবিয়া (অর্থাৎ "তুমি ন-অন্যবীর-বিজয়ী বা অন্য বীরকে পরাজিত করিতে সমর্থ হও নাই" এরূপ নিন্দাবাক্য মনে করিয়া) মনে রোষভাব লুক্কায়িত করিয়া তিনি গৌড়েন্দ্রকে আক্রমণ করিয়াছিলেন, কামরূপ ভূপতিকে বিদুরিত করিয়াছিলেন এবং কলিঙ্গ নরপতিকে বলপূর্ব্বক পরাজিত করিয়াছিলেন।

শূরংমন্য ইবাসি নাস্ত কিমিহ স্বং রাঘব শ্লাঘসে
স্পর্দ্ধাং বর্দ্ধন মুঞ্চ বীর বিরতো নাদ্যাপি দর্পস্তব।
ইত্যন্যোন্যমহর্নিশপ্রণয়িভিঃ কোলাহলৈঃ ক্ষ্মাভুজাং
যৎকারাগৃহযামিকৈর্নিয়মিতো নিদ্রাপনোদক্লমঃ ॥২১॥

২১। 'হে নান্য, যেন এখনও তুমি নিজকে শূর মনে করিতেছ', 'হে রাঘব, এখানে কেন নিজের শ্লাঘা করিতেছ', 'হে বর্দ্ধন, স্পর্দ্ধা ত্যাগ কর', 'হে বীর, অদ্যাপি তোমার দর্প বিরামলাভ করিতেছে না'—এইরূপে (কারারুদ্ধ) রাজগণের পরস্পরের প্রতি দিবারাত্রি প্রজল্পিত কোলাহলদ্বারা তাঁহার (বিজয়সেনের) কারাগারের যামিক বা প্রহরিগণ নিদ্রাচ্ছেদজনিত ক্লান্তির উপশম করিয়া লইত।

পাশ্চাত্যচক্রজয়কেলিষু যস্য যাব—
দ্গঙ্গাপ্রবাহমনুধাবতি নৌবিতানে।
ভর্গস্য মৌলিসরিদম্ভসি ভস্মপঙ্ক—
লগ্নোজ্ঝিতেব তরিরিন্দুকলা চকাস্তি ॥২২॥

২২। যাঁহার নৌবিতান (নৌ-বহর) পাশ্চাত্য (রাজ)চক্রের জয়রূপ কেলি-ক্রিয়াতে গঙ্গাপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে অনুধাবন করিলে পর, শিবের মস্তকস্থিত নদীর (গঙ্গার) জলে ভস্ম-পঙ্কে লগ্ন হইয়া পরিত্যক্ত ইন্দুকলার ন্যায় তরী সমূহ শোভা পাইতেছিল।

মুক্তাঃ কর্পাসবীজৈর্ম্মরকতশকলং শাকপত্রৈরলাবূ—
পুষ্পৈ রূপ্যাণি রত্নং পরিণতিভিদুরৈঃ কুক্ষিভির্দ্দাড়িমানাম্।
কুষ্মাণ্ডীবল্লরীণাং বিকসিতকুসুমৈঃ কাঞ্চনং নাগরীভিঃ
শিক্ষ্যন্তে যৎপ্রসাদাদ্বহুবিভবজুষাং যোষিতঃ শ্রোত্রিয়াণাম্ ॥২৩॥

২৩। যাহার দানানুগ্রহে বহুবিভবভোগকারী শ্রোত্রিয়দিগের পত্নীগণকে নাগরিক স্ত্রীরা কর্পাসবীজদ্বারা মুক্তার, শাকপত্রদ্বারা মরকতমণিখণ্ডের, অলাবুপুষ্পদ্বারা রৌপ্যের, পরিপক্ক হইয়া স্ফুটনোন্মুখ দাড়িমকুক্ষি দ্বারা (অর্থাৎ দাড়িমের অন্তঃস্থিত বীজদ্বারা) রত্নের এবং কুষ্মাণ্ডীলতার বিকসিত কুসুমদ্বারা সুবর্ণের পরিচয় শিক্ষা দিতেন।

অশ্রান্তবিশ্রাণিতযজ্ঞযূপ—
স্তম্ভাবলীং দ্রাগবলম্বমানঃ।
যস্যানুভাবাদ্ভুবি সঞ্চচার
কালক্রমাদেকপদোঽপি ধর্ম্মঃ ॥২৪॥

২৪। কালক্রমে (কলিকালে) ধর্ম্ম একপদবিশিষ্ট হইলেও, যাঁহার (বিজয় সেনের)

প্রভাবে সতত প্রদত্ত যজ্ঞযূপস্তম্ভাবলীকে তৎক্ষণাৎ অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে সঞ্চরণ করিতে পারিতেন।

মেরোরাহতবৈরিসঙ্কুলতটাদাহূয় যজ্বামরান্
ব্যত্যাসং পুরবাসিনামকৃত যঃ স্বর্গস্য মর্ত্যস্য চ।
উত্তুঙ্গৈঃ সুরসদ্মিভিশ্চ বিততৈস্তল্লৈশ্চ শেষীকৃতং
চক্রে যেন পরস্পরস্য চ সমং দ্যাবাপৃথিব্যোর্ব্বপুঃ॥

২৫। যিনি যজ্ঞকারী হইয়া (যুদ্ধে তাঁহার ভুজবলে) আহত শত্রু দ্বারা পূর্ণতট মেরু-পর্ব্বত হইতে দেবগণকে (পৃথিবীতে) আহ্বান করিয়া স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের পুরবাসিগণের স্থান-বিনিময় বিধান করিয়াছিলেন; এবং যিনি অত্যুচ্চ দেবভবনও বিস্তৃত তল্ল বা তড়াগ দ্বারা কৃতাবশেষ স্বর্গ ও পৃথিবীর দেহকে পরস্পরের সমান (পরিমিত) করিয়া তুলিয়াছিলেন।

দিক্‌শাখামূলকাণ্ডং গগনতলমহাম্ভোধিমধ্যান্তরীপং
ভানোঃ প্রাক্‌প্রত্যগদ্রিস্থিতিমিলদুদয়াস্তস্য মধ্যাহ্নশৈলম্।
আলম্বস্তম্ভমেকং ত্রিভুবনভবনস্যৈকশেষং গিরীণাং
স প্রদ্যুম্নেশ্বরস্য ব্যধিত বসুমতীবাসবঃ সৌধমুচ্চৈঃ॥২৬॥

২৬। সেই পৃথ্বীন্দ্র (বিজয় সেন) প্রদ্যুম্নেশ্বরের জন্য দিক্‌শাখার মূলকাণ্ডস্বরূপ, গগন-তলরূপ মহাসাগরের মধ্যস্থিত অন্তরীপতুল্য, পূর্ব্ব-পশ্চিম-পর্ব্বতে অবস্থান করিয়া উদয় ও অস্তলাভকারী সূর্য্যদেবের মধ্যাহ্নপর্ব্বতসদৃশ, ত্রিভুবনরূপ ভবনের একমাত্র আশ্রয়স্তম্ভ ও গিরিসমূহের মধ্যে একমাত্র অবশিষ্ট পর্ব্বতরূপী এক উচ্চ সৌধ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

প্রাসাদেন তবামুনৈব হরিতামধ্বা নিরুদ্ধো মুধা
ভানোস্থাপি কৃতোঽস্তি দক্ষিণদিশঃ কোণান্তবাসী মুনিঃ।
অস্যামুচ্ছপথোয়মৃচ্ছতু দিশং বিন্ধ্যোপ্যসৌ বর্দ্ধতাং
যাবচ্ছক্তি তথাপি নাস্য পদবীং সৌধস্য গাহিষ্যতে॥২৭॥

২৭। হে সূর্য্যদেব, এই প্রাসাদদ্বারাই তোমার (রথের) অশ্বগণের পথ নিরুদ্ধ হইতেছে, তবে কেন অদ্যাপি বৃথাই (অগস্ত্য) মুনি দক্ষিণ দিকের এক কোণে বাস করিতেছেন? তিনি যদি তাঁহার শপথ ত্যাগ করিয়া অন্যদিকে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বিন্ধ্যপর্ব্বতও যদি যথাশক্তি বর্দ্ধিত হয়, তথাপি (সেই বর্দ্ধিষ্যমান বিন্ধ্য) এই সৌধের উচ্চপথ লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হইবে না।

স্রষ্টা যদি স্রক্ষ্যতি ভূমিচক্রে
সুমেরুমৃৎপিণ্ডবিবর্ত্তনাভিঃ।

তদা ঘটঃ স্যাদুপমানমস্মিন্
সুবর্ণকুম্ভস্য তদর্পিতস্য ॥২৮॥

২৮। প্রজাপতি স্বয়ং যদি পৃথিবীরূপ চক্রের উপর সুমেরু পর্ব্বতরূপ মৃৎপিণ্ড স্থাপন করিয়া তদ্বিবর্ত্তন বা তদ্ঘূর্ণন দ্বারা (একটি ঘট) নির্ম্মাণ করেন, তাহা হইলে সেই ঘটই এই সৌধে তদ্দ্বারা (বিজয়সেনদ্বারা) অর্পিত সুবর্ণকুম্ভের একমাত্র উপমান হইতে পারে।

বিলেশয়বিলাসিনীমুকুটকোটিরত্নাঙ্কুর—
স্ফুরৎকিরণমঞ্জরীচ্ছুরিতবারিপূরং পুরঃ।
চখান পুরবৈরিণঃ স জলমগ্নপৌরাঙ্গনা—
স্তনৈণমদসৌরভোচ্চলিতচঞ্চরীকং সরঃ ॥২৯॥

২৯। তিনি ত্রিপুরারি (শিবের) জন্য (সেই সৌধের) সম্মুখে একটি সরোবর খনন করাইয়া দিয়াছিলেন—যে সরোবরের জলৌঘ (জলান্তর্বর্ত্তিনী) নাগবধূদিগের মুকুটাগ্রের রত্নাঙ্কুর হইতে স্ফুরন্ত কিরণমঞ্জরীদ্বারা রঞ্জিত ছিল এবং যাহার উপরিভাগে (স্নানার্থ) জলমগ্ন পৌর রমণীদিগের স্তনতটে ব্যবহৃত মৃগমদের সৌরভে ভ্রমরকুল উড়িয়া বেড়াইত।

উচ্চিত্রাণি দিগম্বরস্য বসনান্যর্দ্ধাঙ্গনাস্বামিনো
রত্নালঙ্কৃতিভির্ব্বিশেষিতবপুঃশোভাঃ শতং সুভ্রুবঃ।
পৌরাঢ্যাশ্চ পুরীঃ শ্মশানবসতে র্ভিক্ষাভুজোঽপ্যক্ষয়াং
লক্ষ্মীং স ব্যতনোদ্দরিদ্রভরণে সুজ্ঞো হি সেনান্বয়ঃ ॥৩০॥

৩০। (শিব) দিগম্বর (নগ্ন) হইলেও তাঁহার জন্য নানাবর্ণাকৃতি বসনের, অর্দ্ধনারীশ্বর হইলেও তাঁহার জন্য রত্নালঙ্কারে শরীরশোভাবর্দ্ধনকারিণী একশত সুভ্রূ রমণী (সেবাদাসী), শ্মশানবাসী হইলেও তাঁহার জন্য পৌরজনপরিপূর্ণ অনেক পুরী এবং ভিক্ষাজীবী হইলেও তাঁহার জন্য অক্ষয় সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন—যেহেতু সেনবংশীয়গণ সবিশেষ জানেন কেমন করিয়া দরিদ্রভরণ করিতে হয়।

চিত্রক্ষৌমেভচর্ম্মা হৃদয়বিনিহিতস্থূলহারোরগেন্দ্রঃ
শ্রীখণ্ডক্ষোদভস্মা করমিলিতমহানীলরত্নাক্ষমালঃ।
বেষস্তেনাস্য তেনে গরুড়মণিলতাগোনসঃ কান্তমুক্তা-
নেপথ্য-নৃস্থিরিচ্ছাসমুচিতরচনঃ কল্পকাপালিকস্য ॥৩১॥

৩১। তিনি (বিজয় সেন) এই কল্পকাপালিক (শিবের) জন্য এইরূপ স্বেচ্ছারচিত বেষের ব্যবস্থা করিলেন, যে বেষে বিচিত্র ক্ষৌমবস্ত্র গজচর্ম্মের, বক্ষঃস্থলবিনিহিত স্থূলহার সর্পরাজের, চন্দনচূর্ণ ভস্মের, করধৃত মহানীলমণি অক্ষমালার, গরুড়মণি-(মরকত)-লতা (অন্যান্য) সর্পসমূহের এবং রমণীয় মুক্তাভূষণ নরকপালের, কার্য্য সম্পাদন করিত।

বাহ্বোঃ কেলিভিরদ্বিতীয়কনকচ্ছত্রং ধরিত্রীতলং
কুর্ব্বাণেন ন পর্য্যশেষি কিমপি স্বেনৈব তেনেহিতম্।
কিন্তুস্মৈ দিশতু প্রসন্নবরদোপ্যর্দ্ধেন্দুমৌলিঃ পরং
স্বং সাযুজ্যমসাবপশ্চিমদশাশেষে পুনর্দ্দাস্যতি ॥৩২॥

৩২। বাহুদ্বয়ের কেলি দ্বারা তিনি পৃথিবীতলে একচ্ছত্রাধিপত্য স্বয়ং বিধান করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার আর অন্য কিছু করণীয় অবশিষ্ট রহিল না। প্রসন্ন হইয়া বরপ্রদানকারী চন্দ্রশেখর (শিব) তাঁহাকে আর কি দিবেন? কিন্তু তিনি অন্তিম দশার শেষে তাঁহাকে নিজ সাযুজ্য (মুক্তি) প্রদান করিবেন।

প্রস্তোতুমস্য পরিতশ্চরিতং ক্ষমঃ স্যাৎ
প্রাচেতসো যদি পরাশরনন্দনো বা।
তৎকীর্ত্তিপূরসুরসিন্ধুবিগাহনেন
বাচঃ পবিত্রয়িতুমত্র তু নঃ প্রযত্নঃ ॥৩৩॥

৩৩। যদি কেহ পারেন, তাহা হইলে বাল্মীকি অথবা পরাশরতনয় ব্যাসদেবই তাঁহার চরিতের স্তুতি সম্পূর্ণভাবে করিতে সমর্থ হইবেন। তবে তাঁহার কীর্ত্তিরাশিরূপ সুরনদীতে (গঙ্গাতে) অবগাহনদ্বারা নিজের বাণীকে পবিত্র করার জন্য এই বিষয়ে (এই প্রশাস্তি রচনায়) আমাদের প্রযত্ন।

যাবদ্বাস্তোস্পতিপুরধুনী ভূর্ভুবঃস্বঃ পুনীতে
যাবচ্চান্দ্রী কলয়তি কলোত্তংসতাং ভূতভর্ত্তুঃ।
যাবচ্চেতো গময়তি সতাং শ্বেতিমানং ত্রিবেদী
তাবত্তাসাং রচয়তু সখী তস্যদেবাস্য কীর্ত্তিঃ ॥৩৪॥

৩৪। যতদিন পর্য্যন্ত ইন্দ্রপুরীর (স্বর্গের) নদী (মন্দাকিনী) ভূর্লোক, ভুবর্লোক ও স্বর্ল্লোক পবিত্রিত করিবে, যতদিন পর্য্যন্ত চান্দ্রমসী কলা ভূতভরণকারী শিবের শিরোভূষণের কার্য্য করিবে, এবং যতদিন পর্য্যন্ত বেদত্রয় পণ্ডিতজনের চিত্তে শুদ্ধি আনয়ন করিবে— ততদিন পর্য্যন্ত ইহাদের (অর্থাৎ স্বর্গগঙ্গা, চন্দ্রকলা ও ত্রিবেদীর) সখীরূপে এই (রাজার) কীর্ত্তিই সেই সেই ক্রিয়া (অর্থাৎ ত্রিলোক পবিত্রকরণ, শিবশিরোভূষণ ও পণ্ডিতগণের চিত্তসংশোধন) বিধান করুক।

নির্ম্মিক্তসেনকুলভূপতিমৌক্তিকানা—
মগ্রন্থিলগ্রথনপক্ষলসূত্রবল্লিঃ।
এষা কবেঃ পদপদার্থবিচারশুদ্ধ—
বুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ ॥৩৫॥

৩৫। এই প্রশস্তি পদ ও পদার্থের বিচার দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি কবি উমাপতিধরের রচনা—ইহা যেন নিষ্কলঙ্ক সেনকুলভূপতিগণরূপ মুক্তাসমূহের গ্রন্থিরহিত গ্রথনকার্য্যের একটি মসৃণ সূত্রবল্লী।

ধর্ম্মপ্রণপ্তা মনদাসনপ্তা
বৃহস্পতেঃ সূনুরিমাং প্রশস্তিম্।
চখান বারেন্দ্রকশিল্পিগোষ্ঠী বারেন্দ্রকশিল্পিগোষ্ঠী—
চূড়ামণী রাণক-শূলপাণিঃ ॥৩৬॥

৩৬। ধর্ম্মের প্রণপ্তা, মনদাসের নপ্তা, বৃহস্পতির পুত্র, বারেন্দ্রকশিল্পিগোষ্ঠীর চূড়ামণি রাণক (উপাধিধারী) শূলপাণি এই প্রশস্তি উৎকীর্ণ করিয়াছিলেন।

পৃষ্ঠা—২৫৫। বীরভূম জেলার অন্তর্গত পাইকোর নামক গ্রামের মনসা-মূর্ত্তি-খোদিত একটি প্রস্তর স্তম্ভের গাত্রে...**রাজেন শ্রীবিজয় সে (নেন)** খোদিত লিপি আছে। এই লিপির প্রথম অংশের ও শেষ দিকের কতকটা অংশ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। [হেতমপুরের কুমার মহিমারঞ্জন চক্রবর্ত্তী প্রণীত "বীরভূমের বিবরণ" দ্বিতীয় খণ্ড ১০ পৃষ্ঠা। [১৯২০ খৃষ্টাব্দ] Mr. K. N. Dikshit...Annual report of the Archaeological survey of India, 1921-22 pp. 78-79 and 80, and PL XXVIII, b.

N. G. Majumdar M.A. Inscriptions of Bengal. Vol. 111. Page 167.

বিজয়সেনের তাম্রশাসন—বারাকপুর ক্যাণ্টনমেণ্টের নিকটবর্ত্তী স্থানে এই তাম্রশাসন খানি পাওয়া যায়। স্বর্গত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' প্রথম ভাগে ইহার সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ করেন। ১৯২০ সালে বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় *Epigraphia Indica, Vol. XV. p. p 278* এ ইহার একটি পাঠ প্রকাশ করেন। ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাক 'সাহিত্য' পত্রিকার ৩১শ বর্ষের (১৩২৮ বাঙ্গালা সালে) ৮১ পৃষ্ঠায় ইহার পাঠ প্রকাশ করেন। স্বর্গত ননীগোপাল মজুমদার মহাশয় Inscriptions of Bengal Vol. Page, 57—67 পৃষ্ঠায় এই শাসন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই তাম্রশাসনের "The expression *Surakulambhodikaumudi* used in regard to Vallalsena's mother Vilasadevi has led to much controversy. It denotes that Vallalsena was born of a daughter of the Sura family".

সেন রাজাদের সম্পর্কে স্বর্গত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী "Notes on the Geography of old Bengal নামক প্রবন্ধে [J. A. S. B. May 1938 Vol. IV No. 6—Page 267 —291] লিখিয়াছেন:—

From about the middle of the twelfth century, the Sena kings, originally of Vanga and Suhma, gradually encroached on the territories

of the Palas, and eventually ousted them from Gauda. During the reign of Laksmanasena Deva, the whole of Gauda appears to have passed into his hands. In the Madanpada plate of his son Visvarupa-senadeva, Laksmanasen is said to have carried his victorious arms southwards as far as Puri in Orissa, and westwards as far as Benares and Prayag. Naturally he came to be called the Gauda king e. g. in the *Pavana-dutta* Dhoy Kaviraja, Similarly in the Bakarganj and Madanapada plates, Visvarupasenadeva, his son is called lord of Gauda.

সদাশিব মূর্ত্তি ২৭০-৭১ পৃষ্ঠা।—বাঙ্গলা দেশে আরও কয়েকটি সদাশিব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। ঢাকা যাদুঘরেও একটি সদাশিব মূর্ত্তি আছে—

1. Black stone (Pt. M. 1. 37) representing Sadasiva seated in meditation was acquired by the Dacca Museum. The deity has ten arms, carrying various weapons, and five faces, four of which are visible. It must belong to the twelfth century and to the reign of Gopala III of the Pala dynasty, as appears from an inscription in two lines engraved on the pedestal. The sculpture exhibits the highly decorative style peculiar to the period. It was found at the village of Rajibpur under the Gangarampur police station in Rajshahi (Annual Bibliography of Indian Archaeology volume XII For the year 1937. Leyden. Printed by E. J. Bill Ltd.—1939 Page 15.

শ্রীযুক্ত নলিনীনাথ দাস গুপ্ত "Sriharsa Misra and Vijayasena নামক একটি প্রবন্ধে বিজয় সেন সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। Indian Culture Vol. No. 3 দ্রষ্টব্য।

২৯২ পৃষ্ঠা

লক্ষ্মণ সংবৎ-পরগণাতি সন—পরগণাতি সন সম্পর্কে ও লক্ষ্মণ সংবৎ সম্বন্ধে কিছু দিন বাঙ্গালার ঐতিহাসিকগণ আলোচনা করেন। আমি "বিক্রমপুরের ইতিহাসে" পরগণাতি সন সম্পর্কে একখানি দলিল প্রকাশ করিয়াছিলাম। সেই চিত্রখানি বর্ত্তমান সংস্করণেও মুদ্রিত হইয়াছে। দলিলের অনুলিপি এখানে প্রদত্ত হইল।

/৭ ইয়াদি জমা মুর্ণ্য ভূমি বিক্রয় পত্র মিদং শ্রীভবানীপ্রসাদ শর্ম্মা ওলধে অনন্তরাম শর্ম্মা মুচরিতেষু শ্রীরামগঙ্গা শর্ম্মণে ওলধে রামকেশব বান্নডি ইবনে রাজীব বান্নডি লিখনং আগে পরগণে বিক্রমপুর সরকার সোণারগাঁও তপে নহাটা হিস্তে রামরাম চৌধুরী আমার ঘরে নিজ তালুক বনামে বামচন্দ্র বান্নডি লিখা যায় এতাহ······কিসমত কামারখাড়া স্থান পশ্চিম নাথের দরজার পশ্চিমের আমার নিজ অংশের যোত যাহা মূল্য এক কোঠা ও বরুইতলা জোত * * * * এক কোঠা একুনে ২ কোঠা কাত মাপ জমি ১৬৸ পন্তুনে সতর গণ্ডির রসি কানি ২৫ পচিস রূপাইয়া পরে ১৪৷৹

চৌদ্দি গণ্ডায় এক কোণ ....জমি বসত............মবলগ ২০৷৷৵ কুড়ি রূপাইয়া তের আনা তোমার স্থানে পাইয়া......বেচিলাম। আমি তোমার এই ভূমি মাফিক চিঠা দরোবস্ত সোমঝ করিয়া দানবিক্রয়াধিকারী হইয়া পুত্রাপৌত্রাদিকারি হইয়া সনে সনে......আমল করিয়া যথিষ্ট বিয়োগ করহ এহার জমার কসিসিন কালে তোমার ঠাই কিছু দায় নাহি এই লিখনে জমা ষূর্ণ্য ভূমি বিক্রয় পত্র......সন ১১৬২ এগারশ বাষাঠ্য **বাংলা পরগণাতী সন ৫৫৪ পাছশ চৌপান্ন** সহরে ১৪ রবিকুরি মাহে ৩ মাঘ রোজ বুদবার।

এই দলিলের বানান সাধারণে যাহাতে বুঝিতে পারেন তজ্জন্য ঈষৎ পরিবর্ত্তন করিয়া দিলাম, কারণ দলিল মধ্যে কোন স্থানেই র-এর নিম্নস্থ বিন্দু লিখিত ছিল না, প্রত্যেকটী ব-এর মত লিখিত ছিল। ৴৭ এইরূপ চিহ্ন সেকালে মঙ্গল চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হইত, বিস্ময়ের বিষয় এই যে, এই দলিল খানার পঞ্চাশ বৎসর পরবর্ত্তী যে কয়েকখানা দলিল পাইয়াছি তাহাতে ৴৭ এইরূপ চিহ্ন কিংবা পরগণাতি সনের কোনও উল্লেখ নাই, ইহার কাঁরণ কি? আবার ১১৬২ সন হইতেও প্রাচীন যে দুই একখানি দলিল দেখিয়াছি তাহাতেও এইরূপ ৴৭ চিহ্ন ও পরগণাতি সনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এখন আমাদের অনুসন্ধান করিতে হইবে যে, কোন্ সময় হইতে এই পরগণাতি সনের সৃষ্টি হইয়াছে। যদি পরগণাতি সন অদ্যাপি প্রচলিত থাকিত তবে আমাদিগকে দলিল পত্রে ৭৩৮ পরগণাতি সন এইরূপ উল্লেখ করিতে হইত। দুঃখের বিষয় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বেও যাহা প্রচলিত থাকিয়া একটা প্রাচীন স্মৃতি বহন করিতেছিল, নূতন রাজশক্তির আবির্ভাবে নবীন শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ক্ষীণ স্মৃতি ভবিষ্যদ্বংশীয়দের নিকট হইতে অন্তর্হৃত হইয়াছে।

'ঢাকার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ডে ৩৯৪-৩৯৭ পৃষ্ঠায় পরগণাতি সন সম্বন্ধে আলোচিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৩২০ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'গৃহস্থ' পত্রের 'পরগণাতি সন' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখিয়াছেন—"এই পরগণাতি সনের উল্লেখ প্রথম বন্ধুবর শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয়ের বিক্রমপুরের ইতিহাসে পাই।" অতঃপর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন রায় আবদুল্লাপুরের আখড়ার পুরাতন পুঁথির স্তূপের মধ্যে "স্বপ্নাধ্যায়" নামক একখানি ক্ষুদ্র প্রাচীন খণ্ড পুঁথিতে সন বলালি দেখিতে পান। যতীন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন—"এই পুঁথির শেষ পাতায় লিখিত আছে: রচিল নারায়ণে ইতি স্বপ্ন-অধ্যায় পুস্তক সমাপ্ত। ইতি সন ১১৭৬ সন তিরিখ ২২ ভাদ্র, রোজ মোঙ্গলবার রাত্রি দুই দণ্ড গত কালে মোকাম হত্রবতনগরের গোলাতে বসিয়া সমাপ্ত ইতি। ভিমস্যাপি রণে ভঙ্গ মুনিনাঞ্চ মতিভ্রম যথা দিষ্টং তথা লিখিতং লেখক নাস্তি দোসকঃ। সকীয় পুস্তক মিদং শ্রীযুগলকিশোর দাষক **"সন বলালি** ৫৭০ সন সকাব্দা ১৬৯২ তিথি পূর্ণিমা।"

আউটসাহী নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রভূষণ গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন বাল্লালি-সন-যুক্ত একখানি দলিল মুন্সীগঞ্জের কোনও আদালতে তাঁহারা দাখিল করিয়াছিলেন। ডক্টর ভট্টশালী মহাশয়ের মতে "সন বলালি ও পরগণাতি সন" অভিন্ন এবং ইহার আরম্ভ কাল ১২০০ খৃষ্টাব্দ। "স্বর্গত নগেন্দ্রনাথ বসুর মতে—" লক্ষ্মণ সেনের রাজ্যাতীতাব্দ মুসলমান আমলে "পরগণাতী সন" বা পরগণাতীত সন" নামে বহুকাল প্রচলিত ছিল। বিক্রমপুরের বহু প্রাচীন কাগজ পত্রে এই পরগণাতী সনের উল্লেখ রহিয়াছে।

১২০০ খৃষ্টাব্দে ১ম বর্ষ ধরিয়া এই "পরগণাতী সনের" বর্ষ গণনা চলিয়া আসিতেছে। মনে হয়, এই অতীত রাজ্যাঙ্ক মুসলমানের গৌড় বিজয় নির্দ্দেশক ছিল বলিয়া "লক্ষ্মণ সেনের নাম তুলিয়া দিয়া মুসলমান-রাজপুরুষগণ তাহাই "পরগণাতী সন" নামে চালাইয়া দিয়াছেন।" [বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস-রাজন্যকাণ্ড ৩৫৩ পৃষ্ঠা]।

যতীন্দ্রবাবু 'ঢাকার ইতিহাসে'র ৩৯৬ পৃষ্ঠায় কয়েকখানা পরগণাতি সন বা সন বল্লালির সহিত বঙ্গাব্দ বা শকাব্দা মিলাইয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ১৩২০ সালের ফাল্গুন মাসের 'গৃহস্থ' পত্রিকায় "পরগণাতি সন" নামক একটি প্রবন্ধে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন। 'প্রতিভা' পত্রিকার ১৩১৮ সালের নবম সংখ্যায়ও এ বিষয়ে আলোচিত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত ঈশান চন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয় ১৩২২ সালের শ্রাবণ, ৩য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যায় "বিজয়া" নামক পত্রে "**পরগণাতিসনরহস্য 'নামক** একটি প্রবন্ধে পরগণাতি সন সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া আমাদের প্রকাশিত পরগণাতি সন সংযুক্ত দলিল খানার আলোচনা করিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে শ্রীহট্ট ও ত্রিপুরায় ও পরগণাতি সন প্রচলিত ছিল। ঈশানবাবু তাঁহার প্রবন্ধে কয়েকখানি "পরগণাতি সন" যুক্ত দলিলের উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পাঁচ খানায় কেবলমাত্র পরগণাতি সন আর দুই খানায় বাঙ্গালা ও পরগণাতি এই উভয় প্রকার সন ছিল। ঈশান বাবু বলেন—"যতদূর চিন্তা ও আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, পরগণাতি সন, যে কোনও বিশেষ ঘটনাধীনেই হউক, মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে প্রবর্ত্তিত হইয়া কিছুকাল প্রচলিত ছিল। পরে ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিলুপ্ত হইয়াছে।" ১৭৯২ খৃষ্টাব্দের পরবর্ত্তী সময়ের কোনও দলিলে পরগণাতি সনের উল্লেখ আজ পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। বাঙ্গালা একাদশ শতাব্দীর (খৃষ্টীয় সপ্তদশ) পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও পরগণাতি-সনের নাম পাই নাই। পরগণাতি সনের ইহাও এক রহস্য।"

কিন্তু একথা সত্য নহে। আমরা পরগণাতি সন সংযুক্ত অনেক দলিল অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বেরও প্রাপ্ত হইয়াছি। আমার কাছে বর্ত্তমানে বহু পরগণাতি সন যুক্ত দলিল সংগৃহীত আছে। ঐরূপ দলিলগুলির প্রতিলিপি দেওয়া সম্ভবপর হইল

না বলিয়া দিলাম না। বিক্রমপুর কাউলীপাড়া বা কালীপাড়ার জমিদার চন্দনধূল নিবাসী শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, বর্ত্তমান ইছাপুরানিবাসী সুরেশকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাইজপাড়া গ্রামের জমিদার শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন রায় ঐরূপ অনেক দলিল আমার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। কাজেই ঈশানচন্দ্র রায়-চৌধুরী মহাশয়ের উক্তি গ্রহণযোগ্য নহে বরং বিচার সাপেক্ষ। ঈশানবাবু এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছেন।

ডক্টর হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী তৎপ্রণীত ভারতবর্ষের ইতিহাসের ৯৪ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন —১১১৯ খৃষ্টাব্দে যে লক্ষ্মণ সম্বৎ প্রচলিত হইয়াছিল, লক্ষ্মণ সেনই তাহার প্রবর্ত্তক। আবার Sir Asutosh Jubilee Volume ; Orientalia Pt. 2.P.1. লিখিয়াছেন :

"Its origin is to be sought in the Sena dynasty of Pithi and not in the Sena dynasty of Bengal, because it was never used by the Senas of Bengal and its earliest use was confined to Bihar where there is epigraphic evidence of the *existence of a line of Sena kings who actually used the era.* There are two epigraphs of Asokavalla known as Bodh-Gaya inscriptions and another of Jayasena found at Janibigha, a place close to Bodh-Gaya, and the dates of these three epigraphs are expressed as follows :—

(1) Srimal-Lakhvana (Ksmana)Senasya-atitya-rajye. S. 51. II. Srimal-Laksmansenadevapadanam-atita-rajye. S. 74. III Laksmansensya-atita-rajya. S. 83.

"The uniform manner of the expression of these three dates in the records of two kings of Pithi shows that they refer clearly to the post-regnal year of a king or an era. Calculating these dates according to La Sam, Dr. Roy Chowdhury says that the king whose reign was a thing of the past in the year 51 (=1170 A. D.) can not be identified with Laksmanasena of Bengal who ruled in the last quarter of the twelfth century. Therefore he concludes, "If the founder of Laksmansena-Era was not identical with Laksmana Sena of Bengal, he must have been the founder of the Sena dynasty of Pithi."......Curiously enough Dr. Roy Chowdhury does not mention any king of Pithi of the name of Laksmana Sena. The Early History of Bengal Page 102-103. Pramode Lal Paul M.A.

অধ্যাপক শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক ডক্টর শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার 'ভারত বর্ষের ইতিহাসে'র ৮২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন, "অনেকে মনে করেন, ১১১৯ খৃষ্টাব্দ হইতে **লক্ষ্মণ-সংবৎ** নামক যে অব্দের গণনা আরম্ভ হইয়াছিল, তাহা লক্ষ্মণসেনের রাজ্যারম্ভ হইতেই প্রবর্ত্তিত হয়। এই ধারণা সত্য বলিয়া মনে হয় না। সম্ভবতঃ লক্ষ্মণসেন দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজত্ব করিয়াছেন। এই সময়ে আর্য্যাবর্ত্তের পশ্চিমাংশ মুসলমানগণের করতলগত হইয়াছিল।" এই সম্বন্ধে এখন পর্য্যন্তও আমরা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি নাই। এবিষয়টি এখনও অনুসন্ধান সাপেক্ষ রহিয়াছে।

লক্ষ্মণ সেনের পলায়ন কলঙ্ক—কাহারও কাহারও মত এইরূপ মাধব সেনের সময় খিলিজি বঙ্গ-বিজয় করেন :—

"It is certain that the descendants of Laksmansensa ruled in Eastern Bengal for a long time after the event. It is even possible that Nadiya may have been attacked after the death of Laksmansena during the reign of Madhavasena whose name appears to have been erased from this Bukerganj Copper-plate. We, therefore, think that if we put the two records together, the reasonable inference would be that Bengal fell after resistance and not as ignominously as depicted in the account. Laksmanasen's Flight from Nadiya. C. V. Vaidya. Indian Historical Quaterly. Edited by Narendranath Law. Vol. 1. No. 4. December 1925.

নবম অধ্যায়—ডক্টর শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় ১৩৪৪ সালের ফাল্গুন সংখ্যার "প্রবাসী" পত্রে ৬৩১-৬৫৭ পৃষ্ঠায় "প্রাচীন বঙ্গে দারু-ভাস্কর্য্য" নামক প্রবন্ধে প্রাচীন বাংলার রাজধানী শ্রীবিক্রমপুর নগরীর নালা পুষ্করিণী হইতে প্রাক্ মুসলমান যুগের দারু-ভাস্কর্য্যের যে সকল নমুনা ঢাকার চিত্রশালায় সংগৃহীত হইয়াছে তাহার পরিচয় দিয়াছেন। রামপাল হইতে সংগৃহীত কাষ্ঠস্তম্ভ, মূর্ত্তি, ইত্যাদি "প্রাক্ মুসলমান যুগের দারু-ভাস্কর্য্য, বাস্তবিকই কৌতুহলোদ্দীপক। আমরা তাহার কয়েকটীর চিত্র প্রকাশ করিয়াছি।

একটি বৌদ্ধমূর্ত্তি (স্থির চক্রমঞ্জুশ্রী ?) ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :— "১৩০৫ খৃষ্টাব্দে পূর্ব্ববঙ্গে মুসলমান অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। এই মূর্ত্তি তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী। * * * আনুমানিক ১২৪০ খৃষ্টাব্দে সেন-বংশের পতনের পর ১৩০৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুর রাজধানীতে "নারায়ণকৃপাপ্রসাদসমাপাদিত গৌড়রাজ্যং" অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথ দেবের বংশের রাজত্ব। এই অরিরাজ দনুজমাধব শ্রীমদ্দশরথ দেব মুসলমান ঐতিহাসিকগণের নিকট দনুজ রায় বলিয়া পরিচিত। ইনি পরম বৈষ্ণব, নারায়ণের কৃপায়

গৌড় রাজ্য—অর্থাৎ বিস্তৃত সেন-রাজ্যের পূর্ব্ববঙ্গস্থ অংশে অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া নিজের আদাবাড়ী তাম্রশাসনে লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার বংশের অধিকারকালে রাজবাড়ীর অভ্যন্তরে, অথবা অব্যবহিত বাহিরে বৌদ্ধ মন্দিরের অবস্থান বিশেষ সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। দনুজরায়ের বংশের পূর্ব্ববর্ত্তী সেনবংশ ও বর্ম্মবংশের অধিকার কাল সম্বন্ধেও সেই কথা খাটে। তবে এক কথা আছে। সামলবর্ম্মের বজ্রযোগিনী শাসনে দেখা যায়, তিনি নারায়ণের প্রীতি কামনায় বিষ্ণুচক্রমুদ্রা দ্বারা মুদ্রিত তাম্রশাসন দ্বারা ভীমদেব-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধদেবী প্রজ্ঞাপারমিতার মন্দিরে ভূমি দান করিতেছেন। কাজেই বর্ম্ম-যুগে রাজবাড়ীর নিকটেও বৌদ্ধ মন্দিরের অবস্থান অসম্ভব নহে। বর্ম্ম-বংশের পূর্ব্বে পরমসৌগত মহারাজাধিরাজ শ্রীচন্দ্র বিক্রমপুর রাজধানী হইতে পূর্ব্ববঙ্গ শাসন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আমলে (আনুমানিক ৯৮৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১০২০ খ্রীষ্টাব্দ) রাজবাড়ীতে বৌদ্ধমন্দির থাকাই স্বাভাবিক এবং এমন অপূর্ব্ব কলানৈপুণ্যমণ্ডিত মূর্ত্তি ঐ আমলেই নির্ম্মিত হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্ধারণ যুক্তিসঙ্গত। এই হিসাবে এই দারু-মূর্ত্তিটির বয়স প্রায় ৯৩১ বৎসর হইয়াছে বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায়।

নৈর পুকুর—ডক্টর ভট্টশালী মহাশয় নৈর পুকুর সম্বন্ধে বলেন—নৈ একজন অজ্ঞাত কুলশীল রাজার নাম বলিয়া মনে হয়। পুকুরের আয়তন দেখিয়া মনে হয়, ইনি বেশ বড় রাজা ছিলেন। ভাগীরথীর উত্তর কূলেও নৈহাটি অভিধেয় গ্রামগুলির নামে, এই রাজারই নাম বিজড়িত রহিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অপর পক্ষে বক্তব্য এই যে, নৈ-নদীর শব্দের অপভ্রংশ হওয়াও অসম্ভব নহে।”

আমরা ভট্টশালী মহাশয়ের নৈ-রাজার নাম হইতে নৈর পুকুর নাম হইয়াছে এই উক্তি সমর্থন করি না। নৈ-সংস্কৃ নদী, প্রাকৃ-নেঈ, নৈ-নদী-কটক দেখি স্নান করি মহা নৈ-কূলে চৈ-ভা। [জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান] কাজেই নদীর সহিত তুলনায় বিশালকায় দীঘি কিংবা নৈ-শব্দে নূতন খনিত দীঘি অর্থেও বুঝাইতে পারে। নৈ-রাজা অপেক্ষা নৈ-নদী বা নূতন পুকুর অর্থে ব্যবহৃত হওয়াই স্বাভাবিক।

৩৫১—৩৫২ পৃষ্ঠা

বিক্রমপুরের যে শোকাবহ জহরব্রত অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, সে কোন্ নৃপতি? তাহা অদ্যাপিও স্থিরীকৃত হয় নাই। এই প্রসঙ্গে ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের’ ঐতিহাসিক ও “বৃহৎ বঙ্গ” প্রণেতা ডক্টর দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় বলেন,—

“আড়াই শত বৎসরের প্রাচীন হস্তাক্ষরে লিখিত রাঘব-পঞ্জী নামক কুলগ্রন্থ আমার নিকট রক্ষিত আছে। সেই পঞ্জীতে দৃষ্ট হয় দিগম্বর, নীলাম্বর ও বিষ্ণুদাস ফৌজদার নামক দাশবংশীয় তিন ব্যক্তি খৃঃ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুয়াপুর গ্রামে আসিয়া বাস করেন। ইঁহারাই “বাজাসনের দাশ।”

এই তিন ব্যক্তি সামান্য বা নগণ্য ছিলেন না। ইঁহারা প্রসিদ্ধ পম্থদাশের বংশধর, এবং পম্থদাশ হইতে দশম স্থানীয়। পম্থদাশ মহারাজ বল্লাল সেনের প্রধান সেনাপতি ছিলেন; চন্দ্রপ্রভায় ইহার সম্বন্ধে এই ভাবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়;—

"সংগ্রামদক্ষো হতবৈরিপক্ষো গৌড়েশ-সেবার্জ্জিত পৌরুষঃ শ্রীঃ।
দাতা বিনীতঃ পরিপাল্য লোকান্ স বালিনছ্যাং বসতিং চকার॥"

(মুদ্রিত চন্দ্রপ্রভা, পৃঃ ৩১৫)

এই বংশীয় ভূতপূর্ব্ব পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কলিকাতা নিবাসী জগদীশনাথ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে বল্লাল সেন কর্ত্তৃক পম্থদাশকে প্রদত্ত সনন্দ সেদিন পর্য্যন্ত রক্ষিত ছিল। পম্থদাশকে বল্লাল সেন মহাকুল প্রদান করেন। কিন্তু চণ্ডালিনী-দোষ-সম্পৃক্ত বল্লালের প্রদত্ত কুল বৈদ্যগণ প্রথমতঃ স্বীকার করেন নাই।

"বারেন্দ্র কায়স্থ, বৈদ্য, বৈদিক ব্রাহ্মণ
বল্লালের কুল না লইল তিনজন॥"

এই প্রবাদ অতি প্রাচীন। লক্ষ্মণ সেনের সময়ে বৈদ্যগণ কুল গ্রহণ করেন কিন্তু সে সময়েও বল্লালী কুল এদেশে সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। প্রাচীনতর-আভিজাত্য-দৃপ্ত বরেন্দ্র-দেশবাসীরা এই নূতন কুলীন সৃষ্টির বিপক্ষে প্রবল প্রভাবে বাধা দিয়াছিলেন। বল্লালী কুল ক্রমে সেই বাধা অতিক্রম করিয়া দেশময় সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করিল। কিন্তু বল্লালী কুলের শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রতিপত্তি লক্ষ্মণ সেনের প্রায় সার্দ্ধশতবৎসর পরে বঙ্গদেশে স্বীকৃত হইয়াছিল। পম্থদাশ হইতে নবম স্থানীয় চণ্ডীবর এইভাবে স্বজাতি-সমাজে অবিসম্বাদ শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ইনি রাঢ়দেশে মৌড়েশ্বর গ্রামে বাস করিতেন। বিদ্যা বুদ্ধি এবং মর্য্যাদায় যাঁহারা তৎকালে বৈদ্য সমাজের অগ্রণী ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে চণ্ডীবর অন্যতম। চণ্ডীবরের প্রপিতামহী সেন-ভূমের রাজা চন্দ্রসেনের কন্যা ছিলেন। চণ্ডীবরের পিতামহের দুই সহোদরা বিক্রমপুরের বৈদ্যরাজবংশে বিবাহিতা হন। বিক্রমপুরের ২য় বল্লালসেন (যিনি পোড়ারাজা নামে খ্যাত হন) এই দুই সহোদরার জ্যেষ্ঠাকে বিবাহ করেন। দ্বিতীয়া সহোদরা উক্ত রাজবংশের কাহনু খাঁর সহিত পরিণীতা হন। দ্বিতীয় বল্লালের এই মহিষীই অগ্নিকুণ্ডে প্রাণত্যাগ করিয়া স্বামীর অগ্রগামিনী হন। সকলেই অবগত আছেন, নিদারুণ মর্ম্মপীড়ায় বল্লাল তাঁহার মহিষী ও অপরাপর পরিবারবর্গের সহিত জলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছিলেন। ১৩৫০ খৃঃ অব্দের কিছু পূর্ব্বে এই দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়। [প্রবাসী—আষাঢ়, ১৩১৯। ১২শ ভাগ, ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা, ঢাকা জেলার কয়েকটি প্রাচীন স্থান]

সুবর্ণগ্রামের ইতিহাস প্রণেতা স্বরূপচন্দ্ররায়ের মতে—

দ্বিতীয় লক্ষ্মণ সেন
|
সুষেণ, বা সুর সেন
|
দনুজ রায়
|
পোড়া রাজা বা দ্বিতীয় বল্লাল সেন।

গোপালভট্ট রচিত বল্লাল চরিত মতে—

বৈদ্যবংশাবতংসোঽয়ং বল্লালোনৃপ-পুঙ্গবঃ।
তদাজ্ঞয়া কৃতমিদং বল্লালচরিতং শুভম্॥
গোপাল ভট্টনাম্না চ তদ্রাজশিক্ষকেন চ।
অঙ্করাজজমানে বসুভির্বাণৈরধিকশাকেষু।
রুদ্রৈশ্চ দর্শিতে মাসে রাশিভির্মান সম্মিতৈঃ॥

অর্থাৎ ১৩০০ শকাব্দে (১৩৭৮ খৃঃ অব্দে) বৈদ্য বংশোদ্ভব রাজা বল্লালের অনুজ্ঞায় তদীয় শিক্ষক গোপাল ভট্ট কর্তৃক বল্লালচরিত রচিত হইল। এই বল্লাল চরিত পাঠে ও জানিতে পারা যায় যে বৈদ্যরাজ বল্লাল বাবা আদম নামক মুসলমানের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার পরিজনবর্গ জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া দেহত্যাগ করিয়াছিলেন।

বাবা আদম সম্বন্ধে Arch. Survey of India 1927-1928 এর রিপোর্টে বাবা আদমের মসজিদের সংস্কার কার্য্য সম্পর্কে লিখিত আছে :—

"An important monument in Eastern Bengal where an expenditure of Rs. 3,780 on special repairs was recorded during the year is the mosque of Baba Adam or Adamsahid at Kazi Kasba in the village of Rampal in the Dacca district. From an inscription preserved in its front wall, the mosque was built by Malik Kafur in the year 888 A. H. (1483 A. D.) in the reign of Jalaluddin Fateh Shaha, Sultan of Bengal, although the saint in whose name It was erected and part of whose remains are enshrined in the adjoining tomb is supposed to have lived sometime in the 12th century A. D. The story goes that the aid of this renowned saint of Arabia was sought by some oppressed Mahammadan subject of king Ballal sena of Rampal and in the struggle that ensued, both the saint and the king lost their lives".

Whatever the historical truth underlying the tradition, it seems clear that Baba Adam must have been one of the earliest pioneers of Islam in Vikrampur, the most important stronghold of Hindu and Buddhist influences in Eastern Bengal in the times immediately preceding the Mahammadan invasion.

The mosque is a typical specimen of the early pathan style architecture in Bengal. It has two octagonal pillars apparently Hindu origin supporting the springs of arches of six domes. The front facade shows the typical curved cornice, being probably the earliest known example of this style in a Mahammadan building. The three miharbs in the western wall were ornamented with beautiful moulded brick wall. The building seems to have suffered much by natural decay and from the invasion of pirates from the Arracan coast, the latter being probably responsible for the denundation of the stone capitals of the pilasters in the walls. Conservation included rebuilding all spalled and disintegrated brick work in the interior walls and arches of the facades, underprinning the foundations of the exterior walls, reconstruction of the cornice in accordance with the old construction and the water proofing of the roof, pages 43 44.

জৈনধর্ম্ম—বিক্রমপুরের কোন কোন স্থান হইতে অতি সামান্য দুই একটি জৈনপ্রভাব-সূচক মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। আর **জৈনসার** গ্রাম নামটি জৈনপ্রভাব সূচক বলিয়া মনে হয়। এ বিষয়ে বিক্রমপুরের ইতিহাসের দ্বিতীয় খণ্ডে বিস্তারিত ভাবে আলোচিত হইবে।